সেরা একশো

প্রস্তাবনা

মৃত্যুর পর অতিক্রান্ত হয়েছে প্রায় একটি শতাব্দী, আজও ও হেনরীর ছোট গল্প সারা পৃথিবীর ছোটগল্প পিপাসু জনমানসে আগের মতোই জনপ্রিয়তার স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে অবস্থান করছে। ও হেনরীর ছোটগল্প তার আপন বৈশিষ্টে সমুজ্জল, প্রতিটি গল্পের মধ্যে এক তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তিনি সমাজকে চিহ্নিত করেছেন আপন অভিধায়। তাকে সাজিয়েছেন নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে, তাই পরিবর্তিত পরিবেশে, সম্পূর্ণ রূপান্তরিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় অথবা বিজ্ঞানের অভাবিত উন্নতির মুহূর্তে ও হেনরীর গল্প ঠিক আগের মতোই আমাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করে। তাই ও হেনরীকে বলা হয় আমেরিকান ছোটগল্পের মুকুটহীন সম্রাট।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, আমেরিকান ছোটগল্পের যে ক্রমবিকাশের ধারা আরভিনের জগৎ থেকে শুরু হয়েছিল এবং এডগার অ্যালান পোর হাতে যার বিস্তৃতি, অবশেষে ডেমন রুনইয়ন থেকে পি. জি. ও.রুরকি পর্যন্ত যে ছোটগল্প পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষকে আবিষ্ট করেছে, এই ইতিহাসে ও. হেনরীর একটি বিশিষ্ট অবদান আছে। সারা জীবনে ও. হেনরী ২৭০ টির মতো ছোটগল্প লিখেছেন। তার মধ্যে অর্ধ-বাস্তবতা, কৌতুকবোধ, আবেগ, হৃদয়ের আকুতি এবং ছোটগল্পের যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আকস্মিক পরিসমাপ্তি — এসবের এক উল্লেখযোগ্য সংমিশ্রণ দেখা যায়। অনেক সময় সমালোচকদের দৃষ্টিতে তিনি চিহ্নিত হয়েছেন এক কৌতুকপ্রিয় আমুদে লেখক হিসেবে। কিন্তু ও. হেনরী জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট ছিলেন এবং তাঁর এই আকর্ষণের সবিশেষ পরিচয় আমরা পাই 'আ মিউনিসিপ্যাল রিপোর্ট' (A Municipal Report) ও 'দি ফার্নিশড্ রুম' (The Furnished Room)— এই দুটি আশ্চর্য ছোটগল্পে। আবার জীবনের বেদনাঘন মুহূর্তকে তিনি কৌতুকের মায়াজালে আবদ্ধ করতে পারতেন যার উল্লেখ আছে 'হোস্টেজ টু মোমাস (momus)' নামক গল্পের মধ্যে।

জন্ম-মুহূর্ত থেকেই তিনি ছিলেন বিশ্বপথিক, জীবনকে নানাভাবে আস্বাদ করার বিরলতম অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর। তাই বোধহয় তিনি এত সুন্দরভাবে জীবনকে রূপায়িত করতে পেরেছেন তাঁর অমর লেখনীর মাধ্যমে।

১৮৬২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা প্রদেশে জন্ম হয়েছিল উইলিয়াম সিডনী পোর্টারের। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ লাভে বঞ্চিত ছিলেন তিনি। তরুণ বয়সে একটি ওযুধের দোকানে চাকরি করতে হয়েছিল উইলিয়াম সিডনী পোর্টারকে। অবশেষে ১৮৮২ সালে তিনি টেক্সাস যাত্রা করেন, তারপর পেশাগত পরিবর্তনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে আসেন সাংবাদিকতার পেশায়। একটি ব্যাঙ্গধর্মী সাপ্তাহিক পত্রিকায় লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে তাঁর। এরপর হাউস্টন পোস্টে (houston Post) তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হল কৌতুকপ্রদ দৈনিক কলাম লেখার জন্য।

১৮৯৬ সালে উইলিয়ম সিডনী পোর্টারের জীবনে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যায়। যে ব্যাঙ্কে তিনি চাকরি করতেন, সেখানে তার প্রতি আরোপিত হয় কিছু অভিযোগ এবং এই কারণে হন্ডুরাসে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। তিনি ফিরে এলেন তিন বছর বাদে এবং মৃত্যুপথযাত্রিনী জীবনসঙ্গিনীকে সঙ্গে করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাঠানো হলো কলম্বাসে।

জীবনের এই বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে পোর্টার, ও হেনরী ছদ্মনাম গ্রহণের ব্যাপারে একটি অদ্ভুত ঘটনা আছে। যখন তিনি ওষুধের দোকানে কাজ করতেন, পি. ইউ. এস. ডিসপেনসারিতে একটি ফরাসী ফার্মাসিস্টের নাম দেখতে পান। এই নামটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তিনি ও. হেনরী নামটি গ্রহণ করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ও. হেনরী সাহিত্য পিপাসু পাঠক-পাঠিকার অন্তরে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেন। ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর অনবদ্য ছোটগল্প-সংকলন — যথাক্রমে ১৯০৬ সালে 'দ্য ফোর মিলিয়ন', 'হার্ট অব দ্য ওয়েস্ট' ১৯০৭ সালে, ঐ বছরই 'দ্য ট্রিমড্ ল্যাম্প', ১৯০৮ সালে 'দ জেন্টল গ্র্যাফ্টার' ও 'দ্য ভয়েস অব দ্য সিটি', ১৯০৯ সালে 'অপশনস্ ও 'রোডস্ অব ডেস্টিনি' এবং ১৯১০ সালে 'হুইরলজিস' ও 'স্ট্রিক্টলি বিজনেস।'

ইতিমধ্যে তিনি একটি অনবদ্য উপন্যাস 'অফ ক্যাবেজেস অ্যা কিংস' রচনা করেছিলেন।

অবশেষে ১৯১০ সালে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে উইলিয়ম সিডনী পোর্টারের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে অপ্রকাশিত গল্পগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয় এবং আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ 'ম্যাগাজিন স্টোরি রাইটার' কে ও. হেনরী মেমোরিয়াল পুরস্কারে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জীবনে যে তিন বছর যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন ও. হেনরী, তখন তিনি গিয়ে পড়েছিলেন এমন দেশে যেখানকার জনতা চঞ্চল আর জীবনের আপাত-উম্মাদনায় বিশ্বাসী। তাই হন্ডুরাসের এই রূপক-কাহিনীর ছায়া আছে তাঁর অনেক গল্পে।

ও. হেনরীর সুবিখ্যাত গল্প-সংকলন থেকে সাজিয়ে দেওয়া হলো আপনাদের সামনে, এই গ্রন্থ প্রকাশের অন্তরালে এ. পি. পি. র কর্ণধার অশোক রায়ের আন্তরিক অনুপ্রেরণার কথা প্রথমেই বলতে হবে। আমরা আশা করবো ছোটগল্পের ইতিহাসে বাংলাভাষা চিরদিনের জন্য সম্মানজনক স্থানে অবস্থান করুক। বাঙালী পাঠক-পাঠিকার কাছে বিশ্বের ছোট গল্প বারে বারে তার গৌরবে ভাস্বর হয়ে ওঠে। ও. হেনরীর 'সেরা একশো' আপনাদের মনোরঞ্জনে সার্থক হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রেষ্ঠ উপহার

নিচের দেউরিতে কাঠের লেটার বক্স-এ জেমস-ডিলিংহাম (ইয়ং) নামটা যেন মালিকের আর্থিক দুরবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। বেচারার দোষ নেই, খোদ মালিক জিমি ডিলিংহামের সাপ্তাহিক আয় তিরিশ ডলার থেকে নেমে যে দাঁড়িয়েছে মাত্র কুড়ি ডলারে।

এদিকে কালই বড়দিনের পর্ব। কি করে বেচারী মিসেস ডিলিংহাম ওরফে তরুণী ডেলা! প্রিয়তম স্বামীকে বড়দিনে একটি তাক লাগানো উপহার দেওয়ার বাসনা তার কতদিনের। গোপন সঞ্চয়ের ক্ষুদ্র ভাড়াবটি খুলে দেখে তার বিষন্ন মুখ আরও ম্লান হয়ে এলো। মাত্র এক ডলার সাতাশি সেন্ট। তার মধ্যে ষাট সেন্ট ছিল পেনিতে। পেনিগুলো একটা দুটো করে সে জমিয়েছে। মুদি, সব্জীওলা, মাংসওলা সবার সঙ্গে লাগাতার দর কষাকষি করে। পাড়ায় হাড়কেপ্পন বলে নাম রটে গেছে তার।

কিন্তু কি হবে এই সামান্য পয়সায়? কত নিভৃত মুহূর্তে সে কেবল এই স্বপ্নই দেখেছে, যে সে তার আদরের জিমিকে একটি দুষ্প্রাপ্য, সুন্দর ঠিক জিমের রুচির সঙ্গে মানানসই উপহার কিনে দিচ্ছে, কিন্তু মাত্র এক ডলার সাতাশি সেন্টে সে রকম উপহার তো হতেই পারে না।

জানলার বাইরে ধূসর রঙের খিড়কির ধূসর দেওয়ালের ওপর দিয়ে যে বেড়ালটা এক্ষুনি হেঁটে গেল, তার রঙটাও ধূসর, ঠিক তার বিষন্নতার রঙ।

পুরোনো তেলচিটে সোফা ছেড়ে এসে ডেলা আয়নার কাছে এসে দাঁড়াল। চোখের জল মুছে নিয়ে এক পলক দেখলো নিজেকে। তারপর মাথার ওপর হাত দিয়ে কাঁটাদুটো খুলে নিতেই জলপ্রপাতের মত একঢাল রেশমী চুলের তরঙ্গ বয়ে গেল। আশ্চর্য শ্রীময়ী দেখালো তার ছিপছিপে একহারা চেহারাটিকে।

অল্পবয়সী দুটি ছেলেমেয়ের এই দীনহীন ঘর গেরস্থলীতে কেবলমাত্র দুটি জিনিষই ছিল মূল্যবান। ডেলার এই অঢেল চুলের রাশি আর জিমির পিতামহের কাছ থেকে পাওয়া সুন্দর একটি হাতঘড়ি। এছাড়া দুজনের ভালবাসা ছিল অমূল্য, এ কথা বলাই বাহুল্য।

আয়নায় নিজের চেহারা দেখে এক মুহূর্তের জন্য থমকালো ডেলা, তারপরেই উত্তেজনায় বড় হয়ে উঠলো তার চোখদুটি। দ্রুতহাতে পুরোনো বাদামী জ্যাকেটটা গায়ে জড়িয়ে নিল, মাথায় পরে নিল পুরোনো বাদামী টুপিটা।

দুতিন লাফে সিড়িগুলো টপকাতেই একেবারে রাজপথে। শীতের উজ্জ্বল নরম আলোয় মায়াময় হয়ে উঠেছে পৃথিবী। রাস্তায় অগনিত দোকানে অভাবনীয় পন্যসম্ভার হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দৃঢ় পদক্ষেপে ডেলা মাদাম সাফ্রেনির কেশপ্রসাধনের দোকানে এসে ঢুকলো। বিশালবপু মাদাম সাফ্রেনিকে রাজি করিয়ে ফেললো তার মাথার চুলগুলি কিনতে। বিশ ডলার দাম দিলেন মাদাম।

এর পরের দুটো ঘন্টা যেন প্রজাপতির পাখায় উড়ে চলে গেল। অনেক খুঁজে, অনেক বেছে একদম হঠাৎই ডেলা পেয়ে গেল ঠিক তার মনের মত জিনিস। প্লাটিনামের একটি সুন্দর ঘড়ির চেন। জিমির হাতে ঐ সুন্দর ঘড়িটার সঙ্গে কি দারুনই না মানাবে। এক মুহূর্তে চুলের দুঃখ ভুলে গেল সে। একুশ ডলার দাম দিল ওটার জন্য। বাকি সাতাশি সেন্ট হাতে নিয়ে চঞ্চলা কিশোরীর মতই প্রায় একছুটে বাড়ি পৌঁছালো সে। বেচারী জিমি, এত সুন্দর ঘড়িটায় একটা কম দামী চামড়ার বক্‌লস লাগিয়ে রাখে। এত বেমানান দেখায়।

গ্যাসটা জ্বেলে নিয়ে নিজের সম্পূর্ণ অচেনা চেহারাটা একটু ভদ্রস্থ করার চেষ্টা করল ডেলা। চুল কোকড়ানোর যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বসলো আয়নার সামনে। চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই কোকড়ানো ছোট ছোট চুলে ভর্ত্তি তার মাথাটা দেখাতে লাগল স্কুল পালানো ছেলেদের মত।

যথেষ্ট হয়েছে। এখন প্রথম দর্শনেই জিমি যদি অগ্নিশর্মা না হয়ে যায়, তবে নিশ্চই স্বীকার করবে, আমাকে ঠিক কোনী দ্বীপের মেয়েদের মত দেখাচ্ছে।

সাতটা বেজে গেল। কফি তৈরী। চপগুলো জিমি এলেই চটপট ভেজে নেওয়া যাবে। দরজার পাশে উপহারটি হাতের মুঠোয় নিয়ে কিছুটা উৎকণ্ঠায় উত্তেজনাময় সময় গুনছে ডেলা।

ক্লান্ত পায়ে ওপরে উঠে এলো জিমি মাত্র বাইশ বছর বয়সেই গোটা একটা সংসারের বোঝায় নুয়ে পড়েছে বেচারী। গায়ের ওভারকোট, হাতের দস্তানা, দুটোর অবস্থাই শোচনীয়। স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকালো ডেলা, অস্ফুট প্রার্থনায় তার ঠোটদুটি কাঁপছে—ঈশ্বর, খুব বেশী যেন রেগে না যায় জিম। ওর চোখ যেন আমাকে এখনও আগের মতই সুন্দর দেখে।

কিন্তু স্বামীর চোখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল ডেলা। সে চোখে খুশি, আনন্দ, বিস্ময়, ক্রোধ কিছুই নেই। কেমন একরকম শূন্যদৃষ্টি নিয়ে হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে আছে তার ভালমানুষ স্বামীটি।

সইতে পারে না ডেলা। দুহাতে ঝাঁকিয়ে দেয় জিমিকে; দোহাই তোমার। ওরকম করে তাকিয়ো না। চুল কেটে ফেলেছি। আবার বড় হয়ে যাবে। তুমি তো জানো, আমার চুলের কি ভীষণ বাড়।

তবু তাকিয়ে থাকে জিম, মনে হয় সে ঠিক করতে পারছে না, হাসবে না কাঁদবে। স্খলিত কণ্ঠে শুধু জিগ্যেস করলো—চুল কেটে ফেলেছো? কেটে ফেলেছো চুল?

এবার ঝাঁঝিয়ে উঠলো ডেলা, মানছি তোমায় জিগ্যেস না করে চুল কাটাটা বোকামি হয়েছে। কিন্তু সত্যি করে বলতো,তুমি কি আমার চুলের জন্যেই আমায় ভালবাসতে, আমার

চুলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভালবাসায় কিছু কম পড়ে নি। জিমের মুখে তবুও ভাবান্তর নেই দেখে নিজের অপরাধী হৃদয়কে লুকোতে সমানে বক্ বক্ করে চলে ডেলা।

কি করবো বল? কতদিনের সাধ বড়দিনে তোমাকে একটা দারুণ উপহার দেবো। তাই তো চুলগুলো বেচে তোমার জন্য আশ্চর্য এক উপহার এনেছি। চুল আবার ঠিক আগের মতই সুন্দর হবে জিম। তুমি একটুও ভেবো না। কাল বড়দিন, আজও কি তুমি ওরকম মুখ ভার করে থাকবে জিম? একটুও ভালবাসবেনা আমাকে?

এতক্ষনে যেন কেটে গেল জিমের হতভম্ব ভাবটা। দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে নিলো ডেলাকে।

—আমাকে ভুল বুঝো না ডেলা। আমি যে মেয়েকে ভালবাসি, সে চুল কাটলে বা শ্যাম্পু করলে আমার ভালবাসায় উনিশ বিশ হয় না। এটা সেরকম কোন ব্যাপারই না। তোমার জন্য আমি যে উপহার এনেছি সেটি দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে কেন একটু আগে এত ভেঙে পড়েছিলাম।

জিম এর হাত থেকে মোড়কটা নিয়ে খুলে ফেলে ডেলা। এক মুহূর্তে চাপা আবেগে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে তার। চোখের জল চাপতে জিমের বুকেই মুখ লুকোয় সে।

টেবিলের ওপর মোড়ক খুলে ছড়িয়ে আছে একসেট মহার্ঘ চুলে লাগাবার চিরুনী। ব্রডওয়ের দোকানের জানলায় সাজানো সেই সেটটিকে দীর্ঘদিন প্রত্যহ দেখেছে ডেলা, মনে মনে পূজো করেছে। খাঁটি কাছিমের খোলায় তৈরী চিরুনীগুলো। হীরে মুক্তো দিয়ে বেড় দেওয়া। যে চুল কেটে ফেলা হয়েছে, তাতে পরার উপযুক্তই বটে। আবার ফুঁপিযে ওঠে ডেলা, তারপর হঠাৎই মনে পড়ে যায় হাতের মুঠোয় লুকিয়ে রাখা জিমের জন্য আনা উপহারটির কথা।

— আমার স্বপ্নের জিনিসটাই এনে দিয়েছো তুমি জিম। মন খারাপ কোরো না লক্ষ্মীটি, আজ না হোক, একদিন আমার চুল আবার আগের মত হয়ে যাবে, আমি প্রাণভরে প্রসাধন করবো তোমার উপহার দিয়ে। এখন, এদিকে একটু তাকাও, দেখ, সারা বাজার তোলপাড় করে ঠিক তোমার যোগ্য উপহার এনেছি কিনা? সুন্দর না এই চেনটা? কই ঘড়িটা দাও, দেখি কেমন মানায়।

নিঃশব্দ অট্টহাস্য ফুটে ওঠে জিমির চোখে। ধপ্ করে সোফায় বসে পড়ে।

—ডেলা, এই চমৎকার উপহারদুটি এত বেশি সুন্দর, যে এখনই পরা ঠিক হবে না। তোমার চিরুনী কেনার জন্য ঘড়িটা বেচে দিয়েছি আমি। আচ্ছা এবার চপগুলো ভাজলে হয় না?

প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতরা সদ্যোজাত যীশুর জন্য নানা আশ্চর্য উপহার নিয়ে এসেছিলেন। সেই থেকেই বড়দিনে উপহার দেবার প্রথা চলে আসছে। তাঁরা নিঃসন্দেহে জ্ঞানী ছিলেন, তাঁদের উপহারগুলিও ছিল যথেষ্ট সুচিন্তিত। কিন্তু এই যে নিতান্ত তরুন দরিদ্র দম্পতি, শুধু পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় দুটি দামী জিনিস খুইয়ে ফেললো, এদের উপহারের কাছে কোথায় লাগে জ্ঞানবৃদ্ধদের হিসেব করা ভালবাসার দান?

* The Gift of the Magi

খাদ্য তালিকায় বসন্ত

ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত। শীত যাই যাই করছে, বসন্ত কিন্তু তার সাড়া পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের তরুণী নায়িকা সারা-র হৃদয়ে। নির্জন ঘরে টেবিলে মাথা রেখে আঝোরে কেঁদে চলেছে সারা।

কেন কাঁদছে সে? সেকথা জানার আগে আসুন আমার সারাকেই একটু জেনে নিই।

মেয়েটি নিউইয়র্ক শহরে ফ্রিল্যান্সার স্টেনোগ্রাফার হিসেবে কাজ করে। আসলে বাঁধাধরা কোনও মোটা মাইনের কাজ করার মত শিক্ষাগত যোগ্যতা বেচারীর নেই।

তা হোলো কি, লাল ইটের যে পুরোনো বাড়ীটায় সে থাকতো, তার পাশেই ছিল হোম রেষ্টুরেন্ট। একদিন সেখানে নৈশভোজ করার সময় সারার হাতে পড়লো সেদিনের খাদ্য তালিকাটি। অসংখ্য ভুল শব্দ ও বানানে ভরা একটি আস্ত প্রহেলিকা। কি মনে করে সেটি বাড়ী নিয়ে এসে নিজের টাইপরাইটারে সেটি সুন্দর, নির্ভুল ও পরিচ্ছন্ন করে টাইপ করে রেষ্টুরেন্ট-এর মালিককে দেখিয়েছিল।

নীট ফলশ্রুতি হোল, মালিক তার সঙ্গে একটা চুক্তি করে ফেললো, রেষ্টুরেন্টের একুশটি টেবিলের জন্য মূল্য সহ খাদ্যতালিকার সমস্ত কপি তাকে সরবরাহ করতে হবে। প্রতিদিনের ডিনারের জন্য একটি খাদ্যতালিকা ও লাঞ্চ ও ব্রেকফাস্টের তালিকায় নতুন কোন সংযোজন বা পরিবর্তন হলে সেটিও তাকে টাইপ করে দিতে হবে। পরিবর্তে রোজ তাকে একজন পরিচারক তিনটি পদের ডিনার পৌঁছে দিয়ে আসবে। আর তার সঙ্গেই দেবে পরদিনের ডিনারের খাদ্য তালিকার একটি খসড়া।

তা এ পর্যন্ত ভালই ছিল। পুরো শীতকালটা সারা ঘরের গরমে আরাম করে ডিনার খেয়েছে, শুধু খাওয়ার জন্য এই শীতে কষ্ট করে পথে নামতে হয়নি। সুখেই ছিল সারা।

আজ বিকালে দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারটা যেন তাকে বারেবারেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, বসন্ত জাগ্রত দ্বারে সারা, তোমার সুন্দর শরীর মনকে কি অভিনন্দিত করবে না এই ঋতুরাজ? তুমি এখনও এত একা, এত বিষন্ন কেন?

কারণটা খুঁজতে একটু পিছনে ফেরা যাক। গত গ্রীষ্মে সারা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানে এক জোতদারের ছেলের সঙ্গে তার আলাপ ও ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হয়। ছায়াচ্ছন্ন এক স্বপ্নের মত গলিপথে সারা ও ওয়াল্টার কত নিভৃতে দুজনেই না কাল কাটিয়েছে। দুজনে মিলে একটা উজ্জ্বল হলুদ রঙের ফুলের মুকুট তৈরী করেছে। সারার উজ্জ্বল বাদামী চুলের ওপর সেই সোনালী হলুদ মুকটের শোভায় উচ্ছসিত হয়েছে ওয়াল্টার। কথা ছিল বসন্তের শুরুতেই বিয়ে হবে তাদের।

কিন্তু কোথায় ওয়াল্টার। বাড়ী পাল্টানোর পর এখানে এসে নতুন ঠিকানা জানিয়ে চিঠি লিখেছে সারা। না চিঠির উত্তর, না মানুষটা। দরজায় টোকা দিয়ে রেষ্টুরেন্টের পরিচালক পরের দিনের ডিনারের খাদ্যতালিকার খসড়া দিয়ে গেল।

অশান্ত মনটাকে গুছিয়ে নিয়ে কাজে বসলো সারা। কড়া নজর রেখে নামের দৈর্ঘ্য অনুসারে প্রতিটি খাদ্যবস্তুর নামকে যথাস্থানে সাজিয়ে নিয়ে দ্রুতবেগে টাইপ করতে শুরু করলো। খাবারের তালিকায়ও লেগেছে বসন্তের ছোঁওয়া।

ফল মিষ্টির ঠিক ওপরে সব্জীর তালিকা, গাজর ও মটন, টোস্টের ওপর শতমূলীর টুকরো, টমেটো, যব ও শব্জীর ঝোল, বীন, বাঁধাকপি, আর তারপরের নামটা? সেদিকে তাকিয়ে নিজেকে তার সংযত রাখতে পারলো না সারা। চোখের জলের বন্যায় ভেসে গেল সে।

খাদ্য তালিকার পরবর্তী কিস্তিটা ছিল হলুদ ড্যাণ্ডেলিয়ন ফুল আর ডিম দিয়ে তৈরী একটা খাদ্যবস্তু। ডিম চুলোয় যাক্ গে, কিন্তু ড্যাণ্ডেলিয়নই তো সেই ফুল যার মুকুট তার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিল ওয়াল্টার।

ধীরে ধীরে সারা তার কান্না থামালো। টাইপটাতো শেষ করতেই হবে। তার মনটা পড়ে রইল সেই বনছায়ায় যুবক জোতদারের কাছে, হাতের আঙ্গুলগুলো কঠোর অনুশাসনে ঝর্নাধারার মত টাইপরাইটারের ওপর বয়ে চললো।

ছটার সময় ওয়েটার ডিনার দিয়ে গেল আর পরদিনের জন্য টাইপকরা একুশটি খাদ্যতালিকা নিয়ে গেল।

খেতে বসে সারা ড্যাণ্ডেলিয়ন ফুলের তৈরী খাদ্যবস্তুটি আগেই সরিয়ে রাখলো। ঐ সুন্দর হলুদ রঙের ফুলগুলো দিয়ে কি রকম একটা কালো থকথকে খাদ্যবস্তু তৈরী করা হয়েছে। স্বাদ যত ভালই হোক না কেন, প্রাণে ধরে ঐ ফুল খেতে পারবে না সারা। ঐ ড্যাণ্ডেলিয়ন ফুলই হোল বসন্তের অগ্রদূত ওর মনেই মিশে আছে সারার জীবনের মধুরতম স্মৃতি।

সাতটা তিরিশ মিনিটের সময় পাশের ফ্ল্যাটে স্বামীস্ত্রীতে লেগে গেল তুমুল ঝগড়া। ওপরের ফ্ল্যাটের লোকটি শুরু করলো তার নিত্যদিনের বংশীবাদন। ঘরের গ্যাস কিছুটা কমানো হলো। বাড়ীর পেছনের বেড়ার ওপব দিয়ে বেড়ালগুলো ধীরে ধীরে মুকডেনের দিকে চলে গেল। কয়লার গাড়ি থেকে মাল নামানো শুরু হোলো।

সারা বুঝতে পারলো এবার তার বই পড়ার সময় হয়েছে। ট্রাঙ্ক থেকে "দি ফ্লয়স্টার অ্যাণ্ড দি হার্থ" বইখানা বের করে চেয়ারে বসে আরাম করে ট্রাঙ্কের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে সারা বইটির নায়ক জেরার্ড এর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলো পথে প্রান্তরে।

সামনের দবজার ঘন্টাটা বেজে উঠলো। বাড়ীওয়ালাকে সাড়া দিতে শুনেই সারা একলাফে নিজের দরজায় কান পাতলো। ভালুকের পাল্লায় পড়ে জেরার্ড আর ডেনিসের যে কি দশা হোল, কে তার খোঁজ রাখে। তারপরই নিচের হলঘরে জোরালো বলিষ্ঠ গলার আওয়াজ। শশকের মত কান খাড়া হয়ে গেল সারার। বইটা মাটিতে ফেলেই ছুট লাগালো দরজার বাইরে।

সারা সিঁড়ির মাথায় পৌছাতে না পৌছাতেই তার তরুণ জোতদারটি একলাফে তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে দিল।

অভিমানক্ষুব্ধ গলায় চেঁচিয়ে উঠলো সারা—কেন তুমি চিঠি লেখনি? কেন? কেন?

ওয়াল্টার ফ্র্যাংকলিন-এরও জবাব তৈরী। নিউইয়র্ক তো ছোটখাট জায়গা নয় যে ডাক দিলেই তোমায় খুঁজে পাবো। গত বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে এসে জানলাম তুমি সে বাসা ছেড়ে দিয়েছো, তোমার এখনকার ঠিকানা বাড়ীওয়ালা জানে না। তারপর থেকে খড়ের গাদায় ছুঁচ খোজার মতই খুঁজেছি তোমাকে।

—কিন্তু আমি যে চিঠি দিয়েছিলাম?
—বিশ্বাস করো, সে চিঠি আমি পাইনি।
—তাহলে আমাকে খুঁজে বের করলে কিভাবে?
জোতদার ছেলেটি এবার একটি ঠিক বসন্তকালীন হাসি উপহার দিল।
—সে ভারি মজার ব্যাপার। বছরের এ সময়টায় কিছু কাঁচা তরিতরকারি খেতে আমার ভাল লাগে। আজ সন্ধ্যায় সেই খোঁজ করতে করতেই এসে পৌঁছলাম তোমার বাড়ীর পাশের ঐ হোম রেস্টুরেন্টে--
তারপর? রুদ্ধ নিশ্বাসে বলে সারা।
—তারপর খাদ্যতালিকায় চোখ বুলোতে বাঁধাকপি পর্যন্ত এসেই আমার চক্ষু স্থির।
—আরে হ্যাঁ। চেঁচিয়ে উঠলো সারা। ঐ বাঁধাকপির পরেই তো ছিল ড্যাণ্ডেলিয়ন ফুল দিয়ে তৈরী খাবারটার নাম। কিন্তু ওয়াল্টার, তুমি কি করে—
—তক্ষুনি লাফ দিয়ে উঠলাম। চেয়ারটা গেল উল্টে। হাঁক ডাক করে দোকানের মালিককে ডাকলাম, সেই তো দিল তোমার ঠিকানাটা।
—কিচ্ছু বুঝতে পারছি না ওয়াল্টার। তুমি কি করে বুঝলে আমার ঠিকানা ও জানাবে?
—আরে বাবা। তোমাকে তো জানি। তোমার টাইপরাইটারের ঐ অদ্ভুত বড় হাতের ডব্লিউটা কি না চিনতে পারার?
—কিন্তু, কিন্তু ওয়াল্টার, ডব্লিউ কেন? ডব্লিউ? ড্যাণ্ডেলিয়ন বানানে তো ডব্লিউ নেই।
একগাল হেসে ওয়াল্টার পকেট থেকে খাদ্যতালিকাটি বার করে একজায়গায় আঙুল দিয়ে দেখালো।
সেই বেদনাবিধুর বিকালে টাইপ করা প্রথম মেনুকার্ডটির ওপর এককোনে অস্পষ্ট চোখের জলের ছাপ। আর যেখানে একটি বনফুলের নাম লেখা উচিত ছিল, সারার অবাধ্য আঙুল সারার অজান্তে বাঁধাকপি আর মশলাভরা কাঁচালংকার মাঝে লিখেছে—
—প্রিয়তম ওয়াল্টার, সঙ্গে পুরো সিদ্ধ ডিম।

* Springtime a 'la Coste

ভালবাসার ভার

কেউ যখন নিজের শিল্পকলাকে ভালবাসে, তখন তার জন্য কোনও বোঝাই দুঃসহ নয়। এরকম একটা প্রবাদ চলে আসছে, দেখা যাক্ আমাদের গল্পের শেষে বিষয়টি কি রকম দাঁড়ায়।
মিডল্ ওয়েস্ট-এর কাঠের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এলো জো লারাবি। শহরের পাম্পটার পাশ দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলা এক গণ্যমান্য নাগরিকের ছবি এঁকে মোটা টাকা রোজগার করেছে সে। লম্বা টাই ঝুলিয়ে সে ভালকরে শিল্পচর্চা করার জন্য নিউইয়র্ক পাড়ি দিল।

ওদিকে ডেলিয়া কারুথার্স দক্ষিনাঞ্চলের গ্রামের বাড়ীতে বসে পিয়ানো বাজিয়ে প্রতিবেশীদের এমন মুগ্ধ করে ফেললো, যে তারা সবাই চাঁদা করে অনেক টাকা তুলে তাকে উত্তরে পাঠিয়ে দিল, আরো ভালো করে শেখার জন্য।

দুজনের দেখা হোল একটা স্টুডিওতে। শিল্প সংগীত নিয়ে আলোচনা করতে করতে একে অন্যকে ভালবেসে ফেললো। আর বিয়ে করতে দেরী কিসের?

একটা ছোট ফ্ল্যাটে শুরু হোল এই ছেলেমেয়ে দুটির মধুর দাম্পত্যজীবন। নীড় ছোট, ক্ষতি নেই, ভালবাসার আকাশটা তো বড়।

জো ছবি আঁকছে বিখ্যাত শিল্পী মাজিস্টার-এর ক্লাশে। তাঁর প্রতিভার খ্যাতি তো সর্বজনবিদিত। তবে তাঁর ফিস্‌টা একটু বেশী। তবে পাঠক্রমটা হাল্কা, তাই ছাত্র মহলে তার জনপ্রিয়তাও বেশি।

ডেলিয়া পাঠ নিচ্ছে রোজেনস্টক এর কাছে। যিনি পিযানোর চাবিতে ঝড় তুলতে পারেন।

যতদিন এই দম্পতির হাতে টাকা ছিল সব ঠিকই ছিল। সারাদিন স্টুডিওতে খাটাখাটুনির পর মনের মত ডিনার, মৌজ করে গল্পগুজব, নিজেদের আশা আকাঙ্খা নিয়ে কল্পনার ফানুষ ওড়ানো, দিনগুলো প্রজাপতির পাখার মত উড়ে চলেছিল।

কিন্তু একদিন এ সবে ভাঁটা পড়লো। খরচ বেড়েই চল্‌ছে, রোজগার শুরুই হয়নি। এভাবে কতদিন চলে? মিঃ মাজিস্টার ও হের রোজনস্টকের মাইনে দেবার টাকাও থাকে না। কি করা যায়।

ডেলিয়া প্রস্তাব দিল, গানের টিউশনি করে সে টাকা রোজগার করবে। দু'তিন সপ্তাহ ছোটাছুটি করে জুটিয়ে ফেললো একটা। একাত্তরতম স্ট্রীটের জেনারেল পিংকিনির মেয়েই তার ছাত্রী।

ছাত্রীর বাবার সুদৃশ্য প্রাসাদ, আতিথেয়তা আর ছাত্রীর সুন্দর মিষ্টি চেহারা ও স্বভাবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ডেলিয়া।

সপ্তাহে তিনটি করে পাঠ দেবে সে, আর পাঠপ্রতি পাঁচ ডলার করে পাবে। অর্থাৎ সপ্তাহে পনেরো ডলার। তাদের দুজনের খরচের পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু একা ডেলিয়া কলাচর্চা ছেড়ে ছাত্রীকে পাঠ দিয়ে রোজগার করবে, স্বামীত্বের অহংকারে আঘাত লাগবে না জো'র? সে বললো, সে বরং ছবি আঁকা ছেড়ে অন্য কোনও কাজ, চাইকি রাস্তায় পাথর বসিয়েও টাকা রোজগার করবে তাদের দুজনের জন্য।

ডেলিয়া দুহাতে জড়িয়ে ধরলো স্বামীর গলা। বোঝালো এখন জো'র কিছুতেই শিল্পশিক্ষা চলবে না। ছাত্রীকে শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে ডেলিয়া তো নিজেও আবার শিখতে শুরু করবে। জো ক্ষুব্ধ স্বরে বললো—কিন্তু তোমার এই কাজটা আমার পছন্দ নয়, তোমার মত ভালমানুষকে এটা একটুও মানায় না।

মধুর হেসে ডেলিয়া বললো—

—সেই প্রবাদটা মনে আছে তো? যে শিল্পকলাকে ভালবাসে,কোনও ভারই তার কাছে দুঃসহ নয়।

সপ্তাহে শেষে সগর্বে অথচ একটু ক্লান্তির সঙ্গে ডেলিয়া তাদের ছোট্ট বসার ঘরে ততোধিক ছোট সেন্টার টেবিলের ওপর পনেরোটি ডলার সাজিয়ে রাখলো।

তখনই জো পাক্কা ম্যাজিশিয়ানের মত নিজের পকেট থেকে গুনে গুনে আঠারোটি ডলার নামিয়ে রাখলো। একগাল হেসে জানালো পিয়োরিয়া থেকে আগত এক শিল্প রসিকের কাছে তার একটি জলরঙের ছবি বিক্রী করেছেন। ভদ্রলোক আরও একটি ছবির অর্ডার দিয়ে গেছেন।

ডেলিয়া আন্তরিক ভাবেই বললো।

—তুমি যে আঁকার কাজটা চালিয়ে যাচ্ছো, এতেই আমি খুশি। তেত্রিশ ডলার। আগে কখনো এত টাকা খরচ করতে পারিনি। আজ রাতে ডিনারে গলদা চিংড়ি হয়ে যাক, কি বলো?

পরের শনিবার জো-ই প্রথমে বাড়ী ফিরলো। বসার ঘরের টেবিলে আঠারো পাউণ্ড রেখে দিয়ে সে হাতের কালো রংটা পরিস্কার করে ধুয়ে ফেললো।

একটু পরেই ফিরলো ক্লান্ত ডেলিয়া, স্বামীর সহর্ষ অভ্যর্থনায় ম্লান ভাবে হাসলো একটু। তাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। তার ডান হাতে যেমন তেমন করে একটা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো।

—এটা কি করে হোল। উদ্বিগ্নভাবে জিগ্যেস করলো জো।

—ও কিছু নয়। পাঠ শেষ হবার পব ছাত্রী খরগোশের কোন খাবার বায়না ধরলো। তাড়াহুড়োয় গরম ঝোল পড়লো আমার হাতে। মেয়েটি খুবই দুঃখিত। আর তার বাবা ছুটে বেরিয়ে গিয়ে কাকে দিয়ে যেন মলম আর ব্যাণ্ডেজ আনিয়ে দিলেন। এখন আর তেমন কষ্ট হচ্ছে না।

স্ত্রীর হাতটাকে হাতে নিয়ে ব্যাণ্ডেজের তলার সাদা ফালিটিকে দেখিয়ে জিগ্যেস করলো— এটি কি?

—এটা কোনও নরম জিনিস, মলমটা এর ওপরেই লাগানো ছিল, আরে, তুমি আবার ছবি বিক্রি করেছো।

—করেছি তা বটেই। আরো দুটোর অর্ডার পেয়েছি, আচ্ছা আজ বিকেলে তুমি কখন হাতটা পোড়ালে ডিলি?

থতমত খেয়ে গেল ডেলিয়া। অস্পষ্ট ভাবে বললো, পাঁচটা হবে। হঠাৎ ইস্তিরিটি মানে খরগোশের মাংসটা—সস্নেহে স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে জো জিগ্যেস করলো।

—গত দুসপ্তাহ তুমি কি করেছো ডিলি।

একটু ইতস্তত করে সত্যি কথাটা বলেই ফেললো ডেলিয়া—অনেক চেষ্টা করেও ছাত্রী জোটাতে না পেরে একটা লন্ড্রিতে সার্ট ইস্তিরি করার কাজ নিয়েছিলাম, নইলে তোমাকে কলাচর্চা ছাড়তে হোতো। সে আমার সইতো না জো।

হেসে উঠলো জো—শিল্পচর্চা। আরে আমি তো এই দুসপ্তাহ ঐ লন্ড্রীর ইঞ্জিন ঘরে কাজ করছিলাম। আজ বিকেলে আমিই ইস্ত্রির ছ্যাঁকা খাওয়া ওপরতলার মেয়েটিকে এই মলম আর ন্যাকড়াটা পাঠিয়েছিলাম। আরে, যারা শিল্পকে ভালবাসে তার কোনও বোঝাকেই বোঝা মনে হয় না।

—না জো, কলাচর্চাকে নয়, যারা দুজন দুজনকে সত্যি ভালবাসে, তাই না?

* A service of Love

হারানো মিশ্রণ

ল্যাস্ট্রি কনেলির কাফেতে কাজ করে কন। সেলুনটা একটা গরীব পাড়ায়। সেখানে আসা যাওয়া করে লণ্ড্রির লোকজন, ক্ষয়িষ্ণু পরিবারের মানুষ আর নিষ্কর্মা ভবঘুরের দল।

কাফের ওপরেই থাকে কেনেলি আর তার পরিবার। তার মেয়ে ক্যাথারিনের চোখ দুটি যেন কাজল নয়না হরিণীর। সে-ই কনের স্বপ্নের রাণী। সে মেয়ে যখন ডিনারে পরিবেশনের জন্য এক কুঁজো বীয়ার নিতে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আস্তে আস্তে ডাক দেয়। তখন কন এর বুকটা উথাল পাথাল করে।

কিন্তু বিপদটা হোল, মেয়েদের সামনে তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। রাঙা হয়ে ওঠে মুখ। কাজেই ক্যাথারিন সামনে এলে তাব অবস্থাটা যে কিরকম হয়, বুঝতেই পারছেন। সে কেবলই কাঁপতে থাকে। মুখে কথাটি ফোটে না, তার প্রেমের দেবীর সামনে সে যেন এক নির্বাক প্রেমিক।

কেনেলির দোকানে একদিন রোদে পুড়ে দুটি মানুষ এলো। নাম রিলে ও ম্যাককার্কি। মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে পিছন দিকের একটা ঘর ভাড়া নিল তাবা। বোতল, সাইফন, কুঁজো আর ওষুধ মাপাব গ্লাস দিয়ে ঘরটা ভরে ফেললো তারা।

সারাটা দিন ঘেমে নেয়ে ঐ ঘরে বসে দুজনে মজুত মদের সঙ্গে অজানা সব বস্তু মিলিয়ে নানাবকম পাচন তৈরী কবে। রিলে পণ্ডিত মানুয, সে দিস্তে দিস্তে কাগজে অংক কবে, গ্যালনকে আউন্সে আর কোয়ার্টকে ড্রামে পরিবর্তিত করে। গোমড়ামুখে ম্যাককার্ক, তার একটা চোখ সবসময়েই লাল, একের পর এক বিফল মিশ্রণ নর্দমা দিয়ে ঢেলে দেয় আর খ্যাসখেসে গলায় খিস্তি করে।

একদিন দোকানের তদারকির কাজ সেরে কন ঢুকতে গেল পিছনের ঘরে। এই দুই মক্কেল মাঝে মাঝে মদ কিনে নিয়ে ঘরে ঢুকে করেটা কি? পথে দেখা ক্যাথারিনের সঙ্গে। মুখে সূর্যোদয়ের মত হাসি।

—শুভ সন্ধ্যা মিঃ ল্যাস্ট্রি, আজকের খবরটা দয়া করে বলবেন?

দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে তোৎলাতে লাগালো কন।

—মনে হচ্ছে বি—বৃষ্টি হবে।

মুচকি হেসে ক্যাথরিন বললো।

—হওয়াই উচিত, জলের মতো জিনিষ নেই। জলের জন্য যা হাহাকার পড়ে গেছে। ঘরে ঢুকে দুই মূর্তিকে যথারীতি কাজে মগ্ন দেখলো কন। রিলের নির্দেশ অনুযায়ী মেপে মেপে নানারকম মদ মিশিয়ে গাঢ় খয়েরী রং-এর একটা মিশ্রন তৈরী করলো ম্যাককার্কি, আর তাতে আঙুল ঠেকিয়ে জিভে লাগিয়েই গালি দিতে দিতে নর্দমায় ঢেলে দিলসেটা।

কর্ণের চোখে মুখে বিস্ময় দেখে রিলি তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললো।

গত গ্রীষ্মকালে টিম ম্যাককার্কি ও আমি স্থির করলাম নিকারাগুয়াতে মদের ব্যবসা করবো। ওটা এমন একটা জায়গা যেখানে নাকি খাবার জন্য কুইনাইন আর পান করার জন্য রাম ছাড়া আর কিছুই মেলে না। তা জাহাজে অগুন্তি মদের বোতল আর মদের দোকানে লাগে এমন সব সরঞ্জাম নিয়ে তো যাত্রা করলাম। জাহাজে নাবিকদের, বিশেষ করে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দিব্যি জমে গেল।

গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি পৌঁছে যাবার পর ক্যাপ্টেন আমাদের আড়ালে ডেকে এনে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানালো, সেটা সে বেমালুম ভুলে গিয়েছিল।

নিকারাগুয়ায় গতমাসে এক নতুন আইন জারী হয়েছে। বোতলজাত সব মালের ওপর শতকরা আটচল্লিশ ভাগ আমদানী শুল্ক দিতে হবে। এমনকি এক বোতল মাথার তেল কিনে ফেলার জন্য সে দেশের প্রেসিডেন্টকেও নাকি ঐ কর দিতে হয়েছে।

সাতচল্লিশ পার্সেন্ট এতগুলো মদের বোতলের জন্যে দিলে আমাদের কি থাকবে? মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে দুটো পিপে কিনে নিয়ে নানারকম মদের বোতলগুলো উজাড় করে দিলাম তাতে। বোতলগুলো বিসর্জন দিলাম সমুদ্রে।

ওখানে পৌঁছে প্রথম পিপেটা খুলে হতাশ হলাম। ওখানকার একজন আদিবাসী তো একঢোক সেই মিশ্রণ গিলে তিনদিন ধরে নারকোল গাছের তলায় বালিতে শুয়ে সমানে মাটিতে গোড়ালী ঠুকতে লাগলো।

দ্বিতীয় পিপেটা থেকে বেরোলো, যেন স্বর্গের সুধা। টলটলে সোনালী রঙের পানীয়, যা পান করার জন্য সে দেশের বড় বড় জেনারেলরা পর্যন্ত লাইন দিতেন। প্রথমে একপাত্র পানীয়ের দাম ধরেছিলাম পঞ্চাশ সেন্ট রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে, আর শেষ দশ গ্যালন জলের মত বিক্রী হয়ে গেল এক চুমুকের দাম পাঁচ ডলার, এই হিসেবে।

আর, সেকি আশ্চর্য জিনিষ। এক চুমুক পেটে পড়লেই মানুষের মনে জেগে ওঠে অদম্য উচ্চাকাঙ্খা, সাহস, আর যে কোন কাজ করার শক্তি। আশ্চর্য চারিত্রিক পরিবর্তন আসে মানুষের।

ওই পিপেটা অর্ধেক খালি হতে না হতেই নিকারগুয়া জাতীয় ঋণ শোধ করে দিল। সিগারেটের ওপর থেকে কর তুলে দিল, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করতে উদ্যত হোলো।

পানীয়ের রাজা এই মিশ্রণটি আমরা ভাগ্যের জোরেই পেয়ে গেছি, আবার যদি পাই, ভাগ্যের দাক্ষিন্যেই পাবো। গত দশমাস ধরে আমরা দুজন সে চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছি। প্রতিবার অল্প করে মাল নিয়ে মিশিয়েছি। মদের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত যতরকম ক্ষতিকর পদার্থ আছে সব গ্যালন গ্যালন খরচ করেছি। একমাসে আমি ও টিম যত মদ নষ্ট করেছি সেইসব হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি, কর্ডিয়াল, বিটার জিন ও ওয়াইন দিয়ে দশ দশটা মদের দোকান ভর্তি করে দেওয়া যেত।

সে যাই হোক খুঁজে আমাদের বের করতেই হবে সেই অপূর্ব মিশ্রণ। এমন একটা গৌরবময় পানীয় থেকে তো আর পৃথিবীকে বঞ্চিত করা যায় না? সেটা তো দুঃখের কথা, আর্থিক ক্ষতির কথা, তাই না!

রিলি যতক্ষণ বক্‌বক্ করে চলেছিল ম্যাককার্কি কিন্তু ততক্ষণ একমনে রিলির লিখে দেওয়া পরিমান অনুযায়ী ছোট ছোট গ্লাসে নানারকমের পানীয় মিশিয়ে পরীক্ষা করে চলেছিল। আর ফলে যে মিশ্রণটি তৈরী হচ্ছিল তার রংটা ছিট ছিট চকলেটের মত। সেটাকে মুখে দিয়েই ম্যাককার্কি যথাযোগ্য খিস্তি সহযোগে নর্দমায় ঢেলে দিচ্ছিল।

সব শুনে কন বললো, গল্পটা যদি সবটা সত্যিও হয়, তবে খুবই অদ্ভুত বলতে হবে। যাহোক্, তোমবা তোমাদের কাজ চালিয়ে যাও। এবার আমি রাতের খাবারটা খেতে যাবো।

এসেছো যখন একপাত্র খেয়ে যাওনা ভাই? ঐ আশ্চর্য মিশ্রণটা ছাড়া আব সবরকম মিশ্রণই আছে আমাদের কাছে।

কন রাজি হোলো না, সে বললো—বার-এ কাজ করলেও জল ছাড়া আমি কখনও কিছু পান করি না। জলের মত জিনিষ আছে। এই তো একটু আগেই মিস ক্যাথিরিনের সঙ্গে দেখা হোলো আমার, উনিও বললেন জলের মত জিনিষ হয় না। আচ্ছা! তবে শুভরাত্রি।

কন বেরিয়ে যেতেই বিলি একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে ম্যাককার্কিকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল আর কি।

—আরে হাঁদারাম টিম। কণ কি বললো শুনলে? জল, জলের কথাই তো ভুলে গিয়েছিলাম আমরা। দ্বিতীয় যে পিপেটাতে মদগুলো মেশানো হয়েছিল, সেটা কিসের পিপে ছিল, মনে আছে।

—আর হ্যাঁ, সেটাতে নীলরঙের কাগজ সাঁটা ছিল, জলই বটে।

—যাও বার থেকে দু'বোতল মদ নিয়ে এসো। ততক্ষণ আমি হিসেবটা করে ফেলি। আসল ভেল্কিটা খেলেছে জল, সেটাই ধরতে পারছিলাম না। ঘন্টাখানেক পরে কাফের দরজায় এসে হতবাক কন। তিনটি বলবান পুলিশ যুদ্ধবিধ্বস্ত রিলি ও ম্যাককার্কিকে ভ্যানে তুলছে। প্রশ্ন করে জানলো ফুর্তিতে মারামারি করে তারা ঘরের সব কাঁচের জিনিষ ভেঙেছে, হট্টগোল করেছে। অবশ্য জরিমানার টাকা মেটালে কাল সকালেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

ঘরে পা দিয়ে রণাঙ্গনের চেহারাটা স্বচক্ষে দেখলো কন। আরও দেখলো একটা ছোটগ্লাসে অক্ষত আছে টলটলে সোনালী রঙের এক চুমুক পানীয়। কিছু না ভেবে চিন্তে গ্লাসটা গলায় ঢাললো সে।

ফেরার পথে আবার ক্যাথারিনের সঙ্গে দেখা। দুষ্টুমীর হাসি হেসে সে আবার খবর জানতে চাইল। বৃথা বাক্যব্যয় না করে কন তাকে দুহাতে জড়িয়ে শূন্যে তুলে ফেললো। আর বললো—

—খবর হোল, আমরা বিয়ে করছি।

কপট রাগে হাত পা ছুঁড়েছিল ক্যাথরিন।

—আমায় নামিয়ে দাও বলছি, নইলে আমি-আমি, আরে কন, এতবড় কথাটা বলার মত সাহস তুমি কোথায় পেলে? আশ্চর্য!

* The Lost Blend

চিলেকোঠার ঘর

চিলেকোঠার ঘরটা বাড়ীওয়ালী কিছুতেই আগে দেখাবেন না। প্রথমে সবচেয়ে বড় ও ভাল ঘরটা, যেটা একসময় ডেন্টিস্টের চেম্বার ছিল। কিন্তু আপনি ডাক্তার নন শুনে করুণার হাসি হেসে আট ডলারের ঘরটি দেখাবেন। আপনার পকেটের অবস্থা অতটা গরম নয় বোঝালে নাট্যকার মিঃ স্কীডারের বড় হলঘরটা দেখাবেন। যদিও নাট্যকার ঘরটা এখনও ছাড়েননি। তবু প্রতিবার নতুন ভাড়াটেকে আনতে দেখে বাড়ী হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়ে স্কীডার প্রতিবারই বাড়ীওয়ালীকে ভাড়ার টাকার কিছুটা দিয়ে দেন।

তারপরেই যদি আপনি খাড়া দাঁড়িয়ে, নিজের পকেটের তিনটে ডলার হাত দিয়ে আঁকড়ে ঘোষনা করতে পারেন, আপনি একজন বীভৎসা রকমের গরীব মানুষ। তবে মিসেস পার্কার আর আপনার দিকে ফিরেও চাইবেন না, কর্কশ গলায় পরিচারিকা ক্লারাকে ডেকে দিয়ে সদর্পে নীচে চলে যাবেন। ক্লারা এসে চারতলার চিলেকুঠুরীতে আপনাকে নিয়ে যাবে। সেই খুপরীটার মাপ ৭/৮ ফুট, আর তার দুদিকেই দুটো গুদোম ঘর। ঘরের মধ্যে রয়েছে একটা লোহার খাট। হাত মুখ ধোবার বেসিন আর একটা চেয়ার। একটা তাকে জামাকাপড় রাখার ব্যবস্থা। ঘরের নিরাভরন চারটে দেওয়াল একটা কফিনের মত আপনাকে চেপে ধরবে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে, হাতটা উঠে আসবে গলায়। সেই মুহূর্তে ওপরের ভেন্টিলেটারের ফাঁকে আপনার চোখে পড়বে এক টুকরো চৌকো আকাশ।

আধা তাচ্ছিল্যের স্বরে ক্লারা জানিয়ে দেবে ঘরটার ভাড়া সপ্তাহে দুই ডলার।

অনেকদিন খালি থাকার পর ঘরটা ভাড়া নিল মিস লীসন। ছোট্টখাট্ট তন্বী মেয়েটি তার নিজের ওজনের চেয়ে ভারী একটি টাইপরাইটার নিয়ে বাস করতে এলো এখানে। সকালে কাজে যাওয়া, আর কাজ থেকে ফেরার পথে টাইপ করার জন্য হাতে লেখা কাগজের গোছা নিয়ে আসতো সে।

একটুও মানায় না মেয়েটিকে এই ঘরে। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা এই মেয়েটি অল্পদিনেই বাড়ীর অন্য ভাড়াটেদের নজর কেড়ে নিল।

কোনদিন তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়ে গেলে সে সিঁড়িতে এসে বসতো। সিঁড়ির ওপরের ধাপে পাবলিক স্কুলের শিক্ষিকা মহিলাটি বসে কেবলই হাঁচতেন। তার সঙ্গে তাল মেলাতো একেবারে নীচের ধাপে বসা বিভাগীয় বিপনীতে কাজ করা শিকার প্রিয় মেয়েটি।

মাঝের ধাপে মিস লীসনকে ঘিরে বসতো বাড়ীর তিন পুরুষ সদস্য। নাট্যকার মিঃ স্কীডার তো বাস্তবজীবন নিয়ে লেখা একখানি নাটকের নায়িকা চরিত্রের জন্য মিস লীসনকেই মনে মনে নায়িকা নির্বাচন করে নিয়েছেন।

এছাড়া পঁতাল্লিশ বছরের থলথলে মোটা ও বোকা মিঃ হুভার আর যুবক মিঃ ইভান্স। সে অনবরত খক্‌খক্ করে কাশতো, যাতে মিস লীসন তাকে বেশী সিগারেট খেতে নিষেধ করে।

কোন এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সিঁড়ির মজলিশ বেশ জমে উঠেছে। মিস লীসন হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে আনন্দে চীৎকার করে উঠলো।

—আরে ওই তো বিলি জ্যাকসন। এখানে বসেই আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি।

সকলেই মুখ তুলে তাকালো,কেউ দেখলো সামনের বাড়ীর জানলাব দিকে, কেউবা আকাশের উড়োজাহাজের দিকে, বুঝিবা তারই চালকের নাম হবে বিলি জ্যাকসন।

ছোট্ট আঙুলটিকে আকাশের দিকে তুলে মিস লীসন বললো—ওই তারাটির কথা বলছি। ঝিকমিক করছে যে তারাটা সেটা নয়, তার পাশে স্থির নীল তারাটা।

আরে সত্যি? শিক্ষয়ত্রী মহিলাটি বললেন, তুমি যে আবার একজন জ্যোতির্বিদ, তা তো জানতাম না।

—হ্যাঁ গো সত্যি, তারাখোঁজা মেয়েটি সহাস্যে বললো, আমি গ্রহ তারাদের এত ভাল করে চিনি যে আগামী শীতকালে মঙ্গলগ্রহের ওরা কিরকম আস্তিনের জামা পরবে, তাও বলে দিতে পারি। বটে? সত্যি? নিজের মুদ্রাদোষটির পুনরাবৃত্তি কবলেন পাবলিক স্কুলের শিক্ষিকাটি। —কিন্তু ওই তারাটার নাম তো গামা। ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রপুঞ্জের একটা তারা, ওর কক্ষপথ হচ্ছে—

কথাটা পছন্দ হলো না যুবক ইভান্সের, বাধা দিয়ে বললো—না না, গামা নয় ঐ বিলি জ্যাকসন নামটাই বেশ।

মিস লীসন বললো—এখান থেকে তারাটা ভাল দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আমার ছোট্ট ঘরটা তো একটা পাতকুয়োর মত, সেখানে খাঁটিয়ায় শুয়ে ঠিক মাথার ওপর ঘুলগুলিতে দেখা যায় ঐ একটামাত্র তারা। মনে হয় রজনীর আকাশ যেন তাঁর কালো রেশমের পোশাকে হীরের ব্রোচ আটকেছেন।

তারপর এমন একটা দিন এলো, যখন লীসন আর টাইপ করার কাজ জোটাতে পারতো না। আধপেটা খেয়ে দিনের পর দিন কাজের খোঁজ করতে করতে আরও শীর্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়লো মেয়েটি। শেষে একদিন দুর্বল শরীরটা কোনমতে টেনে এনে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লো। তার চরিদিকের জগৎ সংসার মুছে গেল, শুধু অন্ধকার আকাশে জেগে রইল বিলি জ্যাকসন।

পরদিন বেলা দশটায় দরজা ভেঙে বের করা হোল তার অচেতন দেহ। অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যে তরুন ডাক্তারটি এলো, সে রোগিনীর নাম শুনেই লাফিয়ে উঠে গেল চিলেকোঠায়। দুহাতে সযত্নে বয়ে নিয়ে গেল মেয়েটির দেহ।

পরদিন কাগজে একটা ছোট্ট খবর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সংবাদে বলা হয়েছিল: ৪৯নং পূর্বস্ট্রীট থেকে অনাহারজনিত দুর্বলতায় আক্রান্ত এক তরুণীকে বেলভিউ নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে।

অ্যাম্বুলেন্সের ডাক্তার উইলিয়াম জ্যাকসন যিনি কেসটি দেখছিলেন, বলেছেন, রোগিনী ভাল হয়ে যাবে।

* The Skylight Room

কোচোয়ানের আসন থেকে

সিডেন্টই হও বা ভবঘুরে, ভাড়াগাড়ির কোচোয়ানের কাছে তুমি শুধু একজন সওয়ারী মাত্র। গাড়িতে উঠে পড়ার পর তুমি তার একটা আসনের দখলদার নও, তার গাড়ীর একটা মাল মাত্র। সমুদ্রে ভেসে চলা জাহাজের একটা বোঝাই মাল।

একরাতে "ম্যাকগারির পারিবারিক কাফে"র পাশে ওয়ালশ পরিবার থেকে খুব নাচ গান। পান ভোজনের হৈ হল্লার আওয়াজ শোনা গেল। কৌতূহলী কেউ কেউ শুধিয়ে জানতে পারলো নোরা ওয়ালশ-এর বিয়ে হচ্ছে।

সন্ধ্যে আরো একটু ঘন হয়ে এলে ম্যাকগারি হট্টগোলের সঙ্গে রবাহুত অতিথিদের হুল্লোড় মিশে সামনের পথটা কোলাহলমুখর হয়ে উঠলো।

মোড়ের কাছেই দাঁড়িয়েছিল জেরী ও ডোনোভানের ছ্যাকরা গাড়ীটা। নিজেদের মধ্যে জেরীর ডাক নাম ছিল 'রাতের বাজপাখী", তার গাড়ীর মত সুন্দর আর পরিচ্ছন্ন গাড়ী শহরে আর একটিও ছিল না।

অতিরিক্ত সুরাপানে প্রায় আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে কাফের দরজায় দাঁড়িয়েছিল জেরী। হঠাৎ তার অভ্যস্ত দৃষ্টি তার গাড়ীর কাছে সম্ভাব্য এক মহিলা সওয়ারীকে দেখতে পেলো। বলিষ্ঠ দুই হাতে ভিড় সরিয়ে সে তরুণীটিকে নিজের গাড়ীতে বসিয়ে দিল, তারপর রাজকীয় চালে নিজের উঁচু আসনে বসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তরুণীটির কিন্তু কোনও গন্তব্য নেই। একটু ঘুরে বেড়ানো আর কি। জেরী তাই তাকে নিয়ে বিশাল পার্কটি প্রদক্ষিণ করলো, তারপর তাকে ক্যাসিনোর ফটকে নামিয়ে দিয়ে, মেয়েটির ফেরার অপেক্ষায় গাড়ীর লাইনে নিজের গাড়ীটা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো।

তরুণী নিজের হাতব্যাগের সামান্য সম্বল থেকে একবোতল বিয়ার কিনে প্রায় ঘন্টাদুই চারিদিকের আনন্দ, প্রাচুর্য আর রঙের মিছিল উপভোগ করে নিল। ফেরার পথে নেশা কেটে গিয়ে সাফমাথায় জেরি গাড়ীর পর্দা ফাঁক করে মেয়েটিকে জিগ্যেস করলো, গাড়ীভাড়া বাবদ চার ডলার দেবার সামর্থ তার সত্যিই আছে কিনা।

সহাস্যে মেয়েটি জানালো খুচরো কিছু পয়সা ছাড়া তার কাছে আর কিছুই নেই।

বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ী ছুটিয়ে দিল জেরি, এবার থানার দিকে।

থানার অফিসার জেরিকে বিলক্ষণ চেনেন, একটি তরুণীর সঙ্গে তাকে ঝড়ের মত প্রবেশ করতে দেখে অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকালেন।

নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করলো জেরি, অফিসার এই যে দেখছেন, আমার গাড়ীর সওয়ারি—এই পর্যন্ত বলেই তরুণীর মুখের দিকে চেয়ে থমকে গেল সে, পুরোপুরি কেটে গেল মাথার কুয়াশাটা।

—অফিসার, যা বলছিলাম এই সওয়ারী হচ্ছে আমার স্ত্রীনোরা। আজই বিয়ে হয়েছে আমাদের। বাইরে বেরিয়ে খুশীর হাসি হাসলো মিসেস জেরি,—কি সুন্দর কাটলো সন্ধ্যেটা, তাই না ডার্লিং?

* From The Cabby's Seat

সারমেয় স্মৃতি কথা

একটি কুকুরের স্মৃতিকথা পড়তে যে আপনারা খুব উৎসাহিত হবেন, তা আমার মনে হয় না। যদিও কিপলিং সাহেব দেখিয়েছেন পশুপাখীরাও দিব্যি শুদ্ধ ইংরেজীতে কথা বলতে পারে। তবে আমি নেহাৎই সোফার কোনে বসে জীবন কাটানো তুচ্ছ এক হলদে কুকুর, আমার কাছে অতটা বিদগ্ধতা আশা করবেন না।

যতদূর মনে পড়ে এক বৃদ্ধা আমার ওপর পে-ডিগ্রী চাপিয়ে দিয়ে এক মধ্যবয়সী মহিলার কাছে বিক্রী করেছিল। নতুন মালিকের কাছে আমি আরামেই ছিলাম। আমার মোটাসোটা মনিবটি সারা গায়ে ভুরভুরে গন্ধ ছড়িয়ে সোনা আমার, চাঁদ আমার ইত্যাদি বলে আমাকে আদর করতেন।

তাঁর ফ্ল্যাটের পুরোনো আসবাবগুলির মধ্যে একটি ছিলেন তাঁর স্বামীদেবতা। স্ত্রীকে যমের মত ভয় করতেন। ঘরের থালাবাসন ধুয়ে দিতেন। ভদ্রমহিলা আবার আদর করে আমাকে ডাকেন 'লাভি', দুঃচোক্ষের বিষ আমার নামটা।

ভদ্রলোকটির জন্য করুণা হোতো আমার। একদিন ওপর তলার কালো টেরিয়ার কুকুরটির সঙ্গে নাক শোঁকাশুঁকি করে জানলাম তার মনিব ভদ্রলোকটি নাকি তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে রোজই পাবে গিয়ে ঢোকেন।

একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। ভাবলাম আমার মনিব কর্তার শ্রীহীন জীবনে একটু ফুর্তি এনে দেওয়া যাক।

পরদিন যখন স্ত্রীর হুকুমে আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন, আগে এগিয়ে গিয়ে একটা পাবে ঢুকে পড়লাম আমি, পিছন পিছন আমার চেনটা হাতে ধরে তিনিও অগত্যা।

চারদিক তাকিয়ে দামী মদের অর্ডার দিল সে। আমিও পেলুম নানা সুখাদ্য। বোতল শেষ হতেই সেই ভীরু বিমর্ষ মানুষটি এক নিমেষে সম্রাট। শিকল খুলে দিয়ে মুক্তি দিল আমাকে।

আমি নাছোড়বন্দা, কিছুতেই বুড়োকে ছাড়বোনা। আরে বাবা আমরা দুজনেই ভুল করে তোমার বউএর শিকলে বাঁধা পড়েছি। তা-ও বোঝোনা। তোমার বউ-এর কাছে তো দুজনেই শিকলে বাঁধা কুকুর। শিকল ছিঁড়ে এসো বাঘ হয়ে বেরিয়ে পড়ি।

বুড়ো সত্যিসত্যি আমার কুকুরের ভাষা বুঝলো। বললো : এই পৃথিবীতে কেউ বারে বারে জন্মায় না। আমি বাঁচবো। ওই ফ্ল্যাটে যদি আবার ফিরে যাই তবে আমি হাঁদা গঙ্গা রাম। আর তুই যদি ফিরিস তবে তুই হাঁদার হাঁদা।

বুড়োর সঙ্গে লেজ তুলে নাচতে নাচতে সোজা জাহাজ ঘাটায়। জাহাজ থেকে নামলাম জার্সিতে। বুড়ো এক অপরিচিত লোককে ডেকে শোনাল, আমরা দুজন নাকি রকি পর্বতের যাত্রী।

আমার আনন্দ দেখে কে। আদর করে বুড়ো আমার নতুন নাম দিল সোনামনি।

ঈশ্বর। আমার যদি পাঁচটা লেজ থাকতো, তাহলে সবকটা নাচিয়েও আমার সব আনন্দ প্রকাশ করতে পারতাম না।

* Memoirs of a Yellow Dog

সাফল্যের বিচার

ইউনিয়ান স্কোয়ারে বসে থাকা নারীপুরুষের দলের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকালো মর্লি। যত সব বোকা হাঁদার দল। আর এই মেয়েগুলো সমানধিকার নিয়ে এত চেঁচামেচি করে। তা কারো মাথায় এইটুকু বুদ্ধি নেই যে আন্দোলন করে পার্কের বেঞ্চিগুলোর উচ্চতা একটু কমিয়ে নেয়। যাতে মেয়েদের পা মাটিতে রাখার সুবিধে হয়। কেমন বিশ্রীভাবে বসে আছে সব।

মর্লি যথারীতি বেশ সুচারু সাজগোজ করেই বেরিয়েছে। জন্ম ও পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষার ফল এটা, কিন্তু পোষাকের আড়ালে তার মনটার খোঁজ আমরা দিতে অক্ষম।

আপততঃ কপর্দকহীন মর্লি। অবশ্য এরকমটা প্রায়ই ঘটে থাকে। সূর্যাস্ত অনেক সময়ই তার ফাঁকা পকেট দেখেছে। কিন্তু সূর্যোদয় সব সময়েই দেখেছে তার পকেট ভর্ত্তি টাকা। সাদা কথায় লোক ঠকিয়ে খাওয়াই তার পেশা।

প্রথমেই সে ম্যাডিসন অ্যাভেনিউতে এক পাদ্রীর কাছে গিয়ে একটা জাল পরিচয়পত্র দিল। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে সেই চিঠিটা লিখেছেন ইণ্ডিয়ানার এক যাজক। আর সেই সুবাদেই পাঁচ ডলার এসে গেল তার পকেটে।

পাদ্রীর দরজা থেকে বিশ পা দূরেই দেখা হয়ে গেল এক পুরানো পাওনাদারের সঙ্গে। মোটাসোটা বিমর্ষ লোকটি ঘুষি লাগিয়ে টাকা আদায় করতে এলো। মিষ্টি কথায় তাকে বশ করে দুপাত্তর মদ খাইয়ে দিল তাকে। যাবার সময় প্রতিশ্রুতি রইল, পরদিনই তার বাড়ী গিয়ে পাওনা টাকা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেবে। যদিও মর্লি মনে মনে জানে এ পথ সে আর ভুলেও মাড়াবে না কোনদিন।

কিছুক্ষণ পরে এক জুয়ার আড্ডা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখ গেল মর্লিকে, পকেটে তখন ঐ পাঁচ ডলারের মধ্যে মাত্র চল্লিশ সেন্ট অবশিষ্ট।

কুছ পরোয়া নেই। জেতা হারাই তো জীবন। রাস্তার মোড়েই একটা ওষুধের দোকান। তার ঝলমলে আলোয় মর্লি দেখলো একটি বছর পাঁচেকের ছেলে ওষুধ কিনতে আসছে।

দ্রুত রাস্তা পার হয়ে তার সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে ফেললো মর্লি। এটা তার চরিত্রের একটা অবিসংবাদী গুণ বলা যায়। ছেলেটি একটা ডলার নিয়ে মায়ের জন্য ওষুধ কিনতে এসেছে।

অভিভাবকের মত ছেলেটির হাত ধরে দোকানে এলো মর্লি। চতুর দরাদরি করে মাত্র পনেরো সেন্টেই ওষুধটা কিনে ফেললো সে। বাকি পয়সা গেল নিজের পকেটে। বাচ্চাটিকে সস্তা মিঠাই কিনে দিয়ে খুশী করে সাবধানে রাস্তা পার করে দিল সে।

একটা দোকানে ঢুকে পরিপাটি করে ডিনার সারলো সে, নিজের চাতুর্যে নিজেই মুগ্ধ হয়ে আপন মনে মিটিমিটি হাসছে।

ধীরে সুস্থে রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে মর্লি শহরের দুটো রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালো। এই জনস্রোতে জাল ফেলেই সে তার পরবর্তী নির্বোধ শিকারটি ধরবে। তার মত দক্ষ আর আত্মবিশ্বাসী মানুষ দুটো মেলা ভার।

দুটি নারী ও দুটি পুরুষের একটি দল মর্লিকে দেখে আনন্দে আত্মহারা। তাদের খানাপিনার আসরে যোগ দিতে ডাকলেন তাকে। পকেটের একমাত্র অবশিষ্ট ডাইমটি হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সহাস্যে তাদের এড়িয়ে গেল সে।

ঢলঢলে সুট পরা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো ছাতা হাতে এসে ধরলো মর্লিকে। তার ছেলে সলোমন স্লোদার্মকে খুঁজছে সে। তাকে এড়িয়েই যাচ্ছিল মর্লি, হঠাৎ কি ভেবে বুড়োকে জানালো সল স্লোদার্ম তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার কাছে এখনই নিয়ে যেতে পারে তাকে। তবে তার আগে কাফেতে একটু বসা যাক।

একঘন্টা পরে মর্লিকে ম্যাডিসন স্কোয়ার-এর একটা নির্জন বেঞ্চে বসে থাকতে দেখা গেল। তার মুখে একটা পঁচিশ সেন্ট দামের চুরুট আর পকেটে দলাপাকানো একশো চল্লিশ ডলার।

এক হতচ্ছাড়া বুড়ো এসে বসলো পাশে, মর্লির চেহারা ও পোশক দেখে হয়তো মনে করলো সে কোন উচ্চস্তরের জীব, ইনিয়ে বিনিয়ে একটা ডাইম চাইল সে। উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে একটা ডলারই দিয়ে দিল মর্লি। সারাজীবন খেটে খাওয়া বুড়োটি এখন আর কোনো কাজ পায়না শুনে হাসলো মর্লি। ওভাবে কিছু হয় না। পৃথিবীর কাছ থেকে আদায় করে নিতে হয় চাহিদা মত জিনিষ।

বুড়ো তার সদাশয়তার জন্য আশীর্বাদ করে বললো মর্লির মনস্কামনা যেন পূর্ণ হয়।

আবার হাসলো মর্লি, সে তো পূর্ণ হয়ে গেছেই। আজ রাতটা সে কাটাবে রাস্তার ওপারের বিলাসবহুল হোটেলে। সৌভাগ্য তো কুকুরের মত তার পিছনে ঘোরে।

রাস্তার ওপারে এস দাঁড়লো একটি মেয়ে, হয়তো দেরী হয়ে গেছে। বাড়ি ফেরার গাড়ির অপেক্ষায় উন্মুখ সে, কোনদিকেই তাকাচ্ছে না।

আট বছর আগে মর্লির সঙ্গে স্কুলের একবেঞ্চে বসতো ঐ মেয়েটি। একটা নিষ্পাপ বন্ধুত্বের মধুর সম্পর্ক ছিল তাদেব দুজনের।

ও' হেনরী—২

নিতান্ত আটপৌরে পোশাকের এই মেয়েটির উজ্জ্বল নিষ্পাপ চোখদুটির দিকে তাকিয়ে তার সারাদিনের প্রতারনার সাফল্যের গৌরব এক নিমেষে ধুলোয় মিশিয়ে গেল।

পাশের রাস্তাটায় মোড় নিয়ে একটা নির্জন রাস্তায় ল্যাম্পপোষ্টে নিজের জ্বালাধরা গলাটা চেপে ধরে অস্ফুট কাতরোক্তি করলো মর্লি।

—হা ঈশ্বর! আজ যদি আমার মৃত্যু হোত।

* The Assesor of Success

শেষ পাতাটি

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পশ্চিমে গড়ে উঠেছিল দরিদ্র শিল্পীদের একটা মহল্লা, সেখানেই জবরদখল করা একটা ইটের তিনতলা বাড়ীর ওপরতলায় থাকতো দুই নবীনা শিল্পী জন্‌সি আর সু। জনসি ওরফে জোয়ান এসেছিল ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে, সু ছিল 'মেইন'-এর মেয়ে।

একটা হোটেলের খাবার টেবিলে তাদের দুজনের প্রথম দেখা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা বুঝতে পারলো শিল্পকলা, পছন্দসই খাবার বা পোশাকের হাতার বিষয়ে দুজনের রুচিই সমান। তাই এই একত্র বাসের পরিকল্পনা।

শীতের শুরুতেই নিউমোনিয়ার প্রবল আক্রমণে আক্রান্ত হোল জন্‌সি। এই তণ্বী মেয়েটি দিন দিন তার শয্যার সঙ্গে যেন মিশে যেতে লাগলো। উৎকণ্ঠিত মুখে ডাক্তার জানালো, মেয়েটির বেঁচে থাকার ইচ্ছেই নেই একেবারে। জীবন সম্পর্কে এই অনীহার কাছে মেডিকেল সায়ন্স বহুবার পরাজয় বরণ করে নিয়েছে। যদিও নিজে বাঁচতে চায়, তবেই ওকে বাঁচানো সম্ভব।

স্টুডিওতে ফিরে এসে তোয়ালেতে মুখ গুঁজে প্রথমে খুব একচোট কাঁদলো সু। তারপর আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নিয়ে আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে পাশের শোবার ঘরে ঢুকলো।

বিছানার সঙ্গে মিশে এমন নিশ্চল ভাবে শুয়ে আছে জনসি, সু ভাবলো সে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃশব্দে সে আঁকার কাগজ বিছিয়ে নিল। টিকে থাকার সংগ্রামে তরুণ সাহিত্যিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মেলায় এই সব নবীন শিল্পীরা। তাদের লেখা বই-এর প্রচ্ছদ আঁকে।

মন দিয়ে স্কেচ করতে করতেই সে বেশ কয়েকবার একটা অস্ফুট শব্দ শুনে বিছানার দিকে ফিরে তাকালো।

ঘুমোয়নি জনসি। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সামনের পুরোনো বাড়ীটার দেওয়ালে উঠে যাওয়া একটা শুকনো আইভি লতা, সেদিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে গুনে চলেছে সে।

বারো,......এগারো......নয়....., একটু পরেই আট ও সাত প্রায় একসঙ্গে।

—ব্যাপার কি জন্‌সি, কি গুনছো তুমি?

—আইভি লতাটার পাতা ঝরে যাচ্ছে এক এক করে, দুদিন আগেও একশোর বেশী ছিল, আর এখন ছয়, না না মাত্র পাঁচটা পাতা। আমি জানি, ওর শেষ পাতাটি ঝরে গেলেই আমিও হারিয়ে যাবো পৃথিবী থেকে।

—এরকম কথা বোলোনা সোনা। তুমি ভাল হয়ে যাবে। নেপল্‌স উপসাগরের ছবি আঁকা তোমার কতদিনের সাধ। যাবে না সেখানে? ওই বুড়ো গাছটার পাতার সঙ্গে তোমার জীবনের কি সম্পর্ক? এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত চোখ বুঁজে চুপ করে শুয়ে থাকো। এ ছবিটি আঁকা হলেই, এটা বিক্রী করে তোমার জন্য ওষুধ আর আমার জন্য কিছু খাবার আনবো।

—ওষুধ আমার কি হবে সু? তিনদিন আগেই আমি জানি যে, আমি আর বাঁচবোনা।

—ঠিক আছে, এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো দেখি, আমি নিচ থেকে বুড়ো বেরহ্যামকে আমার ছবির মডেল করার জন্য ডেকে আনতে যাচ্ছি। যাবো আর আসবো, তুমি ততক্ষণ একটুও নড়বে না কিন্তু।

বুড়ো বেরহ্যাম বাড়ীর একতলাতেই থাকে। শিল্পের সাধনা করে আসছে দীর্ঘকাল, কিন্তু সাফল্যের মুখ দেখেনি। পেটের দায়ে খুচরো নানারকম পত্রপত্রিকার মলাট আঁকে। জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবিটা আঁকার বাসনায় সব সময়েই তৈরী থাকে তার ইজেল।

এই বুড়ো তরুণ শিল্পীদের অঘোষিত অভিভাবক বলে মনে করে নিজেকে। ওদের ভালবাসে মনপ্রাণ দিয়ে। উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে মডেল আনার সামর্থ এদের নেই বলে প্রায়ই অল্প টাকায় এদের মডেল হতে রাজী হয়ে যায়।

সু'র কাছে জনসির মনোবিকারের কথা শুনে বুড়োতো চটে আগুন। এ আবার একটা কথা হোল? জনসির মত একটি চমৎকার জীবন নাকি গাঁথা আছে বুড়ো আইভি লতার সঙ্গে?

তারা যখন ওপরে উঠে এলো, জনসি ঘুমিয়ে পড়েছে। জানলা দিয়ে বাইরের আইভি লতাটার দিকে তাকিয়ে দুজনেরই মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

জানলার পার্দটা নামিয়ে দিয়ে 'সু'র মডেল হয়ে বসলো বুড়ো বেরহ্যাম।

পরদিন সকালে জনসির পিড়াপিড়িতে অনিচ্ছা সত্বেও পর্দা তুলে দিয়ে হতবাক সু। সারারাত তীব্র হাওয়া আর আঝোরে বৃষ্টি হওয়া সত্বেও আইভি লতা আঁকড়ে আছে একটি মাত্র পাতাকে। মাটি থেকে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচুতে বোঁটা আর একটু হলদে হয়ে আসা ডগা নিয়ে জ্বলজ্বল করছে পাতাটি।

—ওটাই শেষ পাতা। ফিস ফিস করে বললো জনসি। এত ঝড়েও ওটা পড়েনি। কাল ওটা ঝরে গেলেই আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাবো।

দিনের আলো ফুরোবার আগে আর একবার জানলা খুলে পাতাটাকে দেখলো জনসি। অদ্ভুত ভাবান্তর হোলো তার। এই প্রথম বিছানায় উঠে বসে 'সু'র হাত থেকে শুরুয়া নিয়ে খেলো। বল্‌লো, মনে হচ্ছে নেপল্‌স-এর ছবিটা বোধহয় আঁকতে পারবো।

পরদিনই একটা দারুন দুঃসংবাদ শুনে চমকে উঠলো সু। গতকাল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে বুড়ো বেরহ্যাম। সকালে ভিজে জামা ও জুতো সমেত জ্বরে বেহুস বেরহামকে পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিল দারোয়ান।

বেরহ্যামের ঘরে ঢুকে বুঝতে আর কিছু বাকি রইল না সু'র। বৃষ্টিতে ভিজে মই নিয়ে গিয়ে নিজের আঁকা একটি আইভি পাতার ছবি লতার গায়ে আটকে দিয়েছে বুড়ো। অদ্ভুত জীবন্ত হয়েছে ছবিটি, শিল্প হার মানিয়েছে সত্যকে। এক তরুণী শিল্পীর প্রাণ বাঁচাতে বেরহ্যাম এতদিনে এঁকেছে তার মাস্টারপীস। আর এরই জন্যে নিবেদন করেছে তার নিজের প্রাণ।

* The Last Leaf

দোষী কে?

জানলার পাশে দোলনা চেয়ারে বসেছিল একটি লোক। গালভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ক্লান্ত চেহারা, পায়ে জুতো নেই। অসীম আগ্রহে সান্ধ্যদৈনিকের পাতার খবরগুলো গিলছিল।

পাশের ঘরে তার স্ত্রী রাতের রান্না করছে। শুয়োরের মাংস রান্নার গন্ধের সঙ্গে কফির গন্ধ মিশে বাতাস ভারী করে তুলেছে।

বাইরে রাস্তায় এপাড়ার দুর্বীনিত তরুন তরুণীদের মেলা বসে যায় এ সময়। তুমুল হট্টগোল, নাচগান, মারামারি আর গালিগালাজের বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

একটি বছর বারোর ছোট্ট মেয়ে ভীরু পায়ে বাবার কাছে এসে তার সাথে চেকার খেলার আর্জি জানালো। খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই লোকটি রুক্ষস্বরে জানালো সে ক্লান্ত, মেয়েটি বাইরে রাস্তায় গিয়ে খেলুক।

পাশের ঘর থেকে এসে প্রতিবাদ করলো তার মা— আমি চাই না ও রাস্তায় গিয়ে ওই অসভ্য ছেলেমেয়ের দঙ্গলে মিশুক। ওখানে লিজি এমন কিছু শিখে ফেলবে, যা ওর পক্ষে ক্ষতিকর। মেয়েটা সারাদিন বাড়ীতে বসে আছে, তোমার তো উচিৎ ওর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানো।

লাল চুলের অপরিচ্ছন্ন চেহারার লোকটি গজগজ করে উঠলো।

—সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর বাড়ি ফিরে এসেও কি একটুও শান্তি পাবো না। ও রাস্তায় গিয়েই খেলুক, আমাকে দিয়ে কিছু হবে না বলে দিলাম।

বার্ক আর কিড মুশলি দুই বন্ধু। সম্প্রতি তাদের মধ্যেই মহাতর্ক বেঁধে গেছে। কিড অ্যানিকে নিয়ে নাচের আসরে যাবেই যাবে। আর বার্ক তাকে বোঝাচ্ছে লিজের মত বান্ধবী থাকতে এসব করা উচিত নয় কিডের। নইলে ঝামেলায় পড়বে সে। লিজ তাকে যেরকম ভালোবাসে তেমনটা আর কোথাও পাবে না কিড।

সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে কিড বল্‌লো—দেখো, আমি মোটেই অ্যানির ভক্ত নই, কিন্তু আমি লিজকে একটু শিক্ষা দেবার জন্যই অ্যানিকে নিয়ে নাচতে যাবো। ঈর্ষা করাকে

আমি ঘেন্না করি। আর লিজ তো আমাকে তার কেনা গোলাম মনে করে, বলে বেড়ায়, অন্য কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহসই নাকি নেই আমার?. এসব সহ্য করা যায়?

—বিয়ে করছো না তোমরা?

—সে তো করছিই, সম্ভবতঃ এক বছর পরেই। কিন্তু লিজ আজকাল খুব বেশি মদ খাচ্ছে, আর অসম্ভব দজ্জাল হয়েছে। এমন সব ভাষা ব্যবহার করে আজকাল, কোন ভদ্রমহিলার মুখে মানায় না।

—কিন্তু কিড্, আমি নিজের চোখে দেখেছি বীয়ারের প্রথম গ্লাসটি তুমিই ওর মুখে ধরেছিল। কেমন নরম লাজুক প্রকৃতির ছিল মেয়েটি, মুখে কথা সরতো না। এখন তো তার মুখে কথার খই ফোটে। যাই হোক্, অ্যানিকে নিয়ে আমি নাচতে যাবোই। লিজকে একটা শিক্ষা দিতেই হবে।

—দেখো ভাই। চোখ কান খুলে রেখো। লিজের সঙ্গে নাচতে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। যা ক্ষ্যাপা মেয়ে। লিজ যদি আমার মনের মানুষ হোত, আর অমি যদি অ্যানীকে নিয়ে নাচতে যেতাম, তবে জামার তলায় লোহার বর্ম পরে নিতাম।

অবাধে ঘুরে বেড়ায় লিজ। তার দুটি কালো চোখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জনতার দিকে তাকিয়ে থাকে। পরনে সুবজ রঙের স্কার্ট। কোমরে ঝোলানো একটি কেতাদুরস্ত বাদামী গোলাপী চৌকো চাদর। আঙুলে একগাদা নকল চুনীর আংটি, গলার লকেটটা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলছে। হাই হিল জুতোয় অনেককাল কালি পড়েনি। মাঝে মাঝেই গুনগুন করে গান গেয়ে ওঠে সে। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে এমন সব চোস্ত বুলি আওড়ায়, সেগুলো বোধহয় ইংরাজী ভাষায় পূর্বাঞ্চলের লোকেদের নতুন সংযোজন।

ব্লু কাফেতে ঢুকে হুইস্কির অর্ডার দিল লিজ। দোকানের লোকটার কাছ থেকে জেনে নিল সত্যিই কিড্ অ্যানীকে নিয়ে নাচের আসরে যাচ্ছে। আপন মনেই কিড্-এর কলজেটাকে দুফাঁক করার সংকল্প শুনিয়ে নাচের আসরের দিকে রওনা দিল সে। বারটেণ্ডার সহানুভূতির সঙ্গে বললো, কিড লিজের মত মেয়েকে ছেড়ে কখনই দেবে না।

আর একটি হুইস্কি নিয়ে বসলো লিজ—পানীয়ের প্রভাবে মনটা একটু নরম হলে, বললো।

—দু দুটো বছর বাড়িতে কোন কাজ না থাকায় সিঁড়িতে এসে বসে থাকতাম। কারো সঙ্গে মিশতাম না। তারপর একদিন কিড এসে আমাকে কব্জা করে ফেললো! ওর কথাতেই প্রথম মদ খেলাম। বাড়ী গিয়ে সারারাত কাঁদলাম, মারও খেলাম। আর সেই কিড্ কিনা অ্যানীকে নিয়ে নাচতে যাচ্ছে?

জ্বলজ্বলে চোখে টলতে টলতে রাস্তা দিয়ে নাচের হলের দিকে এগিয়ে গেল লিজ। সুসজ্জিতা সোনালী চুলের অ্যানীকে নিয়ে নাচের আসরে নামার মুহূর্তেই সবুজ সিল্কের স্কার্ট পরা নিয়তি তার দিকে ছুটে এল, আর সর্বশক্তি দিয়ে হাতের ছোরাটা বসিয়ে দিল কিড্-এর বুকে।

তারপর হয় আত্মরক্ষার তাগিদে বা অন্য কোনও আবেগে আপ্লুত হয়ে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়াতে লাগলো রাজপথ দিয়ে।

এরপর যে ঘটনা ঘটলো, সেরকম জঘন্যতম বর্বরতা একমাত্র এই শহরের পক্ষেই সম্ভব।

শহরের আবালবৃদ্ধ বনিতা উন্মাদের মত পিছু ধাওয়া করলো তার। তাড়া খাওযা উদ্ভ্রান্ত জন্তুর মত প্রাণপনে ছুটে চললো মেয়েটি। ছুটতে ছুটতে একসময় নদীর ধারে পৌঁছে গেল সে, আর এক সময় নদীর গহন অতলে ঝাঁপ দিয়ে শান্তি পেল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরেই আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। মনে হোলো, আমি এক অন্য জগতে চলে গেছি। সেখানে এক আদালতে কক্ষের বাইবে বিচার চলছিল। মাঝে মাঝেই একটি সুন্দরী দেবদূতী পরের মামলার ঘোষনা করে যাচ্ছিল।

পৃথিবীতে থাকতে কত না হাজার পাপ করেছি, আমি বিদেশী লোক একথা জানিযে এদের কাছ থেকে ছাড়া পাওযা যাবে কিনা তাই ভাবছিলাম।

এমন সময় বেলিফ বেশী দেবদূতীটি আর একটি মামলার নম্বর ঘোষনা কবল।

সবিস্ময়ে দেখলাম প্রচাবকেব পোযাক পবা একটি লোক হাত ধবে টানতে টানতে নিযে যাচ্ছে লিজকে, হ্যাঁ আমাদেরই লিজকেই।

আদলতকর্মী তাকে ভেতরে ঢুকিযে নিযে দরজা বন্ধ কবে দিল।

আমি শ্রীযুক্ত পুলিশের কাছে গিয়ে মামলাটার বিষয় জানতে চাইলাম।

হাতের আঙুলগুলো একসাথে জুড়ে নিয়ে সে বললো—কাহিনীটা খুবই দুঃখেব। একেবারে উচ্ছন্নে গিয়েছিল এই মেয়েটি। আমি হচ্ছি বিশেষ অফিসার রেভারেণ্ড জোন্স। মামলাটা আমার আদালতেই এসেছিল। মেয়েটি তার প্রেমিককে খুন করে নিজে আত্মহত্যা করেছিল।

আদালতে নিজের স্বপক্ষে সে কোন উকিল পর্যন্ত দেয় নি। আদালতে আমি যে প্রতিবেদন দাখিল করেছি তাতে সব কিছুই সবিস্তারে বর্ণনা করা হযেছে। প্রচুর সাক্ষীব সমর্থনও পেয়েছি এ বিষয়ে। মেয়েটি নিঃসন্দেহে পাপী। প্রভুর জয় হোক।

কোর্ট অফিসার দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

বেভারেণ্ড জোন্স চোখের জল ফেলে বলে উঠলো—বেচারী মেয়েটি। বড় করুণ কাহিনী তার। আদালতে অবশ্য সে—

কোর্ট অফিসার ধমকে বললো, সে খালাস পেয়েছে। এইসব মিথ্যে অপরাধীদের কেন ধরে আনো বলোতো জোন্স। তোমাকে দেখছি দক্ষিণ সমুদ্র দ্বীপপুঞ্জের প্রচারক বাহিনীতে পাঠিয়ে দিতে হবে। এইসব মিথ্যে গ্রেপ্তারের স্বভাবটা ছাড়।

এই মামলায় আসল দোষীকে খুঁজে বার করোগে যাও। আসল দোষী হচ্ছে সেই লালচুল, খোঁচা দাড়িওলা নোংরা লোকটা। যে জানলার পাশে বসে কাগজ পড়ে আর তার ছেলেমেয়েরা পথে পথে খেলা করে বেড়ায়। তাকে খোঁজার চেষ্টা করো।

আচ্ছা। এটা কি সত্যিই একটা অর্থহীন স্বপ্নমাত্র।

* The Guilty Party

রাজগীর অভিভাবক

দক্ষিণ উপত্যকার নিচু পাহাড়শ্রেণীর সানুদেশে দাঁড়িয়ে আছে ছায়াচ্ছন্ন, স্বপ্নময় ওয়েমাথভিল। এখানে প্রধান ব্যাংকটার মালিক ওয়েমাথ পরিবার। এই পরিবারটির সততা ও আদর্শের কথা সবাই সম্ভ্রমের সঙ্গে বলাবলি করেন।

এই পরিবারের মাথা মিঃ রবার্ট ওয়েমাথ এই ব্যাংকের প্রেসিডেণ্ড। সংসারে তাঁর বিধবা কন্যা লেটি আর তার দুটি সন্তান, নান আর গাই। রবার্ট বিপত্নীক হয়েছেন বছর দুয়েক হল। তাঁর এক আত্মীয় উইলিয়াম ওয়েমাথ ঐ ব্যাংকের কেশিয়ার, থাকেন অন্য বাড়ীতে।

মিঃ রবার্ট মোটসোটা শক্ত সমর্থ মানুষ। বাষট্টি বছর বয়স। তিনি মেজাজী, দয়ালু ও উদার। তাঁর কণ্ঠস্বরে বজ্র আছে। কিন্তু যতটা গর্জায়, ততটা বর্ষায় না। মিঃ উইলিয়াম নরম ধাতের মানুষ। আচার আচরণে কোন ত্রুটি নেই, আর সব সময়েই কর্মব্যস্ত।

ব্যাংকের দারোয়ান আর ওয়েমাথ পরিবারের অলিখিত অভিভাবক ছিল বুড়ো বুশরড খুড়ো। মিঃ রবার্ট ও মিঃ উইলিয়ামের মত তার কাছেও থাকতো ব্যাংকের ভল্টের একটি চাবি। অনেক সময়েই ভল্টের মেঝেতে স্তূপ করে রাখা হোত বস্তাবন্দী রৌপ্যমুদ্রায় দশ, পনেরো বা দশ হাজার ডলার। বুশরড খুড়োর হাতে সবকিছু নিরাপদ। মনে প্রাণে সততায় ও গর্বে সেও একজন ওয়েমাথ।

ইদানিং বুশরড খুড়ো মহা সমস্যায় পড়েছে মিঃ মার্স রবার্ট ওয়েমাথকে নিয়ে। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে দুজনে বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু এখন যেন রবার্ট তার কাছে ক্রমেই অচেনা হয়ে উঠছে। মদ্যপানের প্রতি আসক্তি বেড়েই চলেছে রবার্টের। দিনের মধ্যেই বেশ কয়েকবার ব্যাংক থেকে বেরিয়ে পানশালার দিকে হানা দেয়। মাতলামী করেনা অবশ্য। তবে তার বিচার বুদ্ধির তীক্ষ্নতা কমে এসেছে, ব্যাংকের কাজকর্মেও ক্রমেই অবনতি হচ্ছে। ব্যাংকের জমা টাকার অঙ্ক ক্রমশই কমে আসছে। খুবই চিন্তিত বুড়ো বুশরড খুড়ো।

মাছ শিকারের নেশা রবার্ট ওয়েমাথের। মরশুম এলেই এবং কাজের ফাঁক পেলেই তিনি মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়তেন। একদিন তিনি জানালেন যে দুতিন দিনের জন্য তিনি হ্রদ অঞ্চলে মাছ ধরতে যাচ্ছেন। পুরোনো বন্ধু বিচারক অর্চিনার্ড যাচ্ছেন তাঁর সঙ্গে।

মিঃ রবার্ট যেদিন যাবেন, সেদিন রাত বারোটা নাগাদ ঘুম ভেঙে উঠে পড়লো বুশরড। হঠাৎই তার মনে পড়ে গেছে "সন্তান দল" সমিতি, যার সে কোষাধ্যক্ষ, তাদের পাশবইটা সে ব্যাংকেই ফেলে এসেছে। অথচ কাল সকালেই মিটিংয়ে সেটাই দরকার।

বুড়ি মাটিল্ডার গজগজানি উপেক্ষা করে বাদামী সুটটা পরে নিল বুশরড। বাদামী কাঠের লাঠিটা নিয়ে ওয়েমাথভীল-এর জনশূন্য পথ দিয়ে হেঁটে ব্যাংকে পৌঁছে গেল।

পাশের দরজাটা দিয়ে ব্যাংকে ঢুকলো সে। যে ছোট ঘরটাতে সবসময় তার কোটটা ঝুলিয়ে রাখে। সেখানেই পেয়ে গেল পাশবইটা।

বাড়ীতে ফেরার জন্য পা বাড়বে, এমন সময় সামনের দরজায় একটা চাবির খুট খুট আওয়াজ শুনে সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। কে যেন দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকলো, দরজাটা

আস্তে করে বন্ধ করে দিল, আর লোহার রেলিং এর পাশ দিয়ে গহনাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। আবছা গ্যাসের আলোয় বুশরড খুড়োর চিনতে অসুবিধে হোলনা স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মিঃ রর্বাটকে।

পকেট থেকে চাবি বের করে ভল্টের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন প্রেসিডেন্ট। দু তিন মিনিটের মধ্যেই বড় একটা থলি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি, পরনে ভ্রমণের উপযোগী মোটা পোশাক। একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে গেলেন, দরজায় তালা লাগাতেও ভুললেন না।

বুশরডের পায়ের তলার মাটি সরে গেল। সিন্দুক ও ভল্টের এই লুটেরা যদি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট না হতেন, তবে এই বিশ্বস্ত কর্মীটি বাঘের মতই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো কিন্তু এখন তার কর্তব্য কি?

তার মনে পড়লো রবার্ট-এর সাম্প্রতিক অত্যধিক মদ্যপানজনিত বদমেজাজ। মাঝে মাঝে শোনা যায় ব্যাংকের ব্যবসায় মন্দাভাব ও ঋণ গ্রহনের অসুবিধার কথা। তার মানে মিঃ রবার্ট ব্যবসা চালাতে পারছেন না, তাই ব্যাংকের তহবিল সঙ্গে নিয়ে ফেরার হবার চেষ্টা করছেন। তাই যদি তিনি করেন, তাহলে মিঃ উইলিয়াম, মিস্ লেটি, ছোট্ট নানা, গাই আর বুশরডকে সহ্য করতে হবে লোকনিন্দা আর অপমানের জ্বালা।

পাশের দরজা দিয়ে ছুটতে ছুটতে মনে মনে বলতে লাগলো প্রভুভক্ত বুশরড—একাজ মিঃ রবার্টকে আমি কখনই করতে দেব না। ওয়েমাথ পরিবারের মানসম্ভ্রম চিরদিনের মত ধুলোয় লুটিয়ে যাবে! যদি পারি তোমাকে অমি আটকাবোই মিঃ রবার্ট। তুমি যদি গুলি করে আমার মাথাটা উড়িয়ে দাও, তবুও আমি তোমাকে এই জঘন্য কাজ করতে দেবো না।

স্টেশনে এসেই দেখতে পেলো দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ রবার্ট। সরাসরি তাঁকে কিছু বলতে সাহসে কুলোলো না তার, ভাব দেখালো, অন্য কোনো কাজে এদিকে এসেছে সে।

রবার্ট তাকে বাড়ী ফিরে যেতে বললেন। এত রাতে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বাইরে থাকলে বুড়ো বাতের যন্ত্রনায় মরে যাবে।

আর তখনই তিনমাইল দূরের আগের স্টেশন থেকে ট্রেনের হুইস্‌ল শোনা গেল। এই ট্রেনেই তাহলে পালাবার চেষ্টায় আছেন তার মনিব। মরীয়া হয়ে কথাটা বলেই ফেল্‌লো বুশরড।

—মিঃ রবার্ট আপনার মনে আছে আপনার স্ত্রী মিসেস লুসির সঙ্গে কত মধুর সময় কাটিয়েছেন? কত ভালবাসতেন, কত বিশ্বাস করতেন, মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও আমায় ডেকে বলেছেন, আমি ঠিকভাবে আপনার দেখাশোনা করি, তিনি আরও বলেছিলেন,—বুশরড খুড়ো, আমি চাই যে আমি যখন নেই তুমিই রবার্টকে দেখবে, মনে হয় তোমার কথা সে শুনবে। কখনও কখনও সে ভয়ংকর রেগে যায়, তখন তার পাশে তোমার মত একজনকে থাকতে হবে যে তাকে বোঝে।

—এসব কথা বলার আর সময় পেলেনা খুড়ো? বাড়ী যাও, রাত হয়েছে। আর তোমার মিসেস্ লুসিও তো দুবছর হোলো আমাদের মধ্যে নেই। বাড়ী যাও বলছি।

আবার ট্রেনের বাঁশি বাজলো, এবার মাইলখানেক দূর থেকে।

ব্যাংক কর্তার থলেটার ওপর হাত রেখে বুশরড বললো।

—ঈশ্বররের দোহাই মার্স রবার্ট, এটা তুমি সঙ্গে নিয়ে যেও না। ঐ থলির মধ্যে আছে মিসেস লুসির সন্তানদের বিপদ, ওয়েমাথদের সুনাম।

নিচু গলায় রবার্ট বললেন ঃ

—তুমি তোমার অধিকারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছো। বাড়ী ফিরে যাও বুশরড, আর একটাও কথা নয়।

কিন্তু বুশরড দৃঢ়ভাবে হাতের থলিটা চেপে ধরলো।

—রবার্ট থলিটা আমাকে দাও। তোমার সঙ্গে এভাবে কথা বলার অধিকার আমার আছে। ছোটবেলা থেকে ক্রীতদাসের মত সেবা করেছি আমি। আমরা আজ দুজনেই বুড়ো হয়েছি। সেদিনের তো আর বেশি দেরী নেই, যেদিন মিসেস্ লুসির সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হবে তখন তাঁকে আমি কি কৈফিয়ৎ দেবো?

স্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়ালো । মিঃ রবার্ট থলে থেকে হাত তুলে নিলেন। বললেন—বুশরড, এটা নিয়ে তুমি ফিরে যাও। মনে থাকে যেন, এ ব্যাপারটার এখানেই ইতি। আমি যাচ্ছি। উইলিয়ামকে বোলো, আমি শনিবার ফিরবো। শুভরাত্রি।

ব্যাংক মালিক ট্রেনের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ব্যাংকের পথ ধরলো বুশরড।

ওয়েমাথভিল থেকে তিনঘন্টার পথ পার হয়ে ভোর বেলা এক নির্জন ফ্ল্যাগ স্টেশনে নামলেন মিঃ রবার্ট। তাঁর মাছ ধরার সঙ্গীরা সেখানেই তার অপেক্ষা করছিলেন।

খালি হাতে মিঃ রবার্টকে আসতে দেখে বিচারক অর্চিনার্ডি অবাক হলেন। —কি ব্যাপার রবার্ট তোমার যা আনার কথা ছিল—

—দেখো বেন, সত্যিকথা বলতে কি আমাদের পরিবারের একজন জঘন্য আত্মপ্রত্যয়ী নিগার অভিভাবক আছে, সেই সব ভেস্তে দিল। জিনিষটা যে আমি ব্যাংকের ভল্টে লুকিয়ে রেখেছিলাম, ব্যাটা স্টেশন পর্যন্ত ধাওয়া করে সেটা কেড়ে নিয়ে গেছে। ও লক্ষ্য করেছিল নিশ্চয়ই আমি ক্রমেই বেশি করে সুরাসক্ত হয়ে পড়ছি। না বেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি মদটা ছেড়েই দেবো। নইলে বুড়োর কথামত পবিত্র, নির্ভীক আর নিন্দার উর্ধে কখনই থাকতে পারবো না।

বেন চিন্তিত ভাবে বললেন—কথাটা কিন্তু সে ভুল বলেনি। রবার্ট একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—কিন্তু থলিতে যে দু বোতল বুরবন মদ ছিল, যা তুমি জীবনে পান করোনি।

* The Guardian of the Scutcheon

একজন কাউন্ট ও বরযাত্রী

বোর্ডিং হাউসে ডিনার খেতে গিয়ে নতুন বোর্ডার মিস কনওয়ের সঙ্গে আলাপ হোল অ্যাণ্ডি ডোনাভানের। ছোটখাট লাজুক মেয়েটি। সাদাসিদে একটা নস্যিরঙের পোশাক পরা। ডোনাভান দ্বিতীয়বার ভাবেনি তাকে নিয়ে।

দুসপ্তাহ পরেই আবার দেখা। এবার দেখে চমক লাগলো ডোনাভানের। কালো রেশমী শোকের পোশাক, কালো দস্তানা আর টুপির কালো নেটের ফাঁকে উজ্জ্বল সুন্দর দেখাচ্ছে সেই সাদাসিদে সরল মুখটি। একে নিয়ে তো বারবার ভাবা যায়।

নৈশভোজের সময় তাকে জিগ্যেস করে জানলো ডোনাভান, মেয়েটির কোনও প্রিয়বিচ্ছেদ ঘটেছে। এরপর তার সাগ্রহ আহ্বানে সাড়া দিয়ে পার্কে বেড়াতে বেড়াতে নিজের হৃদয়ের বেদনা উজার করে দিল মিস কনওয়ে।

তার বাগদত্ত প্রেমিক ছিল কাউন্ট ফার্নাণ্ডো মার্জিনি। এদের প্রেমের ব্যাপারে বহু বাধার সৃষ্টি করেছিলে মিস কনওয়ের বাবা। অবশেষে মেনেও নিয়েছিলেন। আগামী বসন্তে তাদের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল। আর, কদিন আগে টেলিগ্রাম এসেছে এক দুর্ঘটনায় মারা গেছে ফার্ণাণ্ডো।

এই বেদনাবিধুর মুখ মুহূর্তে মন জয় করে নিল ডোনাভানের।

পরম আগ্রহে নিজের প্রেমিকের রেশমী কাপড় দিয়ে ঢাকা ছবিখানা পরদিনই তাকে দেখালো মিস কনওয়ে। তার লকেটেও আছে অনুরূপ একটি ছোট্ট ছবি।

অচিরেই দুজনের বন্ধুত্ব জমে উঠলো।

ডোনাভানের সামনে এখন খুব সূক্ষ্ম একটা কাজ উপস্থিত। কনওয়ের হৃদয় থেকে হতভাগ্য কাউন্টকে সরিয়ে সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রায় একমাসের নিরলস প্রয়াসে সফলও হোল, তাদের বিয়ের কথা ঘোষণা করা হয়ে গেল।

ঘোষণার দুসপ্তাহ পরে একদিন চিন্তিত ডোনাভানকে জিগ্যেস করে জানতে পারলো ম্যাগী কনওয়ে যে, সে চিন্তিত তার বন্ধু মাইক সুলিভানকে নিয়ে।

এ নাম কখনো শোনেনি ম্যাগী, কে সে?

—নিউ ইয়র্ক শহরের সবচেয়ে বড় মানুষ সে। রাজনীতির ক্ষেত্রে, সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। 'বড়মাইক' এর বিরুদ্ধে যে কোন প্রকাশ্য জায়গায় একটা কথা বলেছো কি দুজন লোক তোমার কলার চেপে ধরবেই।

—তার কি হয়েছে?

—আমার মত সাধারণ লোকের সঙ্গেও সে বন্ধুত্ব রেখেছে। এটাই আশ্চর্যের। তা গতকাল তার সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় দু'সপ্তাহ পরে আমার বিয়ে শুনে জানালো; আমি যেন তাকে বিয়েতে নিমন্ত্রণ করি।

—তা, এতে অসুবিধেটা কোথায়।

—অসুবিধে আছে ম্যাগী। সেকথা তুমি জানতে চেওনা।

—জানতে আমার বয়েই গেছে। কোন রাজনৈতিক ব্যাপার হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ডোনাভান, তাই বলে তুমি আমার দিকে তাকিয়ে হাসবেনা, এটা তো হতে পারে না। হঠাৎই অ্যাণ্ডি বলে উঠলো।

—আচ্ছা ম্যাগী। সত্যিকরে বলোতো, তুমি কি আমাকে ততটাই ভালবাস, যতটা কাউন্টকে বাসতে?

অনেকক্ষন কোন উত্তর দিল না ম্যাগী তারপর হঠাৎই অ্যাণ্ডিকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুর বন্যায় ভাসিয়ে দিল তাকে।

নিজের সমস্যার কথা ভুলে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো অ্যাণ্ডি।

—কি হয়েছে সোনা? কি হয়েছে তোমার? ফোঁপাতে ফোঁপাতেই বললো ম্যাগী; অ্যাণ্ডি, তোমাকে আমি মিথ্যে কথা বলেছি। প্রতারণা করেছি তোমাকে, জানি এরপর আর তুমি আমাকে ভালবাসবেনা, বিয়ে করবে না, তবু সত্যি কথাটা আমি আর না বলে পারছি না।

—কি সত্য ম্যাগী?

—সত্যিসত্যি কোনদিন আমার কোন প্রেমিক ছিল না। একজন কাউন্ট দূরের কথা, তার কড়ে আঙুলটাও কোনদিন ছিল না। অন্য মেয়েরা যখন তাদের প্রেমিকের গল্প বলতো তখন—। আমি জানতাম, কালো পোশাকে আমাকে ভাল দেখায়। তাই আমি দোকান থেকে একটা ছবি কিনে আনলাম, আমার কাল্পনিক প্রেমিকের ছবি। লকেটের জন্য ঐ ছবির থেকেই একটা ছোট ছবি তৈরী করিয়ে নিলাম। আর, কালো পোশাক পরলাম। আর অ্যাণ্ডি, এইভাবেই তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। একজন মিথ্যেবাদীকে কেউ বিশ্বাস করেনা। জানি, তুমিও আমাকে আর কোনোদিন ভালবাসবেনা। এইটুকু জেনে রাখো অ্যাণ্ডি, আমি তোমাকে, শুধু তোমাকেই ভালবাসি।

কিন্তু তাকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার বদলে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো সহাস্যে অ্যাণ্ডি—তুমি আমাকে ক্ষমা করেছো অ্যাণ্ডি?

—বোকা মেয়ে, আমি তো শুধু আশা করেছিলাম বিয়ের আগেই তুমি সব কথা পরিস্কার করে বলবে।

—তাহলে, কাউন্টের গল্পটা তুমি বিশ্বাস করোনি।

—খুব একটা বিশ্বাস করি কি করে বল? কাউন্টের ছবি বলে তুমি যে ছবিটা দেখিয়েছিলে সেটা যে বড়মাইক সুলিভানের ছবি।

The Count and the wedding guest

কালো ঈগলের অন্তর্ধান

কোন এক বছরে রিয়োগ্র্যাণ্ডির তীরে টেক্সাস অঞ্চলে এক ভয়ংকর ডাকাত কয়েকটা মাস ধরে প্রচণ্ড আতংকের সৃষ্টি করেছিল। ধূমকেতুর মতো উদয় হয়ে আবার হঠাৎই কোথায় অন্তর্হিত হয়ে যেত সে খবর কেউ জানে না।

সেই রহস্য উন্মোচন করার জন্যই এই কাহিনীর অবতারণা।

সেন্ট লুই রেস্টুরেন্টে ভবঘুরে শয়তান রাগ্‌ল্‌স ঠুকরে ঠুকরে বিনে পয়সার লাঞ্চ খাচ্ছিল। তার নাকটা মুরগীর ঠোঁটের মত লম্বা। আর পেটে মুরগীর মতই প্রচণ্ড ক্ষিদে। সেইজন্য অন্য ভবঘুরেরা তার নাম দিয়েছে মুরগী বাবাজি।

কোন পানীয়ের অর্ডার না দিয়েই সঙ্গের বিনে পয়সার খাবারটা খেতে বসেছিল মুরগীবাবাজী, এক লাথি মেরে ওয়েটার তাকে পাঠিয়ে দিল সোজা রাস্তায়।

পাঁচ ছয় বছরের একটি ছেলে হাতে একটা শিশি নিয়ে রুটির দোকানের সামনে লোভাতুর দৃষ্টিতে চেয়েছিল। হাতে মুঠো করে ধরা চকচকে ডলার। মুরগী বাবাজীর চোখ সেদিকে না পড়েই পারে না।

নিজের পকেট থেকে সে পাঁচসেন্ট বার করে কিছু মিঠাই কিনে ছেলেটিকে বশ করে ফেলল মুরগী বাবাজী। ছেলেটির মা তাকে বলে দিয়েছে ডলারটা ভাঙিয়ে দশ সেন্ট দামের একটা ওষুধ কিনতে হবে। দোকানীকে বলতে হবে বাকি পয়সাগুলো একটা কাগজে মুড়ে তার ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে দিতে, আর রাস্তায় কারো সঙ্গে কথা না বলতে।

মুরগী বাবাজি বেশ ওস্তদি চালে দোকানে ঢুকে নিজেই ওষুধ নিয়ে ডলার ভাঙিয়ে বাকি খুচরোগুলো নিজের পকেটে চালান করলো। নিজের একটা পুরোনো বোতাম কাগজে মুড়ে ছেলেটির পকেটে দিতে ভুললো না। ছেলেটি তো তখন বিশ্বসংসার ভুলে মিঠাই চিবোতে ব্যস্ত।

পারের কড়ি জোগাড় হতেই মুরগী বাবাজী টেক্সাসগামী একটি ট্রেনে চড়ে বসলো। পথের একেবারে শেষপ্রান্তে লারেডোতে পৌঁছে শহর থেকে অনেক দূরে সাইডিং-এ ট্রেনটা না যাওয়া পর্যন্ত তার ঘুমই ভাঙলো না।

আচমকা ঘুম ভেঙে জনমানবশূন্য এলাকায় নিজেকে দেখে প্রথমে খুব ঘাবড়ে গেল সে। তারপর চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া প্রান্তরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই একটি দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়া দেখতে পেয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে তার ওপর চড়ে বসলো সে।

একটু পরেই বুঝতে পারলো ঘোড়াটা বুনো ঘোড়া নয়। বিশেষ কোনও লক্ষ্যেই চলেছে সে।

বাড কিং এর নেতৃত্বে একটা সুঃসাহসী দল তখন কিছুদিন ধরে নির্বিচারে গরু ঘোড়া ইত্যাদি সব রকম গৃহপালিত পশু চুরি করে চলেছিল। তাদের লুটতরাজের কাণ্ডগুলো খুব

বড় মাপের না হলেও সেখানকার খবরের কাগজে খুব ফলাও করেই প্রচারিত হয়েছিল। আর তাই ক্যাপ্টেন কীন-এর প্রহরী দলটার ওপর হুকুম হয়েছিল তাদের ওপর নজর রাখার।

বিজ্ঞ দলপতি হিসেবে বাড কিং তাই কিছুদিন কাজকর্ম ছেড়ে ফ্রিও উপত্যকায় দলবল সমেত লুকিয়ে থাকাই শ্রেয় বলে মনে করেছিল।

এই নিয়ে দলের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ। দলপতির এই নীতি ভীরুতা বলে মনে করলো কেউ কেউ।

এমনি এক দিনে তাদের দলে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে উপস্থিত মোরগ বাবাজী। মানে, ঘোড়াটাই নিয়ে এসেছে তাকে। তার চাতুর্যপূর্ণ কথাবার্তা, হঠকারীতা দলের লোককে খুবই আকর্ষণ করলো। মনে মনে এরকম নেতাই চাইছিল তারা।

তার নেতৃত্বে পরবর্তী কয়েকমাস আবার গরু ঘোড়া চুরি করে এনে রিওগ্রান্ডির অপর পারে ভাল দামে বেচে দেওয়া শুরু হয়ে গেল। তার নাগরিক চাতুর্যে দিশাহারা হয়ে গেল সরল গ্রামবাসীর দল। নিজেদের মধ্যে তার নামকরণ করলো কালো ঈগল। বাচ্চাদের তারা ভয় দেখাতো দুষ্টুমী করলে কালো ঈগল তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে তুলে নিয়ে যাবে।

এরপর কালো ঈগল প্রস্তাব আনলো একটা বড় ধরণের দাও মারার। একটা ট্রেন আটক করে লুট করা হোক। বাড কিং এ ধরণের হঠকারীতায় বিশ্বাসী না হলেও দলের অসন্তোষের ভয়ে প্রস্তাবে সায় দিল।

ট্রেন আসার কথা দশটা তিরিশ মিনিটে। ট্রেনটা লুট করে তারা অতি সহজেই পরদিন দিনের আলোয় মেক্সিকোর সীমান্তে পৌঁছে যেতে পারবে। কালো ঈগল দলের সবাইকে কাজ বুঝিয়ে দিল। পথের দুপাশে দলের চারজন করে লোক ঝোপে লুকিয়ে থাকবে। রোজার্স থাকবে স্টেশন এজেন্টের পাহারায়, ব্রাংকো চার্লি ঘোড়াগুলোকে নিয়ে তৈরী হয়ে থাকবে। ট্রেনটা থামলে, ঠিক যে জায়গায় ইঞ্জিনটা থামবে অনুমান করা হোল, তার একপাশে থাকবে বাড কিং, অন্যপাশে কালো ঈগল। তারা দুজন ইঞ্জিন চালক ও ফায়ারম্যানকে জোর করে ধরে গাড়ীর পিছনদিকে নিয়ে যাবে। তারপর এক্সপ্রেস গাড়ীটা লুট করে সকলে হাওয়া হয়ে যাবে।

কালো ঈগল যতক্ষণ না তার রিভলার থেকে গুলি ছুঁড়ে সংকেত করছে, ততক্ষণ কেউ কাজ শুরু করবে না।

ট্রেনের সময়ের দশ মিনিট আগেই প্রত্যেকে নিজের জায়গায় হাজির হয়ে গেল। অন্ধকার রাত। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে সঙ্গে হিমেল হাওয়া। রেলপথের পাঁচ গজের মধ্যেই একটা ঝোপের আড়ালে ওৎপেতে বসে আছে কালো ঈগল। তার বেল্টের দুদিকে দুটো ছয় ঘোড়ার পিস্তল ঝুলছে। একটা কালো বোতলে চুমুক দিয়ে মাঝেমাঝেই সে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে।

এগিয়ে আসছে ট্রেনের হেডলাইট। ট্রেন যত কাছে আসছে, তার গর্জনও তত বেড়ে যাচ্ছে। মাটিতে শুয়ে পড়লো কালো ঈগল। কিন্তু ট্রেনের ইঞ্জিনটা তাদের সব হিসেবকে ভুল প্রমাণিত করে তার ও বাডের চেয়ে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে গিয়ে থামলো।

দস্যু দলপতি উঠে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে নিল। ট্রেনটা শুধুই যাত্রীবাহী নয়, মাঝে মাঝে মাল বোঝাই কামরাও আছে। তারই একটি আপাতত তার সামনে।

মালগাড়ীর ঈষৎ ফাঁক করা দরজা দিয়ে একটা পরিচিত সোঁদা সোঁদা মদ-মদ গন্ধ তার স্মৃতিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল সুদুর অতীতে। মনে এলো সেই মুক্ত ভবঘুরে জীবনের কথা। কালো ঈগল নাক টেনে সেই পাগল করা গন্ধ শুঁকতে লাগলো।

ট্রেন ছাড়ার ঘন্টা বেজে উঠতেই দস্যু দলপতি তার পিস্তল দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিল। কাঁটামারা জুতো আর পটিবাঁধা টুপিটাও। এক লাফে বক্সকারে ঢুকে দরজাটা এঁটে দিল। কালো ঈগলের খোলস ঘুচিয়ে আবার সে মোরগ বাবাজী।

ডাকাতের দলটা দলপতির সংকেতের অপেক্ষায় নিশ্চল শুয়ে রইল আর ট্রেনটা নির্বিঘ্নে এস্পিনা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ট্রেনের গতি বাড়লো। দু'দিকে গাছপালা, মাঠ ঘাট সাঁ সাঁ করে সরে যেতে লাগলো। এক্সপ্রেস ট্রেনের চালক জানলার পাশে বসে পাইপ টানতে টানতে মন্তব্য করলো—লুট তরাজের পক্ষে চমৎকার জায়গাটা।

এই হোলো কালো ঈগলের আকস্মিক অন্তর্ধানের আসল রহস্য।

*The Passing of Black Eagle

দোলক

মেষপালকের তাড়া খাওয়া শাবকের মতই অফিস ফেরৎ একপাল ক্লান্ত মানুষের সামিল হয়েছে জন পার্কিন্স। একাশি নম্বর স্ট্রীটে তাদের পালটাকে নামিয়ে দিয়ে আর এক পালকে গিলে নিয়ে ডিং ডিং শব্দে চলে গেল যাত্রীবাহী গাড়িটা।

বাড়ীর দিকেই চলেছে জন। উৎসাহহীন একঘেয়ে পথ। পথের শেষে অপেক্ষা করে আছে এমনি একঘেয়ে জীবন। বাড়ী গেলেই তার স্ত্রী-কে একটি সুগন্ধী চুমো দেবে। স্বামী স্ত্রীতে গতানুগতিক কিছু কথাবার্তা। সান্ধ্য পত্রিকায় জাপানী হানার বিবরণ পড়া, তারপর ডিনার সেরে নেওয়া। সাড়ে সাতটায় ওপর তলায় মোটা লোকটির শরীরচর্চা শুরু হলেই কাঠের ফার্ণিচারগুলোর ওপর কাগজ বিছিয়ে দিতে হবে। নাহলে ছাদের প্লাস্টার খসে সেগুলোর ক্ষতি হতে পারে।

ঠিক আটটায় রঙ্গনাট্যের দলের হিলি এবং মুনি পাশের ঘরে প্রচণ্ড ভাবে চেয়ার উল্টোউল্টি করে মহলা দিতে শুরু করবে। যেন নায়েকের দল তাদের ভাড়া করার পাঁচশো ডলারের চুক্তিপত্র নিয়ে তাড়া করেছে। এর পরেই জানলার ধারের ভদ্রলোকটি তাঁর বাঁশি নিয়ে বসবেন।

জন পার্কিন্স জানে ঠিক এরকমই হবে। তারপর সওয়া আটটার সময় সে ম্যাকক্লাসির ওখানে দুএক পাত্র পান করা এবং দু'একহাত তাসের বাজী খেলার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। এবং প্রতিদিনই এ নিয়ে কেটি খিট খিট করবে।

অনেক রাত্রে যখন সে বাড়ী ফেরে, তখন হয় কেটি ঘুমে অচেতন, নয়তো বিবাহবন্ধনকে দৃঢ় করার প্রতিজ্ঞায় উন্মুখ।

এই একঘেয়ে জীবনের থেকে কি মুক্তি নেই? কিন্তু আজ রাতে নিজের দরজায় পৌঁছে জন এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হোল। দরজায় আদর আর মোরব্বা-মাখানো হাসি নিয়ে কেটি নেই। ঘরের সব জিনিস এলোমেলো, বিশৃঙ্খল।

কেটির হাতের তাড়াহুড়ো করে লেখা একটা চিঠি জানাচ্ছে যে মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে সে চারটে-তিরিশের ট্রেন ধরতে যাচ্ছে। তার ভাই স্যাম সেখানেই ডিপোতে তার অপেক্ষায় থাকবে। আইস-বক্সের ঠাণ্ডামাংসে যেন জন ডিনার সেরে নেয়, আরও সাংসারিক টুকিটাকি নানা নির্দেশ দিয়ে চিঠি শেষ করেছে কেটি।

বিয়ের পর এই দুবছরে কেটি ও সে কখনও আলাদাভাবে রাত কাটায় নি। হতভম্ব হয়ে জন বারবার চিঠিটা পড়লো। তাদের জীবনের রোজকার রুটিনে এই প্রথম ছন্দপতন। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সে।

কালো ফুটকি দেওয়া যে লাল শালটা কেটি খাবার সময় গায় দেয়, সেটি দলমোচা হয়ে চেয়ারের ওপর পড়ে আছে। ঘরের এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে জামাকাপড় বাসন কোসন, চুলশুদ্ধ চিরুনী। সান্ধ্যদৈনিকের পাতা থেকে চারকোনা করে কেটে নেওয়া হয়েছে রেলের টাইম টেবিল।

মোট কথা সমস্ত ঘরটাতেই ছড়িয়ে আছে চলে যাওয়া, হারিয়ে যাবার একটা স্পষ্ট ছাপ।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ঘর পরিস্কারে মন দিল জন। স্ত্রীর জামাকাপড়ে হাত লাগাতেই এক অভাবনীয় অনুভূতিতে ছেয়ে গেল তার মন। কেটি চলে গেছে। কিন্তু কেটিকে ছেড়ে কি করে থাকবে সে? একথা তো সে কখনো ভাবে নি। তার জীবনের সঙ্গে এ দুবছরে শ্বাসপ্রশ্বাসের মত মিশে ছিল কেটি, যা অলক্ষিত কিন্তু অবশ্য প্রয়োজনীয়। অবশ্য এটা কয়েকদিনের ব্যাপার। বড়জোব এক সপ্তাহ বা, সপ্তাহ দুই। কিন্তু এখন সে কাটাবে কি করে। মনে হচ্ছে মৃত্যুর শীতল হাত যেন ছুঁয়ে ফেলেছে তার শান্ত গতানুগতিক জীবনকে।

জন ঠাণ্ডা মাংসটা বার করলো, কফি বানিয়ে নিল, তারপর নিঃশব্দে একা একাই সেরে নিল তার নৈশভোজ।

ধূমপান করতেও ইচ্ছে করছে না আজ। বাইরের শহরটা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে বোকামি আর স্ফূর্তিতে ভরা আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে।

রাতটা তো এখন তার একান্ত নিজস্ব। যে কোন অবিবাহিত যুবকের মতই সারারাত ফুর্তির দরিয়ায় গা ভাসিয়ে সে কাটিযে দিতে পারে। কেটির ক্রুদ্ধ দৃষ্টির মুখোমুখি হতে হবে না। তার জন্যে অপেক্ষা করার কেউ নেই। যে বিবাহবন্ধন তাকে একসময় এই বেপরোয়া আনন্দের আসর থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে বন্ধন তো আজ রাতে ঢিলে হয়ে গেছে। কেটি চলে গেছে।

নিজের মনকে বিশ্লেষণ করতে কোনওদিনই অভ্যস্ত নয় জন। কিন্তু আজ একা ঘরে গভীর ভাবে নিজের জীবনটা পর্য্যালোচনা করলো সে। আজ স্পষ্ট বুঝতে পারলো কেটিই তার জীবনের সব। তাকে ছাড়া অর্থহীন তার জীবন, একথাটা মনের গভীরে চাপা পড়ে ছিল। কেটির অনুপস্থিতি যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

না, কেটি ফিরে এলে আর একা একা ম্যাকক্লাসিদের ওখানে আনন্দ করতে যাবে না সে। দিনের পর দিন তাকে ঘরে একা রেখে অমানুষের মত কাজ করেছে সে। আর নয়, এবার তাকে নিয়েই আনন্দ উৎসবে যোগ দেবে সে। আদরে, ভালবাসায় ভরিয়ে দেবে তাকে।

চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে ব্যাগ হাতে ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকলো কেট। মায়ের শরীর এখন ভালোর দিকে, ডিপোতে ভাই-এর কাছে এখবর শুনে পরের ফিরতি ট্রেনে ফিরে এসেছে সে। আপাতত কফি তেষ্টায় কাতর।

জনের মনের ক্ষনিকের অনুভূতিটা আবার হারিয়ে গেল গতানুগতিকতার চাপে। সওয়া আটটায় যথারীতি টুপি হাতে দরজার দিকে চললো সে। খুঁত খুঁতে গলায় কেটি জিগ্যেস করলো; একি কোথায় চললে তুমি, জানতে পারি জন কলিন্স।

জন বললো—

—ম্যাকক্লাসিদের আড্ডায় একবার ঢুঁ মেরে আসি আর ওদের সঙ্গে দু এক পাত্তর মদ ও এক হাত তাসের বাজি—।

*** The Pendulum**

একটি অসমাপ্ত গল্প

ভগবান নামক কুসংস্কারকে কে আর বিশ্বাস করে বলুন! অলৌকিক ব্যাপার স্যাপার নিয়ে তর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই। ধর্মপ্রচারকরাও বলতে শুরু করেছেন ঈশ্বর হচ্ছেন রেডিয়াম, ইথার অথবা একটা বৈজ্ঞানিক যৌগিক পদার্থ বিশেষ। এসব নিয়ে আলোচনা তুললেই তুমুল তর্ক।

তবে একটা বিষয় নিয়ে আপনি স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারেন, সেটি হচ্ছে আপনার স্বপ্নে দেখা ঘটনা নিয়ে। অথবা কোনও কাকাতুয়ার মুখ থেকে আপনি কি শুনেছেন তাও নির্দ্বিধায় জানাতে পারেন লোককে। কেননা আপনার কথার সত্যতা যাচাই করতে গেলে সাক্ষী হিসেবে ডাকতে হয় মর্ফিউসকে বা খোদ কাকাতুয়াটাকে। সাক্ষী হিসেবে এরা যে একেবারেই অচল, এ তো বলাই বাহুল্য।

তা, আমার স্বপ্নের কথাটাই ধরা যাক। দেখলাম ব্যস্ত ব্যবসায়ীদের পোশাক পরা হোমড়া চোমড়া কয়েকজন দেবদূত রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়িয়ে। আমি তাদের ভালো করে দেখতে যাবো, এমন সময় একজন পুলিশম্যান আমার কাঁধে টোকা দিয়ে জিগ্যেস করলো. আমি ওদেরই দলের কিনা।

আমি অবাক হয়ে বললুম, ওরা কে? পুলিশম্যান বললো—ওরা—

সে যাই বলুক, ততক্ষণে আমরা ডালসীর গল্পটা বলে নিই।

ডাল্‌সী একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সেল্‌স গার্ল। পোশাকের ঝালর শুকনো মশলা থেকে শুরু করে হাজার রকম জিনিস বিক্রী করাই তার কাজ।

যা আয় করতো তার থেকে ডাল্‌সী সপ্তাহে হাতে পেতো মাত্র ছয় ডলার, বাকিটা খাতায় তার নামে জমা। আর অন্য কারো নামে খরচ হিসেবে লেখা থাকতো। হিসাবটা রাখতো জি—।

স্টোরে কাজ করার প্রথম সপ্তাহে সে পেত পাঁচ ডলার, তা দিয়ে কেমন করে তার সংসার চলতো তা নিয়ে আপনার কোন মাথা ব্যথা নেই তো, বেশ। তা ছয় ডলার তো বেশ মোটা অংকের টাকা তাই না? তা দিয়ে কি করে খরচ চালায় সে, সময়ে সবিস্তারে বলবো।

আজ শুক্রবার, ছুটির সময় ডাল্‌সীর মনটা যেন খুশিতে উড়ে চলেছে। সহকর্মিনী বাঁদিকের কাউন্টারের সাদিকে জানালো আজ পিগি তাকে ডিনারে ডেকেছে।

বন্ধুর সৌভাগ্যে উল্লসিত হোল সাদি, ভাগ্য বটে তোমার ভাই। শুনেছি পিগি খুব খরুচে লোক। গত সপ্তাহে ব্ল্যাঞ্চেকে ডেকেছিলেন। দারুণ সুন্দর রেস্টুরেন্ট, কী সুমধুর বাজনা সেখানে, কত জাঁকজমক। তুমিও নিশ্চয়ই খুব উপভোগ করবে আজকের সন্ধ্যাটা।

লঘুপায়ে পথে বেরিয়ে পড়লো ডালসী। হাতে আছে গত সপ্তাহের রোজগারের পঞ্চাশ সেন্ট মাত্র। তাই দিয়েই একটা নকল লেসের কলার কিনলো। জামার সঙ্গে পরার জন্যে।

ঐ টাকাটা অবশ্য খরচ করার কথা ছিল অন্য খাতে। নৈশভোজের জন্য পনেরো আর প্রাতঃরাশের জন্য দশ সেন্ট, লাঞ্চের জন্যও ঐ দশ সেন্ট। ছোট্ট সঞ্চয় ভাণ্ডারে একটা ডাইম রেখে দিয়ে বাকি পাঁচ সেন্টে একটু যষ্ঠিমধুর রস, যা খেলে রুজ ছাড়াই গাল লাল হয়ে উঠে। সেইটুকুই বিলাস।

ডালসি একা একটা আসবাবপত্র সমেত ভাড়া দেওয়া ঘরে থাকতো। বোর্ডিং হাউস আর এই ফাকা ঘরের তফাৎ এতটাই, যে এখানে তুমি উপোস করে থাকলে কেউ টের পাবে না।

তার ঘরটা চারতলার পেছন দিকে, নিজের ঘরে ঢুকে সে গ্যাস জ্বাললো। সেই অনুজ্জ্বল আলোতে এবার আমরা তার ঘরটা দেখি।

সোফা, বিছানা, চেয়ার টেবিল, পোশাকের আলমারি, মুখ ধোবার বেসিন। এ সবে যদি কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তার দায় বাড়ির মালকিনের। বাকি সব জিনিস ডালসীর খাস সম্পত্তি।

আলমারির ওপর গিল্টি করা চীনা ফুলদানীটা সাদির দেওয়া উপহার। এছাড়া চাটনী প্রস্তুত কারক কোম্পানীর একটা ক্যালেণ্ডার, স্বপ্নতত্ত্ব নিয়ে লেখা একটা বই, একটা কাঁচের ডিশে কিছুটা চালের গুঁড়ো, গোলাপি ফিতে দিয়ে বাঁধা একগুচ্ছ কৃত্রিম চেরী ফল।

আয়নার উল্টোদিকে জেনারেল কিচেনার। উইলিয়াম মুলদুন, মার্লবরোব ডার্চেন ইত্যাদির ছবি টাঙানো আছে। রোমক শিরস্ত্রান পরা ও কালাহানের একটা মূর্তি আছে এক দেওয়ালে। আর তার কাছেই ঝুলছে একটি তৈলচিত্রের প্রিন্ট। লেবু রঙের একটি শিশু প্রজাপতি ধরছে। মোটামুটি এই হোল ডালসীর শিল্প রুচির নমুনা।

ঘরটার জন্য ডাল্‌সীকে দিতে হয় প্রতি সপ্তাহে দুডলার। সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে প্রাতরাশের জন্য তার খরচ হয় দশ সেন্ট। রবিবার সকালে বিলির রেস্টুরেন্টে বাছুরের মাংসের চপ আর আনারসের টুকরোর রাজসিক খানার খরচ পরে পঁচিশ সেন্ট, আর পরিচারিকার বক্‌শিস দশ সেন্ট। কাজের দিনে অফিসের ক্যান্টিনে লাঞ্চ খেতে সপ্তাহে লাগে

ষাট সেন্ট, ডিনারের দাম ১.০৫ ডলার। সান্ধ্য সংবাদ পত্রের জন্য ছয় সেন্ট আর দুখানা রবিবাসরীয় খবরের কাগজ দশ সেন্ট। মোট খরচ হয়ে যায় ৪.৭৬ ডলার। আর বাদবাকি পোশাক আশাক ইত্যাদির জন্য খরচ; ও মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

পিগির কথায় আশা যাক, মেয়েরা যখন লোকটির এই নাম দিয়েছিল, তখন মনে হয় সত্যিকারের শূকর শাবকের ওপর কিছুটা অন্যায়ই করা হয়েছিল।

মানুষটি নাদুস নুদুস, মনটা ইঁদুরের মত। স্বভাবটা বাদুড়ের আর বেড়ালের মত উদার প্রকৃতির। গায়ে দামী পোশাক, উপোস করার রাজা। তার কাজই হচ্ছে এই সব দোকানগুলোর আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়ে উপোসী অভাবী চেহারার মেয়ে দেখলেই ডিনারের টোপ ফেলা।

সাতটা বাজতে দশেই তৈরী ডাল্‌সী, আয়নায় নিজেকে ভারী সুন্দরী মনে হোল। গাঢ় নীল নিভাজ পোশাক। কালো পালক লাগানো টুপি, একটু ময়লা দস্তানা না ভালোই মানিয়েছে।

এক মুহূর্তে ডালসী সব ভুলে গেল, শুধু সে যে সুন্দরী সে কথা ছাড়া। শুনেছে পিগি খুব খরুচে। এর আগে কোন ভদ্রলোক কখনও তাকে ডিনারে ডাকে নি। নিশ্চয়ই খুব বড় মাপের ডিনার খাবে, বাজনা শুনবে, আশ্চর্য পোশাক পরা রমনীদের দেখবে। স্বপ্নের মত কেটে যাবে সময়টা। এরপরেও সে নিশ্চয়ই আবার বাইরে যাবার ডাক পাবে।

দোকানের জানলায় একটা নীল রেশমী পোশাক সে দেখেছে, স্বপ্নের মতই লোভনীয়, কিন্তু দশের বদলে সপ্তাহে বিশ সেন্ট করে জমালেও তো ওটা কিনতে বছর ঘুরে যাবে।

বাড়ীওয়ালী দরজায় টোকা দিয়ে জানালো মিঃ উইগিন্স (পিগির আসল নাম) তার সাক্ষাৎপ্রার্থী। রুমালটা নেবার জন্য আয়নার দিকে ঘুরতেই আয়নার মধ্যে দিয়ে জেনারেল কিচেনারের চোখে যেন ভর্ৎসনার দৃষ্টি দেখলো ডালসী। মুহূর্তে মত বদলে বাড়ীওয়ালীকে জানালো, সে অসুস্থ, আজ বাইরে যাবে না।

দরজা বন্ধ করে ডাল্‌সী বিছানায় পড়ে দশ মিনিট ধরে কাঁদলো। কল্পনায় জেনারেল কিচেনারকে ভালবাসে সে। তার মনে সেই একমাত্র আদর্শ বীরুপুরুষ। নিদ্রাহীন রাতে সে কতবার তাঁর দীর্ঘ তলোয়ারের ঝংকার শুনেছে। তার মত না নিয়ে কি কোন পদক্ষেপ ফেলা যায়?

একটু পরেই শান্ত হয়ে পোশাক পাল্টে পুরোনো কিমোনায় বিস্কুট আর জ্যাম দিয়ে নৈশভোজ সারলো সে। জেনারেল কিচেনারের ছবিটাকেও একটু বিস্কুটে জ্যাম লাগিয়ে দিয়েছিল ডালসী, কিন্তু কাঁচের মধ্যে দিয়ে তিনি তেমনি আশ্চর্য দুটি চোখে বিষন্ন দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকলেন।

অবশ্য এর পরে আর একদিন নিঃসঙ্গ ডালসী সেই লোকটিকে সঙ্গ দিয়েছিল। জেনারেল কিচেনার বোধহয় ঘটনাচক্রে সেদিন অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন।

তা, সেই স্বপ্নের কথায় ফিরে আসি। পুলিশম্যানটি বললো; ওরা হচ্ছে সফল ব্যবসায়ীর দল, যারা গরীব মেয়েদের সস্তায় মাত্র ছ'ডলার দিয়ে খাটিয়ে নেয়, তুমি কি তাদের দলে?

আমি বললাম, না, আমি বরং তার চেয়ে অনাথ আশ্রমে আগুন ধরিয়ে দেবো বা একটি অন্ধ মানুষকে তার ভিক্ষে পাওয়া পেনিগুলোর লোভে খুন করবো।

*An Unfinished Story

একটি দাগী দশ ডলারের কাহিনী

আমি একটা দশ ডলারের ট্রেজারী নোট। ১৯০১ সালের। নোটের মাঝখানে একটা আমেরিকান বাইসনের ছবি আঁকা । দুধারে আছে ক্যাপ্টেন লিউইস ও ক্যাপ্টেন ক্লার্কের ছবি। আমার উল্টোপিঠে আছে স্বাধীনতা বা সেরেস বা ম্যাক্সিন এলিয়টের একটা মূর্তি।

প্রথম কয়েক বছর আমি বেশ ভালভাবেই লোকের হাতে ঘুরেছি। অনেক মৃত ব্যক্তির ধার শোধ করেছি, অনেক ভালো মানুষের হাতেও পড়েছি। তবে মনে রাখবেন একটা দাগী নোট হাতে এলে কেউ খুশী হয় না।

একদিন অন্ততঃ বিশবার হাতবদল হয়েছে আমার। সবরকম কাজকারবারের ভিতরকার হালচাল আমি দেখেছি। মনে আছে এমন একটা শনিবারও কাটে নি, যেদিন আমাকে একটা মদের দোকানের কাউন্টারে ঠেলে দেওয়া হয় নি।

জীবনে প্রথম আমি দাগী টাকার কথা শুনলাম যখন এক রাতে ড্যান নামে একজন লোক একটা মালের দাম হিসেবে আরও অনেকগুলি নোটের সঙ্গে আমাকেও দিয়ে গেল।

মাঝরাতের দিকে দশাসই চেহারার একটি লোক এসে আরও অনেক নোটের সঙ্গে আমাকেও একটা বাণ্ডিলে বেঁধে রাখলো।

দুটি বিশ ডলারের স্বর্ণ সার্টিফিকেটের মাঝখানে আমার জায়গা হোল। একটা সার্টিফিকেট অন্যটিকে ডেকে ফিসফিসিয়ে বললো—আর কানে খাটো বুড়ো, জীবনের খানিকটা চেহারা আজ তুমি দেখতে পাবে, বুড়ো জ্যাক আজ ভেল্কি দেখাবে।

আমি মাঝখানে পড়ে ব্যাপারটা বুঝতে চাইলে সে বলল—ঐ বুড়ো জ্যাক এই জুয়ার আড্ডার মালিক। আজ রাতে সে ঝড় তুলবে কেননা গির্জা তার ৫০,০০০ ডলার দান প্রত্যাখ্যান করেছে জুয়ার টাকা বলে।

অবশ্য আমাকে ঝড় দেখতে হয়নি। শহরের বাইরে এক পানশালায় বসে গান গাইতে গাইতে সে বললো, শহরের ভালমানুষেরা এ টাকা নিতে চাইছে না, তোমার কাছে চলবে তো মাইক? পানশালার মালিক জানালো এখানে সবরকম টাকাই চলে, টাকার কোন জাত নেই।

রাত একটার সময় দোকানের সামনের দরজা বন্ধ করে দিতেই পিছনের দরজা খুলে গেল। একটি কালো শার্ট, ছেঁড়া স্কার্ট ও লতানো চুলের মেয়ে জ্যাকের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো। রুগ্ন বিড়ালছানার মত করুণ চাহনী তার চোখে। কোন কথা না বলে জ্যাক তার নোটের বাণ্ডিল থেকে আমাকে বার করে তার হাতে দিয়ে বললো—

—ম্যাডাম, এটা আমার জুয়ার জেতা জালি নোট, নিতে আপত্তি না থাকলে ...।

মেয়েটির চোখ জলে ভরে উঠলো, বললো, 'এই নোটগুলো যখন সদ্য ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে এসেছিল তখন এ রকম হাজার হাজার নোটের বাণ্ডিল বেঁধেছি আমি। তখন ট্রেজারী বিভাগের একজন কেরাণী ছিলাম আমি। আপনি যদি জানতেন—যাই হোক কিছুই বলবো না আমি। শুধু আপনাকে সর্বান্তকরনে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ।'

এক দৌড়ে আমাকে নিয়ে স্ত্রীলোকটি গেল একটা রুটির দোকানে। কিছু রুটি ও জেলি কেক নিয়ে সে চলে গেল।

এক সপ্তাহ পরে আমার বদলে সে যে খুচরোগুলো নিয়েছিল তারই একটা এক ডলার নোটের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল।

তাকে জিগ্যেস করে জানলাম, স্ত্রীলোকটি অন্য নোট ভাঙিয়ে দুধ ও মাংস কিনলো। ঘরে তার আধপেটা খাওয়া একটি রুগ্ন সন্তান আছে। আমাকে দিয়ে বাড়ীওয়ালার ভাড়া মিটিয়েছে সে আজ। তার দুঃখকষ্টের কথা থাক দশ ডলার। এইসব গরীব মানুষের কাছে থাকতে থাকতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমার মত বড় মাপের টাকা হয়ে যদি আমিও উঁচু সমাজে চলাফেরা করতে পারতাম।

আমি তাকে থামিয়ে দিলাম—

—চুপ করো বোকা কোথাকার। উঁচু সমাজ বলে কিছু নেই। আমি সব দেখেছি। সব চিনেছি। সব শেয়ালের একই রা। এই যে আমার পিঠে লেখা আছে সরকারী এবং ব্যক্তিগত ঋনের ক্ষেত্রে এই নোটটি উল্লিখিত পরিমান অর্থের একটি আইন সম্মত প্রস্তাব পত্র, দাগী টাকা সম্পর্কে এসব কথা শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে।

*The tale of a tainted Tenner

পুলিশ ও'রুনের ব্যাজ

জেন্টল রাইডার্স সেনাদলটি একটি বিশেষ যুদ্ধের সময় ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছিল।

এই সেনাদলটি গড়া হয়েছিল পূর্ব ও পশ্চিমের ধনী আর বেপরোয়া যুবকদের নিয়ে। খাকি পোশাক গায়ে চড়ালে একজনের থেকে আর একজনের কোন বিশেষ পার্থক্য থাকে না। অতএব সহজেই তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী হয়ে উঠেছিল।

দশ মিলিয়ন ডলারের মালিক বড় বংশের ছেলে এল্‌সওয়ার্থ রেমসেনের সঙ্গে এভাবেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল সুসজ্জিত, ভদ্র, ঠাণ্ডা মাথার যুবক ও'রুনের। এই যুবকটিকে রেমসেন বিশেষ পছন্দ করতো।

যুদ্ধশেষে একদিন ক্লাবে দুজনের দেখা। ভাগ্যবিরূপ হয়েছে ও'রুনের ওপর। একটা যে কোন চাকরি প্রত্যাশী সে। রেমসন তাকে পাইয়ে দিল ঘোড়াসওয়ার পুলিশের চাকরী।

যাঁরা অশ্বারোহী পুলিশদলের দিকে লক্ষ্য রাখেন তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন একজন সুসজ্জিত, ভদ্র, ঠাণ্ডা মাথার তরুণ একটা বাদামী রঙের ঘোড়ায় চেপে পার্কের পথে ডিউটি দিচ্ছে।

একদিন রেমসেন তার ক্লাবে থেকে কিছুটা দূরে ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউ ধরে যাচ্ছিল। পথে প্রচণ্ড যানজটে আটকে থাকা একটা মোটর গাড়ীর দিকে তার নজর গেল। গাড়ীতে সোফার ছাড়া ছিলেন পাকা গোঁফের এক সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ। আর তাঁর পাশেই ছিল একটি ডালিম ফুলের মত সুন্দরী মেয়ে। গাড়ীটা ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল, যেন রেমসেনের হৃদয়কে পিষ্ট করে চলে গেল।

এই এতবড় শহরে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে তার মানসীকে যে প্রথম দর্শনেই তার মন কেড়ে নিয়েছিল, তাকে আর কখনো দেখতে পাবে কি রেমসেন?

এরই মধ্যে একদিন জেন্টল রাইডার্সদের পূর্ণমিলন উৎসবে দেখা হোল ও'রুনের সঙ্গে। খানা পিনা হৈ চৈতে উল্লাস মুখর হয়ে উঠলো রাতটা। কিন্তু মুশকিল হোল ও'রুনের। মদের নেশায় চুর তার পাদুটো কিছুতেই খাড়া থাকতে চাইছে না। সকালে পার্কে ডিউটি দিতে যাবে কি করে?

আশ্বাস দিল রেমসেন, একদিনের জন্য না হয় সে নিজেই বন্ধুর ঘোড়া আর ব্যাজ ধার করে তার হয়ে ডিউটি দিয়ে দেবে। দুজনের চেহারায় খানিকটা মিল তো আছেই, আর ঐ পোষাকে সকলকে মোটামুটি একরকমই দেখায়।

যথাসময়ে জাল ও'রুন অশ্বারোহী পুলিশের পোষাকে পার্কে ডিউটি দিতে গেল। আর কি আশ্চর্য, এত ভোরে পার্কে হাজির হয়েছে একটা ঘোড়ার গাড়ী ও তার অরোহীরা। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, আর তাঁর সাথে ছিল রেমসেনের হৃদয়ের রাণী যে যুবতীটি দেখতে ডালিম ফুলের মত বা এক ফালি চাঁদের মত।

রেমসেন এর বাদামী ঘোড়া বন্দুকের গুলির মত তীব্র গতিতে ভিক্টোরিয়া ধরে ফেললো তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই। কেননা ভিক্টোরিয়ার ঘোড়া দুটো হঠাৎ ক্ষেপে গিয়েছিল।

রেমসেনের শক্ত মাংসপেশী গাড়ির চালকদের হারিয়ে দিল। গাড়ীর চালক ঘোড়ার লাগাম ফেলে লাফ দিয়ে আসন থেকে নেমে গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। বাদামী ঘোড়াটি নতুন সওয়ারীকে নিয়ে খুশি হয়ে নাচানাচি শুরু করে দিল। রেমসেন-এর কানে এলো বৃদ্ধ ভদ্রলোক অকারণেই বক বক করে চলেছেন। একটি হাসি মুখ আর একজোড়া বাদামী চোখের সলজ্জ চাইনি। চোখ দুটি হয়তো তার এই সাহসিক কাজের জন্য প্রশংসা জানাচ্ছিল। জানতে চাইছিল এই বীরপুরুষের নাম।

নাম জানাতে গিয়েও থমকালো রেমসেন। তার বংশপরিচয় যথেষ্ট মর্যাদার আসনে আছে, সে জন্যে তাকে কোনদিন লজ্জিত হতে হবে না। কিন্তু এখন তো সে একজন নিতান্ত সাধারণ অশ্বারোহী পুলিশ, তার বুকের ব্যাজেও ও'রুনের নাম। সহকর্মীর ব্যাজ ও মর্যাদা এখন তার হাতে। লাখপতি রেমসেন এখন যদিও এই ভদ্রলোক ও মেয়েটিকে ক্ষেপে যাওয়া ঘোড়ার গাড়ী থামিয়ে হয়তো সে প্রাণে বাঁচিয়েছে, কিন্তু সেখানে ও'রুনের স্থান কোথায়। প্রেম এসেছিল, কিন্তু তাকে বিদায় দেওয়া ছাড়া উপায় কি?

দিনের শেষে ঘোড়াটিকে আস্তাবলে পাঠিয়ে দিয়ে সে ও'রুনের ঘরে গেল। শান্তশিষ্ট দরিদ্র যুবকটি তখন জানলায় বসে চুরুট টানছে। রেমসেন গাঢ় স্বরে গোটা পুলিশবাহিনী, তাদের ঘোড়া, ব্যাজ, আর ও'রুনের মত পুলিশ, যারা দুপাত্র পেটে পড়লেই বেসামাল হয়ে যায়। তাদের সবাইকে জাহান্নামে পাঠালো।

প্রাণ খোলা হাসি হাসলো ও'রুন।

—আমি সব জানতে পেরেছি বন্ধু। দুঘন্টা আগে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে তারা এখানে এসেছিল, তোমার বুকে আমার নাম লেখা ব্যাজটাই আমাকে ধরিয়ে দিল। তোমাকে বলাই হয়নি, ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোক, যাঁকে তুমি পার্কে আজ বাঁচিয়েছো, তিনি আমার বাবা, আর্ল অব্ আউসলি। পার্কের পথে তুমি তাদেরই পিছনে লাগবে, এটা ভারী মজার ব্যাপার হোল দেখছি। আসলে কি জান? বাড়ীর সঙ্গে একটু গোলমাল হয়েছিল তাই বাড়ী ছেড়েছিলাম। যাক্ এখন সব মিটেছে। তবে, আমার ঘোড়াটাকে যদি তুমি খোঁড়া করতে তাহলে তোমাকেও ছেড়ে দিতাম না। ভাবছি ঐ ঘোড়াটাকে কিনে নিয়ে যাবো আমার সঙ্গে।

ও হ্যাঁ। আমার বোন লেডি এঞ্জেলাক তো তুমি দেখেছো, সে আমাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছে আজ সন্ধ্যায় তোমাকে নিয়ে যেন তাদের হোটেলে যাই।

ভালো কথা, রেমসেন, আমার ব্যাজটা হারিয়ে ফেলো নি তো? পদত্যাগ করার সময় ওই ব্যাজটাকে তো আবার হেড কোয়ার্টারে ফেরৎ দিতে হবে।

* The Badge of Policeman O'Roon

কুবের ও তীরন্দাজ

রকওয়াল্‌স ইউরেকা সোপ প্রস্তুতকারক সংস্থার ধনকুবের মালিক এন্টনি রকওয়াল চিন্তিত ভাবে তাঁর প্রাসাদের জানালায় দাঁড়িয়েছিলেন।

একমাত্র ছেলে যুবক রিচার্ড-এর মতিগতি বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি। অতুল বৈভবে প্রতিপালিত হয়েও ছেলেটার মনে সুখ নেই কেন? কি চাই তার!

ডেকে পাঠালেন ছেলেকে, কথায় কথায় জানলেন অভিজাত সমাজের মধ্যমণি মিস ল্যাস্ট্রিকে ভালবাসে সে। কিন্তু সে মেয়ের প্রতিটি ঘন্টা মিনিট এমন ভাবে নানা সামাজিক কাজ কর্মে বাঁধা যে সে সময় করে তাকে প্রেম নিবেদন করবে তার সুযোগ নেই।

আগামী পরশুর জাহাজে দুবছরের জন্যে সে ইউরোপে চলে যাচ্ছে। আসছে কাল মা পিসিদের সঙ্গে থিয়েটারে যাওয়ার আগে মাত্র দু'মিনিটের জন্য সে রিচার্ডের সঙ্গে একলা দেখা করতে পারবে।

বাবার ধনের অভিমানকে কটাক্ষ করে রিচার্ড বললো; সাত জন কোটিপতি মিলেও কি বাড়তি কয়েকটা মিনিট সময় কিনে দিতে পারবে তাকে? মিলবে তার মনের কথা বলার সুযোগ?

ছেলের পিসি এসেও ভাইপোর মনোবেদনার কারন জেনে হা হুতাশ করলেন। ভাই-এর ধনগৌরবকে ধিক্কার দিলেন। অশ্রুজলের সঙ্গে রির্চাড-এর হাতে পরিয়ে দিলেন তারই মায়ের আংটি সৌভাগ্যের চিহ্ন হিসেবে। বুড়ো এন্টনী শুধু চুপচাপ দেখলেন ব্যাপারটা।

পরদিন আংটিটাকে পকেটে নিয়ে রিচার্ড চললো প্রিয়া সন্দর্শনে। স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে থেকে মিস্ ল্যাস্ট্রিকে খুঁজে বের করতেই লেগে গেল আটটা বত্রিশ। ট্যাক্সি চড়ে দ্রুত পৌঁছাতে হবে থিয়েটারে। পথে রিচার্ডের পকেট থেকে আংটিটা পড়ে যাওয়ায় সেটা খুঁজতে মিনিট খানেক সময় লাগলো। তারপরেই ঘটে গেল একের পর এক কাণ্ড।

হঠাৎ মনে হোলো যেন শহরের সমস্ত যানবাহন সামনে, পিছনে, পাশে গতিরোধ করে দাঁড়িয়ে গেল ট্যাক্সিটার। প্রায় দু'ঘন্টা বাধ্য হয়ে আটকে পড়া নিশ্চল ট্যাক্সিতে গল্পগুজব করার সুযোগ পেলো ওরা।

সেদিন রাত এগারোটায় এন্টনীর ঘরে টোকা দিয়ে পিসি জানালেন, প্রকৃত ভালবাসার জয় হয়েছে। আটকে পড়া গাড়িতে বসেই বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল রিচার্ড। মেয়েটি সে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কোটি টাকা ছড়িয়েও এন্টনী যা করতে পারতেন না, রিচার্ডের মায়ের আংটির আশীর্বাদেই তা হয়েছে।

এন্টনী সংক্ষেপে আনন্দ প্রকাশ করে আবার উপন্যাসে ডুবে গেলেন।

গল্পটা এখানেই শেষ হলে বেশ হোতো। পরদিন সকালে অগ্রিম দেওয়া ৫০০০ ডলারের পরেও আরও তেরোশো ডলার নিয়ে গেল কেলি বলে একজন লোক। এন্টনীর আদেশে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে টাকা ছড়িয়ে যানজট করার ব্যবস্থা করেছিল সে।

প্রেমের দেবতা কিউপিডকে কিন্তু সেদিন যানজটের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি।

* Mammon and the Archer

সুসজ্জিত কক্ষ

'ওয়েস্ট সাইড' অঞ্চলের বাড়ীগুলোর ভাড়াটেদের এককথায় যাযাবর বলা হয়। এত দ্রুত তারা বাসস্থান বদল করে, যে তাদের কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানাই নেই বলা চলে।

এই অঞ্চলের বারো নম্বর বাড়ীতে ঘরের সন্ধানে এলো এক উদ্‌ভ্রান্ত যুবক। বাড়ীওয়ালা তাকে নিয়ে গেল তিনতলার পিছনদিকের একটি ঘরে। যুবকটি জানালো থিয়েটারের লোকেরাই সাধারণত এই ঘরগুলি ভাড়া নিয়ে থাকে। ক্লান্ত যুবকটি তখনই একমাসের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ঘরটির দখল নিল।

গৃহকর্ত্রী জানালো যুবকটি সব কিছুই হাতের কাছে পাবে। কেননা এটি সুসিজ্জত কক্ষ, তোয়ালে, জল, সবই হাতের কাছেই আছে।

যে প্রশ্নটা এর আগে সহস্রবার সহস্রজনকে করেছে, সেই প্রশ্নটাই আবার উচ্চারন করলো যুবকটি—মিস এলয়েস ভাস্‌লার নামে কোন বাসিন্দা কি এখানে ছিল কোনদিন, খুব সম্ভব সে মঞ্চের গায়িকাদের একজন। দেখতে শুনতে ভাল, মাঝারি উচ্চতা, লালচে সোনালী চুল আর বাঁদিকের ভুরুর কাছে একটা কালো আঁচিল।

এরমক কাউকে মনে পড়লো না গৃহকর্ত্রীর। রঙ্গমঞ্চের মানুষেরা যেমন প্রায়ই ঘর পাল্টায়, তেমনি নামও পাল্টায়। কত আসে, কত যায়, না এরকম কাউকে মনে পড়ছে না।

পাঁচ মাস ধরে এই প্রশ্নের এই রকমই উত্তর পাচ্ছে যুবকটি। দিনের বেলা ম্যানেজার, এজেন্ট, স্কুল ও কলেজের কোরাসের দলকে প্রশ্ন করতে করতে কত যে সময় কেটে যায়। রাতের বেলাটা কাটে রঙ্গমঞ্চের দর্শক হিসেবে। তাকে বড় বেশি ভালবাসতো বলেই প্রাণপণ চেষ্টা করছে তাকে খোঁজার। বাড়ী থেকে পালিয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেল মেয়েটা।

জীর্ণ আসবাবপূর্ণ এই ঘরে হঠাৎ দমকা হাওয়ার সঙ্গে যেন সেই প্রিয়ার দেহের সুবাস ভেসে এলো। পাগলের মত তন্নতন্ন করে ঘরের প্রতিটি জিনিস খুঁজে দেখলো যদি তার কোন চিহ্ন পাওয়া যায়। অবশেষে নিঃসীম ক্লান্তি গ্রাস করলো তাকে। মনে হোলো তার অশরীরী প্রিয়া নীরবে হাতছানিতে ডাকছে তাকে। মরীয়ার মত ঘরের বিছানার চাদর, পোষাক সবকিছু ছিঁড়ে ফালি করে তাই দিয়ে দরজা জানলার সব ফাঁক বন্ধ করে গ্যাসের চাবিটা খুলে দিল। তারপর ডুব দিল অসীম অনন্ত নিদ্রার কোলে।

নীচে প্রতিবেশিনী গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে চা খেতে এসে জানলেন ওপরের ঘরটা ভাড়া হয়ে গেছে।

—সে কি ঐ ঘরের ভাড়াটেও পেল? ওখানেই তো গত সপ্তাহে ঐ সুন্দরী মেয়েটি গ্যাস জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করেছিল না?

—হ্যাঁ। তবে সেকথা ওকে বলা হয়নি। কি করবো, আমাদের রুজি রোজগার বলতে তো ওই ঘর ভাড়া দেওয়া।

—সে তো বটেই। তবে কিনা সেই ভাড়াটে মেয়েটাকে তো আমিই এনে দিয়েছিলাম। মেয়েটি খুব সুন্দরী ছিল, তাই না?

তার সঙ্গে একমত হয়েও একটু ইতস্তত করে গৃহকর্ত্রী বললেন—আপনি ঠিকই বলেছেন, তাকে সুন্দরীই বলা যেত, যদি না তার বাঁ ভুরুর কাছে কালো আঁচিলটা না থাকতো। আপনার গ্লাসটা আর একবার ভরে নিন মিসেস ম্যাককুল।

* The Furnished Room

ক্ষণিক বসন্ত

বগ্‌ল-এব পারিবারিক রেস্টুরেন্টে ওয়েট্রেসের কাজ করতো দুটি মেয়ে। একজনের নাম আইলীন। লম্বা, সুন্দরী, চট্‌পটে আর পরিহাসপ্রিয়া। অন্য জন টিলডি। বেঁটে, মোটা, সাধারণ মুখশ্রী, আর সকলের মন রাখতে সদাব্যস্ত।

বগ্‌ল-এর খদ্দেররা ছিল আইলীনের কেনা গোলাম। ছটা টেবিলের খদ্দেরদের হুকুমমাফিক কাজ সে একাই করতে পারতো। যাদের খুব তাড়া থাকতো, তারাও আইলীনের সুঠাম দেহবল্লরী আর মনোরম হাসিটুকু দেখার জন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে রাজি ছিল।

সাময়িক খদ্দেররা রহস্যময় আইলীনকে দেখে মুগ্ধ হোত, আর নিয়মিত খদ্দেররা ছিল তার ভক্ত। তাকে নিয়ে তাদের মধ্যে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলতো। প্রতি সন্ধ্যায়ই আইলীনকে তাদের কারো সঙ্গে সময় কাটাতে হোত। সপ্তাহে দুদিন কেউ না কেউ তাকে নাটক দেখতে নিয়ে যেত, কখনো বা নাচের আসরে নিয়ে যেত কেউ। বহু মূল্যবান উপহারও পেতো সে।

আর টিলডি, সে যখন রেস্টুরেন্টের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, তখন খদ্দেররা তার দিকে তাকায় কেবল খাদ্যের ক্ষুধা নিয়ে। কেউ তার সঙ্গে রঙ্গ তামাসা করেনা। কোনও উপহারও সে জীবনে পায়নি।

আইলীনের বেলায় জোটে কেবল স্তাবকতা আর প্রশংসা, টিলডির দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

খদ্দেরদের মধ্যে ছিল সীডার্স। লণ্ড্রির অফিসে কাজ করে। শুকনো শরীর, কলপ লাগানো পাতলা চুল আইলীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সামর্থ নেই তার,. তাই রোজ টিলডির টেবিলে বসেই চুপচাপ খেয়ে নিত।

একদিন সে বসে বীয়ারের পর বীয়ার খাচ্ছিল। তারপর বলা নেই কওয়া নেই টিলডিকে জড়িয়ে ধরে সশব্দে নির্বিবাদে চুমো খেয়ে নির্বিবাদে বেরিয়ে গেল।

টিলডির কাছ থেকে সিডার্স এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ শুনে বগ্‌ল তার মাইনে বাড়িয়ে দিল। খদ্দেরদের জনে জনে কথাটা জানালো টিলডি। তারা কেউ বিস্মিত হোল, কেউবা আইলীনকে যেমন করে করে ঠিক, তেমনি করে তার স্তাবকতায় মুখর হোল। দুদিন সীর্ডাস এদিকে পা মাড়ালো না।

টিলডির যেন নবজন্ম ঘটলো। তার গালে লাগলো নতুন রঙের ছোপ, পোষাক আশাকে মনোহরিনী করে তুলতে লাগলো নিজেকে। সীডার্সকে মনে হোল যেন রূপকথার রাজপুত্র, তার এই বিবর্ণ অসুখী জীবনে বসন্ত এনে দিয়েছে সে।

দুদিন পরে সীডার্স এসে মদের ঘোরে অশালীন ব্যবহার করার জন্য ক্ষমা চাইল টিলডির কাছে।

মধুর স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে গেল টিলডির। যাকে সে প্রেমের স্বীকৃতি বলে মনে করেছিল, তা আসলে মাতালের মাতলামি। সাজ ছিঁড়ে ফেলে অঝোরে কাঁদতে লাগলো সে। বসন্ত ফিরে গেল তার দুয়ার থেকে।

কিছু না জেনেই আইলীন বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিল।

—ভেঙে পড়োনা টিল, ঐ গোমড়ামুখো সীডার্স তোমার করুণার যোগ্য নয়। কখনও ক্ষমা কোরো না ঐ ছোটলোকটাকে।

* The Brief Debut of Tildy

রোদের ফাঁকে

বসন্তের সাড়া জেগেছে প্রকৃতিতে। মিসেস মার্ফির বোর্ডিং হাউসের ওপর জ্যোৎস্নার প্লাবন বয়ে যাচ্ছে।

ওপরতলার বাসিন্দা ম্যাকক্লাস্কি রাত নটায় বোর্ডিং হাউসে ফিরতেই ছুতোনাতায় নিত্যকারের মত স্বামী স্ত্রীতে লেগে গেল ধুন্দুমার কাণ্ড।

ঝামেলাটা যখন খাবারের ভর্তি পাত্র, কাঁচের বাসন, বেসিন, এমনকি শেষে ইস্ত্রী ছোঁড়াছুড়ির পর্য্যায়ে পৌছেছে, সেইসময় একটা আর্ত কান্নার শব্দে হাতের কাজ থামিয়ে দুজনেই উৎকর্ণ হোল।

বাড়িটার মোড়ে পুলিশের লোক ক্লিয়ারি কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে ভাবছিল স্বামী স্ত্রীর এই দ্বৈরথে তার অবতীর্ণ হওয়াটা জরুরী কিনা, এমন সময় এই চীৎকার।

মিসেস মার্ফির ছ'বছরের ছেলে মাইককে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চীৎকার করে কাঁদছেন মিসেস মার্ফি। অন্য বোর্ডারাও যথেষ্ট সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে তাকে খোঁজার নানারকম প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন।

ঝগড়া থামিয়ে মিসেস ম্যাকক্লাস্কি স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে বিষয়টি শুনলেন। দুঃখ প্রকাশ করে বললেন সন্তান হারিয়ে যাবার মত বেদনাদায়ক আর কিছুই নয়। তাঁর ছেলে হারিয়ে গেলে তো দুঃখে তাঁর বুক ফেটে যেত।

ম্যাকক্লাস্কি অবাক হয়ে বললো—কিন্তু জুডি, আমাদের তো কোনও ছেলে পুলেই নেই।

—কিন্তু ধরো যদি ছ'বছরের আগে জন্মাত আমাদের ফেলান, আর হারিয়ে যেত?

—তার নাম কখনই ফেলান হোত না। আমার বাবার নাম অনুসারে তার নাম হতো প্যাট—

কি যা তা বলছো। আমার উপযুক্ত ভাইএর নামে তার নাম রাখা হোত ফেলান।

নীচে আবার একটা হৈ চৈ, বিছানার নীচে রাখা লিনোনিয়ামের আড়ালে ঘুমিয়ে ছিল মাইক। তাকে পাওয়া গেছে।

হো হো করে হেসে উঠলো ম্যাকক্লাক্সি। ওটা নির্ঘাৎ তোমার ফেলান। আমার প্যাট হলে এমন কুকুরছানার মত খাটের তলায় ঢুকতো না।

যে ছেলে কোনদিন কোলে আসেনি তাকে নিয়ে নতুন করে ঝগড়ার সূত্রপাত। মিসেস ম্যাকক্লাক্সি গোমড়া মুখে এগিয়ে গেল বাসনের আলমারির দিকে ।

গলির মোড়ে পুলিশ ক্লিয়ারিকে দেখা গেল। আগের মতই ওপর থেকে ভেসে আসছে লোহার ও চিনেমাটির বাসনপত্র ছোঁড়াছুঁড়ি ও ভাঙ্গার শব্দ। ক্লিয়ারি তার ঘড়িতে সময়টা দেখে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

—লাগ ভেলকি লাগ। সোয়া এক ঘন্টা ধরে লড়ে চলেছে জন ম্যাকক্লাক্সি আর তার গিন্নি। মিসেস এক একখানা যা রদ্দা কসাচ্ছে। হাতের জোর আছে বটে মহিলার।

পুলিশ ক্লিয়ারি হাঁটতে হাঁটতে মোড়টা পার হয়ে গেল। বুড়ো ডের্নি কাগজটা ভাজ করে ওপরে উঠে গেল। মিসেস মার্ফিও দরজায় রাতের মত তালা লাগিয়ে দিলেন।

* Between Rounds

সোনালী বৃত্তের বোনেরা

কতবারনেক অটোর যাত্রীবোঝাই গাড়িটার সবচেয়ে উঁচু পিছনের আসনে বসেছিল মিসৌরীর ক্লোভারডেল এর বাসিন্দা জেম্‌স্‌ উইলিয়ামস্‌ ও তার নবপরিনীতা বধূ। মিসেস জেমস্‌ উইলিয়ামসের মুখে যেন লেখা আছে সুখ, ভালবাসা, আনন্দ আর স্বামীর প্রতি অটল আস্থা।

তাদের সামনে আসনে বসেছিল বছর ছাব্বিশের শক্ত গড়নের এক যুবক, আর তার সঙ্গিনী, একটি খয়েরী রঙের ঢিলে জামা পরা মেয়ে। তার মাথার টুপিতে একই সঙ্গে আঙুর আর গোলাপ দিয়ে সাজানো।

মিসেস উইলিয়ামসের সঙ্গে সামনের মেয়েটির চোখাচোখি হোল। এই চোখের দেখার মধ্যে দিয়েই যেন তারা পরস্পরের সঙ্গে সারা জীবনের, বিশেষতঃ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা আদানপ্রদান করে নিল। এরপর ফিস্‌ফিস্‌ করে দুজনে কয়েক মিনিটের রসালাপে আর বাধা কিং দুবার হাসি ও একডজন মাথা নাড়া। ব্যস। হঠাৎ বড় রাস্তায় অটোর পথ রোধ করে তার সঙ্গীর কানে কানে কিছু বলতেই মুহূর্তে সে ছেলেটি সিটের তলা দিয়ে গলে গিয়ে দরজায় পৌছে হাতল ধরে ঝুলে নেমে পড়লো।

রাস্তায় দাঁড়ানো সাদা পোষাক পরা লোকটি যে আদতে একজন পুলিশ অফিসার, তার ব্যাজটি দেখাতেই প্রমান হোল। সে গাড়ীর ড্রাইভারকে জানালো, যে তারা একজন পলাতক চোর পিংকি ম্যাকগুয়েরকে খুঁজছে। সে এই বাসের পিছনদিকের সিটেই আছে। এই বলে সে জেমস উইলিয়ামকে নেমে আসতে বলল। জেমস ধীরে সুস্থে নামলো। তার স্ত্রীও তার

সঙ্গে নামলো, কিন্তু প্রথমেই চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল, পালিয়ে যাওয়া যাত্রীটি দূরে একটি পার্কের গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

এদিকে জেম্‌স্ বলছে—আমার নাম জেমস উইলিয়ামস, ঠিকানা মিসৌরীর ক্লোভারডেল, আমি একথা প্রমান করতে পারি।

পুলিশ অফিসার বললেন—আপনার সঙ্গে আসামীর চেহারার যথেষ্ট মিল আছে। আমাদের গোয়েন্দারা খবর দিয়েছে এই বাসেই আছে পিংকি। থানায় চলুন। যা বলার সেখানেই বলবেন।

তার স্ত্রীর চোখে এক বিচিত্র হাসি—যাও পিংকি, এটা হয়তো তোমার পক্ষে ভালই হবে।

স্ত্রীর আচরনে বিভ্রান্ত জেম্‌স্ ভাবলো সে বুঝি পাগলই হয়ে যাবে। যথেষ্ট বেগ পেত হোলো তাকে থানায় আনতে।

এক ঘন্টার মধ্যে তাকে ছাড়িয়ে নিতে এলো তার স্ত্রী ও ম্যাডিসন স্কোয়ারের টমাস খুড়ো। যাবতীয় প্রমানপত্র পেশ করে জেমসের প্রকৃত পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করে ছাড়িয়ে নিল তাকে।

মিসেস তাকে টেনে নিয়ে গেল থানার এক নির্জন কোনে। স্বামীকে হয়রানি করার জন্য অনেক ক্ষমা চেয়ে জানালো এ কাজ সে করছে গাড়ীর খয়েরী জামা পরা মেয়েটির কথা ভেবে, তার স্বামীকে বাঁচাবার জন্য। তাদেরও যে নতুন বিয়ে হয়েছে। একথা সে প্রথম দর্শনেই বুঝতে পেরেছিল। নববিবাহের সোনালী আলোয় উদ্ভাসিত ছিল দুজনেই। এক আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা পড়েছিল দুজনে। যেন দুটি বোন। তাই সে ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করেছিল, স্বামীকে গ্রেপ্তার হতে দিয়েছিল।

—জিম্, তোমাকে পেয়ে এত সুখী ছিলাম আমি, যে আর একটি মেয়ের সুখের অন্তরায় হতে পারিনি। লক্ষ্মীটি জিম, মাপ করবে না আমাকে?

*Sister of the Golden circle.

পরিশিষ্ট

হাডসন সেন্টকে প্রথম দেখেছিলাম ডেসব্রোসেস স্ট্রীটের খেয়াঘাটে। অচিরেই এই কুৎসিত দর্শন মানুষটির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল আমার। তাঁর কথায় যাদু আছে। তাঁর কণ্ঠস্বর যেন একটা সুরেলা বাদ্যযন্ত্র, আর সেটাকে তিনি বাজানও খুব কুশলী হাতে। ক'দিন ধরেই মনে হচ্ছিল বিশেষ একটা কিছু বলতে চাইছেন আমাকে, সেটাই জানার জন্যে সেদিন ডিনার টেবিলে অনেকক্ষণ কাটালো তাঁর সঙ্গে।

পার্থিব জগতের প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধেই তাঁর নিজস্ব দর্শন আছে, আজ শুরু করলেন রমনীর প্রেম বিষয়টি নিয়ে। তাঁর কথায়, একটি অনামা দেশের প্রধান রাজশক্তি সাংকোরেনভিডেসের বকলমে তিনিই নাকি পনেরো বছর ধরে আসল শাসকশক্তি ছিলেন। কাজটা তিনি করতেন প্রধানত তাঁর বাগ্মীতার সাহয্যে। কেবল কথার মারপ্যাঁচ দিয়েই তিনি কোন জাতিকে ঋণগ্রস্ত বা ঋণমুক্ত করতে পারতেন। পাখির মত শিস দিয়েই যুদ্ধবাজ কুকুর অথবা শান্তির পায়রাকে জাগিয়ে তুলতেন।

কথাটা শুরু হয়েছিল প্রেম নিয়ে। ব্যাপারটা হোল তাঁর সুদর্শন বন্ধু ফার্গুসনকে নিয়ে তিনি একবার ঐ দেশের উপকূলবর্তী শহর ওরাটামাতে গিয়েছিলেন সেখানকার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দূর করতে। সেখানে প্রথম দর্শনেই সে প্রেমে পড়ে গেল সেনোরিটা আনাবেল জামোরা-র। কিন্তু সে বাক্যবাগীশ নয়, সেনোরিটার সঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা করাও সম্ভব নয়, অত্যন্ত গোঁড়া অভিজাত ঘরের মেয়ে তিনি। অতএব অ্যানাবেলার দাসীকে অর্থলোভ দেখিয়ে ফার্গুসন তার মানসীপ্রিয়ার সঙ্গে রাতের অন্ধকারে জানালার বাইরে থেকে কথা বলার ব্যবস্থা করেছি।

এই কথা বলে মোহিত করার কাজটি কিন্তু করে দিতে হবে যুডসন স্টেটকেই, এটাই ফার্গুসন-এর আর্জি। বন্ধুর কথায় রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। অ্যানাবেল যদিও ফার্গুসনের সুদর্শন চেহারার সঙ্গে পরিচিত, যুডসন তাকে কোনদিন দেখেননি। যাই হোক, জানালার বাইরে থেকেই বেশ জমিয়ে তুললেন যুডসন। দিনকয়েক এরকম অন্ধকারের অভিসার চললো, শেষের দিন সে যুডসনকে জানালা দিয়ে তার হাতে চুম্বন দিতে দিলো পর্যন্ত। অবশ্য এ ব্যাপারটা ফার্গুসন নিজের জন্যেই রাখতে চেয়েছিল।

তার ঠিক পরদিন সকালে ফার্গুসনের সঙ্গে প্রভাত ভ্রমণ করতে গিয়ে যুডসন প্রথম দেখলেন অ্যানাবেলকে। গাড়ীর দরজা ফাঁক করে বিস্মিত মুগ্ধ চোখে সুদর্শন ফার্গুসনকে দেখছিল সে। কিন্তু সেই মোহিনীর অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য ধরাশয়ী করে ফেলল স্বয়ং যুডসনকে। ফার্গুসনকে তিনি শুনিয়ে দিলেন এই রূপসী তাঁরই ঘরনী হবে। ফার্গুসনের নয়। ঠাট্টার হাসি হাসলো ফার্গুসন, এই কদাকার বৃদ্ধের উচ্চাকাঙ্খা দেখে।

পরদিন সন্ধ্যায় কিন্তু হাসি শুকিয়ে গেল ফার্গুসনের। অ্যানাবেলার সঙ্গে পরিচিত হোল যুডসন। একান্তে তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে নিয়ে সে যে এতদিন ফার্গুসনের প্রক্সি দিচ্ছিল, সে কথা খুলে বললো, আর সেই সঙ্গে তার মোহিনী বাক্যবিন্যাস, বিচিত্র বিষয়ে পরিশীলিত অনায়াস জ্ঞান দিয়ে নতুন করে মুগ্ধ করলো অ্যানাবেলকে।

সপ্তাহ খানেক লাগলো মেয়েটিকে বিয়ে করতে রাজী করতে, কিন্তু এর পরেই ঘটলো বিপর্যয়। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে বিকল হোল যুডসনের স্বরযন্ত্র। সেদিন সন্ধ্যায় প্রিয়াকে মুগ্ধ করার মত কোন অস্ত্রই ছিল না তার, অ্যানাবেল বোধহয় এই প্রথম তার কদাকার চেহারাটা দেখার সুযোগ পেল। পরপর পাঁচটি সন্ধ্যা বিফলে গেল। ষষ্ঠদিনে ফার্গুসনের সঙ্গে পালিয়ে গেল অ্যানাবেল।

আট ঘন্টা পরে আর একটি স্টিমলঞ্চে তাদের পশ্চাৎধাবন করলো যুডসন। রওনা হবার আগে আকারে ইঙ্গিতে নিজের গলার দুরবস্থা জানিয়ে এক দোআশলা ইণ্ডিয়ান বুড়োর দেওয়া

একটি ওষুধ নিয়ে গেলেন। সেই ওষুধের আশ্চর্য প্রতিক্রিয়ায় মুহর্তেই খুলে গেল যুডসনের কণ্ঠনালীর অর্গল। এরপর অ্যানাবেলকে পাকড়াও করে নতুন করে বাক্যজালে সম্মোহিত করা তো তাঁর বাঁ হাতের কাজ।

অ্যানাবেল তাঁর সঙ্গেই স্টিমারে ফিরে গেল। এখন সে মিসেস যুডসন স্টেট।

আমি বললাম, গল্পটা মন্দ নয়। বিশেষ করে আমি তো মনস্তত্ব বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী। বিশেষত মহিলাদের মনস্তত্ত্ব।

যুডসন আমাকে থামিয়ে দিলেন, আরে মশাই, আমি মনস্তত্বের কথা শোনাতে বসিনি। আমি শ্বাসনালী আর কণ্ঠনালীর প্রসঙ্গে বলতে চাইছি।

—কিন্তু আমি তো শ্বাসনালী নিয়ে কখনো পড়াশুনা করিনি।

—কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্যই প্রত্যেক মানুষের চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত।

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, কিন্তু এক্ষেত্রে তো তার দরকার হয়নি।

—হয়েছিল। ওরাটামায় ফিরে গিয়ে আমি ম্যানুয়েল ইকুয়িতো নামে সেই বুড়ো ইণ্ডিয়ানের কাছে জানতে পেরেছিলাম, আমার হারানো কণ্ঠস্বরের জন্য তিনি আমাকে কি মিক্সচার দিয়েছিলেন। আগেই বলেছি, সেই ওষুধে আমার গলার অসুখ কত তাড়াতাড়ি সেরে গেছে। সেই ওষুধ তিনি তৈরী করেছিলেন চুচুলা গাছ থেকে।

যুডসন ম্যানুয়েল ইকোয়িতের ফর্মুলা অনুসারে সেই ওষুধের লজেন্স তৈরী করেছেন,সেই পন্য বাজারজাত করার জন্যই তাঁর নিউইর্য়কে আসা।

বোঝো। এই রোমান্টিক কাহিনীর অবতারনা আসলে সেলসম্যানশিপ ছাড়া কিছু নয়। ঐ ওষুধ বাজারজাত করার সামর্থ আমার নেই, একজন গল্প লিখিয়ে হিসেবে ঐ ওষুধের সুগার কোটিংটি অর্থাৎ গল্পটি বাজারে বিক্রী করতে পারবো তো?

ঘরে ফিরে সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকা থেকে পরপর গোটা চারেক গল্প পড়ে ফেললাম। একজন লেখক দেখলাম একটা বিশেষ ধরনের মোটর গাড়ীর গুণকীর্তন করেই একটা হাল্কা গল্প লিখে ফেলেছেন।

নিজেকেই বললাম, পাঠকবৃন্দ যদি মোটরগাড়ীর গল্প খেতে পারে তাহলে কণ্ঠনালীর চুচুলা লজেন্স নিয়ে যুডসনের একটি মাত্র গল্পকে নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা হওয়া উচিত নয়।

এ গল্পটিকে যদি আপনারা ছাপার অক্ষরে দেখতে পান তাহলে বুঝতে পারবেন ব্যবসাটা ব্যবসাই, কলালক্ষ্মী যদি বানিজ্যলক্ষ্মীকে ছাড়িয়ে যেতে চায়, তাহলে তাকেও সজোরে দৌড়োতে হবে।

তবে, আপনাদের ঠকাতে চাই না বলেই বলে দিচ্ছি, কোনও ওষুধের দোকানেই আপনারা চুচলা গাছ কিনতে পাবেন না।

*** Next to Reading Matters**

সাজানো প্রদীপ

লু আর ন্যানসী গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল কাজের খোঁজে। সুশ্রী তন্বী মেয়ে দুটির রঙ্গমঞ্চে নামার বাসনা ছিল না। যে কোন একটা গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধে পেলেই খুশি। লু কাজ করতো একটা লণ্ড্রির ইস্ত্রি বিভাগে। আর ন্যানসী একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে সেলসগার্লের কাজ পেয়ে গেল।

এই দুই বন্ধুর প্রকৃতিতে কিন্তু একেবারেই আকাশ পাতাল ফারাক। লু সারা সকাল ইস্ত্রি করে যায়, ভাল উপার্জন করে। রোজগারের টাকা দিয়ে ভাল খেয়ে এবং বিভিন্ন চটকদারী পোষাক পরলেই তার সুখ। ডান এর সঙ্গে লণ্ড্রিতে আলাপ তার, সাদামাটা পোষাক পরা গভীর স্বভাবের এই যুবকটিই তার একমাত্র পুরুষ বন্ধু। তবে এখনই বিয়ে করতে চায় না লু, নিজের রোজগারের টাকা নিজের খুশীমত খরচ করতেই তার আনন্দ। তাছাড়া বিয়ের পর তো ডান তাকে তার কাজ করতে দেবে না।

ন্যানসি মনে মনে রূপকথার রাজপুত্রকে খোঁজে। তাকে হতে হবে ঠিক ন্যানসির মনের মত। প্রকৃত বন্ধু, একশো ভাগ বিশ্বস্ত। দোকানে যে সমস্ত পরিশীলিত অভিজাত সম্প্রদায় খদ্দের হয়ে আসে, তাদের পোষাক, চালচলন কথাবার্তা সবই খুব মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে। এদের কাছ থেকে অনেক শিখেছে সে।

এই সব সেল্‌স্‌গার্লদের সন্ধ্যের সঙ্গী জোটানো কঠিন কিছু নয়। তবে ন্যানসি এদের তেমন আমল দেয় না। এক সন্ধ্যের আলাপেই সে বুঝে নেয় লোকটির ওপর কতটা আস্থা রাখা যায়। একবার এক মোটামুটি বিত্তশালী যুবককে সে প্রত্যাখ্যান করেছিল, শুধু জানতে পেরেছিল, কথা দিয়ে কথা না রাখার অভ্যেস তার আছে।

ন্যানসির সাধাসিধে পোষাকের রুচিশীলতা লুই-এর চোখে পড়ে না। অল্প মাইনেতে ওই স্টোরের কাজ করাটাও সে অপছন্দ করে, এই নিয়ে দু'বন্ধুর তর্কের শেষ নেই।

দু'বন্ধুতে একসঙ্গে ডান-এর সঙ্গে বেড়াতে যায় মাঝে মাঝে। হাসি আনন্দ গল্পে বেশ কেটে যায় কটা মুহূর্ত। তারপরে ঘরে ফিরে একা ন্যানসি আপন মনে স্বপ্নের জাল বুনে চলে। সে চায়, একজন মানুষের মত মানুষকে, যে কেবল খেলনা ব্যাংকের মত ঠকঠক করে টাকাই বাজায় না। সে সত্যিকারের কাজের মানুষ।

এদিকে হৈ চৈতে ভরা দম বন্ধ করা লণ্ড্রির মধ্যে নিজের ইস্ত্রি নিয়ে বেশ ভালই আছে লু। তার যা মাইনে, তাতে খেয়ে পরে তার বেশ আরামেই দিন কাটছে। তবে মাঝে মাঝে ডান-এর দিকে তাকিয়ে তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, যার পোষাক পরিচ্ছন্ন, কিন্তু তার রুচির সঙ্গে মেলে না।

আর ন্যানসি, তার তো সিল্ক আর জড়োয়া. পৃথিবীর সেরা গন্ধদ্রব্য ও গানবাজনার জগতেই দিন কাটে। এ সব কিছুই নারীর জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। তবু এরই মধ্যে আধপেটা খেয়ে,

কম দামী পোষাক পরে ন্যানসি সুখেই আছে। এরই মধ্যে মেয়েদের চিনে ফেলেছে, এবার পুরুষকে চিনতে চায়। তাদের অভ্যাস ও যোগ্যতার পরিমাপ করছে সে। একদিন সে তার বাঞ্ছিত শিকারটি ধরে ফেলবেই। নিজেই নিজেকে আশ্বাস দিয়েছে যে তার কাছে সেই শিকারটিই হবে সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ। তাকে বরণ করে নেবার জন্যে সে তার হৃদয়ের প্রদীপটিকে নিখুঁত করে সাজিয়েছে।

কোন এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ন্যানসি দোকান থেকে বেরিয়ে লুর লণ্ড্রির দিকে হাঁটছিল। কথা ছিল লু ও ডান-এর সঙ্গে সে একটা গীতিনাট্য দেখতে যাবে।

লণ্ড্রির সামনেই ডান এর সঙ্গে দেখা, তার মুখ মলিন, বিমর্ষ। সে জানালো, সোমবার থেকে লু দোকানে আসেনি। বাড়ীতেও নেই সে, সব জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছে।

রুদ্ধশ্বাসে ন্যানসি বললো—কিন্তু কেউ কি তার কোনও খবর জানে না?

—লণ্ড্রির লোকেরা আমাকে বলল, গতকাল তারা তাকে একটা মোটরে চড়ে চলে যেতে দেখেছে।

আমার তো ধারনা, তুমি ও লু যাদের নিয়ে সারা জীবন মাথা ঘামিয়েছো, সেই কোটিপতিদের একজনের সঙ্গে চলে গেছো।

জীবনে এই প্রথম কোন পুরুষ মানুষের সামনে ভয় পেলো ন্যানসি। কম্পিত গলায় বলল—আমাকে একথা বলার কোন অধিকার নেই আপনার ডান। এ সবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

নরম গলায় ডান বললো—আমি সেভাবে কথাটা বলিনি। তারপর একটু থেমে ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করলো ন্যানসি তার সঙ্গে গীতিনাট্য দেখতে যাবে কিনা, টিকিট তার পকেটেই আছে।

—আমি তোমার সঙ্গে যাবো ডান।

তিনমাস পরে লু'র সঙ্গে দেখা হোল ন্যানসির। প্রথম আলিঙ্গনের পরই পরস্পরকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করে তুললো। তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে ন্যানসি ভাল করে দেখলো বন্ধুকে। ভাগ্য ফিরেছে তার। লু'র গায়ে দামী কোট, ঝকঝকে মনিমুক্তো, সারা পোষাকে পাকা দর্জির শিল্পকলা।

সস্নেহে জিগ্যেস করলো লু, বোকা মেয়েটা এখনও সেই পুরোনো দোকানেই আছে কিনা, শিকার আজও মিললো না। বলেই লক্ষ্য করলো ন্যানসির সারা দেহে ফুটে উঠেছে দামী মনিমুক্তোর চেয়েও উজ্জ্বল আভা। ন্যানসি বললো—হ্যাঁ এখনও সেই দোকানেই আছি। কিন্তু সামনের সপ্তাহে ছেড়ে দিচ্ছি। আমি ডানকে বিয়ে করছি, লু। সে এখন আমার ডান, ঠিক আছে লু।

পার্কের মোড় ঘুরে যে তরুন পুলিশটি এগিয়ে এলো, সে অবাক হয়ে দেখল দামী লোমের কোট ও হীরের আংটি পরা একটি মেয়ে পার্কের লোহার রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ে অঝোরে কাঁদছে। আর একটি ছিপছিপে সাধারন পোষাক পরা খেটে খাওয়া মেয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

সে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে গেল। ব্যাপারটা তার হাতের বাইরে।

* The Trimmed Lamp

সংস্কারের পুনরুদ্ধার

জেল .থকে ছাড়া পেল জিমি ভ্যালেন্টাইন। জেলে জুতোর কারখানায় দশমাস কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে এ পৃথিবীতে সে এখন মুক্ত।

জেলার তাকে উপদেশ দিলেন সিন্দুক ভাঙার কাজ ছেড়ে সৎভাবে জীবনযাপন করতে। তাঁর ধারনা মানুষ হিসেবে জিম খুব নীচু .দরের নয়।

অবাক বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া করলো জিম। সিন্দুক ভাঙাটা আবার কি বস্তু। তার বিরুদ্ধে কোন প্রমান পাওয়া যায়নি বলেই না সরকার তাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিচ্ছেন।

মুচকি হেসে জেলার তাকে একপ্রস্থ জামাকাপড় ও নগদ পাঁচ ডলার দিয়ে বিদায় করতে হুকুম দিলেন।

প্রথমেই একটা ভাল দোকানে ঢুকে পেট ভরে খেয়ে নিল জিম। একটা ভাল চুরুট ধরিয়ে ট্রেনে চড়ার আগে অন্ধ ভিখারীর টুপিতে একটা সেন্ট ছুঁড়ে দিতে ভুললো না।

তিনঘন্টা পরে ট্রেন থেকে নামলো জিমি। সোজা চলে গেল মাইক ডোনালের কাফেতে। মাইক তো পুরানো বন্ধুকে পেয়ে দারুণ খুশী। তার কাছে চাবি নিয়ে বারের ওপর তলার নিজের ঘরে ঢুকলো জিমি। সব ঠিক তেমনই আছে যেমন সে রেখে গিয়েছিল। বিশিষ্ট গোয়েন্দা এই ঘর থেকেই তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। মেঝেতে এখনো পড়ে আছে ধস্তাধস্তির সময় ছিঁড়ে যাওয়া পুলিশের গোয়েন্দা বেন প্রাইস-এর কোটের বোতাম।

দেওয়ালের ভেতরের লুকোনো জায়গা থেকে নিজের ভারী সুটকেশটা টেনে বার করলো জিমি। সস্নেহে হাত বোলালো ভেতরের যন্ত্রপাতিগুলোর গায়ে। বিশেষ পদ্ধতিতে শক্ত করা ইস্পাতেব পুরো সেটটাই সেখানে ছিল, তুরপন, ছেনি, ক্ল্যাম্প ইত্যাদি। তাছাড়া জিমির নিজের হাতে তৈরী কতকগুলি বিশেষ ধরনের যন্ত্রও আছে, সেগুলো জিমির গর্ব। প্রায় ন'শো ডলার এই যন্ত্রগুলি তৈরী করতে লেগেছে।

আধঘন্টা পরে ফিটফাট পোষাক পরে হাতে সুটকেশ ঝুলিয়ে নেমে এলো জিমি। ডোনালের প্রশ্নের উত্তরে জানালো সে এখন নিউইর্য়ক-এর দুটো বড় কোম্পানীর প্রতিনিধি। কথাটা শুনে খুশি হোলো মাইক ডোনাল, জিমি তাহলে আবার কাজে নেমে পড়ছে।

জিমি ভ্যালেন্টাইন খালাস হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই ইণ্ডিয়ানার অন্তর্গত রিচমণ্ডে সিন্দুক ভেঙে চুরি হোল, খুব পাকা হাতের কাজ। যে করেছে তাকে ধরা গেল না।

দু' সপ্তাহের পরে পরপর লোগান্স পোর্ট-এ একটা উন্নত ধরনের চোব প্রতিরোধক সিন্দুক ছুরি দিয়ে মাখান কাটার মত সহজেই কেটে নিল, জেফার্সন সিটির একটা সেকেলে ব্যাঙ্কের সিন্দুক থেকে হাওয়া হয়ে গেল নগদ পাঁচ হাজার ডলারের ব্যাংক নোট।

পরপর এতগুলি টাকাব ক্ষতি হওয়ায় বেন প্রাইসের মত ঝানু গোয়েন্দাকে ডাকতে হোলো তদন্ত করার জন্য। বেন এক পলকেই বুঝতে পারলো এ জিমি ভ্যালেন্টাইনের হাতের কাজ

না হয়েই যায় না। কিন্তু জিম যেন হাওয়ায় মিশে গেছে। বেন প্রাইস এই ধূর্ত সিন্দুক-ভাঙিয়ে লোকটির খোঁজে ওৎ পেতে রইল।

এদিকে বিকেলে সুটকেশ হাতে জিম নামলো এলমোর স্টেশনে। জিমিকে তখন সদ্য কলেজ ফেরৎ অ্যাথলীট যুবকের মত দেখাচ্ছিল। গলিপথ ধরে হোটেলের দিকে এগিয়ে চললো জিম। হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে একটি যুবতী মহিলার চোখে চোখ পড়ে গেল তার। এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেললো সে। যুবতীটির গাল ঈষৎ লাল হোল এই সুবেশ সুদর্শন যুবকটির দিকে তাকিয়ে। তারপর রাস্তা পার হয়ে এলমোর ব্যাঙ্ক লেখা একটি বাড়িতে ঢুকে পড়লো সে।

জিমি সুকৌশলে একটি ছোট ছেলের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তার কাছ থেকে জেনে নিল ঐ যুবতীটির নাম অ্যানাবেলা অ্যাডামস্। ওর বাবা এই ব্যাংকের মালিক।

জিমি শহরের অভিজাত হোটেল প্লান্টার্স হোটেল-এ গেল। নিজের নাম লেখালো র‍্যালফ্ ডি স্পেন্সার। ওখান থেকেই খোঁজ-খবব নিয়ে জানলো, জুতোর ব্যবসা এ শহরে ভালই চলবে। শহরটাও থাকার পক্ষে মনোরম। আর লোকজনও খুব মিশুকে।

মিঃ র‍্যাল্ফ স্পেন্সার---জিমি ভ্যালেন্টাইনের ভস্ম থেকে ফিনিক্স হয়ে উঠে এলো। সে ভস্ম হয়েছে আকস্মিক ভালবাসার আগুনে দগ্ধ হয়ে। নবজন্ম ঘটেছে তার। এলমোরেই থেকে গেল সে। ব্যবসায় বেশ সমৃদ্ধি লাভ করল।

সামাজিক দিক থেকেও সে বেশ সফলতা পেলো। অনেক বন্ধুবান্ধব জুটলো। অবশেষে তার মনের সাধ পূর্ণ হোল। অ্যানেবেলার সঙ্গে আলাপ হোল, এবং অচিরেই তার প্রেমে পড়ল অ্যানাবেলা। তাদের বিয়ের দিনও স্থির হয়ে গেল।

বিয়ের সপ্তাহ দুয়েক আগে জিম তার পুরোনো ব্যবসার বন্ধু পলকে একটা চিঠি লিখলো। জানালো সে নতুন জীবনে প্রবেশ করতে চলেছে, এখন থেকে সৎ নাগরিক হিসেবেই জীবনযাপন করবে সে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রমনীটি তার স্ত্রী হতে চলেছে, তার চোখে জিমিকে নিয়ে অনেক গর্ব, অনেক বিশ্বাস। এ বিশ্বাস ক্ষুন্ন হতে দেবে না সে। আগামী বুধবার রাত ন'টার সময় সুলিভানের কাফেতে যেন সে জিমির সঙ্গে দেখা করে। নিজের যন্ত্রপাতির বাক্সটা পলকে দিয়ে দেবে সে।

জিম এই চিঠিটা লেখার পরই পুলিশের গোয়েন্দা বেন প্রাইস এলমোর শহরে পৌঁছালো। বেনের খোঁজে দেশ তোলপাড় করেছে সে, অবশেষে এখানে পেয়েছে তাব সন্ধান। রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে র‍্যাল্ফ স্পেন্সারকে একদিন দেখেই জিমি বলে চিনতে ভুল হোল না তার।

বুধবার জিমির প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ ছিল ভাবী শ্বশুর ব্যাঙ্কার অ্যাডাম্সের বাড়ীতে। প্রাতঃরাশের পর সবাই মিলে শহরে যাবে। জিমি, অ্যাডাম্স, অ্যানেবেলা, তার দিদি ও দিদির দুটি শিশুকন্যা।

সকলেই ব্যাঙ্কে যাবে। সেখান থেকে ব্যক্তিগত কাজে জিমি বাইরে যাবে। তাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্য বগিগাড়ী দাঁড়িয়ে আছে ব্যাংকের সামনে।

সবাই মিলে খোদাই করা এক কাঠের উঁচু রেলিং ঘেরা ব্যাংকের ঘরে ঢুকে পড়লো। অ্যাডাম্স এর ভাবী জামাতা হিসাবে জিমির তো সর্বত্র অবাধ গতি। যে সুদর্শন যুবকটি রূপসী অ্যানাবেলাকে বিয়ে করতে চলেছে, তার সঙ্গে কথা বলে ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাও খুব খুশী।

জিমির নামিয়ে রাখা সুটকেশটা হাতে তুলে নিল অ্যানাবেল। বেজায় ভারী সেটা। জানতে চাইল কি আছে এর মধ্যে।

ঠাণ্ডা গলায় জিমি জানালো, ওর মধ্যে অনেকগুলি নিকেলকরা সুহর্ন, সেগুলি ফেরৎ দিতেই নিয়ে যাচ্ছে সে।

এলমোর ব্যাঙ্ক সদ্য সদ্য একটা নতুন সিন্দুক ভল্ট বসানো হয়েছে। সেটা নিয়ে মিঃ অ্যাডাম্স-এর গর্বের সীমা নেই। সবাইকে ডেকে দেখালেন তিনি।

ভল্টটা ছোট। কিন্তু তাতে একটা পেটেন্ট নেওয়া ভল্ট লাগানো হয়েছে। তাতে নিরেট ইস্পাতের তিনটে খিল এমনভাবে লাগানো হয়েছে যাতে একটা হাতল ঘুরিয়েই তিনটে খিল লাগানো যায়। মিঃ অ্যাডাম্স উত্তেজিতভাবে মিঃ স্পেন্সারকে ভল্টটা খোলা আর বন্ধ করার কৌশলটা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। জিমি কিন্তু এসবে বিশেষ উৎসাহ দেখালো না।

এই সময় গোয়েন্দা বেন প্রাইসকেও দেখা গেল ব্যাঙ্কের মধ্যে। কেরানীর প্রশ্নের উত্তরে সে জানালো, একজন বন্ধুর জন্য এখানে অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ মেয়েদের মধ্যে থেকে চীৎকার শোনা গেল। বড়দের অজ্ঞাতসারে বড় নাতনীটি ছোট নাতনী আগাথাকে ভল্টে ঢুকিয়ে খিলগুলো আটকে দিয়েছে কম্বিনেশানের নবগুলো ঘুরিয়ে। টাইম লকটাও আটকে গেছে।

ব্যাঙ্কার অ্যাডাম্স আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে হাতল ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। দরজা খোলা যাচ্ছে না, কম্বিনেশন ঠিকমত লাগানো হয়নি। টাইম লকের ঘড়িতেও দম দেওয়া হয়নি। ভল্টের মধ্য থেকে শিশুর অস্ফূট কান্না শোনা গেল। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন আগাথার মা। এখানে আশেপাশে এমন কোনও লোক নেই যে ঐ দরজাটা এখুনি খুলতে পারে।

অ্যানেবেলা তাকালো জিমির দিকে। তার চোখে মিনতি। জিমি কি একবার চেষ্টা করবে। দ্বিধা না করে সুটকেশ খুললো জিম। সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে তার বিচিত্র যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে লেগে গেল। তার আগে অ্যানাবেলের কাছ থেকে চেয়ে নিল তার পোষাকে আটকানো লাল গোলাপটি।

এক মিনিটের মধ্যে জিমির প্রিয় তুরপুনটা দরজায় ঢুকে গেল, আর দশ মিনিটের মধ্যেই খিল কেটে উদ্ধার করলো আগাথাকে।

সব শেষ। সুটকেশটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে হাঁটলো জিমি। পেছন থেকে ডাকলো প্রাইস। ধরা পড়ে দুঃখ নেই আর জিমির, একটি জীবন বাঁচাতে নিজের জীবন, ভবিষৎ জলাঞ্জলি দিয়েছে সে।

কিন্তু আশ্চর্য প্রাইস যেন তাকে জিমি ভ্যালেন্টাইন বলে চিনতেই পারলো না। বললো, আপনিই তো মিঃ স্পেন্সার। আপনার গাড়ীটাই তো বাইরে অপেক্ষা করছে, আচ্ছা চলি।

বেন প্রাইস রাজপথে নেমে চলে গেল।

*A Retrived Reformation

ম্যাগির আত্মপ্রকাশ

প্রতি শনিবার রাতে লবঙ্গপাতা সমিতির সদস্যরা দান-প্রতিদান সমাজের হলঘরে নাচের আসর বসায়। এই নাচে সমিতির ছেলেরা সাধারণতঃ কাগজের বাক্সের কারখানার মেয়েদের সঙ্গিনী করে আনে। বাইরের ছেলেরা একটির বেশী নাচে যোগ দিতে পারে না।

ম্যাগীর চেহারা বা নাচের ভঙ্গী কোনটাই আকর্ষনীয় নয় বলে তার কোন সঙ্গী নেই। তার সহকর্মী অ্যান তার পুরুষবন্ধুকে নিয়ে প্রতি শনিবার ম্যাগীকে তার বাড়ী থেকে নিয়ে আসতে ভোলে না।

এই শনিবার কিন্তু ম্যাগীর অন্য চেহারা। তার ভাষাহীন চোখে ঝিলিক, চওড়া-সাদামাটা মুখে গর্বের ছোঁয়া। অ্যানের সঙ্গে যাবার দরকার নেই তার। একজন বাইরের ছেলে তাকে আজকের নাচের আসরে নিয়ে যেতে চায়।

প্রথম প্রণয়ীর উপস্থিতিতে লাবন্যে ফুটে ওঠা ম্যাগি নাচের আসরে তার বন্ধু টেরি ও সুলিভান-এর সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিল। বেশ আকর্ষনীয় চেহারা তার। বেশ আদবকায়দা-দুরস্ত।

কাগজের বাক্সের মেয়েদের মুখে মুখে একটা কথাই ঘুরতে লাগলো, ম্যাগী টুলেও তাহলে একজন সঙ্গী পেয়েছে। তারা লোকটির চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে আলাপ করতে লাগলো তার সঙ্গে।

এদিকে দুবছর ঘুমিয়ে থাকার পর হঠাৎই যেন জেগে উঠে ম্যাগীর প্রতি আকর্ষন অনুভব করল সমিতির যুবকের দল। তারা প্রত্যেকেই নাচে ডাকতে চাইল ম্যাগীকে।

বাজার মাত হোল ম্যাগীর। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনটি টেরি ও সুলিভান অক্লেশে জিতে নিল। সে নাচলো বনদেবতার মত। নতুন একটা বাতাবরণের সৃষ্টি করলো সে। এমনকি ডেম্পসী ডোনাভানের সঙ্গিনীটির সাথে সে নিয়ম ভেঙে দুবার ওয়াল্‌জ নাচলো।

ক্ষেপে লাল হয়ে গেল ক্রীড়া সমিতির সদস্য ডেম্পসী। সে নামকরা অ্যাথলীট। তার পরেন ড্রেস সুট। একহাতে একটা লোহর দণ্ড দুবার বাঁকাতে পারে। কারো মাথা ফাটিয়ে দিলেও পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে সাহস করে না।

স্পর্ধিত ভঙ্গিতে এই সুদর্শন যুবকটি নবাগতর পরিচয় জানতে চাইল। জেরা করে বুঝতে পারলো এ শহরের ও'সুলিভানদের কোনও আত্মীয় নয় সে। বস্তুতঃ সে যে পরিচয় দিচ্ছে সেটা সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে।

কথায় কথা বেড়ে যায়। তর্কাতর্কি একসময় হাতাহাতির পর্য্যায়ে পৌছলো। সমিতির অলিখিত নিয়মে নাচ ঘরের ভেতর যদি কোন ব্যক্তিগত সংকট উপস্থিত হয়, তবে পিছন

দিকের একটা ঘরে মল্লযুদ্ধের মাধ্যমে তার মীমাংসা হয়। সেই ঘরের উদ্দেশ্যেই রওনা হোল ছেলের দল।

সুলিভানের খোঁজ করতে করতে খবরটা শুনে ভয়ে শুকিয়ে গেল ম্যাগীর মুখ। সে রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল।

—ডেম্পসির সঙ্গে লড়তে গেছে? থামাও ওদের। ডেম্পসি ওকে লড়াইতে হারাতে পারবে না। আ'রে সে তো ওকে খুন করে ফেলবে।

রোজ বললো—তাতে তোমার কি এসে গেল? প্রতিটি নাচের আসরেই তো কেউ না কেউ লড়াই করে, আমাদের চোখের সামনে নয়, এই যা।

কিন্তু ম্যাগি পাগলের মত এঁকে বেঁকে নাচের ঘরের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ছুট লাগালো। পিছনের পর্দাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে অন্ধকার হল ঘরটায় ঢুকলো। তারপর তার বলিষ্ঠ কাঁধের এক ধাক্কায় ভেঙে ফেললো ছোট ঘরটার দরজা।

ঘরে খোলা ঘড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন সদস্য। ডেম্পসি আধুনিক মল্লযোদ্ধার ভঙ্গীতে দু-হাত মুঠো করে প্রতিপক্ষের খুব সামনে দাঁড়িয়ে হাল্কাচালে মেঝেতে পা ঠুকছে। দুই হাত ভাঁজ করে কালো চোখের তারায় খুনীর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে টেরি ও'সুলিভান।

একটা প্রচণ্ড চীৎকার করে ম্যাগি ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনের মধ্যে। টেরির উদ্যত হাতটা ধরে ঝুলে পড়লো সে, আর সেই হাতটা থেকে খসে পড়লো লুকোনো তীক্ষ্ণধার ছুরিটি।

এরকম কাণ্ড আগে এখানে কখনো ঘটেনি। সদস্যরা বিস্ময়ে স্তব্ধ। টেরির দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটা দুর্বোধ্য হিস্ হিস্ শব্দ বেরিয়ে এলো। ডেম্পসি কোন রকম রাগ না দেখিয়ে নীচু গলায় ও'সুলিভানাকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে বললো।

ম্যাগীর দু'গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুর ধারা। খুব সাহসের সঙ্গেই সে সোজা এগিয়ে গেল ডেম্পসীর দিকে।

—আমি জানাতাম ডেম্পসী, ওর নাম টনি স্পিনেলি, ও গিনিয়ার লোক। সঙ্গে সব সময় ছুরি নিয়ে ঘোরে, তাই মারামারির খবরটা শুনেই আমি ছুটে এসেছি। তুমি বুঝতে পারবে না ডেম্পসী জীবনে কোন সাথীকে খুঁজে না পাওয়া কত যন্ত্রনার, কত লজ্জার। তাই আমি ওকে নিয়ে এসেছিলাম। বুঝতে পারছি এ ক্লাবে আর আমার প্রবেশাধিকার নেই।

ডেম্পসী বন্ধুদের অনুরোধ করলো ছুরিটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে, আর নাচঘরে গিয়ে জানাতে, সুলিভানের একটা জরুরী কোন আসায় তাকে চলে যেতে হয়েছে।

তারপর ঘুরে দাঁড়ল ম্যাগীর দিকে। যেন আবিস্কার করলো তাকে নতুন করে, বললো—শোনো ম্যাগি আমি তোমাকে বাড়ী পৌছে দিচ্ছি, আর সামনের শনিবার তুমি কি আমার সঙ্গে নাচতে রাজী আছো?

নতুন আভায় জ্বলে উঠলো ম্যাগীর বাদামী চোখ। তোমার সঙ্গে নাচতে চাই কি না জিগ্যেস করছো ডেম্পসী? হাঁসকে কি জিজ্ঞেস করতে হয় সাঁতার কাটবে কি না?*

* The Coming out of Maggi

দোরঙা প্রতারক

জী সেটা ভালডোর জুয়ার ঘরেই ঘটলো ঘটনাটা। দোষটা লানো কিড-এর, এই বিশ বছর বয়েসেই কথায় কথায় মানুষ খুন করাটা তার অভ্যেসেই দাঁড়িয়ে গেছে। জুয়ার আড্ডায় দুটো বিধি নিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে গেল। সেটা মিটতে দেখা গেল যে কিড করেছিল একটা অবিবেচনার কাজ, আর তার প্রতিপক্ষ করেছিল একটা মারাত্মক ভুল।

প্রতিপক্ষটি ছিল পশুপালন খামারের মালিক-এর ছেলে; তার সাঙ্গপাঙ্গও ছিল অনেক। তবু বেচারার ছোঁড়া গুলিটা কিডের কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। কিডের কিন্তু নির্ভুল নিশানা।

অগত্যা একগাদা প্রতিহিংসাকামীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য পালানো ছাড়া উপায় কি? কিড ঠিক করলো এবার একটু ধরা ছোঁয়ার বাইরে পাড়ি দেওয়া যাক।

স্টেশনের কাছে একটা দোকানের খামারে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি ঘোড়া থেকে একটা বেছে নিয়ে প্রাণপনে ছুটিয়ে দিল কিড। রিও ডি গ্রাণ্ডের সীমান্ত অঞ্চলে মানুষ খুন করার চেয়েও বড় অপরাধ, কারো ঘোড়া চুরি করা।

তিনদিন পরে কার্পাস ক্রিস্টির তীর থেকে সমুদ্রগামী জাহাজ পলাতক-এ চড়ে রওনা দিল দক্ষিন আমেরিকার উপকূলে বুয়েনাস টিয়ার্স-এ।

বুয়েনাস টিয়ার্স-এ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত থ্যাকার তখনও পুরো মাতাল হননি। সবে বেলা এগারোটা, বারোটার আগে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে না তাঁর। কিড্‌কে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ডাকলেন, কেননা উঠে গিয়ে অভ্যর্থনা জানানোর ক্ষমতা এসময় থাকেনা তাঁর। লানো কিড্‌-এর হালচাল জিগ্যেস করলেন তিনি, স্প্যানিশ ভাষাটা খুব ভাল জানে শুনে ওঁর মাথায় একট ফন্দী খেলে গেল।

কিড্ কাজের খোঁজে এসেছে। জানালা দিয়ে একটা ছোট সাদা বাড়ী দেখিয়ে থ্যাকার বললেন, —ওখানে তোমার জন্য একটা কাজ আছে। ঐ বাড়ীর এক ক্যাস্টিলীয় ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তোমার পকেটে টাকা ভরে দেবার জন্য অপেক্ষা করে আছেন।

—আপনি কি গাঁজা টাঁজা খান নাকি?

—বোসো। সব কথা তোমাকে বলছি। বারো বছর আগে ওদের একটি ছেলে হারিয়ে গেছে। আট বছরের ক্ষুদে শয়তান একটা। সোনা খোঁজার দল এসেছিল যুক্তরাষ্ট্র থেকে,তারাই সে দেশের কথা বলে বলে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল ছেলেটার। তারা চলে যাবার একমাস পরে ছেলেটাও উধাও। বুড়ো ইউরিক হাজার হাজার ডলার খরচ করেছে ছেলের খোঁজে। একবার নাকি তাকে টেকসাসে দেখা গিয়েছিল, অর্থাৎ তোমার দেশে, তার বেশি কিছু জানা যায়নি। ম্যাডামের অবস্থা খুবই খারাপ। ঐ ছেলেই তাঁর জীবনসর্বস্ব ছিল। একদিন ছেলে ফিরে আসবেই এ বিশ্বাস তিনি ছাড়েন নি।

হ্যাঁ, ছেলেটার বাঁহাতের উল্টোপিঠে উল্কি আঁকা একটা উড়ন্ত ঈগল, তার নখে ধরা আছে একটা বর্শা।

কিড নিজের বাঁ হাতটা ধীরে ধীরে তুলে ধরে কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে রইল।

সরকারী ডেস্কের পেছন থেকে চোরাই ব্র্যাণ্ডের বোতলটা নামিয়ে এনে থ্যাকার বললেন—উল্কি আমিই এঁকে দেবো তোমার হাতে। সান্দাখানে রাষ্ট্রদূত হয়ে থাকার সময় শিখেছিলাম। একসেট ছুচও আছে আমার কাছে।

কিড বলল—কোনদিন কারো ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করেছি বলে তো মনে পড়ছে না। কথা বলতে শেখার আগেই নিজের বাপ মা তো পটল তুলেছে। তা, আপনার খেলার ছকটা কেমন?

তোমার হাতে উল্কি এঁকে দেবার পর আমি বুড়ো ইউরিককে তোমার কথা জানাবো। ইতিমধ্যে ঐ পরিবারের সারা ইতিহাস তোমাকে মুখস্থ করিয়ে দেবো! তোমার বয়স, চোখের দৃষ্টি, স্প্যানিশ বুলি সবকিছুই ঠিক আছে। তার ওপর টেকসাস সম্পর্কেও সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে তুমি। বুড়ো ইউরিক তোমাকে ক্ষমা করে গ্রহণ করবেন নিশ্চয়ই।

—তারপর?

—তাঁরা যদি কিছু সময়ের জন্য তোমায় গ্রহণ করেন, তারপর ভুল ভাঙ্গে, তাও সই, তুমি তার মধ্যেই বুড়োর সিন্দুক ভেঙে মোটা টাকা সবিয়ে নেবে। উল্কি এঁকে দেওয়ার জন্য আমার প্রাপ্য তার আধাআধি, বুঝলে?

—শুনতে তো ভালই লাগছে, আমি রাজী।

পরিকল্পনা মতই কাজ হোল বুড়ো ইউরিক ও তাঁর স্ত্রী কিডকে সাদরে নিজের ছেলে বলে মেনেও নিলেন।

একমাস পরে থ্যাকারের চিঠি পেয়ে কিড দূতাবাসে এলো। এখন তাকে হুবহু সম্পন্ন স্পেনীয় যুবকের মত লাগছে।

বেলা প্রায় তিনটে, থ্যাকারের নেশায় তূরীয় অবস্থা। মহা ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি ভাগের টাকা দাবী করলেন, নয়তো সব কথা ফাঁস করে দিলে মেক্সিকানরা কিডকে প্রকাশ্যে কুকুরের মত পিটিয়ে মারবে।

—দেখুন মিঃ থ্যাকার, আমার জীবনে আমি বেশি স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসিনি, বলার মত কোন মাকেও পাইনি। কিন্তু এই মহিলাকে আমাদের বোকা বানিয়ে রাখতে হবে। একবার তিনি সহ্য করেছেন, দ্বিতীয়বার পারবেন না। আমি একটা হীন নেকড়ে, হয়তো শয়তানই আমাকে এই পথে পাঠিয়েছে, তবু এ পথের শেষ পর্যন্ত আমি যাবো। আর এরপর যখন আমাদের দেখা হবে, তখন এটা মনে রাখবেন আমার নাম কিড ডাল্টন নয়, ডন ফ্রান্সিস্কো ইউরিক।

—আজই তোমার মুখোস খুলে দেবো আমি। দুমুখো বিশ্বাসঘাতক কোথাকার।

কিড উঠে দাঁড়ালো। ইস্পাত কঠিন হাতে থ্যাকারের গলাটা টিপে ধরে তাকে ধীরে ধীরে একটা কোনে নিয়ে গেল। তারপর বাঁ বগলের ভেতর থেকে বার করলো তার মুক্তা বসানো রিভলবারটা। আর ঠাণ্ডা নলটা ঠেকালো রাষ্ট্রদুতের মুখে। তুষারশীতল হাসি তার মুখে।

—আমি এখানে কেন এসেছি সেকথা আপনাকে আগেই বলেছি। যদি কখনো এখান থেকে চলে যাই, আপনাকে খুন করেই যাবো। একথাটা কখনো ভুলবেন না আমার অংশীদারী। এবার বলুন, আমার নাম কি?

—অ্যা.... ডন, ডন ফ্রানিসস্কো ইউরিক। থ্যাকার হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন।

বাইরে থেকে একটা গাড়ীর চাকার শব্দ, কোচোয়ানের চীৎকার, আর ঘোড়ার পিঠের ওপর চাবুকের শপাশপ আওয়াজ ভেসে এলো।

চলে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল কিড। রাষ্ট্রদূতের দিকে নিজের উল্কিটা তুলে ধরে বললো—

—আরও একটা কারণ সব সময়ে মনে রাখতে হবে। যাকে খুন করে আমি টেক্সাস থেকে পালিয়েছি, তার হাতেও এরকম উল্কি ছিল।

বাইরে ডন সান্টোস ইউরিকের সেকেলে ল্যাণ্ডোটা এসে দাঁড়ালো। সেমিওরা ইউরিক দুটি বড় বড় চোখে খুশি ছড়িয়ে বাইরে থেকে ডাকলেন, বাছা আমার, তুমি কি ভেতরে আছ?

"মাদ্রে মিয়া ইয়ো ভেঙ্গো (মা, আমি আসছি)", যুবক ডন ফ্রান্সিস্কো জবাব দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল।

*A Double Dyed Deceiver

পানশালার বিশ্ব নাগরিক

পানশালায় প্রচণ্ড ভিড়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কোনের দিকে একটা দুজনের টেবিলে নজরে পড়ে গিয়ে নিজের ভাগ্যকে পিঠ চাপড়াতে ইচ্ছে করছিল।

একটু পরেই সেই টেবিলের বাকি চেয়ারটা দখল করলেন একজন বিশ্বনাগরিক। হ্যাঁ, সেই বলেই নিজের পরিচয় দিলেন তিনি। একজন বিশ্বনাগরিককে স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতায় মনে বেশ পুলক জাগলো। কেননা আমার মনে মনে ধারনা ছিল সেই আদমের কাল থেকে ভ্রমনকারী জন্মেছে লাখে লাখে, কিন্তু তার মধ্যে সত্যিকারের বিশ্বনাগরিক একজনও নয়, যার মধ্যে নিজের দেশ বা জন্মস্থান সম্পর্কে কোনও পক্ষপাত নেই। সারা পৃথিবীই তার আপন ঘর।

বিশ্ব নাগরিকটির নাম ই, রাশমোর কলগান। আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে মনে হোলো তিনি যেন এই বিরাট গোলাকার পৃথিবীটিকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছেন।

অবহেলার সঙ্গে বিষুবরেখা অঞ্চল সম্পর্কে কথা বলেই তিনি এক মহাদেশ থেকে লাফ দিয়ে অন্য মহাদেশে-এ চলে যাচ্ছিলেন, একবার হাত ঘুরিয়েই হায়দ্রাবাদের একটা বিশেষ বাজারের কথা শেষ করলেন। হুস করে আপনাকে নিয়ে তুললেন ল্যাপল্যাণ্ডের স্কী-এর ওপর। এরপর আপনি সওয়ার হলেন কিয়েলাইকিহিকির সাগরের উত্তাল তরঙ্গের পিঠের ওপর।

তিনি আপানাকে টেনে নিয়ে চললেন আর্কানসাস এর জলাভূমির ভিতর দিয়ে এবং ইডাহো পশুখামারের ক্ষার প্রান্তরের মুহূর্তের জন্য আপনাকে একটু শুকিয়ে নিয়ে ভোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে আপনাকে হাজির করবেন ভিয়েনার বড় বড় ডিউকের সমাজে।

তিনি আপনাকে শোনাবেন ক্রেমন করে শিকাগোর হ্রদের বাতাসে তাঁর সর্দি হয়েছিল আর বুয়েনার্স এয়ার্সে বুড়ি এস্কিমোলা চুচুলা বীজের গরম ক্বার্থ খাইয়ে তাঁকে সারিয়ে তুলেছিল। ই, রাশমোর কলগান, এস্কোয়ার, পৃথিবী, মহাবিশ্ব, সৌরমণ্ডল" —এই ঠিকানায় চিঠি ফেলে দিলে আনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকা যায়, সে চিঠি তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে।

আমি নিশ্চিত হলাম ইনিই সত্যিকারের বিশ্বনাগরিক। তাঁকে দেখে মনে হোলো বাতাস অথবা মাধ্যাকর্ষনের মতই নগর, দেশ এবং মহাদেশের প্রতি সমান নিরপেক্ষ।

এই ব্যাপারটা আরো একটু ভাল করে যাচাই করে নেওয়ার জন্যে আমি তাঁর জন্মস্থান বিষয়ে কৌতূহল দেখালাম।

ই, রাশমোর কলগানের বজ্রমুঠি টেবিলের ওপর সশব্দে মুষ্ঠাঘাত করতেই আমার বাক্‌রোধ হয়ে গেল।

তিনি বলে উঠলেন, "মাপ করবেন, এ ধরনের প্রশ্ন কোনটা আমি পছন্দ করি না। একটি মানুষ কোন্ অঞ্চল থেকে এসেছে তাতে কি এসে যায়?

তাঁর মতে, ডাকঘরের ঠিকানা দিয়ে একটা মানুষের বিচার করা যায় না। তিনি কেন্টাকির এমন মানুষ দেখেছেন যে হুইস্কি খেতে ঘৃণাবোধ করে। এমন ভার্জিনিয়াবাসীকে দেখেছেন যারা পোচহন্তাসের বংশধর নয়, এমন ইণ্ডিয়ানাবাসী যে জীবনে একটাও উপন্যাস লেখেনি, আমুদে ইংরেজ, বেহিসাবি ইয়াংকি, ঠাণ্ডা রক্তের দক্ষিণী, সংকীর্ণমনের পশ্চিমী, এরকম অসংখ্য লোক দেখেছেন, যাদের আচার আচরনে তাদের জন্মস্থানের কোন ছাপ পড়েনি।

বারো বার তিনি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছেন। উপারনেভিক-এর একজন এস্কিমোকে জানেন যে সিনসিনাটিতে লোক পাঠিয়ে তার নেকটাই আনায়। উরুগুয়ের একজন মেষপালক "ব্যাটলক্রীক" প্রাতরাশ খাদ্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেয়েছে, তাকেও তিনি চেনেন।

তিনি মিশরের কায়রোয় একটি আর ইয়াকোহমাতে একটি ঘরে সারা বছরের জন্য ভাড়া করে রেখেছেন। সাংহাই-এর একটা চায়ের দোকানে একজোড়া চটি তাঁর জন্য সবসময় রাখা থাকে। রিও ডি জেনেরোঁর সিয়েটল হোটেলের লোকদের বলে দিতে হয় না তাঁর ডিমটা কি ভাবে রাধতে হবে।

আমাদের এই পুরোনো পৃথিবীটা তো ছোটখাট নয়, উত্তর বা দক্ষিণ, বা উপত্যকার প্রাচীন জমিদার বাড়ী, বা ইউক্লিড অ্যাভেনিউ বা ফেয়ার ব্যাকস্ জেলা, তা নিয়ে এত হৈচৈ করার কি আছে? কোন ছাতাধরা শহরই হোক বা দশ একর জলাভূমিই হোক, ঘটনাক্রমে সেখানে জন্মেছি বলেই সেটা নিয়ে আমরা যদি মূর্খের মত আচরণ না করি, তাহলেই তো আমাদের জগৎটা আরো বেশি ভাল হয়ে উঠতে পারে।

পূর্ব পরিচিত এক ভদ্রলোকের দেখা পেয়ে বিশ্বনাগরিক ভদ্রলোকটি আমার টেবিল ছেড়ে চলে গেলেন।

হঠাৎ পানশালার অন্য অংশে একটা প্রচণ্ড গোলমাল ও সংঘর্ষের শব্দে সচকিত হয়ে দেখি, আমাদের বিশ্বনাগরিক অন্য একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ভয়ংকর মারদাঙ্গা বাঁধিয়ে

দিয়েছেন। তারা দুজনে রূপকথার রাক্ষুসে টাইটানদের মত লড়ে যাচ্ছে। কাঁচের গ্লাস ভেঙ্গে চুরমার করছে, লোকজনের মাথার টুপি খুলে তাদের মাথায় গাট্টা মেরে তাদের মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। দু'জন মহিলা ভয়ে তারস্বরে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

এমন সময় পানশালার পরিচারকরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের চ্যাংদোলা করে তুলে বাইরে ফেলে দিয়ে চলে এলো।

ফরাসী পরিচারক ম্যাকার্থিকে ডেকে এই মারদাঙ্গার কারণ জানতে চাইলাম।

সে বললো, ঐ লালটাই পরা লোকটি (অর্থাৎ বিশ্বনাগরিক) যে অঞ্চল থেকে এসেছেন, সেখানকার বাজে গলি খুঁজি আর নিকৃষ্ট জন্ম সরবরাহর কথা উল্লেখ করেছিল ঐ অন্য খদ্দেরটি, তা থেকেই এই মারদাঙ্গা।

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললাম, কিন্তু উনি তো বিশ্বনাগরিক, সমস্ত পৃথিবীই ওঁর ঘর—উনি—

পরিচারক যোগ করল—ওঁর মূল নিবাস মেইন এর অন্তর্গত মাট্যা ওয়ামকিগে; সে জায়গাটার নিন্দে কেউ করলে সে কখনও ছেড়ে কথা কন না।

*A Cosmopolitan in a Cafe

পুলিশ ও ধর্মসঙ্গীত

শীত তাহলে এসেই গেল। ম্যাডিসন স্কোয়ারে যথারীতি রাত্রিযাপন করেছে সোফি।

তার কোলের ওপর শীতবুড়ো তার আগমনবার্তা পাঠিয়ে দিল একটি ঝরা পাতার কার্ডে। সোপির মত ভবঘুরেদের কাছে শীতকালটা বিপদের সংকেত নিয়ে আসে। খোলা আকাশের তলায় দয়া দাক্ষিণ্যে পাওয়া অপ্রতুল পোষাকে রাত আর কাটাতে চায় না। মাথার ওপর একটা ছাদের দরকার।

শহরের বড়লোকদেব মত ভূমধ্যসাগরে জাহাজে চড়ে বেড়ানো, ঘুম পাড়ানি দক্ষিন আকাশ বা বিসুরিয়া উপসাগরে ভেসে বেড়ানোর মত উঁচুদরের চিন্তা সোফির নেই। সে কেবল চায় তিনমাসের জন্য নিশ্চিন্ত আহার আর বাসস্থান, তাহলেই সে খুশী।

অবশ্য এমন অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে যাদের দয়া এসব ভবঘুরেদের প্রতি অকৃপনই বলা যায়। কিন্তু সোফি-র ব্যাপারটা আলাদা। সে একটু অহংকারী লোক। মানব সেবকদের হাত থেকে পাওয়া প্রতিটি সুযোগ সুবিধের জন্য টাকাপয়সা না দিলেও অসম্মান তো ভোগ করতেই হয়। সীজারের যেমন ব্রুটাস, তেমনি দাতব্য প্রতিটি রুটির টুকরোর পিছনে আছে গোপন ও ব্যক্তিগত খোঁজ খবর।

কাজেই দ্বীপে, অর্থাৎ জেলখানাতেই তিনমাস কাটিয়ে আসা ভাল। তার জন্যে ব্যবস্থা করতে উঠে পড়ে লাগলো সোপি।

ব্রডওয়ের একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকতে গিয়েই বাধা পেলো সোপি। তার পোষাকের ওপরের দিকটা ফিটফাট হলেও তলায় সুতো বের করা ট্রাউজারটা চোখে পড়ে গেল দরওয়ানের। একটা ঝলমলে দোকানে পাথর ছুঁড়ে কাঁচ ভেঙে দিয়ে চুপ করে পুলিশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল তারপর। পুলিশ এসে কিন্তু বিশ্বাসই করলো না, ওই নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা কাঁচ ভাঙার মত অপরাধ করতে পারে।

পরের অভিযানটাও ব্যর্থ হোল। একটা রেস্টুরেন্টে গাণ্ডেপিণ্ডে গিলে পয়সা নেই জানাতেও তাকে পুলিশে দেওয়ার বদলে মেরে ধরে তাড়ালো ওয়েটাররা। আরও পাঁচটা বাড়ি পেরিয়ে নতুন করে গ্রেপ্তার হওয়ার সাহস জোটালো সোপি। বাসস্টপে একটি যুবতী একা দাঁড়িয়ে আছে, একে একটু বিরক্ত করা যাক। কাছাকাছি একজন পুলিশও আছে। একেবারে সোনায় সোহাগা।

কিন্তু কপালটাই মন্দ, যুবতীটি বারবনিতা, খদ্দের ধরাই তার কাজ। টের পেয়েই এক দৌড়ে পালিয়ে বাঁচল সোফি।

এক ছুটে থামলো সেই অঞ্চলে, যেখানে অনেক আলো, অনেক হাসি, অচেনা আনন্দ। একটা ঝলমলে থিয়েটারের সামনে একজন পুলিশকে দেখে নতুন একটা কৌশল এলো মাথায়।

গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে মাতালের মত আবোল তাবোল বকতে শুরু করলো সে। নেচে গেয়ে চেঁচিয়ে, বকবক করে আকাশ ভরিয়ে তুললো সে।

পুলিশটি লাঠি ঘুরিয়ে মন্তব্য করলো, মনে হচ্ছে ইনিও হার্টফোর্ড কলেজ থেকে আগত মূর্তিমানদের মধ্যে একজন। আমাদের ওপর অর্ডার আছে এদের ধরাধরি না করতে। নিরুপায় হয়ে সোপি তার চেঁচামেচি বন্ধ করলো। পুলিশদের আজ হোলোটা কি।

চুরুটের দোকানের সামনে এক ভদ্রলোক চুরুট ধরাতে থামতেই, সোফি তাঁর ছাতাটা নির্বিবাদে তুলে নিয়ে হাঁটা দিল। চুরুট ধরাতে ব্যস্ত লোকটি দ্রুতপদে তার পিছু নিয়ে ছাতাটি দাবী করলো। সোফি ক্রুদ্ধভাবে তাকে পুলিশ ডাকতে বলতেই লোকটি ভয় পেয়ে স্বীকার করলো ছাতাটা সত্যি সত্যি তার নয়, সে এটা তুলে এনেছে একটা রেস্টুরেন্ট থেকে। এটা যদি তোমার হয়, তুমি রাখতে পারো।

সোফি রাজপথ ধরে পূব দিকে হাঁটতে লাগলো। ম্যাডিসন স্কোয়ারই যদি তার শেষ আশ্রয় হয়, তাহলে সেদিকেই যাওয়া যাক।

কিন্তু একাট অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ কোনে পৌঁছে সোফি হঠাৎ থেমে গেল। কেমন একাট অদ্ভুত অগোছালো ধরনের গির্জা। বেগুনি রঙ করা জানলার ভেতর দিয়ে একটা নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আসন্ন রবিবারের জন্য ধর্ম সঙ্গীতের মহলা হচ্ছে সেখানে। পিয়ানোর সংগতে একটা মধুর সুরের মূর্ছনা সোফির কান জুড়িয়ে দিল।

মাথার ওপর উজ্জ্বল নির্মল চাঁদ উঠেছে; গাড়ী ঘোড়া ও পদযাত্রীর সংখ্যাও অল্প; ছাদের কার্নিশে চড়ুই পাখীরা কিচমিচ করছে। কিছুক্ষনের জন্য সে যেন গ্রামের ছায়া সুনিবিড় গির্জার কাছে পৌঁছে গেছে।

দূর অতীতে এ সুর সে অনেকবার শুনেছে। তখন তার জীবনে মায়ের স্নেহমাখা হাসি ছিল, গোলাপের সুগন্ধ ছিল, উচ্চকাঙক্ষা ছিল, বন্ধুবান্ধব ছিল, পবিত্রতা ছিল।

সোফির বর্তমান মানসিক হতাশায় এই পুরোনো গির্জা, অতীত স্মৃতি একটা আকস্মিক পরিবর্তন ঘটালো।

একটা তাৎক্ষণিক শক্তিশালী আবেগ নতুন করে তাকে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করলো। নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছে হোল তার। এই কাদার মধ্যে নিজেকে টেনে তুলবে সে। এখনও সময় আছে, তার যৌবন শেষ হয়ে যায়নি। পুরানো উচ্চাকাঙক্ষাগুলোকে সে আবার জাগিয়ে তুলবে। অর্গানের মধুর গম্ভীর সুর তার অন্তরে বিপ্লবের সূচনা করেছে।

কালই সে শহরের কেন্দ্রে চলে যাবে, কাজ খুঁজে নেবে, যে কোন কাজ। একজন লোম ব্যবসায়ী তাকে গাড়ীর চালকের কাজ দিতে চেয়েছিল, খুঁজে নেবে তাকে। সে এই চলমান কর্মমুখর জগতের একজন হয়ে যাবে। ভবঘুরের জীবন, জেলের কয়েদীর জীবন আর নয়।

কে যেন সোফির কাঁধে হাত রাখলো। দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে সোফি দেখলো এক পুলিশ বাবাজীর চওড়া মুখ।

পুলিশ অফিসার জিগ্যেস কলো—তুমি এখানে কি করছো।

—কিছু না।

—চলে এসে আমার সঙ্গে ভালোয় ভালোয়।

পরদিন সকালে ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিলেন, তিন মাসের জেল।

*The Cop and the Anthem

আইকে স্কোয়েনস্টিনের তুকতাক

ব্লু লাইট ড্রাগস্টোরের নৈশকরণিক আইকে জ্ঞানের ভারে অবনত পিঠ আকসি এর মত বাঁকা চশমা নিয়ে দোকান বন্ধ করে দুই স্কোয়ার দূরে মিসেস রিড্‌ল এর বাড়ীতে চললো।

ঐ বাড়ীতে বেশ কিছুদিন ধরে পেয়িংগেষ্ট হিসেবে আছে সে। মালিকের মেয়ে রোজার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে সে আজকাল। তবে মুখচোরা ভীতু স্বভাবের জন্য মনের কথাটি এতদিনেও রোজির কর্ণগোচর করতে পারলো না, এই যা দুঃখ।

বাড়ীর অন্য আবাসিক চুংক ম্যাগগোয়ান কিন্তু অন্য ধাতের। সদাচঞ্চল আমুদে এই মানুষটিই রোজিকে ভালবাসে এবং সেকথা তাকে জানিয়ে দিতেও কার্পন্য করে না।

আইকের ড্রাগস্টোরে প্রায়ই দেখা যায় চুংককে এখানে ওখানে কাটা ছেঁড়ার মলম লাগাতে আর পট্টি বাঁধতে।

বাড়ী থেকে প্রাতঃরাশ সেরে ফেরার পর ড্রাগ স্টোরে আবার চুংকের আবির্ভাব। আবার কোথাও চোট লাগয়িছে মনে করে আইকে তাকে জামা খুলতে বললো। চুংক বললো—না বন্ধু, ব্যাপারটা আরও গুরুতর।

—তার মানে? শঙ্কিত হোল আইকে।

—মানেটা একটু জটিল। তুমি তো জানো বুড়ো রিড্‌ল আমাকে দুচোক্ষে দেখতে পারেনা। গত এক সপ্তাহে ধরে রোজিকে আমার সঙ্গে বেরোতেই দিচ্ছে না, এদিকে দুসপ্তাহ ধরে ঠিক আছে আমি আর রোজি পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবো, এখন যদি একটা ওষুধ— এই অপ্রত্যাশিত খবরে বেদম চমকালো আইকে। তার হাতের হাতুড়িটা, ওষুধের বদলে নিজের বুড়ো আঙ্গুলটাকেই থেঁতলে দিল। অথচ আশ্চর্য, সে কোনো ব্যথা অনুভব করলো না। আচ্ছন্নের মতো সে বললো ঃ

—তুমি কোনও অষুধ চাইছিলে?

অপ্রস্তুত দেখলো চুংককে। এটা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। একটা কাগজ অকারনে গোল করে পাকাতে পাকাতে সে হেসে বললো; এ ব্যাপারে আমি অনেক দূর এগিয়েছি। হারলেমে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছি। তার টেবিলে আছে ফুটন্ত ক্রিসেনিথমাম, আর একটা কেটলী—গরম হবার অপেক্ষায়। একজন পাদ্রী আসবেন সেখানে রাত সাড়ে নটায়, আমাদের বিয়ে দিতে। সপ্তাহে কুড়ি ডলার উপার্জন করছি এখন। রোজিকে কখনও কষ্টে পডতে হবে না। কিন্তু রোজি যে কিছুতেই মন শক্ত করতে পারছে না এই পালানোর ব্যাপারে।

—তা এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি?

—তুমি এমন কোন ওষুধ দিতে পারো, যাতে রোজির মন সংকল্প স্থির হয়? আমি জানি এরকম ওসুধ আছে।

অতিবুদ্ধির দেমাকে আইকের নিচের ঠোঁটটা ঘৃণায় বেঁকে গেল। সেদিকে না তাকিয়েই চুংককে বলতে লাগলো—

—টিম লেসি আমাকে বলেছে, একময় ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিছু একটা এনে সে তাঁর মনের মানুষকে সোডার জলের সঙ্গে খাইয়েছিল। প্রথম দাগটা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে ইস্কাপনের বিবি হয়ে গেল। দু'সপ্তার মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

চুংক ম্যাকগোয়ান সাদাসিধে শক্তসমর্থ মানুষ। মানুষ চিনতে যারা ভুল করেনা, তারা বুঝতে পারবে লোকটির মনের গড়নটা সূক্ষ্ম তারের। শত্রুরাজ্য আক্রমণে উন্মুখ একজন ভাল সেনাপতির মতই সে সব আটঘাট বেঁধে এগোতে চাইছে। সে নিশ্চিত জয় চায়।

আইকে বললো—দেখো চুংক, একটা প্রেসকিপশান তোমাকে দিতে পারি, যেটা তোমার কাজে লাগবে।

কৃতজ্ঞ গলায় চুংক বললো ঃ

তাই কর আইকে, আমি ভাবছি যে ডিনারে রোজির সঙ্গে দেখা হলে তাকে যদি একটা ওষুধ খাইয়ে দিতে পারি, তাহলে তার মেজাজটা ঠিক থাকবে। নটার সময় আমি তাকে চিমনী বেয়ে নামতে সাহায্য করবো। পাদ্রীমশাই-এর জন্যেই কাজটা তাড়াতাড়ি সারতে হবে আমাদের।

ধীরে ধীরে নাক চুলকালো আইকে।

—দেখো চুংক, এসব ব্যাপারে আমাদের অনেক সতর্ক হতে হয়। বন্ধুত্বের খাতিরে তোমায় একটা ওষুধ দিচ্ছি, এটা খাওয়ালেই বুঝবে রোজি তোমাকে কত ভালবাসে।

কাউন্টারের পিছনে গিয়ে ঠাণ্ডামাথায় সিকিগ্রাম মরফিয়ার দুটো বড়ি গুঁড়ো করে, মিল্ক অফ সুগারের সঙ্গে মিশিয়ে পুরিয়া বানিয়ে চুংককে দিয়ে দিল। আদতে এটা খেলে একজন পুর্ণবয়স্ক মানুষ কয়েক ঘন্টা ঘুমে অচেতন থাকবে, তবে তার কোনও ক্ষতি হবে না। চুংককে নির্দেশ দিল জলে মিশিয়ে খাওয়াবার। এবং চুংক চলে যাবার পরেই রোজির বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে এই পলায়ন বৃত্তান্ত তাকে জানিয়ে দিতে দেরী করলো না। রোজীর বাবা ভাবী জামাই-এর জন্য বন্দুক হাতে জানলায় অপেক্ষা করবে জানালো।

নিশ্চিন্ত হোল আইকে। রোজি থাকবে গভীর ঘুমে, পাহারায় থাকবে তার ক্রুদ্ধ পিতা। প্রতিদ্বন্ধীর পরাজয় নিশ্চিত। সেই দুর্ঘটনার খবরটা জানার জন্য সারারাত ওষুধের দোকানে ছটফট করলো আইক। সকালের ডিউটির লোকটি এসে যেতেই দ্রুত নামল সে।

একেবারে মুখোমুখি দেখা চুংকের সঙ্গে। তার মুখে বিজয়ীর হাসি। একগাল হেসে সে জড়িয়ে ধরল আইককে। —সব নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে ভাই। রোজি আজ সকালে আমার ফ্ল্যাটে, আমাদের সঙ্গে খাবে।

হতভম্ব আইকে কোনমতে বললো—আর সেই ওষুধটা। ঠোঁট দুটোকে উল্টে দিয়ে চুংক বললো—কাল রাতে রিড্‌লদের ঘরে খেতে বসে রোজির দিকে চেয়ে ভাবলাম এ মেয়েকে আমি সোজা পথেই পেতে চাই। সে নিজের ইচ্ছেয় আমার কাছে আসবে, কোনো ওষুধের প্রভাবে নয়। আর বুড়ো রিড্‌ল্ তো ভাবী জামাতার প্রতি মোটেই স্নেহশীল নয়, তাই গুঁড়োটা তার কফিতেই মিশিয়ে দিয়েছিলাম। বুঝলে?

*The Love-Philtre of Ikey Schoenstein

ছোট রাইনশ্লস এবং বহুরূপী

'পুরোনো মিউনিক' নামের রেস্টুরেন্টটা যেন প্রাচীন জার্মানীর অবিকল প্রতিরূপ হিসেবেই খদ্দেররা মেনে নিয়েছে।

কিছুদিন আগে মালিকপক্ষ ওপরে একটা নতুন ঘর যোগ করেছে, আর তার নাম রেখেছে "ছোট রাইনশ্লস"। একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। নকল পাথরের নিচু পাঁচিলে আইভি লতা। দেওয়ালে আঁকা রাইন নদী আর এরেনব্রিটস্টেন দুর্গ প্রসাদের ছবি। সেখানে বসে খেতে খেতে আপনার মনে হতে পারে দুর্গ প্রাসাদে বসে বীয়ার খাচ্ছেন।

একদিন বিকালে পুরোনো মিউনিকে গিয়ে দেখি সব তেমনই আছে কেবল খদ্দের কম আর পিয়ানোর ওপরের চুরুট দানিটা ভাঙা।

ব্যাপারটি কি? বেয়ারাকে ডেকে জিগ্যেস করলাম। বিস্তর ধানাই পানাই করলো সে। তার স্বভাবই অবিরাম বক বক করে যাওয়া, দিনের আলো ফুটলে গোলাবাড়ী ছেড়ে যাওয়া চাতক পাখিগুলো যেমন করে।

মোদ্দা গল্পটা হোল প্রিন্স অ্যালবার্টকে নিয়ে। সে লোকটাকে দেখেছি এই রেস্টুরেন্টের সিঁড়িতে বর্ম আঁটা কাঁধে কুঠার নিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে। একটা জার্মান পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের মতই তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হোত। সেটাই ছিল তার চাকরী।

সে আমার বন্ধু ছিল। কয়লা তুলে, ঠেলাগাড়ি চালিয়ে, ইট সাজিয়ে তার হাত দুটো ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, তাই বহুরূপী সেজে দাঁড়িয়ে থাকার চাকরীটা সে যেচে নিয়েছিল।

একদিন হোলো কি, একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, একজন মহিলা, একটি মোটাসোটা তরুণী আর একটি ছোট ছেলের একটি দল রাতের খাবার খেতে এলো এখানে। সিঁড়িতে উঠতে গিয়েই বহুরূপীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল মেয়েটির। বোঝা গেল মেয়েটির নাম হেলেন, আর সে এই যুবকটিকে খুব ভালভাবেই চেনে। বহুরূপী সাজার অপদার্থতা নিয়ে খুবই ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করলো মেয়েটি। কিন্তু বহুরূপী তাকে তেমন আমল দিল না। উল্টে বললো, এটাই তার কাজ। আরো কিছুক্ষণ তাকে এরকমই থাকতে হবে।

মেয়েটির চোখে হীরকদীপ্তি ফুটে উঠলো, বলল—বেশ ভাল কথা। আজ রাতেই আমি তোমার চাকর হবার সাধ জন্মের মত মিটিয়ে দেবো।

মালিকের কাছে গিয়ে মধুর হেসে মেয়েটি অনুরোধ করলো আজ তাদের ডিনারটা যেন ঐ বহুরূপীই পরিবেশন করেন তাহলে প্রাচীন জার্মানীর পরিবেশটা ঠিক ঠিক ফুটবে।

মালিক এক কথায় রাজী। বহুরূপীর সঙ্গে আমিও সাহায্য করতে গেলাম ডিনার পরিবেশনে।

প্রথম দিকটা ঠিক ঠিক চলছিল, কিন্তু শেষের দিকে সব গড়বড় হয়ে গেল। বড় থালাটা তার হাত থেকে পড়ে গেল আর মেয়েটির দামী পোষাকের তলার দিকটা ঝোলে একেবারে সপ্‌সপে হয়ে গেল।

মেয়েটি চোখ পাকিয়ে বললো—

—অকর্মার ধাড়ি, কুঠার কাঁধে নিয়ে ঘরের কোনে দাঁড়িয়ে থাকতেই জানো খালি।

—মাপ করবেন ম্যাডাম। ঝোলের থালাটা এত গরম ছিল, ধরে রাখতে পারিনি।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক রেগে আগুন হয়ে তখনই মালিককে ডেকে বহুরূপীকে বরখাস্ত করতে বললেন, আর মেয়ের পোষাকের ক্ষতিপূরন স্বরূপ পোষাকের দাম ছ'শো ডলার চাইলেন।

ছ'শো ডলারটা মালিকের কাছে একটু বেশী মনে হলেও বরখাস্ত করার ব্যাপারটা তিনি মেনে নিলেন।

বহুরূপী তখন ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য নিয়ে একটি সুন্দর দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ফেললো। সে জানালো পরিবেশকে নষ্ট করার অপচেষ্টাটা তার সব থেকে খারাপ লেগেছে। এরা বড়লোক বলে বহুরূপীকে দিয়েও ঝোল পরিবেশন করিয়েছে।

মালিক বললেন, ঠিক কথা, এর তো পরিবেশন করার কথা নয়। ইচ্ছে করলে আপনারা অন্য পরিবেশনকারী নিতে পারেন। তবে আপনারা এখন এখান থেকে যান। আর ছশো কেন ছ'হাজার ডলার জরিমানা চেয়ে মামলা করুন গে।

ঠিক তখনই ঘড়িতে বারোটা বাজলো। বুড়ো ভদ্রলোক সশব্দে হেসে উঠলেন।

—তুমিই জিতে গেলে হে ডিয়ারিং। আসল কথাটা আপনাদের খুলে বলি, কিছুদিন আগে এই ছেলেটি আমার কাছে কিছু একটা (মেয়েটি এখানে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো) প্রার্থনা করেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম অযোগ্যতার অপরাধে বরখাস্ত না হয়ে একটানা তিনমাস যদি সে কোন কাজে লেগে থাকতে পারে, তাহলে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করবো। আজ রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই তিনমাস কেটে গেল।

এই বলে তিনি ডিয়ারিং-এর হাত চেপে ধরলেন। আনন্দে ছাদ সমান লাফ দিল ডিয়ারিং। তারপর বললো, কয়লা কাটা পাথর ভাঙার কাজ করে হাত দুটো ক্ষতবিক্ষত, তাই এদের বিশ্রাম দেবার জন্যেই বহুরূপী সাজা, আর কাটা হাতে গরম ঝোলতো আর মলমের কাজ করে না।

মেয়েটি এগিয়ে এসে সেই হাত দুখানা জড়িয়ে ধরলো। ওয়েটারের বক্তৃতা শেষ হতে আমি নাছোড়বান্দার মত বললাম—কিন্তু চুরুটদানিটা ভাঙলো কি করে?

—ও, গতরাতে স্যার ডিয়ারিং পার্সিভেল হেলেনকে নিয়ে ডিনার খেতে এসেছিলেন। যাবার সময় নতুন বহুরূপীর হাতে একটা দশ ডলারের নোট দিয়ে যান। অপ্রত্যাশিত এই সৌভাগ্যে বেচারার হাত থেকে কুঠারটা পড়েই গেল ঐ চুরুটদানীটার ওপর। এইভাবেই ব্যাপারটা ঘটেছিল।

* The Halberdier of the little Rheinschloss

ব্যস্তবাগীশের প্রেম

তরুণী স্টেনোগ্রাফারকে নিয়ে অফিসে ঢুকেই দালাল হার্ভে ম্যাক্সওয়েল তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ পিচারের দিকে সুপ্রভাত শব্দটা ছুঁড়ে দিয়েই প্রায় ছুটে গেলেন নিজের টেবিলে। মুহূর্তের মধ্যে একগাদা টেলিগ্রাম ও ফাইলের মধ্যে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে ডুবে গেলেন। এটাই তাঁর স্বভাব।

ভারী রূপবতী এই স্টেনোগ্রাফার মেয়েটি। প্রায় একবছর এখানে কাজ করছে সে। আজ যেন তার রূপে নতুন আলোকের ছটা লেগেছে। আরো সুন্দর, কমনীয় দেখাচ্ছে তাকে।

মেয়েটি পিচারকে জিগ্যেস করে জানলো বস-এর কথামত আজই নতুন স্টেনোগ্রাফার-এর জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ নিজেই চালিয়ে নিতে লাগলো মেয়েটি। এদিকে দালাল সাহেবের কাজের চাপে নিঃশ্বাস নেবার সময় নেই। ঘনঘন টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, তাড়া তাড়া চিঠি। আজ সপ্তাহের ব্যস্ততম দিন। পিচার এসে তাঁকে জানালো স্টেনোগ্রাফার এজেন্সী একটি ভদ্রমহিলাকে পাঠিয়েছে কেননা ম্যাক্সওয়েলই তাঁকে আগের দিন বলেছিলেন এজেন্সীকে ফোন করে লোক পাঠাতে বলতে।

বিস্ময়ে আকাশ থেকে পড়লো ম্যাক্সওয়েল—তোমার মনের খেই হারিয়ে গেছে পিচার। মিস লেস্‌লী তো এই একবছর ধরে ভালই কাজ করছেন। তাঁকে ছাড়ানোর প্রশ্নই ওঠেনা। তুমি ঐ ভদ্রমহিলাকে ফিরিয়ে নাও।

পিচার এসে হিসাব রক্ষকের কাছে মন্তব্য করলো—যত বয়স হচ্ছে, ততই ভুলো হয়ে যাচ্ছে লোকটা। এদিকে গভীর আত্মমগ্নতার মধ্যেও ম্যাক্সওয়েলের নাকে একটা পরিচিত সুবাস এসে লাগলো। মন চঞ্চল হয়ে উঠলো তাঁর। এ তাঁর চেনা সুরভী। এই সুগন্ধ একা মিস লিসলীই বহন করে আনেন। তাঁকে একটা খুব জরুরী কথা কতদিন ধরে বলবে ভাবছেন ম্যাক্সওয়েল। কিন্তু সময়ই যে নেই— যাই হোক। দুহাতে টেবিলের কাগজপত্র সরিয়ে উঠে পড়লেন তিনি। আজই, এখনই কথাটা না বললেই নয়, কখন কাজের চাপ এসে সব ভুলিয়ে দেবে আবার।

দ্রুত পায়ে মিস লেসলীর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন ম্যাক্সওয়েল। রুদ্ধশ্বাসে বললেন—মিস লেসলী, আপনাকে এই মুহূর্তে একটা কথা বলতে চাই, এক টুকরো সময় আছে আমার। আমি আমি আপনাকে ভালবাসি, মানে গভীর ভাবে। আপনি কি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবেন?

স্টেনোগ্রাফার তখন একটা অদ্ভুত আচরন করে বসলো। তার দুচোখে জলের ধারা, অথচ ঠোঁটের কোনে হাসির ঝিলিক। দুহাতে ম্যাক্সওয়েলের গলা জড়িয়ে ধরলো সে, নরম গলায় বললো—এখন বুঝতে পেরেছি, সেই পুরোনো কাজের জগতে ফিরে এসে কাজ ছাড়া অন্য সব কিছু তোমার মাথা থেকে বেমালুম উঠে গেছে। আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। হার্ভে, তোমার কি মনে নেই, গতকাল সন্ধ্যেয় মোড়ের মাথার লিট্‌ল চার্চ-এ আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।

* The Romance of A Busy Broker

ক্যাকটাস শহরের খদ্দের

হত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য অনায়াসে যেতে পারেন টেকসাস-এর ক্যাকটাস শহরে, জ্বরে বুক জ্বালা সর্দিকাশির টিকি দেখা যায় না ওখানে।

'ন্যাভারো অ্যাণ্ড প্ল্যাট' নামে বিশাল একটি দোকান আছে ক্যাকটাসে। কি না পাওয়া যায় সেখানে। হাতি থেকে হাতব্যাগ, মোটর গাড়ী থেকে দেশালাই, গেঞ্জি থেকে হাল ফ্যাশানের মেয়েদের কুড়িটি আলাদা আলাদা রঙের দামী কোট পর্যন্ত।

দোকানের বড় অংশীদার ন্যাভোরোর বয়স হয়েছে। দেশ দেশান্তরে ছুটোছুটির ধকল শরীর আর নিতে পারছে না। অথচ প্রতি বসন্তে নিউইয়র্ক যেতেই হয় দোকানের জন্য মালপত্র কেনার কাজে।

বাধ্য হয়ে ছোট্ট অংশীদার জন প্ল্যান্টকে অনুরোধ করলেন এবার নিউইয়র্ক যাবার ভারটা যেন সে-ই নেয়।

খুব একটা উৎসাহ দেখালো না জন, কেননা সে শুনেছে নিউইয়র্ক একটা মৃত শহর। তবে যাত্রাপথে সান এন্টোনেতে নেমে একটু ফুর্তি করে নেওয়া যাবে, এটুকুই লাভ।

দু'সপ্তাহ পরে নিউইয়র্কে নেমে নিম্ন ব্রডওয়ের 'জিজবম এণ্ড সন্স' এর দোকানে ঢুকলো টেকসাসের এই ব্যবসায়ীটি। পাইকারী পোশাক বিক্রেতার দোকান এটা।

বাজপাখির মত তীক্ষ্ণদৃষ্টি আর হাতির মত স্মৃতিশক্তি এই জিজবমের।

অতিথিকে স্বাগত জানালেন তিনি। তাকে যথাসাধ্য আপ্যায়ন করে ছেলেকে ডেকে বললেন, আজ সন্ধ্যেয় সে যেন এই বিশিষ্ট খদ্দেরটিকে নিউইয়র্ক ঘুরিয়ে দেখায়।

পরদিন সকাল দশটায় কাজকর্মের জন্য তৈরী হয়েই দোকানে এলো জন। তার কোটের বুকে একগুচ্ছ হায়সিন্থ ফুল পিন দিয়ে আটকানো।

জিজবমের প্রশ্নের উত্তরে সে জানালো এই শহরটা তার খুব মনোমত নয়, অন্ততঃ এখানে বাস করতে পারবে না সে। রাত্রে জিজবমের ছেলের সাথে সব ঘুরে দেখেছে সে। এখানকার জলটা ভাল, কিন্তু টেকসাসের বিদ্যুৎ পরিবহন ব্যবস্থা এখানকার চেয়ে উন্নত।

নানারকম পোষাকের নমুনা দেখানোর জন্যে জনকে ওপরে নিয়ে গেলেন জিজবম। দোকানের স্থায়ী মডেল মিস আশারকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

মিস্ আশার এলো একঝলক বসন্ত নিয়ে। জীবনে এই প্রথম কাউকে দেখে এত ভাল লাগলো জনের। সে কলোরাডোর তীরে দণ্ডায়মান পাহাড়গুলোর মতই স্থির নিশ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে। মেয়েটির দৃষ্টিতে ধরা পড়লো তার এই নিশ্চল চাহনী। একটু একটু করে রাঙা হয়ে উঠলো সে।

কাজের কথায় এলো জিজবম। তার নির্দেশে একের পর এক ভিন্নভিন্ন পোশাকে মনোহারিনী বেশে দেখা দিতে লাগলো মিস আশার। কিন্তু খদ্দেরটি তখনও তড়িতাহতের মত স্থির।

নমুনা দেখানো হয়ে গেলে প্ল্যান্ট ইতস্ততঃ করতে লাগলো। ব্যবসার কথা এই মুহূর্তে তার মাথায় নেই। সে তখন ক্যাকটাস শহরের কোন্ অঞ্চলটিতে তার ভাবীবধূর জন্য বাড়ী বানাবে, তাই নিয়ে চিন্তামগ্ন।

এই শাঁসালো খদ্দেরটি হাতছাড়া হতে দিতে চান না দুঁদে ব্যবসায়ী জিজবম। তিনি প্রস্তাব দিলেন, কেনাকাটার ব্যাপারে আগেই মনস্থির করতে হবে না জনকে। আজ সন্ধ্যেয় আর একটু ঘুরে বেড়াক, আমোদ প্রমোদ করুক। কাজ তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না। মিস আশারকে নির্দেশ দিলেন আজ সন্ধ্যেয় সে যেন জনকে সঙ্গ দেয়।

হাতে চাঁদ পেল জন। সে তো সাহস করে এ প্রস্তাব করতেই পারতো না। মনে মনে হাসলো আশার, বেচারী জানে না এই সান্ধ্যভ্রমনটাও মিস আশারের চাকরীরই একটা অঙ্গ।

কাজেই মিস আশারের অরাজী হওয়ার কিছু ছিল না। সাতটা নাগাদ তার ঠিকানা থেকে যেন তাকে তুলে নেয় জন। তার আগে এলে অসুবিধে হবে, আশারের সঙ্গে একঘরেই থাকেন এক শিক্ষয়ত্রী। তিনি পুরুষ মানুষকে তার ঘরে ঢুকতে দেন না। কাজেই আগে এলে বাইরে অপেক্ষা করতে হবে জনকে।

সাড়ে সাতটার সময় ব্রডওয়ের একটা রেস্টুরেন্টে ডিনারে বসলো তারা। মিস্ আশার ড্রাই মার্টিনীর অর্ডার দিল। কিন্তু জন তাকে মদ খেতে দিতে চায় না। মিস আশারের নামটি জানতে আগ্রহী সে।

মিস্ আশার ঠাণ্ডা গলায় বললো—হেলেন। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল জন।

—শোন হেলেন, আজ কয়েক বছর ধরে টেকসাসের তৃণভূমিতে যখনই ফুল ফোটে, তখনই আমার মনে এমন একজনের কথা ভেসে ওঠে যাকে আমি কখনও দেখিনি। যার কথা কখনো শুনিনি। গতকাল তোমাকে দেখে মনে হোলো, তোমাকেই এতকাল ভেবে এসেছি আমি। কালই আমি বাড়ী ফিরে যাচ্ছি। আর তোমাকেও নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে। এই দেখো, তোমার জন্যে একটা ছোট্ট উপহার এনেছি।

একটা দুই ক্যারাটের হীরের আংটি টেবিলের ওপর দিয়ে হেলেনের দিকে ঠেলে দিল সে।

হাতের কাঁটাটা দিয়ে সেটি আবার জনের দিকে ঠেলে দিল হেলেন। বললো, —আপনার যতই টাকাই থাকুক, তা দিয়ে আমাকে কিনতে পারবেন না আপনি। ভেবেছিলাম আপনি অন্য সকলের মত নন, কিন্তু দেখছি সব খদ্দেরই এক ধাঁচের।

—সব খদ্দের মানে?

—মানে এর আগে যাদের সঙ্গে আমি ডিনারে এসেছি। এই ডিনার খাওয়াটাও আমার চাকরীর অঙ্গ কিনা। তা তারাও আমাকে নিজের ধনসম্পদ দেখিয়ে করায়ত্ব করার চেষ্টা করেছিল। এমনকি হীরের আংটির উল্লেখও করেছিল। তবু আমাকে আসতে হয় আপনাদের ডাকে, না হলে আমার চাকরীটা থাকবে না। যদিও আমি বিত্তহীন, অনাথ, তবু বেচাকেনার সামগ্রী নই।

হঠাৎ আলো ঝলসে উঠলো জনের মুখে। —পেয়ে গেছি। নিক্লসন ভবন। সেখানে বড় বাগান আর প্রাকৃতিক হ্রদ আছে। পুরোনো বাড়ীটা ভেঙে ফেলে আর একটু পিছিয়ে তোমার জন্য নতুন বাড়ী তৈরী করে দেবো।

এমন মানুষের সঙ্গে তর্ক বৃথা। বাড়ী ফেরার পথে চোখ জলে ভরে উঠলো হেলেনের। সব পুরুষ মানুষই কি একরম? সেই ছেলেবেলা থেকে শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটার পর একটা কাজ করে গেছে সে। তবু সৎ জীবনযাপন করার পথে এত বাধা আসছে কেন?

জন প্ল্যাট মেয়েটিকে তার বোর্ডিং হাউসের দরজায় পৌঁছে দিল। এমন কঠিন ঘৃণার দৃষ্টিতে হেলেন তাকালো তার দিকে, যে বুক কেঁপে উঠলো জনের। তবু সাহস করে এক হাতে তার কোমর জড়াতে গেল সে, খোলা হাতটা দিয়ে তার মুখে একটা ঘুষি বসিয়ে দিল হেলেন।

ঘাবড়ে গিয়ে পড়ে যেতে যেতে টাল সামলালো জন। একটা আংটি তার পকেট থেকে গিয়ে বারান্দায় গড়িয়ে গেল।

—আপনার ঐ হাতচ্ছাড়া অংটিটা নিয়ে কেটে পড়ুন এক্ষুনি!

আংটিটা হাতে তুলে নিল জন,—আরে এটা সেটা নয়। এটা তো অন্যটা, মানে বিয়ের আংটিটা।

প্লেন সোনার ওয়েডিং ব্যাণ্ডটা তুলে দেখালো সে। আধো অন্ধকারে হেলেনের চোখে জ্বলজ্বল করে উঠলো—আপনি ....তুমি কি সত্যি আমাকে বিয়ে .... পিছন ঘরের দরজা খুলে গেল। শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল জন। কাল দোকানে আবার দেখা হবে।

ঘরে ঢুকে ঘমুন্ত শিক্ষিকাটিকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগালো হেলেন—তুমি তো ভূগোল পড়েছো এম্‌মা। বলে তো ক্যা-ক্যা-ক্যারাকাস শহরটি কোথায়?

কেমন ধমকে উঠলো এম্‌মা, এর জন্যে ঘুম ভাঙালে আমার? সেটা তো ভেনেজুয়েলায়, সেখানে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, নিগ্রো, বাঁদর, ম্যালেরিয়া..........

—সেই যাই হোক। তাতে কিছু আসে যায় না। আমি কালই সেখানে যাচ্ছি এম্‌মা। কালই।

* The Buyer from Cactus city

মনোমুগ্ধ পার্শ্বচিত্র

নিউইয়র্কের খুব পুরানো একটি হোটেলের বাঁধা খদ্দের ছিলেন মিসেস ম্যাগি ব্রাউন। ষাট বছরের কুচকুচে কালো পোষাক পরা শক্তপোক্ত মহিলা। হাতে সবসময় কুমীরের চামড়ার ব্যাগ।

তিনি সবসময়েই হেটেলের ওপর তলার একটা ছোট বসার ঘর ও শোবার ঘর দখল করতেন। যার ভাড়া ছিল দু'ডলার। যে কদিন হোটেলে থাকতেন শহরের ধনী দালাল ও ব্যবসায়ীরা দলে দলে তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হতেন। মহিলাকে বলা হোত পৃথিবীর তৃতীয় ধনবতী।

এই হোটেলটিব, যার নাম হোটেল এক্রোপলিস। স্টেনোগ্রাফার মহিলা ছিলেন মিস্ ইভা বেট্‌স্, গ্রীক দেবীসুলভ সৌন্দর্য ছিল তার। মাঝে মাঝে সে আমার কিছু টাইপের কাজ করে দিত অগ্রিম মজুরী দাবী করতো না. মাঝে মাঝে গল্পগুজবও করতাম তার সঙ্গে। দয়া আর সততা এ দুটি গুনই ছিল তার। ইভার সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করার সাহসই ছিল না কারো। স্বয়ং হোটেল মালিক থেকে কণিষ্ঠতম ভৃত্যটি পর্যন্ত ইভার সম্মানরক্ষার দিকে সর্তক দৃষ্টি রাখতো।

হঠাৎ একদিন দেখলাম ইভার জায়গায় কাজ করছে অন্য একজন। এটা সাময়িক পরিবর্তন মনে করে ব্যাপারটায় গুরত্ব দিই নি। তার পরের দিনই দুসপ্তাহের ছুটি কাটাতে বাইরে চলে গেলাম।

ফিরে এসে হোটেলের সামনে দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম ইভা কাজ শেষ করে মেসিনটা ঢেকে রাখছে। ওর অনুপস্থিতির কারণ জিগ্যেস করতে ও যে কাহিনী শোনালো সেটাই আজকের গল্প।

ও সত্যিই হোটেল থেকে চলে গিয়েছিল। ধনী মহিলা মিসেস ব্রাউন দারুন পছন্দ করে ফেলেছিলেন ইভাকে। তিনি ইভাকে প্রস্তাব দিলেন এই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধাকে যদি ইভা সঙ্গ দেয়, তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন। যত মেয়ে তিনি এ পর্যন্ত দেখেছেন, তাদের মধ্যে ইভার মত সৎ ও ভাল মেয়ে একটিও নেই। এরপর ইভার জবানীতে শুনুন।

—আমিও গলে গেলাম, বুঝলেন মশাই। বুড়ির অনেক টাকা আছে বলে নয়, আসলে আমিও তো একজন নিঃসঙ্গ মানুষ! আমারও তো এমন একজনকে মাঝে মাঝে পেতে ইচ্ছে করে, যাকে কাঁধের ব্যথা বা পেটেন্ট লেদার জুতোয় চিড় ধরার কথা অসংকোচে বলা যায়।

হোটেলের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে আমি মিসেস ব্রাউনের সঙ্গে চলে গেলাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম, উনি সবসময়ই আমার পাশে বসে একদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। বলতেন, আমার মুখখানা নাকি তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত।

তিনি দর্জি ডাকিয়ে হুকুম করলেন আমাকে মনের মত করে সাজিয়ে দিতে, তাতে যত খরচ হয় হোক। হোটেল বণ্টন-এ একটা ছয় ঘরের অ্যাপার্টমেন্টে উঠে গেলাম আমরা। দৈনিক একশো ডলার ভাড়া তার, জানেন?

ম্যাগী মাসী আমাকে উপলক্ষ্য করে এক ভোজসভার আয়োজন করলেন একদিন। এই ভোজসভায় যদি আপনি উপস্থিত থাকতেন, কি মজাই না হোত। ডিনার পরিবেশন করা হয়েছিল সোনার ও কাটগ্লাসের পাত্রে। প্রচুর ঝালর লাগানো পোষাক পরেছিলেন ম্যাগীমাসী। আর আমার পোষাক? তার জৌলুষ দেখলে চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে আপনার। আগগোড়া হাতে বোনা লেস-এ তৈরী। দাম তিনশো ডলার, হ্যাঁ, আমি বিলটা স্বচক্ষে দেখেছি মশাই।

ডিনারে আমার বাঁদিকে বসেছিল একজন ব্যাংক মালিক, আর ডানদিকে একজন যুবক। সে তার পরিচয় দিয়েছিল সংবাদপত্রের শিল্পী বলে। তারা কথাই আপনাকে বলব—

যাই হোক, ডিনার শেষে সব ধনীলোকের মত আমারও কষ্টে ভিড় ঠেলে ঘরে গেলাম। সেই সংবাদপত্রশিল্পী, নাম ল্যাথ্রপ, দীর্ঘকায় সুন্দর দুটো চোখ, তাকে কি আপনি চেনেন? না সে কোথায় কাজ করেতা জানিনা।

ঘরে ফিরে সেদিনের বিল পেলেন ম্যাগীমাসী। ছয়শো ডলার। বিল পেয়ে, স্বচক্ষে দেখলাম ম্যাগীমাসী মূর্ছা গেলেন।

পরদিনই হোটেল ছাড়লেন তিনি। আমরা গিয়ে উঠলাম ওয়েস্ট সাইড এর নীচু অঞ্চলে একটা ভাড়া বাড়িতে। তার জল নীচের তলায়, আলো ওপর তলায়। ম্যাগী মাসি হঠাৎ কিপ্টেমির অসুখে পড়লেন। আচ্ছা ল্যাথ্রপের কথা কি আপনাকে বলেছি! সে হয়তো ভেবেছিল, ম্যাগীমাসির কিছু টাকা আমাকে দিয়ে যাবেন, বা ওরকম কিছু। তাকে আমার একেবারে মনের মত মানুষ বলে মনে হয়েছিল। সে যাই হোক তিনদিনেই আমার গৃহস্থলীর শখ মিটে গেল। একশো পঞ্চাশ ডলারের পোষাক পরে এক বার্ণারের স্টোভে পনেরো সেন্ট দামের মেটের ষ্টু রাঁধা আমার পোষালো না।

ম্যাগীমাসি ওরফে মিসেস ব্রাউন কিছুতেই ছাড়তে চাইছিলেন না আমাকে, জোর করেই একটা অপেক্ষাকৃত শস্তা দামের পোষাক পরে চলে এলাম সব ফেলে, আর হোটেলের চাকরীটাও ফিরে পেলাম। শুধু এখনো ভাবতে ভাল লাগে সেই সাংবাদিক হয়তো আমি ম্যাগীমাসির টাকা পাবো একথা ভাবেই নি, আচ্ছা আপনি কি তাকে—গল্পের শেষে হোটেলের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। হাজার বাতির রোশনাই ছড়িয়ে পড়লো ইভার মুখ। —আরে এ যে ল্যাথ্রপ। তাহলে সত্যিই সে টাকার জন্য, মানে..........।

ওদের বিয়েতে উপস্থিত ছিলাম আমি। নববধূর পোষাকে ইভাকে দেখে চকিতেই বুঝতে পারলাম মিসেস ব্রাউনের মনের কথাটা।

ল্যাথ্রপকে একপাশে ডেকে বললাম—তুমি শিল্পী হয়েও বুঝতে পারলে না মিসেস ব্রাউন কেন ইভাকে এত পছন্দ করতেন?

দেওয়ালে সাজানো মালা দিয়ে মুকুট তৈরী করে পরিয়ে দিলাম ইভাকে। পাশ থেকে তার মুখ দেখে আবিষ্কারের আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো ল্যাথ্রপ।

—আরে ইভার মাথাটা ঠিক রূপোর ডলারের ওপর আঁকা মহিলার মাথার মত। টাকাকে প্রানের চেয়ে ভালবাসেন বলেই টাকার ছবির প্রতিরূপকে কাছে রাখতে চেয়েছিলেন মিসেস ব্রাউন।

* The Enchanted Profile

সুরকি গলি

উকিল ওল্ডপোর্টের ব্রডওয়ের অফিসে এসে রাগে ফেটে পড়লো ব্লিংকার। আজ সকালেই তার নরপোর্টে যাবার কথা ছিল, আর আজই এখানে জরুরী তলব। ব্লিংকার বললো—আমি বুঝতেই পারিনা কেন সবসময় আমাকে কতকগুলো বাজে কাগজে সই করতে হবে। আমার সব জিনিস বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে। শেভিংসেটটা কোথায় আছে কে জানে। এখন আমায় ছুটতে হবে এক মাথামোটা নাপিতের কাছে, শুনতে হবে তার বকবকানি। কাল সকালের আগে তো আমার যাবার ট্রেন পাবোনা।

বুড়ো ওল্ডফোর্ট থুতনীতে ভাঁজ ফেলে বললেন—আরে, বোসো, সব চাইতে খারাপ খবরটাতো তুমি এখনো শোনই নি। কাগজপত্র তো এখনও সব তৈরিই হয়নি। আগামীকাল সেগুলো তোমার সামনে সই করার জন্য পেশ করা হবে। তোমার আরও দুবার তোমার নাক ধরে গালে আঁচড়ে কাটার সুযোগ পাবে।

দাঁড়িয়ে উঠলো ব্লিংকার—অনেকগুলো কাগজপত্রে সই করা যদি বাকি না থাকতো আজই আপনার হাত থেকে আমার সব কাজ কর্ম নিতাম। এখন দয়া করে একটা চুরুট দিন।

—আমার পুরানো বন্ধুর ছেলে একদল হাঙরের মুখে পড়তে চলেছে, এ দৃশ্য দেখতে পারবো না বলেই তোমার কাজটা রেখেছি, হলে কবেই ছেড়ে দিতাম। যাই হোক কাল অন্ততঃ ত্রিশটা সই করা ছাড়াও আর একটা সম্পত্তির ব্যাপারে—

—রক্ষে করুন, এখন নয়। সই সাবুদ সম্পত্তি সব কিছু কথা হবে কাল সকাল এগারোটায়, আজ নয়।

সন্ধ্যে বেলা বিরস মুখে ক্লাবে বসে ছিল ব্লিংকার। পরিচিত বন্ধুবান্ধব সবাই কোথাও না কোথাও ভ্রমনে চলে গেছে, রয়ে গেছে সে একা। ওই হতচ্ছাড়া সম্পত্তিটা—

ব্লিংকারের সম্পত্তি বলতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমি জমা, কিছু বড় পাকা বাড়ী, আর একসারি লাল ইঁটের ছোটছোট বাড়ী। উকিল মশাই একবার ব্লিংকারকে সব ঘুরিয়ে

দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তার নিজের হাত খরচের জন্য উকিল ওল্ডফোর্ট যে পরিমান টাকা জমিয়ে রেখেছিলেন, ব্লিংকার ভাবতেও পারে নি ওই বাড়ীগুলো থেকে অতটাকা ভাড়া পাওয়া যায়।

যাই হোক, এখন ক্লাবে বসেই সে ঠিক করল, কোনি দ্বীপেই যাওয়া যাক। যথা ইচ্ছা তথা কর্ম। দ্রুত জেঠিতে পৌঁছে গেল সে। আমি জনতার মতই লাইন দিয়ে টিকিট কেটে স্টিমবোটে চড়লাম।

ক্যাশটুল-এ একটি মেয়ে বসেছিল। মেয়েটি এত সুন্দরী যে চোখে ফেরাতে পারছিল না ব্লিংকার। আলাপ জমানোর ইচ্ছেয় বোকার মত জিগ্যেস করে বসলো সে-ও কোনি দ্বীপেই যাচ্ছে কিনা।

তিক্ত রসিকতার সঙ্গে মেয়েটি বললো—সে কি? আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, আমি একটা পার্কে বাইসাইকেল চালাচ্ছি।

কিন্তু দমে গেল না ব্লিংকার, মেয়েটিকে রাজী করিয়ে নিল, একসঙ্গে কোনি দ্বীপ দেখবে তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণখুলে কথাবার্তা চালাতে লাগলো তারা। মেয়েটির নাম ফ্লোরেন্স। বিশ বছরের এই তরুনীটি একটা পোষাকের দোকানে টুপি সেলাই করে। বন্ধু এলার সঙ্গে সে এক কামরার ঘরে থাকে। একগ্লাস দুধ আর একটা ডিম হলেই তার প্রাতরাশ হয়ে যায়। ব্লিংকার নামটা শুনে সে অবশ্য ভাবলো বানানো নাম, তবে তার কল্পনাশক্তির তারিফ করলো যে সে 'স্মিথ' এর মত সাধারণ কোন নাম বানায়নি।

তারা কোনিতে নামলো। কৌতূহলী দৃষ্টি আর সমালোচকের মন নিয়ে, মুখে কোন মন্তব্য না করে ব্লিংকার একে একে দেখে যেতে লাগলো কত সব মন্দির, প্যাগোডা আর বাগান বাড়ি। চারিদিকে ভিড় আর হৈহল্লা। যে বস্তুটি ব্লিংকারকে এক অমোঘ আকর্ষনে টানতে লাগলো, সে হোল এই সীমাহীন গন-সমুদ্র। এরা তার অপরিচিত।

তার পাশের মেয়েটির চোখে এদেরই মত হাসি। চোখে একই ঔজ্জ্বল্য, স্পষ্ট সুখের চাউনী। ব্লিংকারের মত অভিজাতদের কাছে এ ধরনের হৈ হল্লা নিম্নরুচির মনে হলেও, এরই অতলে লুকিয়ে আছে নিম্নবিত্ত জনতার আনন্দের খনি।

আটটার ফিরতি বোটটা ধরল তারা। মধুর ক্লান্তিতে অবসন্ন ছেলে মেয়ে দুটি বোটের রেলিং-এ আবাম করে ঠেস দিয়ে বসলো।

বোটটা নর্থ রিভার-এর ঘাসে ভিড়তে যাবে, এমন সময় দেখা গেল একটা বিদেশী স্টিমার তাদের দিকে ছুটে আসছে। গতিবেগ বাড়াতে গিয়ে স্টিমারটা হঠাৎ বোটের পেছন দিকের গলুই-এ জোরে ধাক্কা মারলো।

বোটটা গলুই-এর কাছে ডুবতে শুরু করেও, আবার একটু একটু করে সোজা হতে লাগলো। ডেকের ওপর গড়াগড়ি খেয়ে আতঙ্কে চীৎকার করছে যাত্রীরা। ফ্লোরেন্সের হাত ধরে স্থির হয়ে আছে ব্লিংকার। একটুও ভয় করছে না, পাশেই আরেক সাহসিনী ফ্লোরেন্স, সে আবার এরই মধ্যে গান গাইছে গুনগুনিয়ে।

দু হাত দিয়ে ফ্লোরেন্সকে জড়িয়ে ধরে ব্লিংকার বললো—ফ্লোরেন্স, আমি তোমাকে ভালবাসি।

—একথা সবাই বলে।

—তোমার মত একজনকেই আমি সারাজীবন খুঁজছি। তোমাকে নিয়ে সারাজীবন কাটাতে পারি আমি। আমার টাকাপয়সার অভাব নেই, কোন কষ্ট পেতে দেবো না তোমাকে।

—একথাও সবাই বারবার বলে। তোমারই মত লোকরা। যাদের সঙ্গে আমার কখনো নৌকোয়, কখনো পার্কে দেখা হয়েছে। আমি মানুষকে ভালই চিনতে পারি। বুঝতে পারি, কে তাজা হয়ে উঠতে চায়।

—এই তাজা হওয়ার ব্যাপারটা কি?

—যে আমাকে চুমো খেতে চেষ্টা করবে। অবশ্য আমি সবাইকে দিই না। কাউকে কাউকে, কিন্তু এতে দোষটা কোথায়?

ব্লিংকার হিংস্র গলায় বললো—সবটাই দোষের। তুমি যেখানে থাকো, সেখানে সঙ্গী সাথীদের ডাকো না কেন?

—আমি থাকি সুরকি গলিতে। সেখানে কাউকে নিয়ে তোলা যায় না। কিন্তু একটা মেয়ের তো পুরুষসঙ্গীর দরকার, নয় কি? তাহলে পথে দাঁড়ানো ছাড়া আর কি করতে পারি? প্রথম যেদিন একটি লোক পথে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল, ভয় পেয়েছিলাম, ছুটে বাড়ি এসে কেঁদেছিলাম সারা রাত। এখন সব সয়ে গেছে। এমনকি গির্জায় কত ভাল মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। যদি আমার একটা বসার ঘর থাকত, তাহলে তো আপনাকেও সেখানে নিয়ে যেতে পারতাম মিঃ ব্লিংকার, তাই না।

বোটটা অবশেষে নিরাপদ ঘাটে ভিড়ল। পথে নেমে খানিকক্ষণ একসঙ্গে হাঁটলো তারা, তার পর দুজনের পথ ভিন্ন হয়ে গেল।

টাক্সির জানলা দিয়ে একটা বড় গির্জা দেখা গেল। ব্লিংকার আপন মনেই সেদিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠলো—গত সপ্তাহেই আমি একহাজার টাকা দিয়েছি গির্জায়। আর সেই মেয়ে কিনা ওখানেও সকলের সঙ্গে মোলাকাত করে। এটা অন্যায়, এটা বেশ অন্যায়।

পরদিন উকিলের দেওয়া কলমে ত্রিশবার নাম সই করে ব্লিংকার বলল,—এবার আমাকে রেহাই দিন। উকিল ওল্ডপোর্ট বললেন, তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, বেড়িয়ে এলেই ভালই লাগবে। এখন মন দিয়ে শোন। কতগুলি পাকা বাড়ী আছে, সংখ্যায় পনেরোটা হবে, তার পাঁচটা বাড়ীর জন্য নতুন করে পাঁচবছরের লীজ সই করতে হবে। তোমার বাবা লীজের নতুন সর্ত হিসেবে ভেবেছিলেন। এই বাড়ীর বসবার ঘরগুলো ভাড়া দেওয়া যাবে না, যাতে আবাসিকরা দরকারে সেগুলি ব্যবহার করতে পারে। প্রধানতঃ খেটে খাওয়া মেয়েরাই এই ঘরে থাকে। বসার ঘরের অভাবে এই সব মেয়েদের বাইরে গিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে মিশতে হয়। এই সব লাল ইঁটের বাড়ি—

বেসুরে অট্টহাসিতে উকিলের কথায় বাধা দিল ব্লিংকার।

—সুরকি গলির বাড়ী? আর তার মালিক আমি, এই তো?

—ভাড়াটেরা জায়গাটার ওরকমই নাম দিয়েছে শুনেছি।

কর্কশ গলায় বলে উঠলো ব্লিংকার ঃ

—ও বাড়ী নিয়ে আপনি যা খুশি করুন, নতুন করে তৈরী করুন, ভেঙ্গে মাটিতে মিশিয়ে দিন, আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু কি জানেন দেরী হয়ে গেছে, বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

* Brickdust Row

অভাবনীয় অপহরণ

লটারীর ব্যবসা করতে গিয়ে আমি আর কালিগুলা পোল্ক ফেঁসে গেলাম। পুলিশের ভয়ে মেক্সিকো থেকে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে আসতে হোলো আমাদের। কিভাবে যে জর্জিয়ার মাউন্ট ভ্যালিতে পৌঁছালাম নিজেরাই স্মরণ করতে পারছি না। তবে, যে হোটেলে উঠেছিলাম, প্রাতরাশ হিসেবে যে খাবার আমাদের দেওয়া হয়েছিল, তা যে মুখে দেবার অযোগ্য এবং পেট ভরানোর পক্ষেও অপ্রতুল, এ কথাটা মনে আছে।

আমাদের সম্ভাব্য শিকারের দেখা ভাগ্যক্রমে একটু পরেই পেয়ে গেলাম। হোটেল মালিকের কাছে শুনলাম এই ভদ্রলোকের নাম কর্ণেল জ্যাকসন. টি. রকিংহাম। উনি সানরাইজ অ্যাণ্ড ইডেনভিল ট্যাপ রেলরোড-এর প্রেসিডেন্ট, এখানকার মেয়রও নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তিনি প্রায় হাজার একর জমির মালিক। মাউন্টেন ভ্যালিতে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব।

পরদিন ক্যালিগুলা পাহাড়ে গোপন আস্তানা তৈরীর কাজে গেল। আমি গেলাম আমাদের দুজনের সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ করে রসদ সংগ্রহে। এজন্যে আমাকে আটলান্টা যেতে হোল। এই হতচ্ছাড়া জায়গাটায় ভাল খাদ্য পানীয় পাওয়া যায় না। এদিকে রকিংহাম নিশ্চয়ই বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত তাঁকে তো আর অযত্ন করা যায় না।

অপহরণের কাজটা এমন সাবলীলভাবে হয়ে গেল, যে নিজেদেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। নির্জন রাস্তায় রকিংহামকে পাকড়াও করে, আমাদের উদ্দেশ্যটা খুলে বলতে, তিনি বাধ্য ছেলের মত আমাদের সাথে চলে এলেন।

সেদিন পাহাড়ের ওপর আমাদের শিবিরে রকিংহামকে আমরা এর রাজকীয় ডিনার খাওয়ালাম। পরিতৃপ্ত রকিংহাম আমাদের নির্দেশমত মুক্তিপণ-অংক জানিয়ে রেলরোডের ভাইস প্রেসিডেন্টকে চিঠিও লিখে দিলেন। তবে চিঠির শেষদিকে কয়েকটি বাড়তি লাইন জুড়ে দিলেন। লিখলেন, এখানে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা খুব চমৎকার। এরা দুজনেই পাকা রাঁধুনী। লাঞ্চে কি কি খেয়েছেন, পান করেছেন তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে লিখেছেন সন্ধ্যা ছটার ডিনারটা নিশ্চয়ই এর চেয়েও ভাল হবে। এসব কথা লেখার দরকারটা কি ছিল, বুঝলাম না।

যাই হোক, চিঠি পৌঁছে দিয়ে আমরা সাদা পতাকা হাতে মুক্তিপণ দাতার আসার অপেক্ষায়।

যে কোন একজন আসবে এরকমই লেখা ছিল চিঠিতে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রেসিডেন্টের ভাই, যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট, তারপর দু নম্বর ভাইস প্রেসিডেন্ট, রেল ইয়ার্ডের সুইচম্যান. ইঞ্জিনিয়ার, ফায়ারম্যান সবাই একে একে এসে হাজির। কাজের কথা এটুকুই জানা গেল

জেনারেল প্যাসেঞ্জার, এজেন্ট, মেজর টাকার রেলরোড বণ্ডের বিনিময়ে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ার কথা চালিয়ে যাচ্ছেন, যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন। কিন্তু তাদের আসল আগ্রহ দেখা গেল রকিংহামের লেখা চিঠিতে লাঞ্চের যে বিবরণ ছিল, সেই খাদ্যগুলি সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানার। যেন এখানে বনভোজন হচ্ছে।

অবশেষে মেজর টাকার এলেন। জানালেন, তিনি এতক্ষণে টাকা আদায় করতে পেরেছেন। আশ্বস্ত হয়ে আমি নিজে থেকেই সকলকে ডিনারে আহ্বান করলাম। কাজের কথা খাওয়ার পরে হবে। ডিনারের বর্ণনা আর কি দেবো। আমাদের সংগৃহীত যাবতীয় সুখাদ্য ঝড়ের মুখে কুটোর মত উড়ে গেল।

খাওয়ার পর মেজর বললেন রেলরোডের তিরিশ হাজার ডলারের বিনিময়ে তিনি সাতাশি ডলার তিরিশ সেন্ট সংগ্রহ করেছেন। আর প্রেসিডেন্টের খাসজমি নবমবার বন্ধক দিয়ে পেয়েছেন পঞ্চাশ ডলার। তিনি পকেট থেকে একশো সাঁইত্রিশ ডলার তিরিশ সেন্ট বার করে আমাদের গুনে নিতে বললেন।

আমাদের বিস্ময় বিমূঢ় দেখে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন—ভদ্রমহোদয়গণ, রেলরোডটা মাত্র দশ মাইল লম্বা। যখন জঙ্গল থেকে বাষ্প তৈরী করার উপযুক্ত জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, তখনই কেবল ওটা চলে। এ পর্যন্ত সপ্তাহে আঠেরো ডলারই সর্বোচ্চ উপার্জন, তাও সেটা অনেক বছর আগে, যখন সময়টা ভাল ছিল, তখনকার কথা।

—আর জমি?

—কর্ণেল এর জমি ট্যাক্স বাকি পড়ার জন্য তেরো দফায় বিক্রী করা হয়েছে। জর্জিয়ার এই প্রান্তে গত দুবছর একটাও পীচ ফল হয়নি। বর্ষায় তরমুজের ফলন নষ্ট হয়ে গেছে। সার কেনার মত টাকাও কারো কাছে নেই, তাই জমি বন্ধ্যা হয়ে গেছে। খরগোশের খাবার মত ঘাসও নেই কোথাও। এক বছরের ওপর এখানকার লোক শুধু শূকরের মাংস আর অন্যান্য অখাদ্য খেয়ে বেঁচে আছে।

যাক্ আমাদের দিকে তাকালো—এ দু'পয়সা নিয়ে আমাদের কি হবে?

টাকাটা মেজর টাকারকে ফিরিয়ে দিলাম। তারপর কর্ণেলের কাছে গিয়ে তাঁর পিঠ চাপড়ে বললাম—খেলাটা ভালই জমেছিল কি বলেন। আসলে আমরা দুজনেই বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। সময় কাটানোর জন্যে এই মজার খেলাটা খেললাম আপনার সঙ্গে। যাইহোক এখনও দুবোতল ভাল পানীয় মজুত। সেটা শেষ করে নেওয়া যাক। তারপরেই আমরা যে যার রাস্তা দেখবো।

পানীয়ের মাত্রা চড়ে যাবার পর সে রাতে নাচ গান যা জমেছিল, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। হ্যাঁ আমরা সবাই নেচেছিলাম।

* Hostages to Momus

সেয়ানে সেয়ানে

পূর্বা এক্সপ্রেসে ধূমপানের কামরায় হঠাৎ জেফ-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ধূমপান তার অন্যতম দুর্বলতা, তাই তার কাছ থেকে গল্প বার করবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গেই পর পর দুটো ভাল সিগার দিলাম তাকে।

বরফ গললো। শুরু হোল জেফের অনন্য এক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। একে অবশ্য অদম্য জেফ এর অভাবনীয় পরাজয়ের স্বাক্ষরই আছে।

আপনারা জানেন আইনের লম্বা হাত বাঁচিয়ে বেআইনী কাজে জেফ্ এর জুড়ি নেই। তবে একা সব কাজ করা যায় না। নাটক জমানোর জন্য জেফ এবার সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করে নিয়েছিল এক গ্রাম্য যুবক রুফ ট্যাটাকে। ট্যাটামের একমাত্র পেশা ও নেশা হচ্ছে শূকরছানা চুরি করা।

যাইহোক, তাকে নিয়ে ট্রেনে আসতে আসতেই আমার ব্যবসার বিশেষ নীতি নিয়মগুলো শিখিয়ে দিলাম তাকে, বললো জেফ। পরদিন সীমান্তের একটা ছোট শহরে নেমে দেখি সেখানে একটা সার্কাসের দল এসেছে। এই মেলার ভীড়ে আমার ব্যবসাও জমবে ভাল, এই মনে করে সার্কাসের কাছেই মিসেস পিভির বাড়ীতে দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে নিলাম।

পরদিন ট্যাটামকে বুঝিয়ে বললাম, সার্কাসের দর্শকদের জন্য আমি একটা নিতান্ত নির্দোষ জুয়োর আড্ডা বসাবো, সেখানে খেলুড়েদের দলে মিশে থেকে সে'ও খেলবে, এবং জিতবে। জেতার নিয়মটাও তাকে শিখিয়ে দিলাম, তার জেতা দেখেই তো অন্যরা প্রলুব্ধ হবে। কিন্তু আসল কাজের সময় কিছু লোক খেললো বটে, কিন্তু ট্যাটাম আমার কিনে দেওয়া বাহারী পোষাক পরে কোথায় যে ঘুরে বেড়ালো, তার টিকিও দেখতে পেলাম না।

ঘরে ফিরে রাত্রে সবে ঘুমটা এসেছে, এমন সময় একটা কান-ফাটানো, মনে হোলো শিশুর, তীক্ষ্ণ চীৎকারে চট্‌কা ভেঙে গেল। ভীষন রেগে বাড়ীওয়ালীকে ডেকে বললাম তাঁর বাচ্চাকে তিনি যেন একটু চুপ করান, এভাবে বিশ্রাম করা অসম্ভব। গৃহকর্ত্রীও সমান উত্তপ্ত হয়ে জানালেন, তাঁর শিশুর কান্না নয়, মিঃ ট্যাটাম সন্ধ্যেবেলা যে শূকর ছানাটিকে নিয়ে এসেছেন, সেটাই চেঁচাচ্ছে। আমারই উচিত সে চীৎকার থামানো, কেননা ট্যাটামকে আমিই এনেছি।

ট্যাটামের ঘরে গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড। একটা ছোট্ট শূকর শাবককে প্লেটে করে দুধ খাওয়াচ্ছে সে। একগাল হেসে জানালো, অরক্ষিত শূকরছানা দেখলেই তার হাত নিসপিস করে চুরি করার জন্য। কি বলা যায় একে? ওটাকে বিদেয় করতে বলায় সে জানালো সে ওটাকে গ্রামে তার মায়ের কাছে রেখে আসবে।

যা খুশী করুকগে। আমি ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে কাগজ খুলেই একটা বিজ্ঞাপনে চোখটা আটকে গেল। সার্কাস কোম্পানীর মালিক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁর তাঁবু থেকে একটি শিক্ষিত শূকরছানা গতকাল সন্ধ্যায় নিখোঁজ হয়েছে। যদি কেউ চুরিও করে থাকে, ফেরৎ দিলে তার কোনও শাস্তিতো হবেই না, উপরন্তু পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার পাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

একলাফে ট্যাটামের ঘরে গিয়ে দেখি, সে ছানাটিকে দু'পায়ে হাঁটতে শেখাচ্ছে। আমি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছানাটা ছেড়ে দিতে, বা দরকার হলে ভাল দামে কিনে নিতেও চাইলাম। সে রাজী নয়, প্রায় একশো লোকের সামনে সে ছানাটাকে সার্কাসের তাঁবু থেকে তুলে এনেছে, নিজের কৃতিত্বের এই নিদর্শণকে সে ভবিষ্যতে ছেলেপুলে নাতি-নাতনীদের দেখাতে চায়।

তাকে জানালাম এই নিদর্শনটির অতদিন বাঁচার কোনও সম্ভাবনাই নেই, কাজেই দশ ডলারে ওটা আমাকে বিক্রী করে দেওয়াই তার পক্ষে ভাল হবে। মানতেই চায় না, ওটার ওপর নাকি ওর খুব মায়া পড়ে গেছে। যাইহোক শেষে আটশো ডলার দিয়ে তার সেন্টিমেন্টের ওপর মলম লাগিয়ে ছানাটিকে নিয়ে সার্কাসের মালিকের কাছে গিয়ে পাঁচহাজার ডলার দাবী করলাম।

মালিক তো আকাশ থেকে পড়লো, তখন ভেতরে নিয়ে গিয়ে তাদের কালো কুচকুচে শিক্ষিত শূকরটিকে চাক্ষুস দেখিয়ে দিল। কাগজের বিজ্ঞাপনটা দেখাতে, বললো এটা জাল। এরকম কোন বিজ্ঞাপন তারা দেয়নি।

সত্যিই তো, দেবার কোন কারণও তো নেই। এতক্ষণে আমার মাথার ধোঁয়াশাটা কেটে গেল। ট্যাটামের শয়তানীটা বুঝতে পারলাম। তবুও খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে চেহারার বর্ণনা শুনে বুঝতে পারলাম ট্যাটামই এসেছিল বিজ্ঞাপনটি দিতে।

প্রায় এক নিঃশ্বাসে গল্পটা বলে জেফ দম নিতেই আমি তাকে উস্‌কে দিলাম, —দোষটা তোমারও জেফ্, তুমিও তাকে ঠকাতে চেয়েছিলে, তাব চেয়ে তার সঙ্গে পুরস্কারের পাঁচহাজার ডলার ভাগাভাগি করে নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া উচিত ছিল তোমার।

—মোটেই না। ব্যবসার নিয়ম মেনে চলি আমি। কমদামে জিনিষ কিনে বেশি দামে বিক্রি করা, এটাই কি ব্যবসার নিয়ম নয়? তোমাদের শেয়ার বাজারে কি এটাই হয় না।

* The Ethics of Pig

নিতান্তই ব্যবসায়িক

রঙ্গমঞ্চ এবং তার অভিনেতা অভিনেত্রীদের হাঁড়ির খবর রাখেন বলে ভাবছেন তো? কিন্তু শুনে রাখুন, সত্যিই সব ভেতরের কথা যদি জানতেন, তাহালে শিল্পের এই ক্ষেত্রটিতে এতদিন তিলধারনের জায়গা থাকতো না।

সংক্ষেপে গল্পটা বলি। বব হার্ট আর চেরী নামে দু'জনে অভিনেতা অভিনেত্রীর গল্প। এরা দুজনেই দুটি ভিন্ন ভ্রাম্যমান নাট্যদলে ছোট ছোট টুকরো অভিনয় করতো। এতে আয়ও কম, মনও ভরেনা। কিন্তু দুজনেরই প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষ। বব হার্ট স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতে লং আইল্যাণ্ডে বিরাট বাংলোর মালিক হয়ে জাপানী রাঁধুনীর হাতের রান্না খেয়ে আয়েস করে একা দিন কাটাবে। আর চেরী কেবল টাকা জমাতে চায়, এর মধ্যেই বিভিন্ন ব্যাঙ্কে সে একটু একটু করে টাকা জমিয়ে যাচ্ছে। এখন কৃচ্ছসাধন করে ভবিষ্যতের রাস্তা নির্বিঘ্নে আরামে কাটাতে চায় সে।

এদের দুজনের প্রথম সাক্ষাতেই এইসব কথা হয়ে গিয়েছিল তাদের। একান্ত ব্যবসায়িক সম্পর্ক নিয়েই তারা একসঙ্গে হার্ট-এর লেখা একটি নাটকে অভিনয় করবে।

নাটকটিতে সমভাবনা আছে একথা স্বীকার করে নিয়ে চেরী তার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বাস্তাববাদিতা প্রয়োগ করে নাটকটিতে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে নিল।

প্রথম অভিনয় রজনীতেই নাটকটি দর্শকদের মন কেড়ে নিল। অভিনয় শেষে হতেই হাতে খোলা চেকবই আর কলম নিয়ে বুকিং এজেন্টদের ভিড় লেগে গেল। সপ্তাহে চারশো ডলারের চুক্তিতে সই করলো তারা।

সেদিন রাতে চেরীকে তার বোর্ডিং হাউসের দরজার কাছে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিচ্ছিল হার্ট। চেরী অনেক্ষণ ধরেই আনমনা হয়ে কি যেন ভাবছিল। হার্ট বিদায় জানাতে যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তাকে ঘরের ভেতর আসতে বললো। তাদের একান্ত ব্যবসায়িক সম্পর্কের মধ্যে এরকম ঘটনা এত দীর্ঘ দিনের মহলা চলকালীন কখনও ঘটেনি। আজ চেরীর কি হোলো?

চেরী গম্ভীর ভাবে বললো, ভেতরে এসো। এখন আমরা অনেক বেশি টাকা জমানোর সুযোগ পেয়েছি। কি করে কমিয়ে জমা টাকার অংকটা আরো তাড়াতাড়ি বাড়ানো যায়, সেই পরামর্শই করবো তোমার সঙ্গে।

নিউইয়র্কে সাফল্যের সঙ্গে বেশ কয়েক সপ্তাহ অভিনয় হোল চেরী ও হার্টের রোমাঞ্চকর নাটক "ইঁদুররা খেলবে"। তারপর নাটকের দল নিয়ে তারা এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে বেড়াল। এভাবে প্রায় দুবছর কেটে যাবার পর নিউইর্য়কে দ্বিতীয়বারের মত যবনিকা তুললো "ইঁদুরেরা খেলবে"। আর তার প্রথম দিনেই ঘটে গেল এক অঘটন।

নাটকের শেষ দৃশ্যে কাজ ছিল ববের পাশে টেবিলে রাখা একটি ছবিতে গুলি করবে সে, আসলে পিস্তলের আসল গুলি। সেই গুলি ছবি ভেদ করে দেওয়ালে লুকোনো একটি প্যানেলে আঘাত করবে, আর সেই আঘাতে ছাদের সিলিং-এর একটা অংশ খুলে যাবে আর যে টাকাকে কেন্দ্র করে নাটকের সংঘাত, সেই টাকা পয়সা হীরে, মুক্তো ঝরঝর করে ঝরে পড়বে। এই দৃশ্যটিতে দর্শক হাততালিতে ফেটে পড়ে।

কিন্তু আজ চেরীকে একটু নার্ভাস দেখাচ্ছিল। গুলি ছোঁড়ার দৃশ্যে সে পিস্তল চালালো বটে, কিন্তু ছবির ফ্রেমে লাগার বদলে হার্ট-এর গলায় লাগলো। হার্ট-এর কোন সংলাপ মন পড়লো না, কাটা কলাগাছের মত সে সটান মাটিতে পড়ে গেল।

দর্শক অবশ্য এটা নাটকের নতুন চমকে মনে করে হর্ষধ্বনি করে উঠলো। মঞ্চের সহযোগীরা অবশ্য ব্যাপরটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে তাড়াতড়ি পর্দা ফেলে দিয়ে মঞ্চের দরজার কাছ থেকে একজন তরুন ডাক্তারকে পেয়ে গিয়ে যেন হাতে চাঁদ পেলো।

ডাক্তার হার্টকে বেশ নেড়ে চেড়ে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। —খুব বেঁচে গেছেন মশাই, গুলিটা শুধু একটু ছুঁয়ে গেছে, আর দুইঞ্চি এপাশ দিয়ে গেলেই হয়েছিল আর কি। ক্ষতটা তেমন গভীর নয়, একটু ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে দিলেই হবে।

ডাক্তার চলে যাবার পর একটু ধাতস্থ হয়ে শুয়েছিল হার্ট। বন্ধু ও সহকর্মী ভিনসেন্ট উদ্বিগ্ন মুখে ঢুকলো,

—ভগবানের অসীম করুণা হার্ট, তোমার বেশি আঘাত লাগে নি। মহিলাটিকে তো সামলানো যাচ্ছে না।

অবাক হোল হার্ট—কোন মহিলা?

—মিস চেরী, আবার কে? সেই থেকে কেঁদে যাচ্ছে, তিন চারজন মিলে ধরে রাখতে পারছে না, কেবলই তোমায় দেখতে চাইছে।

—আরে এটা তো দুর্ঘটনা, ওর কোন দোষ নেই। ওকে চিন্তা করতে বারণ করো। আর ডাক্তার বলেছে, দিন তিনেক আরাম করলেই আমি আবার অভিনয় করতে পারবো, কাজেই এ সপ্তাহের টাকাটা সে পাবেই।

—তুমি কি মানুষ না রোবট? টাকার শোকে কাঁদছে না সে। মেয়েটা যে তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে, একথা বাকি সবাই জেনে ফেললেও তোমার নিরেট মাথায় এখনও ঢোকেনি?

লাফিয়ে উঠলো হার্ট। —ভালবাসে আমাকে? চেরী? ওঃ বড্ড দেরী হয়ে গেছে, দেরী হয়ে গেছে।

—কিসের দেরী। কিসের দেরী হার্ট?

—আরো দুবছর আগেই তো আমার আর চেরীর বিয়ে হয়েছে। প্রেমে পড়ার পক্ষে একটু দেরী হয়ে গেল না।

* Strictly Business

ফিরে আসা সকাল

ইস্টারের ছবি আঁকতে গিয়ে বহু শিল্পীকেই পেনসিল কামড়াতে দেখেছি। মাত্র চারটি বিষয় নিয়েই আঁকতে হয় তাকে, কোনও নতুনত্ব দেখবার অবকাশ নেই।

প্রথম ছবিটি বসন্তের দেবী ইস্টারের. দ্বিতীয়টি লিলি ফুলের বেষ্টনীর মধ্যে মলিন মুখের এক রমনী, তৃতীয়টি মিস ম্যানহাটনের ইস্টার রবিবারের মিছিলে হেঁটে যাওয়ার, চতুর্থটি গ্রাণ্ড স্ট্রীটে মিস মার্ফির নতুন পালক লাগানো টুপি পরা আত্মসচেতন প্রসন্ন মুখ।

এই ইস্টারের উৎসবটির মর্ম কি বোঝা দায়। তবে, আমরা আজকের গল্পের নায়ক ড্যানী ম্যাকিক্রিকে অনুসরন করে তার চোখ দিয়ে ইস্টারের ছুটিকে দেখার চেষ্টা করি।

আজ ইস্টারের রবিবার। ছুটির দিনের প্রথমত সকাল সাড়ে দশটায় ঘুম থেকে উঠে ড্যানি রান্নাঘরে হাত মুখ ধুতে গেল। মা রান্নাঘরে জলখাবাব তৈরীতে ব্যস্ত। বাবা অত্যন্ত

কর্মঠ পুরুষ ছিলেন, কিন্তু দুবছর হোলো এক দুর্ঘটনায় চোখদুটি হারিয়ে সারাদিন জানলার ধারে হাতে পাইপ নিয়ে বসে থাকেন। কাঠখোট্টা জোয়ান ড্যানীকে দেখে তার মায়ের স্বামীর যৌবনের দিনগুলোকে মনে পড়ে যায়।

মা বলেন, আজ ইস্টার। ড্যানি তার উত্তরে শুধু ডিমটা ভেজে দিতে বলে।

প্রাতরাশের পর ড্যানি বাইরে বেরোবার উদ্যোগ করছে, কি করে যেন টের পেয়ে যান অন্ধ ম্যাকক্রি।

—আজ তুমি নিশ্চয়ই বেড়াতে যাচ্ছো ড্যানি? আজ নাকি ছুটির দিন, সবাই বলছিল, বাতাসের ঘ্রাণে মনে হচ্ছে আজ বসন্তের সুন্দর সকাল।

গজ গজ করে উঠলো ড্যানী।

—আমার কি এখন বাড়ীতে থাকা উচিত নাকি। একটা ঘোড়ারও তো সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম দরকার হয়। বলি, এবাড়ির ভাড়া, খাবারের দাম, এসব কার রোজগার থেকে হয় শুনি?

—না, না, আমার কোনও নালিশ নেই বাবা। যখন চোখ ছিল, এই রবিবারের সকালে বাইরে বেরোতে আমারও খুব ভাল লাগতো। শুধু মাঝে মাঝে ভাবি, তোমার মা যদি লেখাপড়া জানতেন, জলহস্তীর গল্পের শেষটা শুনতে পেতাম।

ড্যানি রান্নাঘরে এসে মাকে ধরলো—বাবা ওসব জলহস্তিটস্তী কি বলছে। তুমি কি ওকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে গিয়েছিলে নাকি।

—না, না, তা কেন নিয়ে যাবো? সারাদিন জানলার ধারে বসে থাকে তো, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় তোর বাবার চিন্তাগুলো কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে, সেদিন গ্রিজ গ্রিজ করে প্রায় একঘন্টা বকবক করলো। আমি ভাবলাম, রান্নাঘরে বুঝি তেল পোড়া গন্ধ বেরোচ্ছে, এসে দেখি তা নয়। কি বলতে চায় বুঝতে পারিনা সবসময়। অন্ধ গরীব মানুষদের কাছে এই ছুটির দিনগুলো বোধহয় আরো অসহ্য লাগে। তুমি যাও বাবা, একটু ঘুরে এসো। ছটার সময় খাবার তৈরী থাকবে।

বাড়ী থেকে বেরোবার মুখে দারোয়ানের সঙ্গে দেখা হোল ড্যানীর। তাকে জিগ্যেস করেও জানা গেল জলহস্তী সংক্রান্ত কোন খবর সে জানে না, রাস্তার মোড়ে পুলিশ কারিগাণের সঙ্গে দেখা, তার সঙ্গে ইস্টারের তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু কথা হোল। কথা প্রসঙ্গে ড্যানী তাকে জিগ্যেস করলো মাতাল না হয়ে কেউ কখনো তার কাছে জলহস্তী সম্বন্ধে কোনও অভিযোগ করেছে কিনা।

—না, না, বড়জোর সমুদ্রের কচ্ছপের কথা বলেছে শুনেছি, তবে তার পেটে কিছুটা পানীয় ছিলই।

কেটি ক্যালনের বাড়ী থেকে একটু দূরেই কেটির সঙ্গে দেখা। চার্চে যাচ্ছে সে। ড্যানীর সঙ্গে যাবে বলেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। ড্যানীকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। কেটি অনুযোগ করলো, তার পোশাক ও নতুন টুপিটা সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত ছিল ড্যানীর।

চার্চের প্রার্থনাতেও মন দিতে পারছিল না ড্যানী। মনের মধ্যে কি একটা কাঁটা বিঁধে আছে। বুধবার সন্ধ্যেবেলা কেটির সঙ্গে দেখা করবে কথা দিয়ে বাড়ীর পথ ধরলো সে।

গত একবছর কেটির আকর্ষণে মজে আছে সে, অথচ আজ অন্য একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি তার অন্তরের অন্তঃস্থলে গোপনে জেগে উঠেছে, সেটিকে ধরতে ছুঁতে পারছে না, কিন্তু বুঝতে পারছে ইস্টারের মতই পবিত্র অনুভূতি সেটা। নারীর প্রেমের চাইতেও বড় কিছু।

হঠাৎ বিদ্যুতচমকের মত তার মাথায় খেলে গেল—জলহস্তী! বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা কি।

রাস্তা পার হয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে গেল সে। বুড়ো ম্যাকক্রি তেমনই পাইপ কোলে নিয়ে জানালার ধারে বসে আছেন। ছেলের পায়ের শব্দে মুখ ফেরালেন।

—খোকা এলে নাকি?

যথারীতি রেগে উঠলো ড্যানী।

—বাড়ীর ভাড়া আর খাবারের দাম কে জোগায় এখানে? আমি নয়কি? আমার কি বাড়ীতে আসার অধিকার নেই নাকি?

—খুব বিশ্বস্ত ছেলে তুমি বাবা। একটা দীর্ঘ নিঃশব্দে ফেললেন ম্যাকক্রি,—সন্ধ্যে কি হয়ে গেছে?

ড্যানী উত্তর না দিয়ে তাক থেকে গ্রীসের ইতিহাস বইটা নামালো। তার ওপর একবছরের ধুলো জমে আছে। টেবিলের ওপর বইটা রেখে, পাতা দিয়ে চিহ্নিত করা অংশটা খুললো সে, তারপর গলা ঝেড়ে নিয়ে জিগ্যেস করলো—তুমি জলহস্তী সম্বন্ধে শুনতে চেয়েছিলে?

ম্যাকক্রি ঘুরে বসলেন।

—আমি কি বই নামানোর আওয়াজ শুনলাম। অনেক দিন হয়ে গেল তুমি পড়ে শোনাওনি। গ্রীকদের কথা শুনতে খুব ভাল লাগতো আমার। কিন্তু আজ উৎসবের দিন। সন্ধ্যেটাও নিশ্চয়ই মনোরম। তুমি একটু বাইরে ঘুরে এসো বাবা। সারা সপ্তাহে হাড়ভাঙা খাটুনীর পর—

—জলহস্তী বা হিপোপটেমস্ নয়, আমরা পেল-পেলোপনেসাস পর্যন্ত পড়েছিলাম। সেখানে তিরিশ বছর ধরে যুদ্ধ হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব তিনশো আটত্রিশে গ্রীসের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ম্যাসিডনের ফিলিপ। আমি পড়ে শোনাচ্ছি।

কানের পাশে হাত দিয়ে প্রায় একঘন্টা ধরে বুড়ো ম্যাকক্রি পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধের গল্পে ডুবে গেলেন।

তারপর উঠে গেলেন রান্নাঘরের দরজার কাছে। ড্যানীর মা খাবার তৈরী করতে করতে মুখ তুলে দেখলেন বৃদ্ধের দুচোখে জলের ধারা, —তুমি শুনেছো, আমাদের ছেলে আমাকে বই পড়ে শোনাচ্ছে? ওর মতো ছেলে আর কারো নেই মনে হচ্ছে, আমার দৃষ্টি যেন ফিরে পেয়েছি।

খাওয়ার পর ড্যানীর বাবা বললেন—আজ ইস্টার। সত্যিই আনন্দের দিন। তুমি এখন কেটির কাছে যাবে তো? যাও, ঘুরে এসো।

গর্জে উঠলো ড্যানী।

—এ বাড়ীর ভাড়া আর খাবারের দাম কে মেটায় শুনি? আমার কি বাড়ীতে থাকার অধিকার নেই নাকি? খাবার পরে খৃষ্টপূর্ব একশো ছেচল্লিশ অব্দে করিন্থ যুদ্ধের কথা পড়বো আমরা। যে যুদ্ধের পরে ঐ রাজা রোম সাম্রাজ্যের আওতায় চলে এলো। আমি কি এবাড়ীর কেউ নই নাকি?

* The Day Resurgent

জীবনটাই প্রহসন

সাংবাদিক বন্ধুটির বদান্যতায় তার সঙ্গে নাট্যমন্দিরে প্রবেশের সুযোগ প্রায়ই ঘটে। সেদিনও গিয়েছিলাম একজন বেহালা বাদকের বাজনা শুনতে।

সংগীতের প্রতি তেমন গভীর আকর্ষণ না থাকলেও চল্লিশোর্ধ কাঁচাপাকা চুলের যে মানুষটি তন্ময় হয়ে বাজনা বাজাচ্ছিলেন তাঁকেই মন দিয়ে দেখছিলাম।

বাইরে বেরিয়ে বন্ধু বললো, ঐ বেহালাবাদককে নিয়ে একটা মজার গল্প লেখার বাসনা নিয়ে ওঁর সম্বন্ধে সব খোঁজ খবর নিয়েছিলাম। কিন্তু সে জীবনকাহিনীতে হাসির খোরাক নেই। তুমি দেখো চেষ্টা করে, যদি এ গল্প থেকে একটা তিন অঙ্কের বিষাদ নাটক বার করতে পারো।

তার কাছে শুনলাম, অ্যাবিংটন স্কোয়ারে একটা দোতলা বাড়ীর একতলায় ছিল মিসেস মেয়োর মুদীখানার দোকান, দোতলায় মেয়ে হেলেনকে নিয়ে থাকতেন তিনি।

এই হেলেনের বিয়ের দিন ঘটলো এক সাংঘাতিক ঘটনা। ফ্র্যাংক বেরি আর জন ডিলানি, দুজনেই প্রেমে পড়েছিল হেলেনের। সুন্দরী হেলেন ফ্র্যাংককেই পতিত্বে বরণ করে নিল। তাদের বিয়ের প্রধান সাক্ষী ছিল জন ডিলানি। বোঝা গেল প্রেমের দ্বৈরথে পরাজয়ের গ্লানি সে কাটিয়ে উঠেছে।

রেজিস্ট্রার চলে যাবার পর হেলেন ওপরে তার ঘরে টুকিটাকি কাজ সেরে নিচ্ছিল, এখনি মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্যে রওনা দেবে সে ও ফ্র্যাংক। এমন সময় হঠাৎ জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকলো জন ডিলানি। হেলেনের সত্যি সত্যি বিয়ে হয়ে যেতে দেখে নিজেকে সামলাতে পারেনি সে। বুঝতে পেরেছে হেলেনকে ছাড়া বাঁচবে না সে। এই মুহূর্তে হেলেন তার সঙ্গে পালিয়ে চলুক। পুরোনো বন্ধুর কাছ থেকে এ ধরনের অপ্রত্যাশিত ব্যবহার পেয়ে রাগে আগুন হয়ে গেল হেলেন। কোনও বিবাহিত ভদ্রমহিলাকে এ ধরনের কথা বলার সাহস কোথা থেকে পেলো জন?

হেলেনের রুদ্রমূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেল জন। সে ক্ষমা চেয়ে নিল বারবার। প্রতিজ্ঞা করলো জীবনে আর হেলেনকে মুখ দেখাবে না সে, চলে যাবে সুদুর আফ্রিকায় বা অন্য কোনও দূর দেশে।

হেলেনের পেলব হাতে শেষ বারের মত চুম্বন করে বিদায় নিচ্ছিল জন, এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকলো স্বয়ং ফ্র্যাংক। নিচে অতিথিদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিল সে।

ঘরে ঢুকেই দৃশ্যটা দেখে নিমেষে পায়ের তলার মাটি সরে গেল ফ্র্যাংকের। জানলা গলে বেরিয়ে যাওয়া জনকে ধরতে উদ্যত হোলো সে। পুরো ব্যাপারটাই সে ভুল বুঝেছে আন্দাজ করে হেলেন তাকে জড়িয়ে ধরে আসলে কি ঘটেছিল বোঝাতে চাইল। ফ্র্যাংকের

কানে কোনও কথাই ঢুকলো না, এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে ঝড়ের মত হতভম্ব অতিথিদের সামনে দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল সে। আর কখনো হেলেনের সঙ্গে দেখা হয়নি তার।

এরপর কেটে গেছে কুড়িটা বছর। মায়ের কাছ থেকে দোকান আর বাড়িটা পেয়েছে হেলেন, আজ আটত্রিশ বছরে পৌছে সে একেবারে একা। খুব দক্ষতার সঙ্গে দোকান চালাচ্ছে সে। তার মধুর ব্যবহার আর সততার প্রশংসা সর্বত্র। খদ্দেরদের মধ্যে কেউ কেউ তার পাণিপ্রার্থীও হয়ে এসেছে। কিন্তু সবিণয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে সে। মনে মনে দুঃখ পেতো, একজন ভালো খদ্দের হারানোর জন্য।

ব্যবসায় একটু মন্দা যাচ্ছিল, হেলেন ঠিক করলো বাড়ীর বাড়তি ঘরগুলোতে ভাড়াটে রাখবে। ভাড়াটেরা একজন দুজন করে এসে থাকতে লাগলো। সময় শেষ হলে চলে যাবার সময় তারা দুঃখই পেত। মিসেস হেলেন বেরির ব্যবহার যেমন সুমধুর, তাঁর বাড়ীঘরও তেমনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক।

নিজের বসার ঘরে বসে কাজের শেষে নানারকম অপ্রয়োজনীয় টুকিটাকি সেলাই নিয়ে সময় কাটাতো হেলেন। সে সময় প্রায়ই দুজন ভাড়াটে তার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, একজন হলেন বেহালাবাদক রামন্টি। তিনি হেলেনকে প্যারিসে, যেখানে তিনি বাজনা শিখেছেন, সেখানকার কথা বলতেন। এই শান্ত, স্থিতধী মানুষটির কথা শুনতে ভাল লাগতো হেলেনের। নিঃস্তব্ধ সন্ধ্যায় তার বেহালায় কেমন মন-কেমন করা সুর বেজে উঠতো, শুনে মুগ্ধ হোত সে।

অন্যজন সুপুরুষ, চল্লিশের ঘরে বয়েস, তার বিষণ্ণ চোখে ব্যাকুল আর্তি। একে দেখে মনে মনে চঞ্চল হয় হেলেন। তার স্থির বিশ্বাস হয়, এই তার হারিয়ে যাওয়া ফ্র্যাংক, তার গলার স্বরে যেন নিজের যৌবনের দিনগুলো মনে পড়ে যায় হেলেনের। আর তার চোখে যেন পুরোনো ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার মিনতি। কিন্তু সে যে চিনেছে, তা প্রকাশ করতে চায় না হেলেন। কুড়ি বছর ত্যাগ করে থাকার পর কোনও স্বামীরই আশা করা উচিত নয়, স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে তাকে পুরোনো জায়গাটা ফিরিয়ে দেবে। দেখা যাক ভবিষ্যৎ কি বলে।

এক সন্ধ্যায় রামন্টি তার শিল্পী সুলভ কোমলতা আর ভালবাসার আন্তরিকতা মিশিয়ে হেলেনের পানি প্রার্থনা করতে এলো। তবে বল্‌লো, আগে তার সব কথা শুনে তবেই যেন হেলেন মন স্থির করে। সে বললো—

—আমার আপনাকে প্রথমেই বলে দেওয়া উচিৎ, এই রামন্টি নামটা ছাড়া আমার আর কোন পরিচয় জানা নেই। নামটা দিয়েছে আমার ম্যানেজার। আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কিছুই মনে নেই। আমার স্মৃতিতে আছে, আমি তরুণ বয়সে এক হাসপাতালে ছিলাম। সেখানে আমার বহুদিন কেটেছে। তার আগের অতীত আমার কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। শুনেছি আমাকে আহত অবস্থায় রাস্তা থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। আঘাতটা লেগেছিল আমার মাথায়, কোন পাথরের আঘাত। আমার পরিচয় জানার মত কোন নিদর্শন আমার কাছে পাওয়া যায়নি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর আমি বেহালা হাতে তুলে নিই, আর সফলতাও আসে। মিসেস বেরি—আমি আপনার নাম জানি না, যেদিন প্রথম আপনাকে দেখি, সেদিনই আমার মনে হয়েছিল পৃথিবীতে আপনিই একমাত্র নারী, যাকে পেলে ধন্য হবো আমি।

হেলেনের মনে হোলো সে আবার তরুণী হয়ে গেছে। রামন্টির চোখে চোখ রেখে তার হৃদয় গলে যেতে লাগলো, তবু কষ্টে নিজেকে সংযত করে সে বললো—

—মিঃ রামন্টি, আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। কিন্তু আমি যে বিবাহিতা।

তাকে সব কথা খুলে বললো হেলেন, কিছুই লুকোলো না।

রামন্টি স্থির হয়ে শুনলো সব কথা, তারপর তার হাতে চুম্বন করে অভিবাদন জানিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

বিষণ্ণ মনে চুপ করে বসে রইলো হেলেন।

ঘন্টাখানেক পরে দ্বিতীয় বোর্ডারটি এলেন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিজের ঘরে যেতে গিয়েও কি ভেবে হেলেনের ঘরে এলেন তিনি। দু'একটি শিষ্টাচারের পর তিনিও হেলেনের প্রতি নিজের প্রেম নিবেদন করলেন। তারপর বললেন,

—হেলেন, তুমি কি আমাকে চিনতে পারোনি। কুড়ি বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু হেলেন তোমার চোখ বলছে, তুমি আমাকে চিনেছো। আমি অন্যায় করেছি, তোমার কাছে ফিরে আসতে ভয় পেয়েছি। কিন্তু আমার প্রেম এই বিশ বছর ধরে একনিষ্ঠ আছে। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো হেলেন, তার হাত অন্যজনের দৃঢ়মুষ্ঠিতে ধরা। এটাই তো চেয়েছিল সে। কিন্তু কেন তার মন এমন দ্বিধাবিভক্তি। কেন বারবাব ওপর থেকে ভেসে আসা বেহালার সুরে কান পাততে ইচ্ছে করছে?

তাকে নিশ্চুপ দেখে আবার সে বললো।

—ক্ষমা করবে তো আমাকে?

—কুড়ি বছর অনেকটা সময়, যাকে তুমি ভালবাস বলছো, তাকে ছেড়ে থাকার পক্ষে, তাই না?

—কি করে আগে বলতাম। তোমার কাছে লুকোবো না। সেই রাত্রে আমি তাকে অনুসরণ করেছিলাম, আমি ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। একটা অন্ধকার গলিতে আমি তার মাথায় পেছন থেকে আঘাত করি। সে একটা পাথরের ওপর পড়ে যায়। আমি তাকে হত্যা করতে চাইনি হেলেন। আমি প্রেম ও ঈর্ষায় অন্ধ ছিলাম। আমি লুকিয়ে থেকে দেখেছিলাম একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে তাকে তুলে নিয়ে গেল। যদিও তুমি তাকে বিয়ে করেছিলে হেলেন, তবু—

হাত ছিনিয়ে নিয়ে বিস্ফারিত চোখে চীৎকার করে উঠলো হেলেন।

—তুমি কে। কে তুমি?

—তোমার মনে নেই হেলেন? যে তোমায় সবার চেয়ে বেশি ভালবাসতো? আমি সেই জন, জন ডিলানী। যদি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারো—

কিন্তু হেলেন একমুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালো না। সে ঝড়ের মত তীব্রবেগে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। উঠে গেল সেই সঙ্গীতের মূর্ছনার দিকে, সেই মানুষটিব কাছে, যে মানুষটা সব কিছু ভুলে গেছে। কিন্তু অতীত আর বর্তমান তার দুটো অস্তিত্বই হেলেনকে নিজের বলে চিনে নিতে ভুল করেনি। কুড়ি বছর আগেও না, এখনও না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে যেন গান গাইছিল হেলেন, তার প্রিয়তমের নাম ধরে।

—ফ্র্যাংক, ফ্র্যাংক, ফ্র্যাংক.....। সময় এই তিনটি মানুষকে নিয়ে যে খেলা করেছে, সাংবাদিক বন্ধুটি তার মধ্যে মজার খোরাক পাননি।

*The thing is the Play

স্মৃতির ছলনা

প্রতিদিনকার মত সকালে স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় নতুন কিছুই ঘটেনি। আধখাওয়া চা ফেলে রেখে সে আমার সঙ্গে দরজার কাছে এলো, আমার কোট থেকে অদৃশ্য ধূলিকণা ঝেড়ে ফেললো। যদিও ঠাণ্ডা লাগার ধাত আমার নেই তবুও সতীসাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য অনুযায়ী ঠাণ্ডা লাগা সম্বন্ধে আমাকে সর্তক করতে ভুললো না, তারপর বিদায় চুম্বন (গতানুগতিক) দিয়ে দরজা বন্ধ করে ফিরে গেল চায়ের টেবিলে, শেষটা অবশ্য আমি দরজার বাইরে থেকে তার পায়ের শব্দ শুনে অনুমান করলাম। আজ যে বিশেষ কিছু ঘটতে যাচ্ছে তেমন কোনও ইঙ্গিতই ছিল না কোথাও।

বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে রাতদিন পরিশ্রম করেছি আমি ঐ রেলরোড সংক্রান্ত মামলাটা নিয়ে। দুতিন দিন হোলো জিতেও নিয়েছি কেসটা। এছাড়া বহু বছর ধরে একটানা এই ওকালতীর কাজে মনপ্রাণ সমর্পন করে দিয়ে খেটে চলেছি, ছুটি নিইনি একদিনও।

আমার ডাক্তার বন্ধু ভোলনি আমাকে। কয়েকবারই আমাকে সর্তক করে দিয়েছে, যে আমি যদি কাজের চাপ না কমাই তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে মস্তিকে রক্তের একটা ছোট্ট জট দেখা দিতে পারে। তারপর সেই রোগটা হবে যাকে বলে স্মৃতিবিভ্রম। পুরানো সব কথা ভুলে যাবে, এমনকি নিজের পরিচয় পর্যন্ত। তোমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত, এখনই।

সকালে কাজে যাবার পথে ডাক্তারের কথাই মনে মনে ভাবছিলাম। শরীর মন কিন্তু যথারীতি তরতাজাই ছিল।

দূরপাল্লার বাসে ঝাঁকুনীতে ঘুম ভাঙলো আমার। আড়ষ্ট শরীরটাকে টান করে নিতে হঠাৎই মনে হোল, কে আমি? আমার নিশ্চয়ই কোন একটা পরিচয় আছে। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম সেখানে কোনও কাগজপত্র, ডায়েরী কিছুই নেই। আছে শুধু নগদ তিনহাজার ডলার। আশা হোল, বাসে এত লোক, এর মধ্যে কেউ না কেউ হয়তো আমায় চিনবে, নাম ধরে ডাকবে। কিন্তু সবাই নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

পাশের সিটের ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করলাম। তিনি এবং এই বাসের অনেকেই নিউইয়র্কে ঔষধবিক্রেতা সমিতির অধিবেশনে যোগ দিতে যাচ্ছেন। আমিও তাদেরই একজন বলে জানালাম। তাঁর নাম বললেন আর পি, বোল্ডার। আমার নামটাও বলতে হল, কিন্তু সেটা কি। তাড়াতাড়িতে নিজের নাম বললাম এডওয়ার্ড পিংখামার। ঐ নামটাই বা মাথায় কেন এলো কে জানে।

ভদ্রলোক তাঁর হাতের কাগজটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন,—দেখুন আবার একটা ভুয়ো খবর, কে এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল নাকি হঠাৎ বাড়ী থেকে কাজে যাবার পথে নিখোঁজ হয়ে গেছেন। সন্দেহ করা হচ্ছে হয়তো তাঁর স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে, তাই তিনি নিজের ঠিকানায় ফিরে আসতে পারছেন না। ব্যাপারটা আমি মোটেই বিশ্বাস করিনা। স্মৃতিবিভ্রম আবার কি? ঐ এলউইন বেলফোর্ড লোকটা নিশ্চয়ই ইচ্ছে করেই গা ঢাকা দিয়েছে। নিজের পরিবেশ আর কাজের জায়গায় একঘেঁয়েমী এসে গেলেই মানুষ এরকম করে থাকে। কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করে নিজের ইচ্ছেমত কটা দিন বেছে নেয়। তারপর ধরা পড়লেই বলে অতীতের সব কথা ভুলে গিয়েছিল বলে বাড়ী ফিরতে পারেনি। আরে বাবা, রোগটা তো বাড়ীতে বসেই হতে পারতো, না কি?

—আমার মনে হয় আপনি খুবই অবিশ্বাসীর মত কথা বলছেন। একজন প্রতিষ্ঠাবান, অর্থবান লোক, তার স্ত্রী পরিবার, আত্মীয় বন্ধু ছেড়ে কেন শুধু শুধু গা ঢাকা দেবে? আমি জানি এ ধরনের রোগ হয়ে থাকে।

—আরে আজকাল সবাই বেশি পড়াশোনা করতে শুরু করেছে তো। এই স্মৃতিবিভ্রম রোগটার নাম হয়তো কোথাও পড়েছে, অমনি নিজের দরকার মত ঐ রোগটার শরণাপন্ন হয়ে পড়লো।

এ লোককে কে বোঝাবে। যাই হোক, নিউইর্য়কে পৌঁছে একটা হোটেলে উঠে রেজিস্ট্রারে সেই এডওয়ার্ড পিংখামার নামটাই লিখলাম। জানালাম যে আমি ঐ ঔষুধসংক্রান্ত অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছি।

পরের দিন একটা ট্রাঙ্ক ও কিছু জামাকাপড় কিনে নিলাম। তারপর শুরু হোল এডওয়ার্ড পিংখামারের জীবন যাপন। পরের দিনগুলো প্রতিটাই সোনারূপোর তবকে মোড়া। প্রাণখুলে আনন্দ উপভোগ করলাম, কখনও নাটক, অপেরা দেখে, কখনও প্রকৃতির দাক্ষিণ্য উপভোগ করে। পুরোপুরি নিজের ইচ্ছেয়, নিজের মত করে বাঁচলাম কদিন। এ ইচ্ছের কোনও লাগাম নেই, কোনও সীমা নেই।

একদিন বিকেলে আমার হোটেলে ফিরতেই একজন বিশাল লম্বা নাক আর বড় গোঁফওয়ালা বলিষ্ঠ ভদ্রলোক আমাকে আটকালেন।

—আরে বেলফোর্ড যে, তুমি নিউইয়র্কে কি করছো? তোমার আইনের বই-এর তলা থেকে বেরোতে পেরেছো তাহলে? মিসেস এসেছেন নাকি সঙ্গে?

আমি খুব ঠাণ্ডা গলায় বললাম।

—আপনার ভুল হচ্ছে। আমার নাম পিংখামার। বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল ভদ্রলোকের, একপাশে সরে দাঁড়াতেই আমি এগিয়ে গেলাম। শুনলাম, ভদ্রলোক বেয়ারাকে ডেকে টেলিগ্রাফের্ ফর্ম আনতে বলেছেন।

পরদিনই আমি হোটেল পাল্টালাম।

ব্রডওয়ের কাছে রাস্তার ধারেই সুন্দর গাছগাছালিতে সাজানো এক রেস্টুরেন্টে বিকেলে খেতে গিয়ে হঠাৎ জামার হাতায় টান অনুভব করলাম।

—মিঃ বেলফোর্ড!

তাকিয়ে দেখি বছর তিরিশের এক সুদর্শনা আমার দিকে চেয়ে হাসছেন। সেই সুনয়নার চোখ দেখে মনে হোল আমি যেন তাঁর কোনও প্রিয় বন্ধু।

—তুমি আমাকে না দেখে চলে যাচ্ছিলে! আমাকে চেনোনা একথা যেন বোলো না। বোসো, আমরা পনেরো বছরে একবার তো করমর্দন করতে পারি? তাঁর পাশেই বসলাম অগত্যা। পানীয়ের অর্ডার দিয়ে বললাম—আপনি কি আমাকে সত্যি চেনেন? তিনি হাসলেন—না। এ বিষয়ে আমি কোনদিনই নিশ্চিত হতে পারিনি।

—যদি বলি আমার নাম এডওয়ার্ড পিংখামার, তবে কি ভাববেন?

—তবে কি ভাববো? ভাববো তুমি ম্যারিয়মকে আনোনি, একা এসেছো। অবশ্য ওকে আনলেই আমি খুশি হোতাম, ওকে দেখতে ইচ্ছে করে। তুমি খুব একটা পালটাও নি এলউইন।

আমি থতমত খেয়ে বললাম,—কিন্তু আমি যে সব ভুলে গেছি, আমাকে মাপ করবেন।

—তোমার কথা সবই শুনেছি। তুমি খুব বিখ্যাত উকিল বলে পরিচিত হয়েছো, পশ্চিম ডেনভারে থকো, তাই না? ম্যারিয়ম নিশ্চয়ই তোমাকে নিয়ে খুব গর্বিত? জানো, তুমি বিয়ে করার ছ'মাসের মধ্যেই আমিও বিয়ে করেছিলাম। কাগজে নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। বিয়ের আসরে ফুলই এসেছিল দু'হাজার ডলারের।

মহিলা পনেরো বছর আগেকার কথা বলছেন। পনেরো বছর, কত দীর্ঘ সময়। কম্পিত স্বরে বললাম—যদিও অনেক দেরী হয়ে গেছে, এখন কি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে পারি?

পারো, যদি ইচ্ছে করো। আচ্ছা একটা মেয়েলী কৌতূহল আমার অনেকদিনের—তুমি কি তারপর কখনো সদ্যফোটা শিশির ধোওয়া সাদা গোলাপ দেখতে, বা ঘ্রাণ নিতে পেরেছো এলউইন?

—আমি আবার বলছি ম্যাডাম, আপনি ভুল করছেন, আমার নাম পিংখামার। আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনার কথা, বিশেষতঃ ঐ গোলাপফুল সংক্রান্ত—কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না।

—তুমি মিথ্যে বলছো, আমি জানি তুমি মিথ্যে বলছো, যাই হোক, বিদায় মিঃ বেলফোর্ড। দরজায় দাঁড়ানো একটা চকচকে গাড়ীতে উঠে চলে গেলেন ভদ্রমহিলা।

সেরাত্রে থিয়েটার দেখে হোটেলে ফিরতেই একজন কালো পোশাক পরা সিল্কের রুমালওলা ভদ্রলোক আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে, নিজের নখ পর্যবেক্ষণ করতে করতে জানালেন, আমার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে চান।

ভালো কথা। তাঁর সঙ্গে একটা ছোট বারন্দায় গিয়ে দেখি একজন ভদ্রলোক ও একজন ভদ্রমহিলা সেখানে বসে আছেন। ভদ্রমহিলার চেহারায় একটা তীব্র উৎকণ্ঠা ফুটে না থাকলে, তাঁকে বেশ সুন্দরীই বলা যেত। আমাকে দেখেই কেমন ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে নিজের বুকে হাত রাখলেন তিনি। বোধহয় তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসতেন, কিন্তু পাশের ভদ্রলোকটি তাঁকে নিরস্ত করে নিজেই এগিয়ে এলেন।

—বেলফোর্ড, তোমাকে আবার দেখতে পেয়ে খুব খুশী হ'লাম। সব ঠিক আছে। আমি আগেই তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম, তুমি বাড়াবাড়ি রকমের পরিশ্রম করে ফেলছো। এখন চলো আমাদের সঙ্গে, সব ঠিক হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। আমি বিদ্রূপের হাসি হাসলাম—

—এতবার আমার ওপর বেলফোর্ড-এর লেবেল লাগানো হয়েছে যে, এবার বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনাদের কি একথা বিশ্বাস করানো যাবে, যে আমার নাম পিংখামার, আর আমি আপনাদের এর আগে কখনও দেখিনি?

ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই ভদ্রমহিলা ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এসে আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন—এলউইন, আমার হৃদয় ভেঙে দিওনা। আমি তোমার স্ত্রী! একবার নাম ধরে ডাকো আমাকে। তোমাকে এরকম অবস্থায় দেখার চেয়ে মৃত্যুও তো ভাল ছিল।

আমি হাত ছাড়িয়ে নিলাম।

—ম্যাডাম, বেলফোর্ডের সঙ্গে আমার চেহারায় হয়তো খুব বেশীই মিল, কিন্তু আমি সে নই। মহিলা তাঁর সঙ্গীর দিকে ফিরে তার হাত চেপে ধরলেন, —কি হবে এখন ডক্টর ভোলনি, কি হবে?

ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে দরজার কাছে নিয়ে গেলেন,—কিছুক্ষণের জন্যে নিজের ঘরে যান। আমি ওর সঙ্গে কথা বলি। না না, ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়নি, ব্রেনের একটা দিক একটু—যাই হোক আপনি ঘরে বিশ্রাম নিন, আমি দেখছি।

ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। কালো পোশাক পরা লোকটিও সম্ভবত বাইরে অপেক্ষা করতে গেলেন। ভদ্রলোক আবার এগিয়ে এলেন।

—মিঃ পিংখামার, আপনার সঙ্গে কি কিছু কথা বলতে পারি?

—নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি খুব ক্লান্ত, আমি কি ঐ সোফটায় একটু শুতে পারি?

সোফায় শুয়ে আরাম করে সিগারেট ধরালাম। ভদ্রলোক বললেন।

—কাজের কথায় আসা যাক। প্রথম কথা তোমার নাম পিংখামার নয়।

—সে আমিও জানি, কিন্তু মানুষের একটা নাম তো চাই? নামটা আমারও খুব একটা পছন্দ নয়, তবু নিজের নামকরন করার সময় একটাও সুন্দর নাম মনে পড়লো না যে।

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন,

—তোমার নাম এলউইন সি. বেলফোর্ড। তুমি ডেনভাবের প্রথম শ্রেণীর উকিল। তুমি স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছো, তাই নিজের পরিচয় ভুলে গেছ। যে ভদ্রমহিলা এখানে এসেছিলেন, তিনি তোমারই স্ত্রী।

—ভদ্রমহিলা খুব সুন্দরী, ওর চুলের রঙটা আমার সবচেয়ে পছন্দ।

—শুধু তাই নয়। ওঁর মত স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা। তুমি নিরুদ্দেশ হবার পর তিনি একমুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নেননি, ইসিডোর নিউম্যান তোমাকে এখানে দেখে তার করেছিল যে তুমি তাকে চিনতে পারো নি।

—হ্যাঁ ঘটনাটা মনে পড়ছে। কিন্তু ইয়ে—আপনার নামটা কি?

—আমি রবার্ট ভোলনি। ডাক্তার। কুড়ি বছর ধরে তোমার বন্ধু। পনেরো বছর ধরে তোমার চিকিৎসক। আমি তারটা পেয়ে মিসেস বেলফোর্ডকে নিয়ে তোমাকে খুঁজতে এসেছি। একটু চেষ্টা করো এলউইন, একটু মনে করার চেষ্টা করো।

—চেষ্টা করে কি হবে? আপনি তো ডাক্তার। বলুন তো আমার এ রোগের কোন চিকিৎসা আছে কি? আর স্মৃতি কিভাবে ফিরে আসে? একটু একটু করে, না হঠাৎ করে?

—দুরকমই হতে পারে।

—ডক্টর ভোলনি, আপনি আমার চিকিৎসার ভার নেবেন?

—বন্ধু, তোমার জন্য সব করবো আমি, চিকিৎসা বিজ্ঞানে যতটুকু আছে তার সবটাই করবো আমি তোমাকে সারিয়ে তোলার জন্যে।

—ঠিক আছে, তুমি তাহলে আমাকে রোগী হিসেবে নিচ্ছ, এখন আমাদের মধ্যে রোগী ও ডাক্তারের মধ্যে যে গোপনীয়তা থাকা উচিত, তা থাকবে?

—নিশ্চয়ই।

কে যেন ফুলদানীতে সুগন্ধী সাদা গোলাপ রেখে গেছে একরাশ। টাটকা গোলাপের সুগন্ধে ভরে গেছে ঘর। আমি উঠে গিয়ে ফুলগুলো জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে আবার সোফায় শুয়ে পড়লাম।

—ববি, তোমার চিকিৎসায় আমার স্মৃতি যদি আচমকা ফিরে আসে, তাহলেই ভালো হয়। আমি এতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তুমি এখন ম্যারিয়মকে এঘরে নিয়ে আসতে পারো। কিন্তু ওহে ডাক্তার, বলতেই হবে দারুন কাটলো দিনগুলো।

*A Ramble in Aphasia

পঞ্চম চাকাটি

শীতার্ত রাতে বিছানার খোঁজে দলটি একমনে পাদ্রীর বক্তৃতা শোনার চেষ্টা করছিল। চার্চের সহৃদয়তায় কিছু কিছু ভবঘুরে একরাতের মত আস্তানা পায়। এদের দলে একটি যুবককে একটু বেমানান লাগছিল। তার পোশাক মলিন হোলেও দামী কাপড়ের, আর যত্ন নিয়ে বানানো। ওর নাম টমাস ম্যাককুইড, একমাস আগেই মাতলামির জন্য কোচোয়ানেব কাজটা খুইয়েছে, আর এতদিনে নামতে নামতে ভিখারীদের দলে পৌঁছেছে।

নিউইর্য়ক শহরে ভ্যানস্মিথ পরিবারের পারিবারিক গাড়ীটি মোটামুটি অনেকেই দেখেছে। এই গাড়ীটাই চালাতো টমাস, আর তাকে চালাতো মিসেস ভ্যানস্মিথের ব্যক্তিগত পরিচারিকা অ্যানি। চাকরী খুইয়ে একটানা একমাস নামমাত্র খাদ্য আর অবিরাম পানীয়ের প্রভাবে তার অবস্থা এখন শোচনীয়।

টমাসের পাশে তারই বয়সী একটি যুবক দাঁড়িয়ে ছিল। তার পোশাক অপরিচ্ছন্ন হলেও পরিপাটি। তার হালচাল জিগ্যেস করলো টমাস।

তরুণটি জানালো টমাসের মত পানীয়ের প্রভাবে অধঃপতন হয়নি তার। পরিবারের অমতে বিয়ে করায় বিতাড়িত হয়েছে সে। কোনও কাজকরার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় সে বেকার। স্ত্রী সন্তানকে স্ত্রীর বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। সর্বোপরি অসুস্থ হয়ে চারমাস হাসপাতালে থাকার পর আজই ছাড়া পেয়েছে সে। পকেটে কানাকড়িও নেই।

—খুবই দুভার্গ্য তোমার। এক পুরুষমানুষ অনেক দুঃসময়ের মোকাবিলা করতে পারে। কিন্তু মেয়েরা আর বাচ্চারা যখন কষ্ট পায়, তার মত দুর্ভাগ্য আর হয়না।

ঠিক এই সময়ে দলটাকে সচকিত করে একটি ঝকঝকে মোটর গাড়ী তীব্রগতিতে এগিয়ে এলো, গাড়ীর বাঁদিকে একটা অতিরিক্ত টায়ার লাগানো ছিল, সেটি হঠাৎ খুলে গিয়ে ছিটকে চলে এলো।

টমাস ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাফিয়ে গিয়ে টায়ারটা ধরে ফেললো, আর কিছু বকশিস পাবার আশায় গাড়িটাকে অনুসরন করলো।

গাড়ীটা একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার আরোহী সুসজ্জিত সম্ভ্রান্ত দর্শন ভদ্রলোক কিন্তু বকশিস সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না। শুধু ধন্যবাদ দিলেন, এবং জিগ্যেস করলেন ওয়াশিংটন স্কোয়ারের ভ্যানস্মিথ পরিবারকে সে চেনে কিনা।

—চিনি মানে? সেখানেই তো একসময় থাকতাম আমি। এখনও যদি থাকতে পেতাম—

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর দরজা খুলে দিলেন ভদ্রলোক—উঠে এসো। তোমার সঙ্গে দরকার আছে। বিস্মিত টমাস হুকুম তামিল করলো। ব্যাপারটা কি? ভদ্রলোকের কাছে কি বকশিসের জন্য খুচরো নেই বলে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছেন।

তাঁর ঘরে পা দিয়ে বিস্ময়ে হতবাক টমাস। সারা ঘরে আবছা অন্ধকার। দামী দামী আসবাব আর পরদায় ঢাকা। হঠাৎ একটা কোন থেকে একটা রাক্ষুসে প্যাঁচা তার তীব্র উজ্জ্বল চোখ নিয়ে এগিয়ে এলো। টমাস চকিতে পিছিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে একটা ধাতুর মূর্তি তুলে নিয়ে তার দিকে ছুঁড়ে মারলো। ঝনাৎ করে একটা আওয়াজ হোলো, আর সঙ্গে সঙ্গেই নিখুঁত সান্ধ্য পোশাক সজ্জিত গৃহকর্তা পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

ক্ষমা চাইলো টমাস—দেখুন দেকি, কিছু ভেঙে ফেললাম কিনা। আপনার প্যাঁচার চোখদুটো যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল!

—ও কিছু নয়। ওটা একটা যান্ত্রিক খেলনা মাত্র, সত্যিকারের নয়। যাই হোক, আমি আমার গাড়ীর চালককে একটা নির্দেশ দিয়ে এখনি আসছি।

ভদ্রলোকের চালচলন, ঘরের অভিনব সাজসজ্জা সবকিছুই আরব্য রজনীর গল্পের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল টমাসকে।

তারপর সুখাদ্য ও পানীয় দিয়ে তাকে আপ্যায়িত করলেন ভদ্রলোক। আধঘন্টা ধরে নানা বিষয় নিয়ে নিপুন বাক্‌জালে প্রায় সম্মোহিত করে তুললেন টমাসকে।

দরজায় গাড়ি দাড়ানোর শব্দ পেয়ে আবার টমাসের অনুমতি নিয়ে অর্ন্তহিত হলেন ভদ্রলোক। গাড়ীতে এসেছেন ভ্যানস্মিথ পরিবারের গৃহকর্ত্রী আর ব্যক্তিগত সহচরী। আরো বিচিত্র রহস্যময় পরিবেশ গড়ে তোলা একটি ঘরে তাঁদের বসালেন ভদ্রলোক।

মিসেস ভ্যানস্মিথ পঞ্চাশ বছর বয়সের বিষণ্ন প্রতিমা। তাঁর দাসীটি মোটাসোটা হাসি খুশী তরুণী। মিসেস একটু বিরক্ত হয়েই বললেন.

—আবার আমাদের ডেকে নিয়ে এলেন কেন প্রফেসার, এর আগে আপনার সব রকম বিদ্যাই তো ব্যর্থ হয়েছে।

—এবার ব্যর্থ হবে না ম্যাডাম। মনে আছে, ঐ টেবিলে আপনার হাত দিয়েই কি লেখা বেরিয়েছিল?

—সে কথাটার তো কোন মানেই হয়না প্রফেসার। লেখা হয়েছিল পাঁচরকমের রথে সে আসবে। কোনও রথে পাঁচটা চাকা থাকে তা তো কখনও শুনিনি।

—বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি এত এগিয়েছে ম্যাডাম, এখন সবকিছুই সম্ভব হচ্ছে।

—তা হলে কি তাঁকে পেয়েছেন? সেকি ফিরবে আমার কাছে।

—একটু ধৈর্য্য ধরুন ম্যাডাম। আমি এক্ষুনি আসছি।

পাশের ঘরে গিয়ে টমাসের কাছে বসলেন ভদ্রলোক।

—হ্যাঁ। এবার বলুন, ভ্যানস্মিথ পরিবারে আপনি ছিলেন বলেছেন, আপনি কি সেখানে ফিরে যেতে চান।

—এক্ষুনি। কিন্তু ম্যাডাম কি আমাকে আর ফিরিয়ে নেবেন? এসব বিষয়ে তিনি খুব কড়া। আমি ভাবছিলাম হয়তো ওদের কোন কিছু চুরি গেছে, তাই আমাকে আটকে রেখেছেন।

—না, না, সেরকম কিছু না, তোমার ভয় নেই, ওঁরা তোমাকে সাদরে গ্রহণ করবেন।

—সত্যি, তাহলে তো বেঁচে যাই। এই ভবঘুরের জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে।

আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, মদ ছোঁবনা, আর একনম্বর কোচোয়ান কাকে বলে এবার দেখিয়ে দেবো।

—কোচোয়ান! তার মানে?

—আরে, একমাস আগেও তো আমি ওদের গাড়ীর কোচোয়ান ছিলাম, তারপর—টমাস হতভম্ব হয়ে দেখলো, এই পর্যন্ত শুনেই ঐ বলিষ্ঠ ভদ্রলোক রাগে কাঁপতে কাঁপতে তাকে কোটের কলার ধরে প্রায় শূণ্যে তুলে ধরে দরজা খুলে বাইরে বার করে দিলেন।

ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো টমাস, আপন মনেই বিড়বিড় করলো ভদ্রলোকের মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে। তারপর পায়ে পায়ে আবার পুরোনো জায়গায় ফিরে গেল, যেখানে তখনও গুটি দশেক ভবঘুরেকে নিয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন পাদ্রী। তাদেরই অর্থ সাহায্যে এদের রাতের শোবার আস্তানা মিলবে।

সেই তরুণটিও এখনও লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। টমাসকে ফিরে আসতে দেখে দুঃখিত হোল সে,—ভাবলাম, তুমি হয়তো ভালো কিছু জোটাতে পেরেছো।

—না, না। শরীর গরম করার জন্য একটু হাঁটাহাঁটি করে নিলাম আর কি!

এমন সময় রাস্তার ওপারে এক চেনা চেহারার তরুণীকে দেখে প্রায় দৌড়ে চলে গেল টমাস। —অ্যানি, অ্যানি—

তরুণীর মুখ হাসি কান্নায় মিশে অপরূপ হয়ে উঠেছে—ওঃ টমাস। বোকা কোথাকার, কেন এরকম করলে?

—একটু বেশি পান করে ফেলেছিলাম অ্যানি। কিন্তু তুমি আমাকে কি করে খুঁজে পেলে?

—তোমাকে খুঁজতেই তো এখানে এসেছি। প্রফেসর চেরুবাস্কো বললেন, তোমাকে এখানে পাওয়া যেতে পারে।

—তিনি আবার কে?

—তিনি ভবিষ্যৎ গননা করেন। পৃথিবীতে যেখানে যা কিছু ঘটছে, নিজের বিদ্যের সাহায্যে জানতে পারেন। তিনি বলেছিলেন পাঁচ চাকার গাড়ীতে করে তুমি আসবে।

—কি বাজে কথা বকছো অ্যানি, কোন গাড়ী পেলে আমি তো সেখানেই শুয়ে পড়তাম। এই ঠাণ্ডায় বিছানা ভিক্ষে করার জন্য দাঁড়াতাম নাকি?

—চুপ করে, বুদ্ধুরাম। আমার কথাটা মন দিয়ে শোনো। ম্যাডাম তোমাকে আবার কাজে লাগাবেন বলেছেন। আমিই কাকুতি মিনতি করে রাজী করিয়েছি তাঁকে। তুমি আজই ওবাড়ীতে ফিরে যেতে পারো। আজ রাতে প্রফেসারের কাছে ম্যাডামের সঙ্গে গিয়েছিলাম, সেখান থেকেই দৌড়ে আসছি।

—ওখানে কেন গিয়েছিলে তোমরা?

—ম্যাডাম তো প্রায় যান, অনেক টাকাও দেন ওঁকে। উনি সব জানেন, কিন্তু এখনও ম্যাডামের ইচ্ছে পূরন করতে পারেন নি।

—কি চান ম্যাডাম?

—সে সব পারিবারিক গোপন কথা। আর কথা বাড়িও না, বাড়ি চলো।

অ্যানির সঙ্গে দু'তিন পা গিয়েই থমকে দাঁড়ালো টমাস—অ্যানি তোমার কাছে কিছু পয়সা হবে? না না মদ খাবোনা, তোমার দিব্যি, ঐ লাইনে একটি গরীব ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, অসুস্থ, আবার নাকি তার বৌ বাচ্চাও আছে। আধডলার পেলে বেচারী রাতে শোয়ার ব্যবস্থা করতে পারে।

—পয়সা তো আছে। কিন্তু তোমায় বিশ্বাস করি না। কই, ডাকো তো তাকে, দেখি।

টমাস ডাকতেই ব্যগ্র পায়ে চলে এলো তরুণটি, মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়েই চোখ বড় হয়ে গেল অ্যানির।

—মিঃ ওয়াল্টার, ওঃ মিঃ ওয়াল্টার।

—অ্যানি নাকি? ফিসফিসিয়ে বললো ছেলেটি।

—মিঃ ওয়াল্টার, ম্যাডাম আপনাকে কোথায় না খুঁজেছেন।

—মা কি আমাকে দেখতে চান?

—আপনার জন্য শহর তোলপাড় করেছেন উনি। হাসপাতাল, মর্গ, আইন, আদালত, পুরস্কার ঘোষনা, গোয়েন্দা লাগানো, কিছুই করতে বাকি রাখেননি। তারপর ঐ প্রফেসারের দ্বারস্থ হয়েছেন, যদি ওঁর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে কিছু করা যায়। হ্যাঁ, তিনি আপনাকে দেখতে চান বই কি। তিনি চান আপনি বাড়ী ফিরে আসুন। আসবেন তো মিঃ ওয়াল্টার?

নিশ্চয়ই যাবো অ্যানি, মা যখন ডেকেছেন। তিনবছর বড় দীর্ঘ সময়। কিন্তু হেঁটে যেতে পারবো কি? বাসে কি বিনে পয়সার যাত্রী নেবে? অথচ একদিন আমাদের গাড়ীর চারটে ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতাম। এখনও কি সেই ঘোড়াগুলো আছে।

—নিশ্চয়ই আছে, বললো টমাস—থাকবেও এখন অনেক দিন। আমিই তাদের কোচোয়ান, মানে আজই আবার নতুন করে নিযুক্ত হলাম। অ্যানি যদি পয়সা দিয়ে সাহায্য করে, তাহলে তো আমরা সবাই একসঙ্গেই বাসে করে যেতে পারি।

বাসে উঠে অ্যানি ওদের দুজনকে কণ্ডাকটারকে দেওয়ার জন্য ঠিক দুটি নিকেলই দিল। বললো ব্যাগের বাকি সব টাকা পয়সা সে কালই প্রফেসারকে দিয়ে আসবে। তিনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন।

—সত্যি কি করে যে বুঝলেন আমি এখানে আছি। যাইহোক তাঁর ঠিকানাটা দিও, একদিন ধন্যবাদ জানিয়ে আসবো। কিন্তু অ্যানি, আমি কি মদের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখলাম, যে একটা পেল্লায় গাড়ী আমাকে একটা রহস্যময় প্রাসাদে নিয়ে গেল। সেখানে একটা পাগল আমাকে খাইয়ে দাইয়ে লাথি মেরে বের করে দিল? আমার গায়ে এখনও ব্যথা রয়েছে। দ্যাখো।

—চুপ করো বোকারাম।

—কিন্তু বলে রাখছি অ্যানি, ঐ ভুতুড়ে লোকটার ঠিকানা খুঁজে পাই যদি কখনো, ঠিক ওর নাকে একখানা বিরাশী সিক্কার ঘুঁষি মেরে আসবো, দেখো।

*The Fifth Wheel

ক্রুশবিদ্ধ হৃদয়

তিননম্বর পেগটা একটু বেশি করেই ঢাললো বালডি উডস। একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে আবাল্যের বন্ধু ওয়েব ইয়েগারের সঙ্গে। তারজন্যে এটুকু তো ঢালতেই হবে গলায়।

—দেখো ভাই ওয়েব, তোমার জায়গায় আমি থাকলে এতদিন রাজা হয়ে যেতাম। আর তুমি কিনা কিং কণসর্ট হয়েই রইলে?

—কিং কণসর্ট বস্তুটি কি?

—আরে, ঐ যে ডিউক টিউকরা যদি সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণীকে বিয়ে করে, তবে তাদের যা বলা হয়। রাণীর সঙ্গে ছবিতে হাজির থাকা আর সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীকে পৃথিবীতে আনার ব্যাপারে সাহায্য করা ছাড়া আর কোনও কাজই নেই তার।

—কথাটা ভুল বলোনি হে। তুমি আর আমি ছোটবেলা থেকে পশুখামারে কাজ করছি। আমি একসময় নোপালিটো র‍্যান্চ এর ফোরম্যান ছিলাম, যখন আমার সঙ্গে খামার মালিকের মেয়ে সান্টা ম্যাক অ্যালিস্টারকে বিয়ে করি। তারপর আমার এই হাল, না ঘরকা, না ঘাটকা।

বুড়ো ম্যাক অ্যালিস্টার যখন পশ্চিম টেক্সাসের গৃহপালিত পণ্য বিক্রেতা সম্রাট ছিল, তখন খামারের যাবতীয় কাজকর্মে তোমার সিদ্ধান্ত বুড়ো কত সম্ভ্রমের সঙ্গে মেনে নিতো বলতো?

—বুড়ো টের পায়নি সান্টার সঙ্গে আমার মাখামাখির ব্যাপারটা। তারপরেই তো আমাকে পাঠিয়ে দিল অনেক দূরে। তারপর সান্টা যখন ক্যাটলকুইন হোল, আমি গরুছাগল ভেড়াদের সর্বময় কর্তা এইমাত্র। সান্টা যখন ব্যবসার সব কাজকর্ম নিজেই দেখে, টাকাপয়সা নিজে গুনে নেয়। একটা গরুর ক্ষুর পর্যন্ত বিক্রী করার অধিকার নেই আমার। সান্টা এখন রাণী। আর আমি, আমি একটা ফালতু।

—সে যাই হোক, এবার ওঠা যাক্। আমার কথাটা ভেবে দেখো। তুমি একজন পুরষমানুষ। নিজের সাম্রাজ্যের প্রভু না হলে কি মানায়?

—চলো একসঙ্গে খানিকটা যাই। আমাকে আজই র‍্যাঞ্চে ফিরতে হবে।

ড্রাইলেক পর্যন্ত এসে দুজনের রাস্তা আলাদা হয়ে গেল। শেষবারের মত বন্ধুর হাত ছুঁয়ে বললো ওয়েব,

—তুমি তো সব জান বাল্ডি। বুড়ো যখন সান্টাকে বারন করে দিল আমার সঙ্গে কথা বলতে, এমনকি চিঠি লিখতে, সান্টা কি করতো? ওর একটা বিশেষ চিহ্ন ছিল, একটা হৃদয় আর তার মধ্যে একটা ক্রুশ চিহ্ন। সেই চিহ্নটা সে যে কোন উপায়ে আমার কাছে র‍্যাঞ্চে পাঠিয়ে দিত, সে আলুর বস্তায়ই হোক, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায়ই হোক।

—মনে আবার নেই। একবার তো বুড়ো রাঁধুনীর পিঠে ঐ চিহ্ন এঁকে খামারে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

—ঐ চিহ্ন দেখেই তো আমি আমাদের গোপন জায়গায় দেখা করতে যেতাম ওর সঙ্গে। সান্টা বলতো ঐ চিহ্নটার মানে আমাদের ভালবাসা আর সেইসঙ্গে আমাদের বেদনা।

সান্টা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে ঐ চিহ্নটা পাঠিয়েছিল। আমি পিন্টোকে সেই রাতে চল্লিশ মাইল ছুটিয়েছিলাম। বুড়ো ম্যাকঅ্যালিস্টার তো আমাকে দেখে অবাক্—আমি তো এখনই একজনকে খামারে পাঠালাম, তোমায় খবর দিতে। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম,তোমাকে চোখের সামনে দেখলেই গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেবো। আমারই কর্মচারী হবে আমার জামাই? কিন্তু অসুস্থ মেয়েটা কেবলই তোমায় দেখতে চাইছে। যাও, ওর কাছে গিয়ে উদ্ধার করো আমায়। .

আমাকে দেখে সান্টার পাণ্ডুর মুখে একঝলক আলো ফুটে উঠলো—কখন থেকে মনের মধ্যে টের পাচ্ছি ওয়েব, তুমি আসছো। কতদূর থেকে শুনছি তোমার ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ।

আমার হাত নিজের দুটি হাতের মধ্যে নিয়ে যেন এতদিন নিশ্চিন্তে ঘুমে তলিয়ে গেল সে। সেদিনের সেই সান্টা এমন পাল্‌টে গেল কি করে?

ওয়েবকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে শেষবারের মত মনে করিয়ে দিল বালডি—আমি যদি তুমি হতাম ওয়েব, তবে রাজা হতে চাইতাম।

পরদিন সকাল আটটায় বাড টার্নার নোপালিটো র‍্যাঞ্চ হাউসে এসে উপস্থিত। এবার গবাদি পশুর পাল নিয়ে এখন তাকে স্যান অ্যান্টোনিওর পথে যেতে হবে।

মিসেস সান্টা ইয়েগার হায়াসিন্থ ফুলের টবে জল দিচ্ছিল। কিং ম্যাক অ্যালিস্টারের সব সদ্‌গুণগুলোই তার মেয়ে পেয়েছে, সেই আত্মসম্মান বোধ. সাহস, পশুপালন ব্যবসায়ে একচ্ছত্র আধিপত্য রক্ষার সংগ্রাম, সবই সান্টার মধ্যে আছে। তার ওপর মায়ের কাছ থেকে সে পেয়েছে দীর্ঘ একহারা চেহারা, স্নিগ্ধ মাধুর্য।

ওয়েব গ্যালারীর অন্যপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার সহকারী কর্মচারীকে বিভিন্ন নির্দেশ দিতে ব্যস্ত। পশু বেচা কেনা ইত্যাদি বিষয় সান্টা নিজে দেখে। তার স্বামী পশুপালন বিষয়ে যা করণীয়, তা যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গেই করে আসছে এ যাবৎ।

সুপ্রভাত জানিয়ে বাড কাজের কথায় চলে এলো, পশুগুলিকে সে কি অন্যবারের মত শহরে বার্বারের কাছেই নিয়ে যাবে।

সান্টা উত্তর দেবার আগেই উত্তর দিল ওয়েব, —না, জিমারম্যানের কাছে নিয়ে যেও। আমি এবার তার সঙ্গেই কথা বলে রেখেছি।

অবাক হয়ে গেল সান্টা।

–হঠাৎ এ কথা বলছো কেন ওয়েব? আমি জিমারম্যান বা নেসবিটের সঙ্গে কখনও ব্যবসা করিনি। গত পাঁচ বছরে ধরে বার্বারই আমাদের খামারের পশু বাজারে দিচ্ছে। হঠাৎ তার হাত থেকে সেটা নিয়ে নেওয়া ঠিক হবে না। ওয়েবের চোখে নীল বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল—আমি চাই এবার জিমারম্যান বা নেসবিটকেই দেওয়া হোক।

—বোকার মত কথা বোলোনা। দাঁড়িয়ে আছো কেন বাড? তাড়াতাড়ি রওনা দাও। বার্বারকে বোলো, মাসখানেকের মধ্যে আর একদল তৈরী হয়ে যাবে।

বিদ্রূপের হাসি হেসে স্ত্রীর সামনে প্রায় মাটিতে লুটিয়ে অভিবাদন জানালো ওয়েব।

—তোমার মনিবের কথা শুনেছো তো বাড। এবার যাও।

চলে গেল বাড। তার আনত চোখে ওয়েব-এর জন্য সমবেদনা দেখাতে ভোলেনি।

স্বামীর এরকম অস্বাভাবিক আচরনে মাথা গরম হয়ে গেল সান্টার।

—হচ্ছে কি ওয়েব? বড্ড বোকার মত কাজ করছো আজ।

—বোকাই তো। আমি তো তোমার রাজত্বের বিদূষক ছাড়া আর কিছু নই। তোমাকে বিয়ে করার আগে আমি একটা মরদ ছিলাম। আর আজ এই খামারের সকলে আমাকে নিয়ে পরিহাস করে। আমি এখন একটা ফালতু। আমি আবার মরদ হতে চাই।

—এভাবে বোলো না ওয়েব। তোমাকে কোনভাবেই ছোট করা হয়নি কখনো। পশুপালন বিষয়ে তোমার কথার ওপর আমি কি কখনও কিছু বলেছি? ওব্যাপারটা তুমিই ভাল বোঝ। কিন্তু ব্যবসার দিকটা বাবার সঙ্গে থেকে শিখেছি আমি। ওটা আমি ভাল জানি, এই তো ব্যাপার। এতে এত কথার কি আছে?

—রাজত্বই বলো, আর মহারাণীত্বই বলো, আমার যেখানে কোন ভূমিকা নেই, সেখানে আমি থেকে কি করবো? আমি চলে যাচ্ছি। যদি আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হয়, তাই করবো। নিজের চেষ্টায় নিজের রাজত্ব তৈরী করবো আমি।

ঘোড়া নিয়ে তৈরী হোলো ওয়েব, স্থির প্রতিমা সান্টা, অবাক হতেও যেন ভুলে গেছে সে।

—তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছো ওয়েব?

—আমি আবার মানুষ হতে চাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে কঠিন হোলো সান্টা —বেশ, যেখানেই যাও, যাই করো, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় যেন।

দৃঢ় পদক্ষেপে ঘরে চলে গেল সান্টা। আর পিছন ফিরে তাকালো না।

বহুদিন কোনও খোঁজ নেই ওয়েবের। নোপালিটো র‍্যাঞ্চের বিশাল ভূখণ্ডের কোথাও তাকে দেখা যায়নি। অবশেষে মেষপপালক বার্থলোমিউ সান্টার আতিথ্য গ্রহণ করে জানিয়ে গেল হিডালগো কাউন্টিতে সেকো র‍্যাঞ্চে ওয়েব নামে একটি লোক ম্যানেজারের কাজ নিয়েছে।

সান্টা বললো, সে আমার স্বামী।

সেতো ভালই করেছে। ওর মত দক্ষ কর্মী সহজে মেলে না।

নোপালিটো র‍্যাঞ্চ সাসেক্স ব্রীড-এর পশু প্রজনন ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা চালচ্ছিল। অবশেষে সফল হয়েছে। টেক্সাসের গবাদি পশুদের চেয়ে সেরা এই সাসেক্স গবাদি পশুতে ভরে গেছে নোপালিটোর খামারের একাংশ। এদের সুখ্যাতিও ছড়িয়েছে সর্বত্র।

একদিন 'সেকো' পশু খামারের ম্যানেজার ওয়েব ইয়েগার তিনচারটি লোক পাঠিয়ে দিল সান্টার খামারে। চিঠি লিখে জানালো, ঐ সাসেক্স পশু কিনতে চায় তারা। নিতান্ত-ব্যবসায়িক চিঠি। ব্যক্তিগত কোনও কথা নেই।

সেই রাত্রেই সান্টার ব্যবস্থাপনায় একশো গবাদি পশু র‍্যাঞ্চের কাছেই খোঁয়াড় বাছাই করে আটকে রাখা হোল। পরদিন সকালেই তারা যাবে 'সেকো' খামারের পথে।

সেই রাতেই সবার অলক্ষ্যে সান্টা কামারশালায় গিয়ে একটা বিচিত্রদর্শন লোহার চিহ্ন তৈরী করলো, তারপর বহু চেষ্টায় একটা সাদা বাছুরকে আটকে লোহাটা গরম করে তার গায়ে চিহ্ন এঁকে দিয়ে যেমন চুপিসাড়ে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে ঘরে ফিরে গেল।

প্রায় ছ'দিন লাগলো ঐ পশুদের নিয়ে 'সেকো' র‍্যাঞ্চে পৌঁছাতে। রাস্তায় ওদের খাবার, বিশ্রাম করার, সময় দিতে হবে তো।

ষষ্ঠদিন সন্ধ্যায় র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান গুনে মিলিয়ে নিল পশুদের।

পরদিন সকাল আটটায় একজন অশ্বরোহীকে নোপালিটো র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে লাফিয়ে নামতে দেখা গেল। তার ক্লান্ত ঘোড়াটির মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে, মনে হচ্ছে তার জীবনীশক্তি প্রায় নিঃশেষ।

তবে ঐ বেলশাজার নামক ঘোড়াটার জন্য চোখের জল ফেলার দরকার নেই। আজকাল তাকে বহাল তবিয়তে নেপোলিটো র‍্যাঞ্চে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। দূরপাল্লার দৌড়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে বলে তাকে মাথায় করে রেখেছে সকলে।

তা পরের কথা পরে। এখন অশ্বারোহীটি ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঘরে ঢুকতেই দুটি রমণীয় বাহু বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেল।

—আমি একটা জঘন্য লোক সান্টা।

—তুমি দেখতে পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ সান্টা। দেখেই তো সারারাত ঘোড়া ছুটিয়ে —এদিকে এসো, দেখো, এখন আর আমি রাণী নই, শুধু মিসেস ইয়েগার। নতুন রাজা এসে গেছে। দেখো ঠিক তোমার চোখদুটো পেয়েছে দুষ্টুটা। দোলনায় শুয়ে আছে হৃষ্টপুষ্ট, ওয়েবএর প্রতিরূপ শিশুটি। আপন মনে হাত পা ছুঁড়ে খেলা করে চলেছে!

এই সময় ঘন্টা বাজিয়ে বাড টার্নারের আর্বিভাব। প্রায় বছরখানেক আগেকার সেই দিনের সেই একই প্রশ্ন নিয়ে এসেছে সে। পশুগুলি কি বার্বারের কাছেই নিয়ে যাবে।

দোলনা থেকে শিশুটি বললো-বা-বা-বা-বা। অট্টহাসি করে উঠলো ওয়েব। বাডকে বললো—শুনলে তো বাড, মনিব কি বললো?

এরপর মধুরনে সমাপয়েৎ।

সেকো র‍্যাঞ্চে বুড়ো মালিক কুইন স্যাসেক্স গরু বাছুর দেখতে গিয়ে নতুন ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলো নোপালিটো ব্যাঞ্চের ব্র্যাণ্ড তো এক্স আর ওয়াই, তবে সাদা বাছুরটার গায়ে হৃদয়চিহ্নের মধ্যে ক্রুশ চিহ্ন এই অদ্ভুত মার্কাটা কেন? এটা কিসের চিহ্ন।

*Hearts and Crosses

বন্ধুত্ব ও টেলেমাচাস

শিকার সেরে ফেরার পথে নিউ মেক্সিকোর একটা ছোট স্টেশনে ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সেখানেই আলাপ হোটেল মালিক টেলেমাচাস হিকস্-এর সঙ্গে। কথায় কথায় তার কানের লতির ছেঁড়া অংশটা দেখিয়ে জানতে চাইলাম, ওটা কি কোনও বন্যজন্তুর আক্রমণ?

—না, না, এটা বন্ধুত্বের স্মারক বলতে পারেন।

—ব্যাপারটি কি? কোন দূর্ঘটনা?

—বন্ধুত্ব, কোনও দুর্ঘটনা নয়। যদিও দু'জন মানুষের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব চিরকাল টিকে থাকে না, একদিন না একদিন প্রকৃতির নিয়মেই সেটা ফিকে হয়ে গিয়ে মিলিয়ে যেতে বাধ্য। আমার আর আমার বন্ধু পেইস্লি ফিশ এর মধ্যে ঠিক এরকমটাই ঘটেছিল।

বেশি সাধাসাধি করতে হোল না। বলার জন্যে যেন তৈরিই ছিল হিক।

—সাত বছর ধরে আমরা মাণিকজোড় ছিলাম বলতে পারেন। জীবিকা অর্জনের জন্যে যত বিচিত্র কাজই করতে হোক না কেন, একসঙ্গে হাসিমুখে করেছি। ফূর্তিও করেছি একসঙ্গে। এত বেশি চিনতাম পরস্পরকে যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ বন্ধুত্ব টিকে থাকবে বলে দুজনেই বিশ্বাস করতাম।

তারপর এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আমরা একই সঙ্গে হোটেল মালিকের বিধবা স্ত্রী মিসেস জেসাপকে দেখলাম, আর একইসঙ্গেই মাথা ঘুরে গেল আমাদের। তাঁর আগমণ যেন স্বাগত জানালো আমাদের।

বন্ধুত্বের খাতিরে এ ব্যাপারটা নিয়ে, আমরা আলোচনায় বসলাম। ঠিক হোলো আমরা একসঙ্গেই মিসেস জেসাপকে নিজের দিকে টানার চেষ্টা করবো। অন্যের আড়ালে কখনও তাঁকে প্রেম নিবেদন করবো না। দেখা যাক ভাগ্য কার ওপর সুপ্রসন্ন হয়।

প্রতিদিন বিকেলে কাজের পোশাক ছেড়ে যখন তিনি বিশ্রাম নিতেন, আমরা দুই বন্ধু তাঁর দুপাশে বসে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ করতাম, এমনকি একজন না এসে পৌঁছানো পর্য্যন্ত অন্যজন মুখ খুলতাম না পর্য্যন্ত।

ফিশের প্রেম নিবেদনের পদ্ধতিটা ছিল শেক্স্পীয়ারের ওথেলো থেকে ধার করা। সে তার জীবনের, বা কখনও বই-এ পড়া বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে ভোলাতে চাইতো তার ডেসডিমোনাকে। আমি কথার চেয়ে কাজে বেশি বিশ্বাসী, প্রেমপত্রের দিকে কিভাবে তাকালে, তার হাতটি কেমন করে সযত্নে তুলে নিলে তার মন ভোলানো যায়, এ বিষয়ে আমরা একটা স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল, তা বলতেই হবে।

ফল হোল এই ফিশের একটানা বকবকানিতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল মিসেস জেসাপের। আমার দিকেই বন্ধুত্বের, ভালবাসার হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

একমাস পরে আমাদের বিয়ের দিন। ফিশ আসতে দেরী করছিল। আমি বিয়েটা থামিয়ে রাখলাম, আমাদের এতদিনের বন্ধুত্ব এইটুকু দাবী তো করতেই পারে?

ফিশ এলো, কি ব্যাপার? না, সব দোকান বন্ধ থাকায় সে একটা পোশাকের দোকানের পিছনের দরজা ভেঙে একটা সার্ট আনতে গিয়েছিল। তাই এই দেরী।

পাদ্রী যখন আমাদের বিয়ে দিচ্ছিলেন সে এত কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, যে আমার মনে সন্দেহ হচ্ছিল, পাদ্রী ভুল করে তার সঙ্গেই মেয়েটির বিয়ে দিতে পারেন, এই আশায়ই দাঁড়িয়ে আছে সে।

পরদিন ভোরে আমাদের হসিমুখে যাবার কথা। তাই সেদিন রাতে আমরা শুতে গেলাম বড় রাস্তার ধারে যাজকের একটা বাড়ীতে। তাঁর স্ত্রী ঘরটা ফুল পাতা দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিলেন।

রাত দশটা বেজে গেল। আমার স্ত্রী ঘরের টুকিটাকি কাজ সারছিলেন, আমি চৌকাটে বসে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

একসময় ঘরের আলো নিভে গেল। আমার স্ত্রী ভেতরে আসবো কিনা জিগ্যেস করলেন।

অন্যমনস্ক ভাবে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—হ্যাঁ, এই যে যাই, ফিশটা যে কেন এখনও—

বন্ধুকের গুলির মত কি একটা কানের লতিতে এসে লাগলো, না ফিশ গুলি ছোঁড়েনি, আমার স্ত্রী তাঁর হাতের ঝাঁটাটা ছুঁড়ে মেরেছেন।

*Telemachus, Friend

প্রজাপতির খেরোর খাতা

বিটাররুট মাউন্টেনএ সোনা খুঁজতে গিয়েছিলাম আমি, অর্থাৎ স্যাণ্ডারসন প্র্যাট, আর আমার বন্ধু ইডাহো গ্রীন। হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত তুষার ঝড় আমাদের দুজনকে মাসখানেকের বেশি একটা ছোট্ট কেবিনে আটকে রেখে দিয়েছিল। আর বলতে গেলে সেই একমাসে আমাদের জীবনের ধারাটাই একেবারে পাল্টে গিয়েছিল, সেই নিয়েই আজকের গল্প।

সঙ্গে যথেষ্ট খাবার আর প্রচুর পরিমান জ্বালানী কাঠ থাকায় শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ অভাব হয়নি, কিন্তু মুস্কিল হোল দুজন বেকার যুবক একটা ছোট্ট ঘরে কতক্ষণ একজন আর একজনকে সহ্য করতে পারে?

আস্তে আস্তে দুজনেই খিটখিটে হয়ে উঠলাম। কথায় কথায় তর্কবিতর্ক বেঁধে গেল রোজই। শেষে এমনকি একই উনুনের দুপাশে নিজের নিজের রান্না করে নিতে লাগলাম আলাদা ভাবে। তারপর একদিন কথাই বন্ধ হয়ে গেল দুজনের মধ্যে।

একদিন বিকালে হঠাৎই ইডাহোর হাত লেগে কেবিনের ওপরের তাক থেকে দুটো বই পড়ে গেল মাটিতে। লেখাপড়ার প্রতি কোনরকম আকর্ষণ আমাদের ছিল না বটে, কিন্তু এই কর্মহীন জীবনের একঘেঁয়েমী কাটাতে দুজনেই সাগ্রহে বইদুটো তুলে নিলাম।

আমার হাতের বইটা লম্বায় পাঁচ আর চওড়ায় ইঞ্চি ছয়েকের মত। কিন্তু এই একরত্তি বইটাতে ঠাসা আছে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার। পড়তে পড়তে নেশা লেগে গেল আমার। "হারকিমার্স হ্যাণ্ডবুক অব ইনডিসপেসসিব্‌ল্‌ ইনফরমেশন"-সার্থকনামা বই বটে। কি নেই এতে। পৃথিবীর দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ কোনটি, কটাই বা তারা আছে আকাশে, কোন শহরের লোকসংখ্যা কত, মেয়েদের বয়স কি করে বোঝা যায়, উটের কটা দাঁত আছে। চিকেন পক্স দেখা দিতে কতক্ষণ সময় লাগে, মেয়েদের গ্রীবা কতটা লম্বা হওয়া শোভনীয়, ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। লেখক ভদ্রলোক মনে হয় লক্ষ লক্ষ মাইল ভ্রমন করেছেন, এবং অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর ব্যয় করেছেন এই বইএর পেছনে। হারকিমার যে বিষয় সম্বন্ধে জানেন না, সে জিনিষটা জানার যোগ্য নয় বলেই আমার ধারনা।

ইয়াডো যে বইটা নিয়ে মজে আছে, সেটা নাকি হোমার , কে, এম বলে এক কবির কাব্যগ্রন্থ। তার ধারণায় মদের ঝোঁকে কবি যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তাঁর কবিতায়, তার কাছে আমার বই-এর তত্ত্ব আর তথ্যগুলো শুকনো কাঠের মতই নীরস।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কাহাঁতক ঝগড়া করা যায় একটা অবুঝের সঙ্গে? আমার দিনগুলো পরম শান্তিতে কাটলো প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো হৃদয়স্থ করে। কখন তুষার থামলো। বই-এ ডুবে থাকায় আমরা টেরই পেলাম না। সেই বসন্তে আমরা যেসব খনিজ পদার্থ পেয়েছিলাম, আট হাজার ডলারে সব বিক্রী করে দিয়ে সালমান নদীর ধারে রোজা শহরে বিশ্রাম নিতে এলাম।

এখন পয়সাব সঙ্গে সঙ্গে ঐ ছোট্ট লোকালযে তাই আমাদের সাদর অভ্যর্থনার অভাব হোল না।

দমকলবাহিণীর সাহায্যেব জন্য অনুষ্ঠিত সিটি হলের এক জলসায় 'বোজা'র সোসাইটি মহলেব মক্ষিরাণী মিসেস ডি অরমণ্ড স্যাম্পসনকে আমরা দুজনে একসঙ্গেদেখলাম।

বিধবা মিসেস স্যাম্পসন 'বোজা' শহরের একমাত্র দোতলা বাড়ীর মালিক। আমরা দুজন ছাড়াও অন্ততঃ বাইজন যুবক মিসেস স্যাম্পসনকে ঘিরে নাচের প্রস্তাব দিল, আমি সেদিকে সুবিধে হবে না বুঝতে পেরে প্রথমই নাচ শেষে তাঁকে বাড়ী পৌছে দেবার অনুমতি নিয়ে রাখলাম। এদিকে দিযে আমারই জিত হোল।

ফেরার পথে মিসেস বললেন।

—আকাশের তারাগুলো দেখছেন মিঃ প্র্যাট, কিরকম ঝলমল করছে।

—খুব স্বাভাবিক। ঐ যে বড় তারাটা দেখছেন, আমাদের থেকে ছেষট্টি কোটি মাইল দুরে আছে। ওর আলো আমাদের কাছে পৌছাতে প্রায় ছত্রিশ বছর লেগে যায়। একটা আঠারো ফুট টেলিস্কোপ দিয়ে আপনি প্রায় তেতাল্লিশ লক্ষ তারা দেখতে পাবেন।

—ও মিঃ প্র্যাট, আমি তো এসব আগে জানতামই না। যা গরম পড়েছে আজ, একেবারে ঘেমে গেছি।

—তা তো হবেই। আমাদের যে দুলক্ষ ঘর্মগ্রন্থি একসঙ্গে কাজ করে চলে।

—এতো কথা আপনি জানলেন কি করে মিঃ প্র্যাট?

—পৃথিবীর পথে চোখখানা খোলা রেখে চলি যে ম্যাডাম।

—মিঃ প্র্যাট, শিক্ষিত লোকের এত অভাব এই শহরে। আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগলো। যদি মাঝে মাঝে বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, খুশী হব।

এভাবেই হল্‌দে বাড়ীর রমণীটির প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলাম আমি। প্রতি মঙ্গলবার আর শুক্রবার আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। আর 'হারকিমার' থেকে সংগৃহীত আমার জ্ঞানভাণ্ডার উজার করে দিয়ে, মুগ্ধ করে তুলতাম তাঁকে। অন্য সময়গুলোর সদ্‌ব্যবহার করতো ইয়াডো আর অন্য স্থানীয় যুবকরা।

ইয়াডো যে তার কবিতার বইএর দর্শন প্রয়োগ করে মিসেস স্যাম্পসনকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করছে একথা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। একদিন রেগে লাল হয়ে তিনি বললেন ইয়াডো নাকি সবসময় শুঁড়িখানার মালিকের মত কথা বলে, তাঁকে একহাতে মদের বোতল নিয়ে সাকীর বেশে বনভোজনে নিমন্ত্রণ করেছে সে। এটা কি কোনও ভদ্ররমণীর পক্ষে সম্ভব?

অনেক কষ্টে বুঝিয়ে শান্ত করলাম তাঁকে। বললাম, ইয়াডো একজন ভদ্রলোক তাতে কোনও সন্দেহ নেই, যত নষ্টের গোড়া ঐ কবিতার বইটা। এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। সপ্তাহ দুয়েক পরে একদিন রাত্রে কোলাহলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে এসে দেখি দূরে মিসেস স্যাম্পসনের বাড়ীতে কিভাবে যেন আগুন লেগে গেছে।

দৌড়ে সেখানে গিয়ে শুনলাম গৃহকর্ত্রীকে কেউ বাইরে আসতে দেখেনি, কিন্তু দমকলের লোকেরা আমাকে কিছুতেই ভেতরে যেতে দেবে না। ওখানে ঢুকলে নাকি আর বেঁচে ফেরা যাবে না।

ঐ আগুনের আভায় পকেট থেকে হারকিমারের বইটা বার করে দুর্ঘটনার পাতায় চোখ বোলালাম। দেখলাম লেখা আছে ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে এলে দুচোখের বাইরের দিকের কোনে কয়েকটি করে অতসীর বীজ দিলে অব্যর্থ উপকার পাওয়া যায়।

তখনি পকেট হাতড়ে পয়সা বার করে একটি ছোট ছেলেকে অতসীর বীজ কিনতে পাঠালাম। তারপর যথাসাধ্য বলপ্রয়োগে দমকলকর্মীদের হটিয়ে জ্বলন্ত বাড়ীতে ঝাঁপ দিলাম। দমকলকর্মীরা তাদের লম্বা পাইপ দিয়ে যদি অনবরত আমার গায়ে জলের ছিটে না দিত, তবে মুহূর্তেই আমি রোস্ট হয়ে যেতাম, যাইহোক কোনমতে সংজ্ঞাহীন মিসেস স্যাম্পসনকে তাঁর ঘর থেকে উদ্ধার করে বাইবের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে এলাম। ইতিমধ্যে ছোট ছেলেটিও অতসীর বীজ নিয়ে হাজির। আমিও দু'চারটি করে বীজ তাঁর চোখের বাইরের কোনে রেখে নিশ্চিন্ত হোলাম।

এমন সময় গ্রামের ডাক্তারবাবু এসে উপস্থিত। তিনি তো আমার কাণ্ড দেখে থ। এটা কি ধরনের চিকিৎসা?

আমি তাঁকে হারকিমারের বই-এর একশো সতেরো পৃষ্ঠাটি দেখে নিতে বললাম। এ বিষয়ে হারকিমারের মত যে অভ্রান্ত তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।, এ কথাও জানালাম।

বইটার পাতা উল্টে বিষম খেলেন ডাক্তার ভদ্রলোকটি—ও মশাই, শ্বাসরোধের চিকিৎসা হিসেবে তো এখানে লেখা আছে, রুগীকে মুক্ত বাতাসে আনুন, আর তাকে হেলান দিয়ে শুইয়ে রাখুন, অতসীর-বীজের ব্যাপারটা তো তার ওপরের লাইনে, ওটা চোখ কড়কড় করার ওষুধ। তাহলে আপনি—

এখানে বাধা দিলেন স্বয়ং রোগিনী—ঐ অতসীর বীজ আমার চোখের চুলকুনি যেরকম সারিয়েছে, সেরকম আর কোনও ওষুধ পারেনি।

এইকথা বলে আমার কোলে মাথা রেখে পাশ ফিরে অন্য চোখেও ঐ বীজ দিতে অনুরোধ করলেন তিনি।

এখন যদি রোজা শহরে যান, দেখবেন একটি নতুন হলদে বাড়ীতে মিসেস স্যাম্পসন, এখন মিসেস প্র্যাট হয়ে ঘরকন্নার তদারকিতে ব্যস্ত। আমার বইটি লাল মরক্কোর মলাটে বাঁধাই হয়ে মার্বেলের টেবিলে শোভা পাচ্ছে। ওর মলাট খুললেই শন্তি সুখের চাবিকাঠিটা পাওয়া যাবে।

* The Handbook of Hymen

আক্ষেপানুরাগ

নীচের ফ্ল্যাটের বান্ধবী মিসেস ক্যাসিডির কাছে গল্প গুজব করতে গিয়েছিল মিসেস ফিঙ্ক। মিসেস ক্যাসিডির চেহারাখানা যা হয়েছে, দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। একটা চোখ প্রায় বুঁজে এসেছে, তার চারিদিকে সুবজে বেগুনী রঙের কালসিটে। ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে। দুগালে কেটে বসে গেছে পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ। মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, এই আঘাতগুলো সে বেশ গর্বের সঙ্গেই দেখাচ্ছিল বন্ধুকে। পুরোনো দুএকটা আঘাতের চিহ্নও দেখাতে ভুললো না। এগুলো সবই নাকি স্বামীর ভালবাসার চিহ্ন। যদি মারধোড়ই না করলো, তাহলে বুঝতে হবে তোমার স্বামীর তোমার ওপর খেয়ালই নেই। আর একদিন এরকম মারপিট করলে, পরদিন অনুতপ্ত স্বামীর কাছ থেকে নানা উপহার পাওয়া যায়, থিয়েটার, পিকনিক এসবে নিয়ে যাবার সাদর আমন্ত্রণ আসে। মোটকথা ক্ষতিপূরণটা ভালভাবেই হয়।

—কিন্তু এভাবে মারে কেন তোমাকে? দোষটা কি তোমার?

—আরে ব্যাপারটা সাধারণত ঘটে শনিবার রাতে। মদ খয়ে চুর হয়ে আসে তো? তখন খাবার তৈরী পেলে দোষ, না পেলেও দোষ। আসলে একমাত্র বউ-এর ওপরেই তো হাতের সুখ করে নেওয়া যায়। আমিও ফার্নিচার টার্নিচার সরিয়ে ময়দান খালি রাখি যাতে বেকায়দায় পড়ে টরে গিয়ে ওগুলোতে ধাক্কা না খাই।

—কিন্তু আমার স্বামী তো এরকম করে না। আসলে সে একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক।

—রাখো, ও একটা মরদই নয়। জানে কেবল বসে বসে কাগজ পড়তে। চেয়ার গরম করা ছাড়া আর কিছুই শক্তিতে কুলোয় না ওর, যতই হাট্টাকাট্টা জোয়ান হোক না কেন? নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসতে আসতে বেদনা আর হতাশায় ভরে গেল মিসেস ফিঙ্ক ওরফে

ম্যাগীর। সে আর স্বামী ক্যাসিডি একসঙ্গে এক জায়গায়ই কাজ করতো, দুজনেই বিয়ে করে একই বাড়িতে আছে, তবু দুজনের ভাগ্য দুরকম হয়ে গেল কেন? তাহলে কি মার্ট তাকে যথেষ্ট ভালবাসে।

পরদিন 'লেবার ডে' হিসেবে ছুটির দিন ছিল। সকাল থেকে নিচের ফ্ল্যাট থেকে হৈ হুল্লোড়ের আওয়াজ আসছিল। কোথাও বাইরে যাবার তোড়জোড় করছে ওরা। জ্যাক সাজিয়ে দিচ্ছে ম্যামিকে। যতদূর সম্ভব ঢাকার চেষ্টা করছে আগের রাতের মারের চিহ্নগুলো।

এদিকে দুসপ্তাহের জমানো জামাকাপড় কাচতে বসে হঠাৎ ম্যাগীর মাথায় আগুন ধরে গেল। চেয়ারে কাগজ হাতে নিরুত্তাপ নিশ্চল স্বামীকে দেখে মাথায় একটা মতলব খেলে গেল, দেখা যাক ম্যামির মত সেও স্বামীর পুরুষত্বের স্বাক্ষর গর্ব করে দেখাতে পারে কিনা।

এক ঝটকায় হতভম্ব স্বামীর হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিল ম্যাগী,—কুঁড়ের হদ্দ কোথাকার? তোমার মত মেনিমুখোর জন্য সংসারের হাড় কালি করে খেটে চলেছি আমি!

গায়ের জোরে দুচার ঘা লাগিয়েও দিল বিস্ফারিত চক্ষু স্বামীকে। তারপর বেঁধে গেল তুমুল কাণ্ড। ওপরের ফ্ল্যাট থেকে এরকম অপ্রত্যাশিত মারপিঠের আওয়াজে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলো ম্যামি। স্বামীকে পিছনে ফেলে সিঁড়ির মুখে উঠতেই ম্যাগীর সঙ্গে সংঘর্ষ। দুহাতে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলো ম্যামি,—কি হয়েছে ম্যাগী? সে কি মেরেছে তোমাকে। অবরুদ্ধ বেদনায় ভেঙ্গে পড়লো ম্যাগী, দেখ গে যাও , দেখ গে যাও ম্যামি, সে রান্নাঘরে কাপড় কাচতে বসেছে।

*A Harlem Tragedy

চৌম্বক শক্তির পরাকাষ্ঠা

জেফ পিটার্সকে বৈশ লাগে আমার। ধড়িবাজ লোক বটে, পয়সা কামাবার জন্যে নিত্যি নতুন উপায় বার করতে জুড়ি নেই তার।

সম্মোহণ বিদ্যাও কিছু জানা আছে বোধহয়, নাহলে অক্লেশে দিনের পর দিন লোকের মাথায় টুপি পরায় কি করে লোকটা। এমনকি একবার নাকি এক অভিনেতার হীরের আংটির সঙ্গে নিজের একটা পেন্সিলকাটা ছুঁরি পর্যন্ত বদলা বদলি করেছিল সে।

তা, তার সঙ্গেই সেদিন তার সাম্প্রতিকতম অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে কথা হচ্ছিল সেদিন। গল্পটা তার জবানিতেই শুনুন।

সেবার পকেটের অবস্থা কাহিল, কোনরকমে কিছু কুইনিন, হোটেলের কল থেকে জল, আর টুকিটাকি দু একটা জিনিষ মিশিয়ে কয়েক বোতল সর্ব-রোগহর দৈব ওষুধ তৈরী করে মেইন স্ট্রীটে ফেরি করতে গিয়েছিলাম। ফিশারহিল এমনিতেই ম্যালেরিয়া প্রবণ গরীব লোকেদের জায়গা, তুক্‌তাকে বিশ্বাসও তাই তাদের বেশি।

তা বেশ কয়েক বোতল বিক্রীও হোল। এমন সময় এক ব্যাটা কনেস্টবল এসে কঁ্যাক করে ধরলো। ডাক্তারের লাইসেন্স না থাকলে নাকি এখানে ওষুধ বিক্রী করা বারন, আমাকে মেয়রের সঙ্গে দেখা করে অনুমতি আদায় করতে হবে।

তা-ই সই, পরদিন সকাল থেকে মেয়রের অফিসে ধর্ণা দিয়ে বসে আছি, ও বাবুর দেখা নেই, সেখানেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল অ্যাণ্ডি টাকারের সঙ্গে। দেখেই চিনেছি আমারই মত কথা বেচে খায় ছেলেটা। আমার একজন পার্টনার দরকার ছিল। ছেলেটিকে বেশ পছন্দ হোল আমার। তাকে বুঝিয়ে বললাম বর্তমান পরিস্থিতিটা। আমার শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথাও লুকোলাম না। অ্যাণ্ডি সেদিন সকালেই নেমেছে ট্রেন থেকে। পকেটের অবস্থা তথৈবচ। ও নাকি একটা নতুন যুদ্ধজাহাজ তৈরী করার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলতে চায়, তা ব্যাপারটা ক্যানভাস করার জন্যই কিছু টাকার তো দরকার? বাঃ কল্পনাশক্তি আছে ছেলেটার।

তা ছেলেটার সঙ্গে খানিকটা গল্পগুজব করে ফিরে এলাম। মেয়র মহাশয় দর্শন দিলেন না।

পরদিন সকালে মেয়রের বার্তা নিয়ে একটি লোক হাজির হোলো আমার হোটেলে। কি ব্যাপার? না মেয়র মশাই হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এদিকে শহরের একমাত্র ডাক্তারটিও রুগী দেখতে গেছেন অনেক দূরে। তাই মেয়রের সনির্বন্ধ অনুরোধ ডাক্তার ওয়াগহ্ (অধমের ছদ্মনাম) যেন একবার তাঁকে দেখতে আসেন।

আমি ডাক্তার নই, একথা জানিয়েও কোনও লাভ হোলনা। পরিচারকটি নাছোড়বন্দা। অগত্যা আমার সেই দৈব ওষুধের বোতল নিয়ে রওনা হলাম।

মেয়রের মনোরম প্রাসাদে গৃহকর্তাকে দেখলাম বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় অবিশ্রাম কাতরাচ্ছেন, পাশে একটি যুবক দাঁড়িয়ে। সে তাঁকে একগ্লাস জল খাওয়াতে চেষ্টা করছে।

মেয়র বললেন, ছেলেটি তাঁর ভাগ্নে মিঃ বিড্‌ল। আমার নামধাম মনে রাখার ব্যাপারে স্মৃতিশক্তির ওপর ভরসা নেই। যাই হোক, আমি মেয়রকে জানানো কর্তব্য মনে করলাম। আমার কোনও ডাক্তারীর সার্টিফিকেট নেই, আমি আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলে রোগ সারানোর চেষ্টা করে থাকি।

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে মেয়র বললেন, সে যাই হোক ডাক্তার, আপনি দেখুন যে করেই হোক আমার যন্ত্রণা যদি কমাতে পারেন।

অগত্যা আমি তাঁর নাড়ী দেখলাম, জিভ দেখলাম, দু'একটা উদ্ভট রোগের নাম বললাম। তারপর জানালাম আমি তাঁকে দু সিটিংয়ে একেবারে তাকে সুস্থ করে তুলবো, তবে প্রতিকারের জন্য আমার আড়াইশো ডলার চাই।

রাজী না হয়ে কি করেন মেয়র. এবার আমি তাঁর আত্মশক্তি জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করলাম। মনটাকে একটু একটু করে যন্ত্রণার জায়গা থেকে তুলে আনতে বললাম। সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে হাতের নানারকম ভঙ্গী করে তাঁর যন্ত্রণার জায়গাটাতে আস্তে আস্তে আরাম এনে দিতে লাগলাম। ভদ্রলোক স্বীকার করলেন, বেদনা এখন সহ্যের সীমার মধ্যে।

পরদিন ঠিক সকাল এগারোটায় দ্বিতীয় বারের চিকিৎসা করার জন্য মেয়র সদনে হাজির হলাম। দরজা খুললো সেই ভাগ্নেটি।

—সুপ্রভাত মিঃ বিড্‌ল, কাকা কেমন আছেন আজ?

—হ্যাঁ এখন কিছুটা ভাল আছেন।

আর একবার সম্মোহন বিদ্যা কাজে লাগাতেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো মেয়র। আমিও আমার দর্শনী পাঁচশো ডলার গুনে নিলাম।

আসল নাটকটা ঘটলো তখনই। ঐ মিঃ বিড্‌ল্ না ফিড্‌ল হঠাৎ একজন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর বনে গিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করতে চাইলেন।

কৌতুকের হাসি হেসে মেয়র জানালেন, ঐ লোকটি সত্যিই সরকারী গোয়েন্দা, দীর্ঘদিন ধরে ছায়ার মত আমার বেআইন কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য রাখছে। এই শহরে এসে কালই মেয়রকে সবকথা জানিয়ে আমাকে ধরার জন্য এই ফাঁদ পেতেছে।

গ্রেপ্তার এড়াতে চেষ্টার কসুর করিনি। কিন্তু ঐ গোয়েন্দা তার বন্দুকের নলটা আমার চিবুকে ঠেকিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা করে দিল আমাকে।

আমার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে গোয়েন্দা মেয়রকে বললো—এই টাকাগুলোতে আমাদের দুজনেরই বিশেষ চিহ্ন দেওয়া আছে, আমি কালই জজ কোর্টে আসামীকে হাজির করবো, প্রমাণ হিসেবে এগুলো দাখিল করতে হবে। আপনি ওখান থেকেই আপনার টাকা পয়সা পেয়ে যাবেন।

হাতকড়া সমেত আমাকে গেটের বাইরে নিয়ে এলো গোয়েন্দা। এবার আমি মুখ খুললাম।

—কি হচ্ছে অ্যাণ্ডি? রাস্তায় লোকজন জমে যাবে যে আমায় এভাবে দেখ্‌লে।

অবাক্ হচ্ছেন? আরে ও-ই তো অ্যাণ্ডি টাকার। আমরা দুজনে মিলে প্ল্যান করেই তো মেয়রকে ঠকিয়ে টাকাটা বাগালাম। আমাদের পরবর্তী যৌথ ব্যবসাব জন্যে মূলধন যোগাড় করতে হবে না?

* Jeff peters as a personal Magnet

অঘটন পটিয়সী রমণী

জেফকে সেদিন বলছিলাম, একথা তো অনস্বীকার্য যে প্রত্যেক সফল পুরুষের পেছনেই একজন না একজন মহিলার অবদান আছে।

জেফ বললো পুরান, ইতিহাস ইত্যাদিতে সে এরকম অনেক নজির দেখেছে বটে। তবে সে নিজে যেরকম আইনের ঘোমটার আড়ালে বেআইনী ব্যবসাপত্তর চালায়, সেখানে মেয়েদের কোন ভূমিকাই নেই। মানে তাদের বিশ্বাস করে কোন কাজ করতে গেলে, শেষমেশ হয়তো দেখা যায় তারা সব গুবলেট করে দিয়েছে।

অ্যাণ্ডি আর আমি সে সময় দারুন ব্যবসা করছি। বেড়ানোর জন্য লাঠি বিক্রী করতাম আমরা। তা,সে লাঠির তলার কর্কটা খুলে আপনি দিব্যি একচুমুক হুইস্কি পান করে নিতে পারেন। ওভাবে মদ বিক্রী বে-আইনী হলেও লাঠি বিক্রী তো তা নয়।

তা এমন সময় আমার পুরোনো বন্ধু বিল হাম্বল এসে হাজির। তার ধারনা আমার ও অ্যাণ্ডির অসাধ্য কিছুই নেই, তাকে, চেষ্টা চরিত্র করে ইউনাইটেড স্টেটস-এর মার্শাল করে দিতে হবে। তার বক্তব্য, সে একজন সাধাসিধে লোক। সাতটা খুন করেছে। নটা বাচ্চার বাবা। লিখতে বা পড়তে জানে না। এবং পয়লা মে থেকে একজন সাচ্চা রিপাবলিকান হয়েছে, কাজেই মার্শাল হওয়ার যোগ্যতা তার নেই বললে চলবে না।

একাজটার জন্য খরচ খরচা, ঘুষ ঘাষ, ইত্যাদি মেটাতে সে আমাদের হাজার ডলার দেবে, কাজটা হয়ে গেলে আরো হাজার ডলার।

অ্যাণ্ডির সঙ্গে পরামর্শে বসলাম। বন্ধু মার্শাল হলে আমাদের ব্যবসাপত্তরও অনেকটা নিশ্চিন্তে করতে পারবো।

বহু গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর জানতে পারলাম মিসেস অ্যাভেরী নামে উঁচুতলার এক মহিলার পক্ষে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এ ধরনের চাকরীর নিয়োগ পত্র বাগানো সম্ভব।

প্রথম দেখাতেই এই সুন্দরী কর্মব্যস্ত মহিলাকে বেশ নির্ভরযোগ্য বলে মন হোল। আমাদের সব কথা, এবং এই কাজ করে দেওয়ার জন্য আমাদের কাছ থেকে তিনি কত পাবেন, সব জেনে নেওয়ার পর বিভিন্ন কাগজপত্র ঘেঁটে তিনি বললেন, পশ্চিমের লোককে চাকরী দিতে হলে পশ্চিমের সেনেটারকেই ধরতে হবে।

সেরকম একজন আছেন সেনেটর স্লিপার। পঞ্চান্ন বছর বয়স, দুবার বিবাহিত। সোনালী চুলের মেয়ে, টলস্টয়ের নভেল পড়া পোকার খেলা ইত্যাদি পছন্দ করেন।

—হ্যাঁ ওর কাছে দরবার করে আপনার বন্ধু মিঃ বামারকে মেক্সিকোর মন্ত্রী করে দিতে পারবো।

—নামটা হাম্বল ম্যাডাম। আর ওর চাই ইউনাইটেড স্টেট্স এর মার্শেলের কাজ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আসলে আমাকে ঐ ধরনের এত কাজ করতে হয়, মাঝে মাঝে একটু গোলমাল হয়ে যায়। যাই হোক, আপনি সব কাগজপত্র, আবেদনপত্র ইত্যাদি এখানে রেখে যান। দিন চারেক পরে খোঁজ নেবেন। আশা করছি কাজটা তার মধ্যেই হয়ে যাবে।

আমি ও অ্যাণ্ডি হোটেলে ফিরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অ্যাণ্ডির ধারনা সৌন্দর্য আর মেধার এমন সমন্বয় বাস্তবে সম্ভব বলে তার আগে জানা ছিল না।

আমরা কিন্তু এইসব রাজনৈতিক ব্যাপার স্যাপারে মহিলারা যে কতটুকু সুবিধে করতে পারেন, সে ব্যাপারে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছিল। কারণ হিসেবে অ্যাণ্ডিকে আমি মিসেস আর্থারের গল্পটা শোনালাম।

আফগানিস্থান না কোথায় বিদেশী দূতাবাসে কাজ নিয়ে বেশ সন্তুষ্টই ছিল আর্থার। কিন্তু তার স্ত্রীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল অসীম। স্বামীকে কোন ভাল জায়গায় উঁচুদরের পদে আসীন দেখার জন্য সে একাই সংগ্রামে নেমে পড়লো।

যখন মিসেস আর্থার পঞ্চদশী ছিলেন, তখন এক সেনেটার নাকি তাঁকে পাঁচডজন প্রেমপত্র লিখেছিলেন। সেই চিঠিগুলি, আর দু'একটি পরিচয় পত্র নিয়ে তিনি উঠলেন ওয়াশিংটনে। তিনটি চিঠি কাগজে প্রকাশ করলেন, দু'একটি গরম গরম বক্তৃতা দিলেন কোন কোন জায়গায়। তারপর একদিন স্বয়ং প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেলেন। প্রহরীরা তৈরীই ছিল।

দরজা থেকেই তাঁকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে রাস্তায় সেলারের সামনে বসিয়ে দিয়ে গেল। এখন শুনছি মহিলা চাইনিজ মিনিষ্টারকে লিখছেন, তাঁর আর্থারকে যেন কোন চায়ের দোকানে কাজ দেওয়া হয়।

এই তো ব্যাপার। কিন্তু মহিলাদের ব্যাপারে আমার বিশ্বাস টাল খেলো।

যখন নির্দিষ্ট দিনেই হাম্বল এর নাম লেখা, ইউনাইটেড স্টেটস্ এর মোহর লাগানো নিয়োগ পত্রটি আমাদের হাতে তুলে দিলেন। তাঁর মজুরী বাবদ আমাদের দেওয়া পাঁচশো ডলার না গুনেই ড্রয়ারে রেখে দিলেন। মধুর হেসে জানালেন, কাজটা পরদিনই হয়ে গিয়েছিল, চাওয়া মাত্রই পেয়ে গেছেন। তবে এখন এরকম বহু কাজ হাতে থাকায় ইচ্ছে থাকলেও আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারছেন না।

পরদিনই ট্রেন ধরলাম আমি আর অ্যাণ্ডি, হাম্বলকে একটা তার পাঠিয়ে দিলাম সফলতার সংবাদ দিয়ে।

অ্যাণ্ডি সারা রাস্তা আমাকে মহিলাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারনা পোষনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তুললো।

গন্তব্য স্থান থেকে কয়েক মাইল আগে হঠাৎ কি ভেবে হাম্বল-এর নিয়োগপত্রটা খুলে দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল আমাদের দুজনের। নিয়োগপত্রটা বিল হাম্বল এর নামেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে নিয়োগ করা হয়েছে ডাড্ সিটির পোস্টমাস্টার পদে।

পরের স্টেশনেই নেমে পড়লাম দুজনে। নিয়োগপত্রটা বিলের নামে ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে দুজনে পাড়ি দিলাম সুদূর দক্ষিণপূর্বে লেক সুপিরিয়র অঞ্চলে।

বিলি হাম্বল কে তারপরে আর দেখিনি।

*The Hand that Riles the World

পরিণয় বিজ্ঞান

জেফ পিটার্সের ধারনা মহিলাদের কোনও কাজে সহযোগী ততক্ষণ পর্যন্তই করে নেওয়া যায়, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে ঐ সব আবেগ অনুভূতিগুলো উথলে ওঠে। অতি বুদ্ধিমতীরও গলায় দড়ি পড়ে ঐসব ইমোশান টিমোশানের বাড়াবাড়িতে।

গল্পের ঈশারা পেয়ে আর কি ছাড়ি, চেপে ধরতেই জেফ্ উগরে দিল তার আর এক অ্যাডভেঞ্চারের কথা।

প্ল্যানটা অ্যাণ্ডির মাথাতেই এসেছিল। আমাদের দুজনের নামের একটি এজেন্সি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পাত্র খুঁজবে। পাত্রী একজন ধনপতি মহিলা। সহায় সম্বলহীন উচ্চাকাঙ্খী যে ব্যক্তি সদয়, মধুর স্বভাবের এবং ব্যবসাপরিচালনায় তাঁকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক। এমন পাত্রই চাই। এজেন্সীর ঠিকানাতেই পত্রালাপ চলবে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞ্যেস করলাম—কিন্তু পাত্রী কে? সে কোথায়?

মাথা ঝাঁকালো অ্যাণ্ডি; আরে পাত্রী দিয়ে কি হবে? আমরা কি জনে জনে পাত্রী দেখিয়ে বেড়াবো নাকি? যা কিছু হবে, সব চিঠিপত্রে, আর প্রত্যেকে আমাদের এজেন্সীকে দু'ডলার করে পারিশ্রমিক দেবে, তারপর একদিন বেশ কিছু গুছিয়ে নিয়ে কেটে পড়লেই হবে।

আমি মাথা নাড়লাম,—তা হয়না অ্যাণ্ডি , আমি বেআইনী কাজ করি বটে, তবে আইনের নলচে আড়াল দিয়ে। পাত্রী একটা চাই, ধরো পুলিশের লোক বিজ্ঞাপন দেখে খোঁজ করতে করতে যদি জেনে ফেলে সবটাই ভাঁওতা? ওদের বিশ্বাস নেই বাপু। তারপর গণপ্রতারণার অভিযোগ মামলা ঠুকে দিলে গেছি আর কি?

—তা এখন হট্ করে পাত্রী পাই কোথায়? তাকে তো সব কথা বলতে হবে? বিশ্বাস করতে পারি এমন কোনও বিধাবাকে চেনো নাকি তুমি?

—একজনের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল, যদিও তরুণী বা ধনবতী নয়, তবে সেন্টপার্সেন্ট বিধবা এবং নিঃসঙ্গ। আমার বন্ধু জেক ট্রটার, হঠাৎই মারা গেছে বেচারা। তার বউএর সঙ্গে বেশ আলাপ আছে আমার। তিনকূলে কেউ নেই তার। মাঝে মাঝে যাই দেখা করতে। দেখি সে কি বলে।

মিসেস ট্রটার আমাকে বিশ্বাস করে বলেই রাজী হয়ে গেল। কথা হোল বাড়ীতে তালা দিয়ে সে শহরের হোটেলে থাকবে। সপ্তাহে পঁচিশ ডলার তাকে দেব আর হোটেলের যা খরচা, সব আমাদের। আড়াই হাজার ডলার তার নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দিলাম। পাশ বইটা তার কাছেই রইল। যদি কোন নাছোড়বান্দা পাত্র পাত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চায়, তবে সে যে ধনবতী, সে বিশ্বাস জন্মানোর জন্যই ওটা হাতের কাছে থাকা চাই।

বিজ্ঞাপনে অভূতপূর্ব সাড়া মিললো। এত অলস অকমর্ণ্য লোক যে ধনবতী বিধবাকে ব্যবসায়ে সাহায্য করতে উন্মুখ, ভাবতে পারিনি। প্রত্যেককেই লিখলাম, বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে চিঠি ও দুটি ডলার আমাদের চিঠি পৌঁছে দেবার মাশুল হিসেবে পাঠাতে বললাম।

কিছু অতি উৎসাহী পাত্রীর সঙ্গে দেখা করেও এলো, তবে মিসেস ট্রটারকে বলাই ছিল, বেশি বিরক্ত করলে অনায়াসে তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারেন।

এরপর কয়েকটা দিন খাম খুলে টাকা বার করতে করতেই কেটে গেল কয়েকটা দিন। যা আশংকা করেছিলাম, পুলিশের গোয়েন্দা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে একদিন এসে হাজির। যাই হোক্, সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাত্রীর হোটেলে নিয়ে গিয়ে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়ে দিলাম। তিন মাসে পাঁচহাজার ডলার কামালাম। এবার এ ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। পাত্রদের তরফ থেকে প্রচুর অভিযোগ আসছে। পাত্রীও পাত্র দেখে দেখে ক্লান্ত।

শেষ সপ্তাহের মাইনে দিয়ে মিসেস ট্রটারকে বাড়ী পাঠানোর ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখি তিনি স্কুলে না যেতে চাওয়া শিশুর মত বসে বসে কাঁদছেন। ব্যাপারটা কি? সেই আড়াই হাজার ডলার যা তাঁর নামে রেখেছিলাম,সেটাও তো ফেরৎ দেওয়ার কথা আমাকে?

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে তিনি জানালেন, পাত্রদের মধ্যে একজন প্রায়ই তাঁর সাথে দেখা করতে আসতো। তাকে তিনি ভালবেসে ফেলেছেন, ঐ আড়াই হাজার ডলার পেলে সে তাকে বিয়ে করতে রাজী হবে বলে তাঁর বিশ্বাস। পাত্রটির নাম উইলিয়াম উইলকিনসন। তাকে ছাড়া মিসেস ট্রটার বাঁচবেন না।

মনটা নরম হয়ে গেল। ফিরে এসে অ্যাণ্ডির সঙ্গে পরামর্শ করলাম। সে বললো, তার অত বাড়তি আবেগ, মায়াদয়া নেই, তবে আমার খাতিরে ব্যবস্থাটা মেনে নিতে রাজী আছে। মিসেস ট্রটার যেন ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলে ঐ উইলিয়াম না কাকে দিয়ে দেন।

সেই মতই ব্যবস্থা হোল। অ্যাণ্ডি দেখি সেদিনই ফেরার জন্য ব্যাগ গুছোচ্ছে। আমি অবাক হয়ে বললাম—এত তাড়াহুড়োর কি আছে? চলো একদিন মিসেস ট্রটারের সঙ্গে দেখা করে আসবে। তুমি তো তাঁকে কোনদিন দেখইনি। আমার কাছে তোমার কথা শুনে শুনে তোমাব সঙ্গে আলাপ করতে খুবই আগ্রহী তিনি।

অ্যাণ্ডি কিন্তু জিদ ছাড়লো না—রাখো তো ওসব ঝামেলা। কাজ হয়ে গেছে, এবার তাড়াতাড়ি কেটে পড়াই ভাল।

পাত্রদের বাদান্যতায় পাওয়া টাকাগুলো গুছিয়ে কোমরে বেঁধে নিচ্ছিলাম, অ্যাণ্ডি আরো কিছু টাকা এগিয়ে দিয়ে ওগুলোও একসঙ্গে রেখে দিতে বললো।

—ও টাকাটা কিসের? আমি অবাক হয়ে বললাম।

—মিসেস ট্রটার দিয়েছেন তাঁর ভাবী স্বামীকে। সপ্তাহে তিনদিন করে তাঁর সঙ্গে গল্প করতে যেতাম যে।

—আরে, তুমিই তাহলে উইলিয়াম উইলকিন্‌সন্?

—ওর কাছে তা-ই ছিলাম।

*The Exact Science of Matrimony

শিল্পের চাতুরী

প্রতারণার আইনসঙ্গত রাস্তাটা কিছুতেই আমার পার্টনার অ্যাণ্ডি টাকারকে শেখাতে পারলাম না, আক্ষেপ করছিল জেফ পিটার্স। আসলে ওর কল্পনাশক্তি এত বেশি যে সৎ থাকা ওর ধাতে সয় না। বেশ ছিল ফ্যামিলী অ্যালবাম, আরশোলা মারাব ওষুধ, মাথাধরা সারানোর পাউডার এইসব বিচিত্র জিনিষ মিড্‌ল ওয়েস্ট-এ ফেরি করে, কিন্তু বেশিদিন একটা কাজ নিয়ে থাকতে পারে না। হঠাৎ একদিন এসে বললো—এইসব দু'পয়সার লোকদের সঙ্গে কাজ করে পোষাচ্ছে না, এসো, একটা বড় দাও মারার চেষ্টা করি।

কি রকম? পিট্‌স্‌বার্গের ধনী লোকেরা দুহাতে পয়সা খরচ করে। নিউইয়র্কে হোটেলে থাকতে এসে তারা দশদিন খাবার জন্য খরচ করে পঞ্চাশ ডলার, কিন্তু বকশিসের জন্য খরচ করে পাঁচহাজার সাতশো পঞ্চাশ ডলার। এধরনের লোককে বোকা বানানো তো বাঁ হাতের খেলা।

পিট্স্‌বার্গে দিনচারেক কাটানোর পর অ্যাণ্ডি একরাতে বেশ উত্তেজিত ভাবে হোটেলে আমার ঘরে এলো। একজন আয়েল কিংকে পাকড়াও করেছে সে। লোকটা টাকার কুমীর, কিন্তু বেশ দিলখোলা। এতকাল শুধু টাকাই কামিয়েছে, এখন বাড়ীতে অধ্যাপকের কাছে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত পাঠ নিচ্ছে।

ভদ্রলোক প্রথম দর্শনেই নাকি অ্যাণ্ডিকে খুব পছন্দ করে ফেলেছেন। ওকে সঙ্গে করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সংগ্রহ চল্লিশ হাজার ডলার মূল্যের ছবির সংগ্রহ আছে। আর একটি ঘরে কিউরিও আছে, তা ও প্রায় কুড়িহাজার, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স, পিয়ানো বাজানো শিখতে শুরু করেছে, প্রতিদিন তার তেলের কূয়ো থেকে প্রায় পনেরো হাজার ব্যারেল তেল ওঠে।

আমি অধৈর্য্য হয়ে অ্যাণ্ডিকে বাধা দিলাম—সব বুঝলাম, কিন্তু তেল বা অ্যান্টিক নিয়ে আমরা কি করবো?

—স্কাডার আমাকে একটা খোদাই করা সুন্দর মূর্তি দেখালো। একজন ইজিপ্‌শিয়ান ভাস্কর, তার নাম কাফ্‌রা, প্রায় দুহাজার বছর আগে তৃতীয় রামেসিস এর জন্যে তৈরী করেছিল। একটা পদ্মফুলের মধ্যে একটি মেয়ের মুখ। এরকম দুটো ছিল বলে জানা গেছে, কিন্তু আর একটার কোনও হদিশ নেই। এটা স্কাডার দু'হাজার ডলার দিয়ে কিনেছে।

—কি যে আবোল তাবোল বকছো, আমরা কি কোটিপতিদের কাছ থেকে শিল্পচর্চার পাঠ নিতে এসেছি নাকি?

—দেখোই না কি হয়।

একথা বলে তো অ্যাণ্ডি নিজের ঘরে চলে গেল। পরের দিন সারা সকাল তার টিকির দেখা নেই। দুপুরের দিকে এসে দেখালো ঠিক যেমনটি স্কাডারের কাছে দেখেছিল, ঠিক তেমনই একটি অনুপম ভাস্কর্য। সারা সকাল বন্ধকী জিনিষের দোকান ঘুরে ঘুরে এক দোকানের জঙ্গলের স্তূপ থেকে এটা উদ্ধার করেছে সে, আর কিনেও নিয়েছে পঁচিশ ডলার দিয়ে।

অ্যাণ্ডির ধারনা এটা স্কাডারের মূর্তিটারই জুড়ি। ওটা নিশ্চয়ই স্কাডারের কাছে দুহাজার ডলারে বিক্রী করা যাবে।

—তা যেতে পারে। কিন্তু কি করে আমরা ওটা ওকে কেনাবো। ওটা যে আসল জিনিষ বোঝাবো কি করে।

অ্যাণ্ডির প্ল্যান তৈরীই ছিল। আমি একটা নীল চশমা পরে নিলাম, চুলটা এলো মেলো করে নিয়ে প্রফেসার পিক্‌লম্যান বনে গেলাম। অন্য একটা হোটেলে উঠে গিয়ে স্কাডারকে এইমর্মে একটা তার করে দিলাম যে জরুরী একটা কাজে সে যেন অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করে।

আধঘন্টার মধ্যেই স্কাডার এসে উপস্থিত। তাকে বললাম, আমি হাতির দাঁতের একটি মূর্তি কিনেছি। শুনেছি ওটা তৃতীয় রামেশিসের আমলে এক ভাস্কর একটা পদ্মফুলের মধ্যে রাণী আইসিসের মূর্তি খোদাই করেছিল। আমি ওটা বন্ধকী—না মানে ভিয়েনার একটা অখ্যাত যাদুঘর থেকে পেয়েছি। তা, শুনলাম ওর জুড়ি মূর্তিটা নাকি তোমার কাছে আছে, আমি ওটা কিনতে চাই। তোমার দাম বলো।

—কি বলছো প্রফেসার। কর্ণেলিয়াস স্কাডার যে জিনিষ নিজে রাখতে চায়, সে জিনিষ বিক্রী করবে? তোমার মূর্তিটা কি তোমার কাছে আছে? আমি একটু দেখতে পারি।

মূর্তিটা বার করে দিলাম। স্কাডার খুব আগ্রহের সঙ্গে সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

—আরে, ঠিকই তো, এর জুড়িটাই তো আমার কাছে আছে, কিন্তু আমি তো সেটা বেচবো না, তুমি কি দয়া করে তোমারটা আমার কাছে বেচবে? এ জিনিষটা আমি কতদিন ধরে কত জায়গায় খুঁজেছি। বেচ্‌বে আমাকে, আড়াই হাজার ডলার দেবো তোমাকে।

—ঠিক আছে। তুমি যখন বিক্রী করবে না, তখন আমরটাই নাও। বড় নোটে নগদ দাও টাকাটা । আজই আমায় নিউইর্য়ক যেতে হবে। ওখানকার অ্যাকুইরিয়ামে একটা বক্তৃতা আছে আমার।

স্কাডার তখনই একটা চেক কেটে দিল এবং হোটেল থেকেই সেটা ভাঙিয়ে টাকাটা আমার হাতে এসে গেল।

আমি প্ল্যানমতো অ্যাণ্ডির হোটেলে দ্রুত ফিরে দেখি অ্যাণ্ডি অস্থির হয়ে পায়চারী করছে।

—পাঁচশশো ডলার পেয়েছি অ্যাণ্ডি। নগদ।

—পশ্চিমে যাবার গাড়ী ছাড়তে আর মাত্র এগারো মিনিট বাকি। শিগ্‌গীর তোমার মালপত্র নিয়ে এসো।

—এতো তাড়া কিসের অ্যাণ্ডি। মূর্তিটা যদি আসল না-ও হয়, বুঝতে ওর কিছুটা সময় তো লাগবেই। ও তো ওটাকে আসল বলেই ধরে নিয়েছে দেখলাম।

—ওটা আসলই। কাল যখন ওর কিউরিওগুলো দেখছিলাম, ও অল্প সময়ের জন্য ঘরের বাইরে গিয়েছিল। সেই সুযোগে আমি ওর মূর্তিটাই তুলে এনেছিলাম। সেটাই তুমি এইমাত্র ওকে পাঁচিশশো ডলারে বেচে এলে, বুঝেছো?

—তবে আমাকে বন্ধকী দোকানের গল্পটা শোনানোর কি দরকার ছিল?

—ওঃ ওটা তো তোমার বিবেককে সান্ত্বনা দেবার জন্য। চলো, চলো,বেরিয়ে পড়ি।

*Conscience of Art

ওস্তাদের মার

প্রতি শীতে আমি জেফ পিটার্সের পথ চেয়ে থাকি। কেননা এই সময় ছুটি কাটাতে জেফ নিউইর্য়কে আসবেই। ওর কাছ থেকে গল্প বার করার সুযোগ বছরে এই একবারই আসে।

এবারও আমাদের পরিচিত রেষ্টুরেন্টে প্যাঘেটি খেতে খেতে জেফ অসাধুতার তারতম্য বিষয়ে তার অভিমত ব্যক্ত করছিল। তার মতে শেয়ার বাজার আর ডাকাতি, এ দুটোর কোনটাই তার ধাতে সয় না, এগুলো সমাজ থেকে উঠে যাওয়াই ভাল।

ডাকাতির বিষয়টাই বিশেষ করে জানাতে ইচ্ছে হোল। এই থেকেই জেফ এর গল্পের সূত্রপাত।

গত কাজের মরশুমে জেফ বেশ বেকায়দায় পরে গিয়েছিল। আরকানসাসের একটা ছোট শহরে নিজের ঘোড়ায় টানা গাড়ী নিয়ে ঢুকেই বুঝতে পেরেছিল, মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছে সে। কয়েক বছর আগে এখানেই সে প্রায় ছশো ডলারের ফল গাছের চারা বিক্রী করে গিয়েছিল, আর শহরবাসীরা তক্কে তক্কে ছিল, কবে সে আবার ফিরে আসে। কাজেই উত্তেজিত জনতা সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ঘেরাও করে নিয়ে গিয়ে দেখালো, প্রতিটি গাছই পরিণত হয়েছে বুনো ঝোপঝাড়ে। ফল ফলাবার মত গাছ একটা ছিল, সেটা শিমুল গাছ।

যাই হোক, তারা জেফ-এর গাড়ী, ঘোড়া এবং টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে এক বস্ত্রে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিল।

সহায়সম্বলহীন জেফ যখন রেললাইনের ধারে আকাশ পাতাল ভাবছে, সেখানে একে একে আরও দুই মূর্তি এসে হাজির। একজন বিল ব্যাসাট, পেশায় সাধাসিধে ডাকাত। জেফকে সে এক বসন্তে মিসৌরীতে রঙিন বালি বিক্রী করতে দেখেছিল, তাই মুখ চেনা। অন্যজন বড়দরের প্রতারক আলফ্রেড. ই. রিকস। সে শিকাগোয় এক পরিপাটি সাজানো অফিস থেকে ফ্লোরিডার জলের তলার জমি বিক্রী করেছিল। একজন খদ্দের সরেজমিন তদন্ত করতে গিয়ে ভাঁওতাটা টের পেয়ে যায়। তারপর কাগজে প্রতারক আলফ্রেড. ই. রিকস-এর ছবি সহ ব্যাপারটা বেরিয়ে যাওয়ায় একবস্ত্রে পিছনের দরজা দিয়ে পালানো ছাড়া গতি ছিল না তার।

এই তিন কপর্দকহীনের নেতৃত্ব নিয়ে নিল বিল ব্যাসাট। রাতের প্রতীক্ষায় একটা পরিত্যক্ত কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিল তারা। সন্ধ্যে ঘনাতেই কাজে নেমে পড়লো ব্যাসাট। প্রথমে একটা ফার্মহাউস থেকে কিভাবে খাবার চুরি করে আনলো ভগবানই জানেন। তিনজনের উদর পূর্তির পর রাত নিঝুম হলে আবার কাজে নেমে পড়লো ব্যাসাট। স্থানীয় ছোট্ট ব্যাংকের তালা ভেঙে পাঁচহাজার ডলার তুলে আনলো সে। প্রমাণ করে দিতে চাইলো তার পথটাই শ্রেষ্ঠ ফলপ্রসূ। ঐ টাকা থেকে সাথীদের ভাগ দিতেও চাইলো সে। অ্যালফ্রেড রিকস কৃতজ্ঞতার সঙ্গে একশো ডলার নিয়ে নিজের পথ দেখলো। কিন্তু আমাদের জেফ তো কখনও কিছু না দিয়ে কিছু নেয়না। বিশেষ করে তার খদ্দেররা সামান্য আর্থিক ক্ষতির বিনিময়ে ভবিষ্যতে দ্বিতীয়বার প্রতারিত না হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতার শিক্ষাটা পেয়ে যায়। তাই সে ব্যাসার্টের দান প্রত্যাখ্যান করলো, কিন্তু দুর্দিন না কাটা পর্যন্ত ব্যাসার্টের সঙ্গে রয়ে গেল।

ডাকাতির টাকায় একটা জুয়াখানা খোলার পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাসার্ট আরিজোনার একটা ছোট শহরে এসে পৌছল, সঙ্গে জেফ পিটার্স। সেখান পৌছে জেফ তার এক পুরোনো বন্ধুর খোঁজ করে তার কাছে ধার হিসাবে দুশো ডলার সংগ্রহ করলো, ততক্ষণ বিল ব্যাসার্ট জুয়োখানার জন্য ঘর এবং আসবাবের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিল।

দুশো ডলার পেয়েই জফ পিটার্স ঐ শহরের যে একটি মাত্র দোকানে তাসের প্যাকেট বিক্রী হোত, সেখানকার সব তাস কিনে নিল। আবার পরদিন সকালেই কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে সব তাসগুলোই দোকানদারের কাছে অর্ধেক দামে বেচে দিল। এতে তার পঁচাত্তর ডলার লোকসান হোল বটে, কিন্তু আখেরে দেদার লাভ।

এক রাতেই জেফ প্রতিটি তাসের পেছনে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল। ব্যাসাটকে সেই তাসই কিনতে হয়েছে জুয়ো খেলার ব্যবসার জন্য, তাই পরদিন জুয়োর আড্ডায় প্রথম খেলুড়ে জেফ অক্লেশে সব বাজী জিতে নিল। তার পকেটে এলো পাঁচহাজার ডলারের কিছু বেশি টাকা।

ব্যাসাট এবার স্বীকার করে নিল, ব্যবসা ট্যাবসা তার ধাতে সইবে না, সে শ্রমিক আছে তাই থাকবে। অর্থাৎ সরাসরি ডাকাতিকেই সে উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম করবে। জেফ-এর তাসের ভাগ্যের তুলনা হয় না। তাকে অভিনন্দন জানিয়ে শহর ছাড়লো ব্যাসাট। এরপর দুজনের আর কোনদিন দেখা হয়নি।

জেফ পিটার্স-এর গল্প শেষ হলে আমি বললাম—তা বেশ তো। মোটা মূলধন যখন জোগাড় হয়েছে, তখন কোন ভাল সরকারী প্রকল্পে টাকাটা লগ্নি করো, ভবিষ্যতের জন্য থাকবে।

—আরে সেকথা আর আমাকে বলে দিতে হবে না। এই দেখো, পকেটে নিয়ে ঘুরছি। সোনার খনির অংশীদার হয়েছি ঐ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে। বছরে শতকরা পাঁচশো ভাগ সুদ। তুমিও কিছু শেয়ার কিনে রাখতে পারো।

—এই সব সোনার খনিটনিগুলো সব সময়—

—আরে না, এটা নতুন আবিস্কার হয়েছে । শতকরা একশো ভাগ খাঁটি। এই দেখো না!

টেবিলের ওপর বিছিয়ে রাখা বণ্ডগুলো দেখতে দেখতে বললাম—আচ্ছা! কলোরাডোতে? আচ্ছা জেফ, তোমাদের দুর্দিনে তোমাদের তৃতীয় যে সঙ্গীটি ছিল, তার নাম যেন কি ছিল?

—ও, ঐ ব্যাণ্ডটার নাম হচ্ছে অ্যালফ্রেড, ই, রিক্‌স।

—আচ্ছা। এই মাইনিং কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট হিসেবে সই করেছে এ. এল. ফ্রেডিরিক্‌স। সেই লোকটাই নয়তো?

—কই দেখি, দেখি। এক ঝটকায় আমার হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিল জেফ।

তারপর তার মুখের চেহারাটা হোল দেখার মত। অপ্রস্তুত ভাবটা আড়াল করার জন্য আমি ওয়েটারকে ডেকে আর এক বোতল বারবেরা আনতে দিলাম। এ ছাড়া আর কি-ই বা আমি করতে পারতাম?

*The Man Higher Up

প্রেমিক বাতাস

বাকিংহাম স্কিনারের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা বেশ নাটকীয় পরিবেশে। কানকাস সিটিতে একটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখি একটা খড়রঙা চুলের মাথা দোতলায় "চাষীদের ঋণদান সংস্থার" র বারান্দা থেকে ঝুঁকে 'হো—য়া" বলে একটি বিকট চীৎকার করে দুড়দাড় করে নেমে এসে রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। খানিক পরে দেখি তেমনি ভাবেই দৌড়ে ফিরে এসে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

মজাটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ওখানেই অপেক্ষা করলাম। শেষে নেমে এলো লোকটি। রাস্তায়ই পাকড়াও করলাম তাকে—কি ব্যাপার? তোমার ঘোড়াটাই গাড়ী সমেত ছুটে পালালো বুঝি, সেটাকে তো একটু আগেই আমি রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করতে দেখেছিলাম।

আমাকে ভাল করে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সলজ্জ হাসলো ছেলেটি, তারপর করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো—আমি বাকিংহাম স্কিনার। আপনি তো পার্লিভো পিকেন্‌স্‌, আমাদের লাইনে আপনাকে কে না চেনে? সবই তা বুঝেছেন।

—বুঝিয়ে বললে আর একটু পরিস্কার হয়।

—আমি ঐ ঋণদান সমিতিতে গিয়েছিলাম বোনের সঙ্গীত শিক্ষার খরচ জোগানোর জন্য চাষের জমি বাঁধা দিয়ে টাকা ধার করতে। বুঝতেই পারছেন, বোন আর জমি, দুটোর অস্তিত্বই আছে কেবল আমার মগজে। তা সব কথাবার্তা হয়ে যাবার পর ওরা যেই জমির দলিল চাইলো আমি অমনি বারান্দা দিয়ে উঁকি দিয়ে ঐ বিকট চীৎকারটা দিয়ে খানিকটা ছুটে এলাম। ফিরে এসে ওদের বললাম আমার ঘোড়াটা ওয়াগন সমেত ছুটে পালাতে গিয়ে ধাক্কা লগিয়ে গাড়ীটার চাকা ভেঙেছে, আমাকে এখন পুরো রাস্তা ভাঙাগাড়ী টেনে নিয়ে হেঁটে ফিরতে হবে। পয়সা আনতে ভুলে গেছি, চাকা সারাতে পারবো না। কাজেই এখন চলি, পরে দেখা যাবে।

খদ্দের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে ওরা স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে চাকা সারানোর জন্য দশ ডলার ধাব দিল। কাল সকালে জমির কাগজপত্র জমা দেওয়ার সময় টাকাটা ফিরিয়ে দিলেই হবে। আসলে পকেট ফাঁকা, তাই এই ছিঁচকেমিটুকু করতেই হোলো।

কথায় কথায় আমরা অনেকদূর চলে এসেছি। ছেলেটিকে ভাল লাগলো। ঠিক করে ফেললাম পরবর্তী ব্যবসায়ে একে অংশীদার করে নেবো।

বাকের অভিমত, এতকাল আমরা গরীব লোকের পকেটের বাড়তি দু'একপয়সা নিয়ে ব্যবসা করেছি। এবার বড় শহরে বড় ব্যবসা ধরতে হবে, তাতে নিশ্চয়ই বেশ কিছু রুইকাতলা জালে ধরা পড়বে। যাদের অনেক আছে, তাদের ঠকানো বিবেকসঙ্গত বলেই আমার মনে হয়। তা, বড় ব্যবসার মূলধন জোগাড় করেছিলাম আমরা অভিনব উপায়ে।

বাক্ তার পরিচিত মলি বলে একটি মেয়েকে এনেছিল আমাদের দলে। প্ল্যান মত বাক্ আর মলি ছোট একটা ফার্ম হাউসে সন্ধ্যের পর ঢোকা দিল। তাদের বেশভূষা, আচার আচরণ বেশ উদ্‌ভ্রান্ত। সহৃদয় কর্তা ও গিন্নিকে তারা জানালো, কড়া প্রকৃতির বাবার ভয়ে এই প্রেমিক যুগল পালিয়ে এসেছে, এখনই বিয়ে করা ছাড়া উপায় নেই তাদের। যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারে। কিন্তু এখন পাদ্রী কোথায় পাওয়া যাবে? এ হেন সময়ে পাদ্রীর বেশে আমাকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে হাতে চাঁদ পেলো সবাই। গৃহকর্তা ও কর্ত্রীর আশীর্ব্বাদের মধ্যে দিয়ে বাক্ ও মলির বিয়ে দিয়ে দিলাম, রীতিমত সার্টিফিকেট সমেত। কর্তা গিন্নী সাক্ষী হিসেবে সই-ও করলেন। তারপর আমরা তিনজন আবার পথে নামলাম। এভাবে প্রায় কুড়িটা ফার্ম হাউজে বাক ও মলিকে কুড়িবার বিয়ে দিলাম। এরপর আমরা সেই হ্যান্ড নোট তথাকথিত ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙিয়ে নিলাম, কেননা সেগুলো আসলে তিনশো থেকে পাঁচশো ডলারের হ্যাণ্ড নোট, টাকাটা ব্যাঙ্ক যখন তাদের কাছ থেকে আদায় করবে, রোমান্স কি বস্তু, হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

মলিকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিলাম। সে আর এসব উঞ্ছবৃত্তি করবে না। এবার সিনসিনাটিতে গিয়ে ম্যাডাম মারামোলাই নাম নিয়ে এক ডলার করে ফি নিয়ে লোকের ভাগ্য গননা করবে।

চার হাজার ডলারের মত মূলধন যোগাড় হোলো। এবার আমাদের অভিযান বড় শহর নিউইর্য়কে। ওখানে ইস্টসাইড হোটেলে রমুলাস জি অটারবারি নামে একজন বিশাল পয়সাওয়ালা লোকের সঙ্গে আলাপ হোল। তার মাথা দেখলাম আমাদের চেয়েও বেশি বদ মতলবে ঠাসা।

সে বললো আমরা তিনজনে মিলে একটা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী খুলবো। সেভাবে বড়বড় কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে প্রচুর বড় বড় লোক মাসে মাসে মোটা সুদ হাতে হাতে পেয়ে যাবার লোভে এবং জমা টাকা দ্বিগুন হয়ে যাবার আশা পেয়ে মোটা অংকের শেয়ার কিনবে। মাস তিনেক এ ব্যবসা চালিয়ে যা টাকা জমা হবে, তা নিয়ে কেটে পড়লেই হবে। বেশী দিন এ ব্যবসা চালু রাখা নিরাপদ নয়।

সেইমত অফিস ভাড়া করে ব্যবসা শুরু করে দেওয়া গেল। কে, কত টাকা দিচ্ছে, তা দেখার, কাগজপত্র তৈরী করার দায়িত্ব অটারবারির, বাক্ টাকাপয়সা সামলায়। আমি টাকার কুমীর ভাইস প্রেসিডেন্ট সেজে টেবিলের ওপর পা তুলে আপেল চিবিয়ে দিন কাটাই। বেশ চলছিল। তিনমাসে পড়তে না পড়তেই বিপত্তি। অটারবারি খবর দিল একজন লোক টাকা লগ্নী করতে আসার অজুহাতে আমাদের ব্যবসাটা সম্বন্ধে হাজার একটা প্রশ্ন করে গেছে। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি সরাসরি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে অটারবারির মত তুখোড় ধান্দাবাজও থমকে গেছে। ও লোকটা খবরের কাগজের রিপোর্টার না হয়েই যায় না।

অটারবারি দূরদর্শী বটে। পরদিন সকালের কাগজেই দেখলাম আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সন্দিহান মন্তব্য করা হয়েছে। অফিসে এসে দেখি তুলকালাম কাণ্ড। দলে দলে বুড়ো বুড়ি, তরুণী, এমনকি ছোট ছোট ছেলে পর্যন্ত ভিড় জমিয়েছে, দরজা ভেঙে পরার উপক্রম হয়েছে। অটারবারি সটকান দিয়েছে। ভিড়ের চেহারা দেখে আমাদের চক্ষুস্থির। এ কাদের ঠকাবার ব্যবস্থা করেছি আমরা। দুঃসহ বৃদ্ধা মহিলারা তাদের শেষ সম্বল হারাবার ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। অল্প বেতনের খেটে খাওয়া তরুণীরা তাদের না খেয়ে জমানো টাকা তুলে

দিয়েছে। কাগজ বিক্রেতা ছেলেটি পর্যন্ত তার সামান্য সঞ্চয় জমা করেছে আমাদের কাছে। একটি লাল শাল গায়ে দেওয়া তরুণী এক কোনে হাপুস নয়নে কাঁদছে। তাকে জিগ্যেস করে জানলাম, তার জমা টাকা যদি ফেরৎ না পাওয়া যায়, তার বিয়ে ভেঙে যাবে। তার প্রেমিক নিশ্চয়ই রোজাকেই বিয়ে করবে। রোজার জমানো চারশো ডলার আছে সে জানে।

খবরের কাগজের রিপোর্টারটিও দেখলাম দেওয়ালে হেলান দিয়ে পাইপ টানছে। আমি আর বাক্ দ্রুত পরামর্শ করে নিলাম। নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে যেতে আমরা কেউই রাজি নই। সবাইকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে এক এক করে সকলের জমা টাকাই ফিরিয়ে দিলাম। সেই মেয়েটিকে বিয়ের উপহার হিসেবে বাড়তি পঁচিশ ডলার পর্যন্ত।

রিপোর্টারকে বললাম শুরুটা তো লিখেছো শেষটা লিখবে তো? সে হেসে বললো, এ খবর নিয়ে গেলে তার এডিটারই অসম্ভব বলে মনে করবে। পাঠক সাধারণ তো ছাড়। যাইহোক মানুষটিকে সাচ্চা মনে হোল। তার হাতেই বাকি টাকা পয়সা, আর যারা এখনও জমা টাকা নিতে আসেনি, তাদের নামের তালিকা দিয়ে, বাকি কাজটুকু মিটিয়ে দিতে অনুরোধ করলাম। সে সানন্দে রাজী হয়ে গেল।

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আর বাক্ একটা ছোট্ট হোটেলের ঘরে চলে এলাম। কদিনের আয়েস আবাম ছাড়া আবার পুরানো ব্যবসায়ে ফিরতে হবে। বর্তমানে জলের সঙ্গে দারচিনির রস, লাল রং মিশিয়ে কয়েক ডজন শিশিতে ভর্ত্তি করছি। প্রথমে ভেবেছিলাম ওগুলো হেয়ারটনিক হিসেবে বিক্রী করবো। কিন্তু আমাদের স্টকে হেয়ার টনিকের লেবেল বেশি নেই, অঢেল লেবেল আছে ঠাণ্ডা লাগা সারানোর ওষুধের। অগত্যা ঐ লেবেলগুলোই লাগিয়ে দিলাম। শরীর ঠিক না থাকলে চুল নিয়ে হবেটা কি?

*A Tempered Wind

আহত স্বাভিমান

কিড ব্র্যাডি যখন তার প্রেমিকা মলির অনুরোধে ছিনতাইবাজী ছেড়ে সুস্থ জীবনে প্রবেশ করতে চাইলো, বন্ধুরা ক্ষুণ্ন হোলো, কিন্তু অবাক হোলো না। ক্ষুণ্নতার কারণ স্টোভপাইপ গ্যাং-এর সবচেয়ে চালাক চতুর এবং দক্ষ ছেলে কিড। যে সব ছেলেরা ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে নখের পরিচর্যা আর গুলতানি করে সময় কাটায়, আর সুযোগ পেলেই বিনা রক্তপাতে পথচলতি মানুষের পকেট হালকা করে, কিড ছিল তাদের নেতা।

আর, অবাক না হবার কারণ, এরকম ঘটনা, অর্থাৎ প্রেমের খাতিরে দল ছেড়ে দেবার ঘটনা আগেও ঘটেছে।

একদিন ক্রন্দনরতা মলিকে সান্ত্বনা দিয়ে কিড বলেছিল—এবার চোখের জলের কলটা বন্ধ কর দিকিনি। বলছি তো, ওসব চুরিচামারি ছেড়ে সৎ পথে উপার্জন করবো। এক বছরের মধ্যেই বিয়ে হবে আমাদের। তারপর একটা ফ্ল্যাট, একটা ফ্লুট আর একটা সেলাই মেশিন নিয়ে শুরু করবো আমাদের সংসার।

—ও কিড, তুমি যদি বলতে সমস্ত নিউইয়র্কটাই কিনে দেবে তার চেয়েও বেশি খুশী হোলাম তোমার কথা শুনে।

নিজের দামী পোষাক আর চকচকে জুতোর দিকে চেয়ে একটু ম্লান হাসলো কিড।

—এইসব বড়মানুষী আবরণ অবশ্য আর জুটবে না। অথচ তুমি তো জানো, সস্তা জিনিষে আমার রুচি নেই কোনও দিনই।

—আমার চোখে তুমি সবসময়ই সুন্দর কিড।

যাই হোক বাপ বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়ে শেখা কলের মিস্ত্রির কাজটাই শুরু করলো কিড। অবশ্য অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে। মাইনে মাসে পচাত্তর ডলার মাত্র।

তা আটমাস বেশ ভালভাবেই কেটে গেল, তারপর একদিন সন্ধ্যেয় সে মলিকে চমৎকৃত করে দিল দামী রাশিয়ান ফারের স্কার্ফ আর মাফলার উপহার দিয়ে। এই প্রথম ফার-এর স্পর্শ পেলো মলি। আয়নায় নিজেকে দেখে দেখে আর আশ মিটছিল না তার।

প্রাথমিক উচ্ছাসটা কেটে যাবার পরই দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়লো মলির কপালে। কিড বলেছে জিনিষটা খাঁটি, মোট দাম চারশো পঁচিশ ডলার। মলিকে দেবার জন্য সস্তা ঝুটো মাল কেনার কথা সে ভাবতেও পারে না। এত টাকা কিড পেলো কোথায়?

প্রশ্নটা তুলতেই রেগে গেল কিড।

—পুরোনো লাইনটা ছেড়ে দিয়েছি, যখন দিয়েছিই, একথাটা বিশ্বাস করতে পারো। টাকাটা জমিয়েছি।

—মাসিক পঁচাত্তর ডলার আয় থেকে মাত্র আটমাসে এত টাকা জমালে কিভাবে?

—আরে আমার কি আটমাস আগে একেবারে হাত খালি ছিল নাকি? তুমি কি বিশ্বাস করতে পারছো না আমি দল ছেড়ে দিয়েছি?

—না, না কিড, সেকথা নয়, আমি ভাবছিলাম—যাক্ গে সেসব কথা। চলো একটু বেড়িয়ে আসি। আমার সাজটা দেখাতে ইচ্ছা করছে সবাইকে।

রাস্তা দিয়ে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়ালো এই সুখী তরুণ তরুণী। নতুন 'ফার' একটা বাড়তি দীপ্তি এনে দিয়েছে মেয়েটির মুখে।

পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান র‍্যামসন রোজকার মতই ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে অঞ্চলে। ওখানে সবাই চেনে এই নির্ভীক সৎ লোকটিকে। মাঝে মাঝে স্টোভপাইপের বাসিন্দাদের সঙ্গে টুকরো টুকরো আলাপচারিতার মাধ্যমেই সে কিছু কিছু খবর পেয়ে যায়।

আজ তেমনি একজন তরুণ পথের ছেলের কাছে সে জানতে পারলো কিড তার মলিকে দারুণ রাশিয়ান ফার কিনে দিয়েছে। লোকের মুখে মুখে অবশ্য তার দামটা ততক্ষণে বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ন'শো ডলার-এ।

ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে। দ্রুতগতিতে পা চালিয়ে কিড আর মলিকে ধরে ফেললো র‍্যামসন।

—তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে কিড।

—কি ব্যাপার। আমি তো আর—

—গতকাল ওয়েস্ট সেভেন্থ স্ট্রীটের মিসেস হেথকোট এর বাড়ীতে কি তুমি জলের পাইপ সারাতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। তাতে কি হয়েছে।

—সেই কাল থেকেই মিসেস হেথকোট তাঁর হাজার ডলার দামের রাশিয়ান ফারের স্কার্ফ আর মাফলারটা পাচ্ছেন না।

—চুলোয় যাক্। আচ্ছা! তুমি তো ভাল করেই জানো র‍্যামসন, আমি আর দলে নেই, চুরিচামারি করি না। ওটা তো আমি কিনে এনেছি—

—শুনেছি, তুমি আজকাল সৎপথে ফিরতে চাইছো, তাই তোমাকে সবরকম সুবিধে দেবো আমি। তুমি শুধু আমাকে নিয়ে চলো, যেখান থেকে ওটা কিনেছো, সেই দোকানে।

—ঠিক আছে, চলো। বলে চলতে গিয়েই থমকালো কিড। শঙ্কিত মলির দিকে চেয়ে একটু ম্লান হাসি হাসলো সে।

—কোন লাভ নেই। হ্যাঁ আমি স্বীকার করছি ওটা মিসেস হেথকোটের স্কার্ফ। তোমাকে ওটা ফিরিয়ে দিতে হবে মলি, লক্ষ টাকা দাম হলেও ওটা তোমার যোগ্য হোত না।

বেদনায় বিবর্ণ মুখে কিডের হাত জড়িয়ে ধরলো মলি—এটা কি হোল কিড, তুমি না কথা দিয়েছিলে, আমাদের সুখ, শান্তি স্বপ্ন, এসবের কি হবে এখন?

—বাড়ী যাও মলি। চলো র‍্যামসন, কোথায় যেতে হবে।

ঠিক এই সময় নদীর ধারে পাহারা দিতে যাচ্ছিল পুলিশ অফিসার কোহেন, তাকে ডেকে সব বললো র‍্যামসন।

—হ্যাঁ, আমিও মিসেস হেথকোটের ফার-এর কথা শুনেছি, কিন্তু—কই দেখি।

স্কার্ফটা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে হাসলো কোহেন—আমি একসময়ে এগুলো বিক্রী করতাম। এগুলো আলাস্কা থেকে আসে। সস্তা মাল। স্কার্ফটার দাম বারো ডলার হবে বড় জোর আর—

কথাটা শেষ করার আগেই তার মুখে পেল্লায় এক ঘুসি বসিয়ে দিল কিড। আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো মলি। দুই পুলিশে মিলে কোমরে দড়ি পরিয়ে দিল কিডের।

কথাটা শেষ না করে ছাড়লো না কোহেন। আর মাফলারটা দাম হবে ডলার। তা এর মধ্যে হাজার টাকার ফারের কথা আসছে কোথা থেকে।

রাস্তায় বসে পড়ে দুহাতে মুখ ঢাকলো কিড। হ্যাঁ মলি! সাড়ে একুশ ডলার দিয়ে কিনেছি ও দুটো। আমার মাইনেতে রাশিয়ান ফারের বানানটাও হয় না। কিন্তু তোমাকে সস্তা জিনিষ দিয়েছি এটা প্রকাশ পাওয়ার চেয়ে ছমাস জেল খাটাও আমার ঢের ভাল ছিল।

স্বস্তির শ্বাস ছাড়লো মলি।

—আরে বোকারাম, টাকাপয়সা দামী জিনিষ দিয়ে আমি কি করবো? আমার তো চাই তোমাকে? মাথামোটা কোথাকার।

গলা খাঁকাড়ি দিল কোহেন—ওর কোমরের দড়িটা খুলে নাও অফিসার। একটু আগেই থানা থেকে শুনে এলাম মিসেস হেথকোট তাঁর ফারটা খুঁজে পেয়েছেন। ঘুষিটা এবারের মত মাপ করে দিলাম কিড, বুঝলে? কিন্তু এই একবারই। চলো র‍্যামসন, যাওয়া যাক। এই ছেলে-মেয়ে দুটোই একেবারে বুদ্ধু।

*Vanity and some Sable

উৎসবের অভিনন্দন

বড়দিনের উৎসবকে কেন্দ্র করে যত সাহিত্য রচিত হয়েছে, তা সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় না বললে আশাকরি সত্যের অপলাপ হবে না। বলতে পারি কাগজে কলমে, পত্রপত্রিকায় এই একটি মরশুম ব্যবহৃত হতে হতে ক্ষয়ে যেতে বসেছে। তবু আমাদের গল্প এই পটভূমিকাতেই কোটিপতির নয়ণমনি. পাঁচবছরের কন্যা তার তুচ্ছ ন্যাকড়ার পুতুলটি হারিয়ে ফেলে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। অসংখ্য দাসদাসী পরিবৃত সে প্রাসাদের প্রতিটি কর্মচারী হাজার অনুসন্ধান করেও হারিয়া যাওয়া 'বেট্সী' কে উদ্ধার করতে পারছে না। কন্যার পিতা মনিমুক্তা খচিত মোটরকারের চেয়ে এই বিবর্ণ পুতুলটি কি গুনে বেশি আদৃত, এ চিন্তা করে কূল কিনারা পাচ্ছেন না। অবশেষে সফল ব্যবসায়ীর স্বাভাবিক প্রবণতার কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন পুতুলটি যে উদ্ধার করবে, তাকে একশো ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।

ডক্টর ওয়াটসনকে যদি তদন্তের জন্য ডাকা হোতো। তাহলে তিনি হয়তো শার্লক হোমসকে রিপোর্ট দিতেন, বাড়ীর আদুরে কুকুরটির মুখে কিছু সুতো আর পায়ে মাটি লেগে ছিল। হোম্স চোখ বুজে পাইপে টান দিতে দিতেই সমস্যার সমাধান করে দিতেন, বাড়ীর কুকুরটাই পুতুলটিকে সারমেয় সুলভ প্রবণতায় কোথাও মাটিতে পুঁতে রেখেছে।

কিন্তু হায় কোথায় ওয়াটসন? কোথায় হোম্স! অগত্যা গল্পটা আবার শুরু করা যাক।

দূর্ভাগ্যতাড়িত ফাজি রোজকার মতই একটু মাতাল হয়ে ফিরছিল। নদীর ধারে যে জায়গাটায় ঐ কোটিপতি ব্যবসায়ীর আঙ্গিনা এসে মিশেছে, সেখানে হঠাৎ মাটির তলা থেকে পুতুল 'বেট্সী'র একটা পা উঁকি মারছে দেখে কৌতূহল হয়ে একটানে বার করে আনলো সেটাকে।

নদীর ধারে ভাঁটিখানায় অনেক দিনের যাতায়াত ফাজির। আজ তার পকেট শূণ্য, তবু ভাটিখানায় না গিয়ে পারলো না, আর অচিরেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোলো। পুতুলটিকে নিয়ে নানারকম মজা করে দু'এক পাত্র গলায় ঢালার সুযোগ জুটে গেল। আস্‌লে, কালই বড়দিন, মানুষের মেজাজটাই গেছে বদলে।

তিন ভবঘুরে শয়তান ম্যাকার্থি, কালো রেলি আর কানা মাইক অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল পুতুলটাকে, কেননা পুরস্কার ঘোষনার কাগজটা দৈবক্রমে তাদের হাতে এসে পড়েছে।

একজোট হয়ে ফাজির কাছ থেকে পুতুলটা পঞ্চাশ সেন্টে কিনে দিতে চাইলো তারা। কিন্তু ফাজির তখন ফূর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। পুতুলটা তখন তার কাছে অমূল্য, এর সঙ্গে কাল্পনিক কথাবার্তা চালিয়ে আরো কত পেগ পানায় উপহার পেতে পারে সে।

আর একটা পানশালায় যাওয়ার পথে তিনজন আবার ধরলো ফাজিকে। উপায়ন্তর না দেখে পুরস্কারের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললো।

এবার ফাজির মন টললো। নগদ একশো ডলার কম কথা নয়।

—ঠিক আছে, ধন্যবাদ তোমাদের, কিন্তু আমি একাই যাবো এটা ফিরিয়ে দিতে, বুঝেছো। টলমল পায়ে গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল ফাজি। তিন শয়তান পথে দাঁড়িয়েই প্ল্যান করে নিল, কিভাবে টাকা নিয়ে রাস্তায় নামলেই টেনে নিয়ে নির্জনে ফাজিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে একশোটি ডলার হস্তগত করবে তারা।

ফাজির হাতে পুতুলটি দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো গোটা প্রাসাদ। ছোট্ট মালকিন এসে ফাজির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার আদরের বেট্সীকে। হাতে হাতে নগদ টাকাও পেয়ে গেল সে।

কেতাদুরস্ত পরিচারক এবার বাইরে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিতে এলো নিতান্ত বেমানান ভবঘুরেকে।

কিন্তু চারদিক আসন্ন উৎসবের বাতাবরণ এক মুহূর্তেই ফাজিকে যেন নিয়ে গেল ফেলে আসা অতীতের সোনালী দিনগুলোর স্মৃতিতে। হঠাৎ মনে পড়লো বড়দিনের আগের রাতে কোন বাড়ীতে প্রবেশ করলে গৃহকর্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে যাওয়াই রীতি। তাই করতে চাইলো সে।

বিস্ময়বিমূঢ় ভৃত্যটি তাকে দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখেই গৃহকর্ত্রীর অনুমতি আনতে গেল। খোলা দরজার ফ্রেমে আলোকিত ফাজিকে দেখতে দেখতে উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়লো তিন শয়তান, অন্ধকারে একবার আসুক না ব্যাটা।

গৃহকর্ত্রী অত্যন্ত কোমল স্বভাব রমনী, তিনি ফাজিকে লাইব্রেরীতে আনতে আদেশ দিলেন। অতুল বৈভবের মধ্যে বসে থাকা এই রমনীর মুখের মত সুন্দর মুখ কোনও ছবিতেও কখনো দেখেনি ফাজি।

একজন ভৃত্য তাকে এবং গৃহকর্ত্রীকে ছোট্ট সুদৃশ্য গ্লাসে সামান্য ওয়াইন দিয়ে গেল। ফাজির মনে পড়ে গেল সুদূর অতীতে দক্ষিণে পারিবারিক পরিমণ্ডলে এমনি বড়দিনের আগের রাত্রির অনুষ্ঠানের কথা, কি যেন প্রার্থনা করতো সবাই মিলে, ভাল মনে পড়ছে না।

—আরেকটি বছরের আশীর্বাদ, তারপর? মহিলা মনে করিয়ে দিলেন—ঝরে পড়ুক এই ভুবণে—হ্যাঁ, এইরকমই কিছু হবে। জীবনযাপনের যন্ত্রনায় কবে ভুলে মেরে দিয়েছে সুস্থ দিনের স্মৃতি।

পরিচারক জেম্স আবার ফাজিকে দরজায় পৌঁছে দিতে গেল। গৃহকর্ত্রীর মনে হতে লাগলো এই ভবঘুরেটি যেন তাকে কি একটা স্মৃতি জাগিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু একে কি তিনি আগে কখনও দেখেছেন, হয়তো—

বাইরে গেট চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে কানা মাইক। ফাজি এলো বলে হাতের মুঠোয়।

ভেতর থেকে জেম্সকে ডাকলেন গৃহকর্ত্রী। তুমি ঐ লোকটিকে নিচে নিয়ে যাও, লুইকে বলো গাড়ীটা বের করে ওঁকে নিয়ে যেখানে যেতে চান, সেখানে পৌঁছে দিতে।

*Compliments of the Season

হাতে নাতে

লাঞ্চ সেরে অফিসে ফেরার পথে পুরানো সাহিত্যিক বন্ধু শ্যাকলফোর্ড ডোয়ির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল 'মিনার্ভা ম্যাগাজিনের' সম্পাদক ওয়েস্টব্রুক-এর। সম্পাদক মশাই-এর মনটা আজ বেশ উৎফুল্ল ছিল, এপ্রিল মাসের 'মিনার্ভা ম্যাগাজিন' সব কটি বিক্রী হয়ে গেছে, কর্তৃপক্ষ তাঁর মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবং তরুণী স্ত্রী সঙ্গীত সাধনায় বিশেষ উৎকর্ষ অর্জন করেছে। পার্কের মধ্যে দিয়ে ফেরার সময় পৃথিবীটা আর একটু মনোরম মনে হচ্ছিল তাঁর। এমন সময় জামার হাতা ধরে টানলো ডোয়ি। একসময় উপন্যাস লিখিয়ে হিসেবে একটু নাম হয়েছিল তার। এই 'মিনার্ভা'তেই ছাপা হয়েছে তার কটি গল্প, সেই সময় সাহিত্যিক, সম্পাদকের মধ্যবিত্ত পাড়া ছেড়ে নিম্নবিত্তদের বস্তিঅঞ্চলে ঠাঁই হোল তার, আর লেখা মিনার্ভাও বারে বারে অমনোণীত বলে ফেরৎ পাঠাতে লাগলো, সেই নিয়েই আজ প্রশ্ন তুললো ডোয়ি, হাত ধরে টেনে বসালো বন্ধুকে ভবঘুরেদের আস্তানায় অর্থাৎ পার্কের বেঞ্চে।

—আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো তো বন্ধু, তোমার অর্থাৎ মিনার্ভায় আমার লেখাগুলো অমনোণীত করার সত্যি কারণটা কি?

—দেখো, সত্যি করেই বলছি, তুমি লেখাটা শুরু করো চমৎকার, চরিত্রগুলোও বেশ জীবন্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু শেষটায় সব গোলমাল করে ফেলো।

—কি রকম, শুনি?

—আরে শিল্পী তো আর ফোটোগ্রাফার নয়। তোমার চরিত্রগুলো চরম নাটকীয় মুহূর্তেও কেমন সহজ আচরণ করে। যেটা স্বাভাবিক নয়। যেমন ধরো, ঐ যে গল্পে মহিলাটির মেয়ে হারিয়ে গেল, তখন—

—তখন সে কি করবে? স্টেজের নাটকের মত বুক চাপড়ে কাঁদবে? থিয়েটারের ভাষায় ভাগ্যকে অভিসম্পাত দেবে? না, আমার তো মনে হয়, সে তক্ষুনি তৈরী হবে পুলিশ স্টেশনে রিপোর্ট লেখাতে যাবার জন্য।

—ওখানেই তো তোমার ভুল। জীবনটা সাদাকালো ফোটোগ্রাফ নয়। সেটা বুঝতে পারোনি বলেই তোমার আজ এই দশা। জীবেনর বর্ণময় রঙিন মুহূর্তগুলোতে মানুষ কখনই স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে না। তোমার শেষ গল্পের নায়িকা যখন চিঠি খুলে দেখলো, তার স্বামী সেলুনের মেয়েটির সঙ্গে পালিয়ে গেছে, তখন সে বললো কিনা—

—বলছি, সে বললো, "এ থেকে তোমার কি মনে হচ্ছে বলতো?"

—তবেই দেখো। এরকম কখনও হতে পারে। জীবনে সংঘাতের মুহূর্ত আসেই, তখন চরিত্রগুলো স্বাভাবিক ভাবেই নাটকীয় আচরণ করে থাকে। এটাই তুমি বোঝো না।

—আমি এখন মনে করি জীবন আর নাটককে গুলিয়ে ফেলছো তুমি। যাইহোক আমাদের মধ্যে কে ঠিক, সে বিষয়ে একটা ফয়সালা হওয়া দরকার।

—বেশ তো। একদিন আমার বাড়ীতে ডিনারে এসো না, তোমরা দুজন। তোমার স্ত্রীর সঙ্গেও অনেকদিন দেখা হয়নি। তুমি তো জানো আমার স্ত্রী তাঁকে খুবই পছন্দ করেন।

—এই পোষাকে? আর একটা সার্ট কিনতে না পারা পর্যন্ত সেটা সম্ভব নয়। আমার প্ল্যানটা শোনো। তুমি তো জানো আমার স্ত্রী লুইসি আমাকে অসম্ভব ভালবাসে। দারিদ্রের চরমসীমায় পৌঁছেও আমার ওপর থেকে তার বিশ্বাস এতটুকু টলেনি।

—জানি মিসেস ডোয়ি সত্যিই স্বাধ্বী, পতিগতপ্রাণ, এর প্রমাণ অনেকবার পেয়েছি।

—আজ সকালে বেরোবার সময় সে আমাকে বলেছে, যে, সে আজ তার কাকিমার বাড়ী যাবে। বেলা তিনটে নাগাদ ফিরবে। এখনও একটু সময় আছে, এর মধ্যে চলো আমাদের ফ্ল্যাটে, একটা মজা হবে।

—মজাটা কি বলবে তো? তাছাড়া আমার অফিস—

—আরে রাখো তো, এ মীমাংসাটা অনেক জরুরী। ফ্ল্যাটে ঢুকে আমি লুইসির নামে একটা চিঠি লিখে জানাবো, "আমি এমন একজনের সঙ্গে চিরদিনের মত চলে যাচ্ছি। যে আমার প্রতিভার কদর করে।" আমরা ঘরে লুকিয়ে থেকে দেখবো ওই চিঠি পড়ে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়। আর মিলে যাবে তোমার প্রশ্নের উত্তর।

—না না, এরকম নিষ্ঠুর খেলা মিসেস ডোয়ির সঙ্গে করতে পারবো না আমি।

—আরে দুমিনিটের তো ব্যাপার। তারপর তো সবকথা তাকে বুঝিয়েই বলবো। আর আমার উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়, যদি লুইসা এই আকস্মিকতায় নাটকীয় আচরণ না করে, তবে তো তুমি আমার গল্পের যৌক্তিকতা স্বীকার করবে? আমার গল্প আবার ছাপা হবে মিনার্ভা ম্যাগাজিনে। তাতে তো লুইসারই লাভ।

দুই বন্ধু দ্রুতগতিতে পার্ক থেকে বেরিয়ে কাছেই ডোয়ির ফ্ল্যাটবাড়ীর পাঁচতলায় উপস্থিত হোল। চাবী দিয়ে দরজা খুলে বন্ধুকে চেয়ার খুঁজে নিয়ে বসতে বলে কাগজ কলম খুঁজতে গেল গৃহকর্তা।

হঠাৎ তার নজরে পড়লো টেবিলের ওপর লুইসি লেখা একটি চিঠি, বন্ধুকে শোনাবার জন্য জোরে জোরেই পড়লো সে।

লুইসি লিখেছে, এ চিঠি যখন পড়বে তখন আমি অন্ততঃ একশো মাইল দূরে চলে গেছি। অক্সিডেন্টাল অপেরা দলে কাজ পেয়েছি। উপোষ করে মরতে চাই না বলে নিজের ভরনপোষন নিজেই অর্জন করে নিতে চাই। মিসেস ওয়েষ্টব্রুক (সম্পাদকের স্ত্রী) আমার সঙ্গে যাচ্ছে। সে বলে, হিমশৈল, অভিধান আর কলের গান এর সংমিশ্রনের (অর্থাৎ তার স্বামীর) সঙ্গে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমরা দুজনেই আর ফিরবো না। গত দুমাস ধরে আমরা লুকিয়ে নাচ ও গান প্র্যাক্‌টিস করেছি। আশা করি তুমি উন্নতি করবে, আর ভাল থাকবে।

চিঠিটা হাত থেকে খসে পড়লো ডোয়ি'র, দুহাতে মুখ ঢাকলো সে। আবেগমথিত জড়ানো গলায় চীৎকার করে উঠলো—ভগবান এ কি পানীয় তুমি আমার হাতে তুলে দিলে। সে আমার সঙ্গে প্রতারনা করেছে, প্রতারনা করেছে। ভালবাসা, বিশ্বাস, যা কিছু তোমারই দান, সে সবই কি বন্ধু আর শত্রুর কৌতুক?

সম্পাদকের হাত থেকে চশমটা খসে পড়লো, একহাতে নিজের কোটের বোতাম চেপে ধরে সে বলে উঠল,

—শ্যাক, চিঠিটা কি সাংঘাতিক তাই না? তোমার নিশ্চয়ই মাথা ঘুরে গেছে, ওঃ চিঠি বটে একখানা।

*Proof of the Pudding

রুনির দোকানে মধ্যরাত

ডাচ মাইকের ভাঁটিখানায় দেখা হয়ে গেল দুদলের। ক্যাপুলেটদের এডি ম্যাকনামাস, যাকে ক্যাপুলেটরা ডাকে কর্ক ম্যাকনামাস, তার সহযোদ্ধা ব্রিক ক্লিয়ারির সঙ্গে দোকানে ঢুকে মন্টাগু গ্যাং এর কয়েকটি পাণ্ডাকে হৈ হল্লা করতে দেখে, প্রথমে ভেবেছিলাম কোন ঝুটঝামেলায় যাবে না। কিন্তু কি থেকে যে তর্কাতর্কি লেগে গেল বোঝা মুশকিল, মোট কথা দেখা গেল মন্টাগুদের বাক মেলন ফস্ করে একটা আট ইঞ্চি পিস্তল বার করে ফেলেছিল, কিন্তু তার থেকেও ক্ষিপ্রগতি কর্ক। সে বাক্ মেলনের পাঁজরে তিন ইঞ্চি ছুরির ফলা ঢুকিয়ে দিল। তার সহযোগী ব্রিক ক্লিয়ারি সময়মত আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিল, তাই আলো জ্বালতে শুধু আহত লোকটি ছাড়া আর বিশেষ কাউকে দেখা গেল না।

সাহায্যের জন্য চীৎকার করে দোকানে পুলিশ এনে ফেললো ডাচ মাইক। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে বাক্ মেলন বললো, যদিও আততায়ী কে সে চিনতে পেরেছে, তবু পুলিশের কাছে। তার নাম বলবেনা, ব্যাপারটা সে নিজেই মিটিয়ে নিতে পারবে।

রাত বারোটায় নদীর ধারে দেখা হোল কর্ক ও ব্রিকের। সব খবরাখবর নিয়ে এসেছে ব্রিক। বাক্ যদিও পুলিশের কাছে মুখ খোলেনি, কিন্তু ডাচ মাইক খুলেছে। রোজ রোজ দোকানে এই তাণ্ডব তার আর সহ্য হচ্ছে না। কাজেই দলনেতা টিম করিগান শুক্রবার দিন ইউরোপ থেকে ফেরার আগে পর্যন্ত কর্কের পক্ষে গা ঢাকা দেওয়াই শ্রেয়। টিম এসে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলবে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কর্ক আর লুকোনো জায়গায় বসে থাকতে পারলো না, বন্ধুহীন ফর্তিহীণ নির্জন আবাসে ইঁদুরের মত থাকতে থাকতে অসহ্য হয়ে উঠেছে । এদিকে নিজের এলাকায় ঢোকা একেবারেই নিরাপদ নয়, রুনির বারটা শহরের একেবারে অন্যপ্রান্তে, ওখানে ঢোকা যেতে পারে।

একটি নিঃসঙ্গ মেয়ে এসে বসলো তার টেবিলে। চোখাচোখি হোলো দুজনের। আর ভাগ্য যেন এক মুহূর্তেই অদৃশ্য গাটছড়ায় বেঁধে ফেললো তাদের।

প্রথম দর্শনে প্রেম ব্যাপারটা নতুন নয়, আর সেই পুরোনো প্রথা অনুসরণ করেই এরা নানা বানানো বাক্যজাল সৃষ্টি করে নিজেদের আসল চেহারাটা লুকোতে চাইলো।

তরুণীটি সুশ্রী, সপ্রতিভ, আলাপচ্ছলে জানালো তার নাম রুবি ডেলামেয়ার। থার্ড এভেনিউতে একটি বই বাঁধাই-এর দোকানে কাজ করে। রুনির বারেই একজন ভদ্রমহিলা বিনা ঝামেলায় সিগারেটে সুখটান দিতে পারে, তাই তার আসা। ওভারটাইম সেরে বাড়ী ফেরার পথে একটু ঢুকতে ইচ্ছে হোল। জায়গাটা সত্যিই নিরাপদ তো মেয়েদের পক্ষে। না হলে সে আর আসবেনা। না, সে ড্রিঙ্ক করে না।

কর্ক জানালো তার নাম এডি ম্যাকনামাস। একলা কোনও মেয়ের বাইরে থাকার পক্ষে রাতটা একটু বেশিই হয়েছে। অনুমতি করলে সে মেয়েটিকে বাড়ী পৌছে দিতে পারে।

টেবিলে দুটো বিয়ার দিতে বলে দুজনে রাজ্যের অর্থহীন কথা বললো, শুধু বলার আর শোনার সুখের জন্যে। একসময় সব দ্বিধা খসিয়ে ফেলে কর্ক সরাসরি জানতে চাইলো মেয়েটির পরিচয়, সে বুঝতে পেরেছে এমনই এক মেয়ের খোঁজে ছিল সে, যে তার জীবনসঙ্গিনী হতে পারবে, রাজী আছে তো রুবি।

রুবি জানালো সে সত্যি বলছে, এডি কি সত্যিই তাকে চায়?

—নিশ্চয়ই চাই রুবি। এরপর আমরা আর এখানে দেখা করবো না। সিগারেট টান দিতে খুব ইচ্ছে করলে, পার্কের নির্জন বেঞ্চ তো আছেই। তবে রুবির ওটা ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করাই উচিৎ।

—তুমি বললে আজ থেকেই ছাড়বো এডি। তুমি কবে আসবে আমার সাথে দেখা করতে?

—পরশু সন্ধ্যেয়। ঠিক আছে তো?

—ঠিক আছে, আজ তোমাকে আমার বাড়ীর দরজাটা দেখিয়ে দেবো। সন্ধ্যে সাতটায়, কেমন?

এমন সময় বারের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কে যেন এসে খবর দিল দরজায় পুলিশ হাজির। দেওয়ালের একটা প্যানেল সরিয়ে, ঘর অন্ধকার করে সব খদ্দেরদের বাইরে বের করে দেওয়া হোলো, এডি আর রুবি ছিল সব শেষে, তখনো কথায় মগ্ন তারা তাই পালাতে পারলো না।

পুলিশ এসেই দুজনকেই পেলো। প্রথমে এডিকেই জিগ্যেস করলো—কি করছো এখানে?

—সিগারেট টানছি, আরকি! শান্ত জবাব এডির। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার আপদমস্তক দেখলো পুলিশটা। —তোমার নাম ম্যাকনামাস, তাই না?

—অনুমান ভুল। ওটা হবে পিটারসন।

—কর্ক ম্যাকনামাস, গত সপ্তাহে ডাচ মাইকের দোকানে একটা মেয়েকে ছুরি মেরেছো?

—তুমি অন্য কারো সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলছো।

—তাই? চলো আমার সঙ্গে থানায়। দেখা যাক্ কে ঠিক। চলে এসো।

কর্ক রুবির বিবর্ণ মুখের দিকে তাকালো। একই দিনে রুবিকে পেলো, আর হারালো বরাবরের জন্য। থানায় কেউ না কেউ তাকে চিনতে পারবে। পাথর চাপা কপাল।

কিন্তু কর্ককে অবাক করে দিয়ে সাপিনীর মত ফুঁসে উঠলো রুবি, প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো পুলিশটির ওপর।

—অত তাড়াহুড়ো কোরোনা মাগুই, তুমি আমাকে চেনো, আমার লোকের গায়ে হাত দিলে ভাল হবে না বলছি, এ তোমার কর্ক নয়, এর নাম এডি। আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো।

—দেখো ফ্যানি, আমি কিন্তু তাহলে দুজনকেই তুলে নিয়ে যাবো। তুমি কি করে জানলে এই লোকটা সেই লোকটা নয়, কি করছিলে তুমি এখানে?

কি করে জানলাম, রাগে লাল হয়ে উঠেছে রুবি। একবছর ধরে জানি আমি ওকে। ও আমার। নীচু হয়ে পায়ের ইলাস্টিকের ভেতর থেকে এক গোছা নোট বার করে পুলিশটির দিকে বাড়িয়ে দেল রুবি ওরফে ফ্যানি—এই নাও, কেটে পড়। তোমার রোজকার টাকা তো তুমি পেয়েই গেছো আগে।

রাগে বেগুনী হয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো পুলিশটি।

—মিথ্যো কথা। তোমাকে আমার এলাকায় দেখলেই এবার গ্রেপ্তার করবো আমি।

—না, তা তুমি করবে না। আমি আজ এবং গত সপ্তাহেও সাক্ষী রেখে টাকা দিয়েছি তোমাকে। কর্ক ধীরে সুস্থে টাকাটা তুলে নিয়ে নিজের পকেটে ঢোকালো—চল ফ্যানি, বাড়ী ফেরার পথে চপ-সু-ই খেয়ে নেওয়া যাক।

—ভাগো বলছি এক্ষুনি, নইলে—গর্জে উঠলো পুলিশটা। রাস্তার বাঁকে দুজনের গতিই থেমে গেল। কর্ক নিঃশব্দে টাকার গোছাটা বাড়িয়ে দিল, মেয়েটি তেমনি নীরবে নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলো সেটা।

—মনে হয়, এখানেই বিদায় নেওয়া ভাল। তুমি নিশ্চয়ই আর আমার সঙ্গেদেখা করবে না। আমি কি তোমার সঙ্গে করমর্দন করতে পারি? ম্যাকনামাস?

—তুমি ঐ কাণ্ডটা না করলে আমি তো তোমার আসল চেহারাটা জানতেই পারতাম না ফ্যানি। কেন ওরকম করলে।

—আমি না করলে, তুমি ধরা পড়ে যেতে, এটাই কি যথেষ্ট কারণ নয়? সত্যি এডি, আমি ভাল মেয়ে হাতে চাই, এ জীবন সহ্য করতে পারছি না আর, তোমায় যখন দেখলাম, তোমার কাছে ভাল সাজতে চাইলাম। আর, তুমি যখন আমাকে পছন্দ করলে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, ভাল হবই। যাক্‌গে, এখন আর এসব কথা বলে কি হবে। বিদায় এডি।

কান্না মিশে গেল ফ্যানির কথায়।

—আমি মেলানিকে ছুরি মেরেছিলাম ফ্যানি। পুলিশটা ঠিক লোককেই ধরেছিল।

—তাতে কিছু যায় আসে না।

—ওয়ালষ্ট্রীটের সংকটে পড়ে গেলাম, ইস্ট সাইডের গুণ্ডার দলে ভিড়ে যেতে হোলো।

—বাদ দাও এডি। তাতে কিছু এসে যায় না।

কর্ক নিজের মনেই বললো—আমি ওব্রায়েনের ওখানে একটা চাকরী পেতে পারি।

—বিদায় এডি। মেয়েটি আবার বললো।

কর্ক তার হাত ধরে টানলো।

—চলো, আমার একটা জায়গার কথা মনে পড়েছে। দুটো ব্লক হেঁটে পার্কের সামনে একটা ছোট লাল ইঁটের বাড়ীর সামনে থামলো তারা।

মেয়েটি অবাক হোলো—কার বাড়ী এটা, কেন এখানে যাচ্ছ?

রাস্তার আলোয় বাড়ীর নেমপ্লেটটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেদিকে দেখালো কর্ক—পড়ে দেখো।

নেমপ্লেটটা পড়ে চাপা আর্তনাদ করে উঠলো ফ্যানি—না না এডি, হে ভগবান, না। আমি তোমাকে এটা করতে দেবো না, এখনই নয়। আমাকে যেতে দাও। তোমার এটা করা

কখনই উচিৎ নয়, তুমি যখন সবই জেনেছো—। তাড়াতাড়ি চলো এখান থেকে। উত্তেজনায় এডির আলিঙ্গনের মধ্যেই এলিয়ে পড়লো ফ্যানি। অন্য হাত দিয়ে দরজার ঘন্টিটা টিপে দিল কর্ক।

একটা পুলিশ হঠাৎ কোথা থেকে এসে উদয় হোলো।

—অ্যাই কে তোমরা? কি হয়েছে মেয়েটির।

—ও কিছু নয়, এখনই ঠিক হয়ে যাবে, কোনও গোলমাল নেই এখানে।

দরজার নেমপ্লেটটা পড়লো পুলিশটি।

—রেভারেণ্ড জেরেমায়া জোনস্।

—ঠিক। আমরা এখনি ওঁর কাছে বিয়ে করতে যাচ্ছি।

* Past One at Rooney's

ডিক্সির গোলাপ

দক্ষিণের অভিজাত মণ্ডলী 'ডিক্সির গোলাপ' সাময়িকীটা বেশ ঢাকঢোল বাজিয়েই প্রকাশ করল। সমাজের মাথাদের আগ্রহাতিশয্যে সবথেকে সেরা লোকটিকেই বেছে নেওয়া হোলো এর সম্পাদক হিসেবে। জর্জিয়ার ঐ সব অভিজাত নাগরিকরা কর্ণেল অ্যাকুইলা টেলফেয়ার-এর সিডার হাইটসের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে রাজী করিয়ে এলেন। টেলফেয়ারের শিক্ষা, পারিবারিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত সুনাম প্রশ্নের অপেক্ষা রাখেনা। একলক্ষ ডলার মূলধন নিয়ে শুরু হোলে জর্জিয়া টুম্ব শহরের 'ডিক্সির গোলাপ' মাসিক পত্র।

পত্রিকার সহযোগী কর্মচারীরা সকলেই দক্ষিণের, বিশেষতঃ জর্জিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে কোন না কোন উত্তরাধিকার রাখে। এর লেখক আর গ্রাহক, সবই দক্ষিণের বাসিন্দা।

হঠাৎই একদিন পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে এসে হাজির নিউইর্য়কবাসী টি টি. থ্যাকার। সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে তিনি প্রস্তাব রাখলেন এই ডিক্সির গোলাপ"-এর সুগন্ধ শুধু দক্ষিণে সীমাবদ্ধ না রেখে গোটা আমেরিকায় ছড়িয়ে দেওয়া হোক। আর্থিক দিক থেকে তাহলে আর অনুদানের ওপর নির্ভর করতে হবে না। সংবাদপত্রের ব্যবসায়িক দিকটা উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মন দিয়ে শুনলেন সম্পাদক টেলফয়ার। তারপর বললেন, পত্রিকার ব্যবসায়িক দিকটা দেখা তো আমার কাজ নয়। আমাদের কাগজ দক্ষিণের লোকরা করেছে দক্ষিণীদেরই জন্যে। তবে একথা অস্বীকার করছি না পত্রিকার সার্কুলেশন ছড়িয়ে পড়া উচিৎ।

—নিশ্চয়ই একটা টাকা সব সময়েই একটা টাকা, সে উত্তরে, দক্ষিণে , পূর্বে, পশ্চিমে, যেখানেই হোক। হ্যাঁ ভালকথা, আপনাদের নভেম্বর মাসের সংখ্যাটা পড়ছিলাম, ওই তো, আপনার টেবিলেও আছে একটা। ও বিষয়ে আমার কিছু জানবার আছে।

—কি জানতে চান, বলুন?

—তুলোর চাষ সম্বন্ধে লেখা ছবিটবি সমতে ভালই হয়েছে। কিন্তু এই যে "অত্যাচারীর পা" বলে তিনপাতার কবিতা ছাপিয়েছেন, লোরেলা ল্যাসেল্‌স-এর লেখা। দেখুন, আমার সারা জীবন কাটলো সংবাদপত্র আর সাময়িকীর সঙ্গে, এ লেখিকার নাম তো আগে কখনো শুনিনি—তার লেখা তিনপাতা কবিতা?

—উনি দক্ষিণের স্বনামধন্য লেখিকা। এছাড়া আলাবামার বিখ্যাত ল্যাসেল্‌স্‌দের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় উনি। এই রাজ্যের উদ্বোধনীর দিনে যে রেশমী পতাকাটা তোলা হয়েছিল, সেটা উনি নিজের হাতে তৈরী করেছিলেন।

—আচ্ছা, কিন্তু কবিতার সঙ্গে একটা রেলরোডের ডিপোর ছবি কেন?

—ওর পাশেই যে বেড়াটা দেখতে পাচ্ছেন, ওটা ওঁর যে বাড়ীতে জন্ম হয়েছিল, তারই বেড়া।

—তা কবিতাটা রেলরোড নিয়ে না বুলরানের যুদ্ধ নিয়ে. পড়ে তো কিছুই বুঝলাম না। আর এই যে গল্পটা রোজীর লিপ্সা, লেখক ফসডাইক পিগট। এই পিগট জিনিষটা কি?

—মিঃ পিগট এই সাময়িকীর সবচেয়ে বড় অংশীদারের ছোট ভাই।

—ও, এই কথা? আর এই যে আটালান্টা, নিউ অর্লিয়েন্স, ন্যাশভিল, আর সাভানার মদ তৈরীর কারখানাগুলোর বিস্তৃত বিবরণ ছাপিয়েছেন, সেটা কি জন্য?

—আমাদের পত্রিকার মালিক নিজে হাতে ওটা আমাকে দিয়েছিলেন ছাপবার জন্যে।

—আচ্ছা, বেসি বেলফ্লেয়ার কে? যিনি মিলেডগেভিলের জল্ সরবরাহ্ পরিকল্পনা নিয়ে লিখেছেন।

—ওটা ছদ্মনাম। মিস এলভিরা সিম্পকিনকে আমি অবশ্য দেখিনি। ওই লেখাটা দিয়েছিলেন কংগ্রেসম্যান ব্রাওয়ার।

—দেখুন কর্ণেল, এভাবে চলতে পারেনা, কখনই চলতে পারে না। এই ভাবে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে একটা কাগজ কখনই সাফল্যের মুখ দেখতে পারে না। আমার কথাটা শুনুন। সারা দেশ ঘুরে আমি লেখকদের কাছ থেকে ভাল ভাল গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ কিনে নিয়ে এসেছি। চারহাজার ডলার খরচ হয়েছে আমার। আমি চাই এর কিছু লেখা আগামী সংখ্যায় 'ডিক্সির গোলাপ' এ প্রকাশ করুন। পত্রিকার মান উন্নত হলে, সারা আমেরিকায় ভাল ব্যবসা করবে এটা।

-আগামী সংখ্যার সব লেখাই ঠিক হয়ে গেছে, শুধু মোটমুটি আটহাজার শব্দ ছাপার মত জায়গা আছে।

—খুব ভলা কথা। আপনি আমার আনা কিছু রচনা নির্বাচন করুন। এই জেনারেল গর্ভনর ইত্যাদিদের উত্তরাধিকারের একঘেঁয়েমী থেকে বাঁচবে পাঠকরা।

—একটা লেখা আছে আমার কাছে, সেটা প্রকাশ করবো কিনা ভাবছি অনেকদিন ধরেই।

—কার লেখা।

—যিনি লিখেছেন তিনি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছেন, লেখা পড়েও মনে হয় একজন চিন্তাশীল মানবহিতৈষী, সত্যিকারের শিক্ষিত ব্যক্তি।

—কিন্তু আটহাজার শব্দে এত কি লিখেছেন উনি, কোন খুনের ঘটনার বিচারবিভাগীয় বর্ণনা নয়তো।

—আপনার কৌতুকবোধের প্রশংসা করতে পারিছনা। দক্ষিণের লোকেদের সম্বন্ধে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাবার বোধহয় সময় এসেছে। যাই হোক, লেখক সম্বন্ধে সম্যক না জেনে আমি কোন লেখা ছাপাই না, তাই একটু দেরী করছি, এ ব্যাপারে আমি একটু খুঁতে খুঁতে। কি ঠিক করলাম আপনাকে জানাবো।

যথা সময়ে জানুয়ারী মাসের "ডিক্সির গোলাপ" থ্যাকারের চোখে পড়লো। কৌতূহলী হয়ে সেই আটহাজার শব্দ লেখা রচনাটা খুঁজে বার করলেন তিনি। সেটি হচ্ছে, কংগ্রেসে দেওয়া দ্বিতীয় ভাষণ। লিখেছিলেন, জর্জিয়ার বুলোচ পরিবারের সন্তান, আর তলায় ছোট হরফে লেখকের নাম টি. রুজভেল্ট।

আমেরিকার প্রেসিডেন্টকেও আতসী কাঁচের তলায় রেখে পরীক্ষা করে তবেই ছাড়পত্র দিয়েছেন সম্পাদক।

*The Rose Of Dixe

ডাইনীর রুটি

মিস মার্থা মিচেল-এর রুটির দোকানের ওপরের তলাতেই থাকে। চল্লিশ বছর বয়সেও বর জোটেনি তার। আচ্ছা, মার্থা তো আর পাঁচটা মেয়ের চেয়ে কুশ্রী নয়, তবু কে জানে বিয়েটা এখনও হয়ে ওঠে নি তার।

তার খদ্দেরদের মধ্যে একজন দু'তিনদিন অন্তর অন্তরই বাসি রুটি কিনতে আসে। লোকটি মধ্যবয়সী, চশমা আর কটা রঙের দাড়িতে বেশ সম্ভ্রান্ত দেখায় তাকে। লোকটি জার্মান মিশিয়ে ইংরাজী বলে। তার তর্জনীতে একদিন রঙ লেগে থাকতে দেখেছিল মার্থা। তাই তার অনুমান লোকটি নিশ্চয়ই গরীব শিল্পীদের একজন। বেচারা পাঁচ সেন্ট খরচ করে একটা তাজা রুটি কেনার চাইতে পাঁচ সেন্টে দুটো বাসি রুটি কিনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। লোকটির প্রতি সমবেদনায় মনটা ভরে যায় মার্থার।

যখন মার্থা তার তৈরী বিভিন্ন সুখাদ্য, সহযোগে চা খেতে বসে, প্রায়ই ভাবে ঐ বিনীত সুভদ্র লোকটিকে যদি এসব খাওয়াতে পারতো, তার মন ভরে যেতো।

লোকটি সত্যিই শিল্পী কিনা তা জেনে নেবার জন্যে মার্থা অনেক দিন আগে কেনা একটা ছবি কাউন্টারের পেছনে ঝুলিয়ে রাখলো। ছবিতে ভেনিসের একটা প্রাসাদ, আর তার ঠিক পেছনেই গণ্ডোলার সারি।

এরপর লোকটি যেদিন এলো ছবিটি তার দৃষ্টি ঠিকই আকর্ষণ করলো। বললো, ছবিটি খুব সুন্দর, কিন্তু ভুল পটভূমিকায় আঁকা হয়েছে প্রাসাদটা। যাই হোক, পরীক্ষা সফল হওয়াতে দারুন খুশি মার্থা। তার অনুমান তাহলে নির্ভুল।

দিবাস্বপ্ন দেখে মার্থা। তার ব্যাঙ্কে জমা টাকা আর দোকানের আয় দিয়ে সে ঐ শিল্পীর আর্থিক ভাবনা ঘুচিয়ে দিয়েছে, আর সেই উজ্জ্বল চোখের শিল্পী একমনে নিজের শিল্পসাধনা করে চলেছে।

মাঝে মাঝে রুটি কিনতে এসে ভদ্রলোক মার্থার সঙ্গে গল্পগুজব করে যান, কিন্তু বাসি রুটি ছাড়া কখনও কিছু কেনেন না, অথচ মার্থার দোকানে থরে থবে সাজানো আছে নানা ধরনের কেক, পেস্ট্রি, রোল। ব্যথায় মন ভরে যায় মার্থার।

কদিন ধরেই মার্থার মনে হচ্ছে ভদ্রলোক যেন ক্রমশই ক্লান্ত ও শীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন। তার ইচ্ছে করে ঐ বাসিরুটির সঙ্গে মুখরোচক কিছু দিয়ে দিতে। কিন্তু শিল্পীর অহংকারে আঘাত লাগবে মনে করে কিছু বলার সাহস হয়না।

মিস মার্থা কাউন্টারে থাকার সময় তার সবচেয়ে সুন্দর নীল বুটিওলা পোষাকটা নিয়মিত পরতে শুরু করলো, রান্নাঘরে মাঝে মাঝে রূপটান তৈরী করতেও দেখা গেল তাকে।

একদিন খদ্দেরটি এসে যথারীতি তার পয়সা বাড়িয়ে দিয়ে বাসি রুটি চাইছিল, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ প্রবল বেগে ঘন্টা বাজিয়ে একটা দমকল চলে গেল, ভদ্রলোক দরজার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা দেখতে যেতেই মার্থার মাথায় বিদ্যুত চমকের মত একটা কৌশল খেলে গেল। সে দ্রুত রুটিগুলো ছুরি দিয়ে ফাঁক করে ভেতরে বেশ খানিকটা করে ভাল মাখন ঢুকিয়ে দিল। ভদ্রলোক কিছু সন্দেহ না করেই রুটি নিয়ে চলে গেলেন।

ভদ্রলোক চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মার্থার হৃদয়ে নতুন এক আলোয় ছেয়ে গেল। সে কি খুব বেশি দুঃসাহস দেখিয়ে ফেলেছে? ভদ্রলোক মনে আঘাত পাবেন না তো?

সারাদিন ধরে ভাবলো মার্থা, ভদ্রলোক খেতে বসে মাখন মাখানো রুটি দেখে কি করছেন না করছেন, কি ভাবছেন। মার্থাকেই ভাবছেন তো?

দরজার বেলটা বেজে উঠলো। কে যেন পাগলের মত ঘন্টি বাজিয়েই চলেছে। ত্রস্তপায়ে দরজা খুলে দিল মার্থা। একজন অপরিচিত তরুণ পাইপ মুখে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পাশে মার্থার সেই শিল্পী।

মার্থা অবাক হয়ে দেখলো এতদিনের চেনা সেই শান্ত হাসিখুশি ভদ্রলোকটির মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে. টুপিটা মাথার পেছনদিকে ঠেলা। চুলগুলো এলোমেলো। সে তার দুটি বদ্ধমুষ্ঠি মার্থার দিকে আস্ফালন করতে লাগলো।

সেই সঙ্গে জার্মান ভাষায় চীৎকার করে এমন কতগুলো কথা বললো, যার কিছুই মার্থার বোধগম্য হোলো না।

তরুণটি তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু ভদ্রলোক শুনলেন না, গর্জন করে বললেন—

—আমি যাবো না, যতক্ষণ না ওকে কথা শোনাতে পারছি। তুমি, বুড়ি বেড়াল, তুমি আমাকে নষ্ট করে দিয়েছো, ধ্বংস করে দিয়েছো।

তরুণ ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ ব্যক্তিটিকে জোর করে কলার ধরে বাইরে নিয়ে গেল—এখন চল। অনেক বলেছো।

মার্থা কোনরকমে তাকটা ধরে নিজের কম্পিত শরীরটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। জার্মান ভদ্রলোকটিকে রাস্তায় বার করে দিয়ে তরুণটি ফিরে এলো।

—ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলা উচিত, ঐ লোকটি, মানে ব্লুমবার্গার, বাড়ীঘরের নক্সা আঁকার কাজ করে। আজকেই শেষবারের মত কালি দিয়ে এঁকে এত দিনের কাজটা শেষ করেছিল। আপনি হয়তো জানেন প্রথমে পেন্সিল দিয়ে এঁকে নেওয়া হয়, আর সেই আঁকা ঘসে ঘসে মুছে তুলতে বাসি রুটিই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী, ভারতীয় রাবারেও অত ভাল মোছে না। তা আজ শেষবারের মত মুছতে গিয়ে ওর কাজটার যা দশা হয়েছে, তা আর বলার নয়। ঐ আঁকাটা দিয়ে এখন বোধহয় স্যাণ্ডউইচ ছাড়া আর কিছু করা যাবে না। বুঝতেই পারছেন, একটানা এতদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে এত বড় একটা কাজ যদি—মানে রুটিটা ও বরাবর এখান থেকেই কিনতো তো, তাই আপনার ওপর।

পিছনের ঘরে ফিরে গিয়ে মার্থা নীল পোষকটা খুলে সেই আগেকাব মত পুরোনো বাদামী সার্জের পোষাকটা পরে নিল।

আর, জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল রূপটান তৈরীর সব সাজ সরঞ্জাম।

*Witch's Loaves

একটু একটু

ব্রডওয়ে ধরে বেশ খানিকটা পথ যাওয়ার পর একবার বাঁয়ে, আর একবার ডাইনে মোড় নিয়ে যে বিশাল একুশতলা ইস্পাতের খাচার মত বাড়িটি দেখতে পাবেন, তারই বারো তলায় কার্টরেট অ্যাণ্ড কার্টরেটে কোম্পানীর অফিস। এরা ব্রুকলিনের কারখানায় মিলের চাহিদা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও চামড়ার বেল্টিং তৈরী করে।

ব্যবসার কথা থাক। অনর্থক প্রকাশক ও পাঠকের বিরক্তি কুড়িয়ে লাভ কি। বরং এই অফিসে যে একটি একাঙ্ক নাটক হয়ে গেল, আসুন সেদিকেই উঁকি দিই।

ষোল'শ কুড়ি খৃষ্টাব্দে পিছিয়ে গিয়ে আমরা দুই কার্টরেট ভাইকে আমেরিকায় ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় পদার্পণ করতে দেখি। এর মধ্যে জন পিলগ্রিম ফাদার হিসেবে এসে অত্যন্ত ধুরন্ধর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন, আর ব্র্যাণ্ডফোর্ড ভার্জিনিয়ার উপকূলে বিশাল খামার বাড়ীতে পানীয়, ও পাখি শিকারীর গর্ব নিয়ে নিজের কৃষ্ণকায় ভৃত্যদের সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন।

সিভিল ওয়ার ব্ল্যাণ্ডফোর্ড কার্টরেটকে প্রায় নিঃস্ব করে দিয়েছিল, পারিবারিক গর্বটুকু ছাড়া তিনি বংশধরদের জন্য কিছুই প্রায় রেখে যেতে পারেন নি।

ওদিকে যুদ্ধের অনেক আগে থেকে জন কার্টরেট নিউইয়র্কে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, এই মিল সাপ্লাই আর চামড়ার বেল্টিং-এর ব্যবসার গোড়াপত্তন তিনিই করেছিলেন।

ব্ল্যাণ্ডফোর্ডের পঞ্চম অধঃস্তন বংশধর পনেরো বছরের কিশোর ব্ল্যাণ্ডফোর্ডকে নিউইর্য়ক থেকে জন কার্টবেট পরিবার থেকে ব্যবসা শেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ব্ল্যাণ্ডফোর্ড তো আনন্দে লাফিয়ে উঠলো, পারিবারিক সমৃদ্ধি তলানিতে এসে ঠেকেছে, এখন শুধু পারিবারিক গর্বটুকু সম্বল করে শেয়াল শিকার করা ছাড়া তার তো আর কিছু ছিল না।

আজ দশ বছর পরে পঞ্চম ব্ল্যাডফোর্ড তার তুতো-ভাই পঞ্চম জন কার্টরেট এর সঙ্গে এই ব্যবসার সমান সমান অংশীদার। এখানেই আমাদের গল্প শুরু।

দুই কার্টেরেটই প্রায় এক বয়সী, একই ধরনের চেহারা, দুজনেই সমান সপ্রতিভ ও মনে হয় সমান মানসিক শক্তির অধিকারী। একই ধরনের পোষাক এমনকি মুক্তো বসানো টাইপিন দুটিও নিউইয়র্কবাসী সুলভ, এক ধরনেরই।

আজ সকালের ডাকে বাড়ী থেকে একটা চিঠি পেয়ে ব্ল্যাণ্ডফোর্ড নিজের মনেই হাসছিল। অন্য টেবিল থেকে জনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে সে জানালো, —মা লিখেছেন, আমাদের জ্যাককাকা নাকি নিউইয়র্কে আসছে, উদ্দেশ্য দেশভ্রমণ, যা নাকি তার পঁচাত্তর বছরের জীবনে এই প্রথম, আর প্রধান উদ্দেশ্য আমার বাবার হাতঘড়িটা, যেটা বাবার ব্যক্তিগত ভৃত্য জ্যাক কাকা একবার নিজের প্রাণ বিপন্ন করে উদ্ধার করেছিল, সেটা নিজের হাতে আমার মণিবন্ধে তুলে দেওয়া।

ঠিক বানানো গল্পের মতই ব্ল্যাণ্ডফোর্ডের চিঠি পড়া শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পিওন এসে জানালো কৃষ্ণকায় মিঃ জ্যাক মিঃ কার্টরেটের দর্শন চান।

জন কার্টরেট বৃদ্ধকে একটু বসিয়ে রাখতে বললো। তার মাথায় একটা মতলব এসেছে। ভাইকে জন বুঝিয়ে বললো,

—দেখো ব্ল্যাণ্ড, তোমাদের অর্থাৎ দক্ষিণীদের একটা ধারনা আর সব অ্যামেরিকানদের থেকে তোমরা আলাদা। তা, এই দশ বছরে তোমাকে তো আমরা ঘসে মেজে নিউইর্য়কী করে তুলেছি। আমার সঙ্গে তোমার চেহারারও খুব একটা অমিল নেই। আমি দেখতে চাই তোমার জ্যাক কাকা দুজনের মধ্যে থেকে ঠিক লোকটিকে চিনে নিতে পারে কি না।

—ঠিক আছে জন, বলছো যখন, দেখাই যাক। কৃষ্ণকায় ভদ্রলোকটিকে ডেকে পাঠানো হোল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ একই ধরনের চেহারার দুটি তরুণকে দেখে ধন্দে পড়ে গেল, সে ভেবেছিল হাজার জনের মধ্যে থেকে নিজের মনিবপুত্রকে চিনে নিতে পারবে, কিন্তু এদের দুজনের চেহারায়ই কার্টরেট পরিবারের ছাপ এত স্পষ্ট, যে বিশেষ একজনকে চিনে নেওয়া অসম্ভব বললেই হয়। কাজেই বৃদ্ধ দুজনের মাঝামাঝি জায়গায় চোখ রেখে অভিবাদন জানালো।

—মাস্টার ব্ল্যাণ্ডফোর্ড, ভাল আছেন তো? দুটি তরুণ একসঙ্গে উত্তর দিল।

—কেমন আছো জ্যাক কাকা। বোসো, বোসো। জ্যাক একটু দূরে সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব রেখে চেয়ারে পিঠ না ঠেকিয়ে বসলো। টুপিটা সযত্নে মাটিতে রেখে দিল।

হাতের ঘড়িটা চেপে ধরলো জ্যাক, প্রভুর ঘড়ি, সে প্রভুপুত্র ছাড়া আর কারো কাছে দেবে না।

—ঘড়িটা এনেছো তো জ্যাক কাকা? আবার কোরাসে বললো তরুণদ্বয়।

—হ্যাঁ ঘড়িটা আমার কাছেই আছে। মিসেস ব্র্যাগুফোর্ড এটা মাস্টার ব্র্যাগুফোর্ডকে দিতে বলছেন। আর বলেছেন পরিবারের মর্যাদা স্বরূপ ঐ ঘড়ি যেন তিনি সবসময় পরে থাকেন।

দুই তরুণই সোৎসাহে বললো—নিশ্চয়ই পরবো আমি আর আমার ভাই আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের কথাই এতক্ষণ বলাবলি করছিলাম, মার চিঠি পাবার পর থেকেই।

অট্টহাস্য করে উঠলো জ্যাক।

—বুঝতেই পেরেছি, আপনারা দুজনেই এই বুড়োর সঙ্গে মজা করতে চাইছেন। কিন্তু এই বুড়োর চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না মাস্টার। অন্য ভদ্রলোকটির সঙ্গে যদিও আপনার যথেষ্ট মিল, তবু সেই একরত্তি শিশু থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত বেড়ে উঠতে দেখেছি যাকে, তাকে কি চিনতে ভুল হয়? এই নিন—

মুচকি হেসে দুজন কার্টরেটই একসঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল।

হতবুদ্ধি জ্যাক এই চাতুরীর ফাঁদ থেকে বের হবার রাস্তা খুঁজতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল এমন সময় বেয়ারা এসে এক মহিলার আগমনবার্তা জানিয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিল।

নীল টাই পরা ও কালো টাই পরা তরুনদ্বয় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করে নিল জ্যাক কাকা ততক্ষণ অফিস ঘরটির অন্যকোনে বিশ্রাম করুক, তারা ঐ মহিলা, অর্থাৎ অলিভিয়া ডি অরম্যাগু-এর সঙ্গে কাজের কথাটা সেরে নিতে চায়।

অলিভিয়া ডি অরম্যাগু নিঃসন্দেহে সুন্দরী, সুবেশা এবং আত্মসচেতন তরুণী। তিনি নীল টাই এর টেবিলে বসলেন, এবং তিনজনে কিছুক্ষণ প্রথাসিদ্ধ বাক্যালাপ করলেন।

অলিভিয়া বললেন—এবার কাজের কথাটা হয়ে যাক। না, আপনাদের দুজনের উপস্থিতিতেই কথাটা বলতে আমার আপত্তি নেই। মিঃ কার্টরেট অনেকের সামনেই আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন, এবং এই মর্মে কিছু চিঠিও দিয়েছেন, তার কি হবে?

কালো টাই চেষ্টাকৃত সৌজন্যের সঙ্গে বললো, —আপনার কথাটা সত্যি। আমার ভাই এরকম কাজ করেছেন। আমি এবং আমাদের বন্ধুরা তার সাক্ষী। কিন্তু মিস্ অলিভিয়া, আপনি তো স্টেজে অভিনয় করেন, এরকম অনেক পাণিপ্রার্থী তো আপনার আগেও এসেছে, তাই না?

—কিন্তু চিঠিগুলো? সেগুলো তো আমার কাছে আছে।

—হ্যাঁ, তা ঐ চিঠিগুলোর জন্য কি দাম চান আপনি?

—আমি সাধারণ সস্তা মেয়ে নই মিঃ কার্টরেট। আপনার ভাইকে আমার ভাল লেগেছিল, তাকে বিশ্বাস করেছিলাম আমি। তবে আপনারা সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে, তাই ঠিক করেছি দশ হাজার ডলার দামে চিঠিগুলো আমি দিয়ে দেবো।

—আর, তা না হলে?

—না হলে বিয়ে করতে হবে।

নীল টাই এতক্ষণে মুখ খুললো। ভাই, এবার আমার কথা বলার সময় হয়েছে যদিও আমরা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে জন্মেছি, তবু একথা তো সত্যি আমরা দুজনেই কার্টরেট। নারীকে

সম্মান করতে আর কথা দিয়ে কথা রাখতে কার্টরেটরা কখনও পিছ-পা হয় না। অলিভিয়া, কোন্ তারিখে বিয়ে করবে আমায়?

কালো টাই ভাই-এর মুখের কথা কেড়ে নিল। —না বন্ধু,অতীতের ইতিহাস মনে এনে লাভ নেই। সময় পটভূমিকায় একেবারে পাল্টে দিয়েছে। এখন আর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষেরা যা করতেন, তার অনেক কিছুই করিনা, মেয়েদের হাঁটার জন্য রাস্তায় গায়ের কোট বিছিয়ে দিইনা, ক্রীতদাসদের পুড়িয়েও মারিনা। আমরা এখন ব্যবসার জগতে বাস করি। ব্যবসায়ীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই দেখি পৃথিবীকে।

কালো টাই চেকবই টেনে নিয়ে খসখস করে টাকার অংকটা লিখে চেকটা ছিঁড়ে অলিভিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল—এই নিন্ মিস্ অলিভিয়া, আমার ব্যক্তিগত চেক্। আপনি কোনটা পছন্দ করবেন ভেবে নিন, দশহাজার ডলার, না বিয়ের ফুল?

চেকটা নিল অলিভিয়া।

—এতেই হবে। আমার মনে হোল তাই আপনাদের সঙ্গে কথা বলে নিলাম। ভালো কথা, শুনেছি আপনাদের মধ্যে একজন দক্ষিণের লোক। কোন্ জন তা বুঝতে পারলাম না। মিষ্টি হেসে বিদায় জানিয়ে মেয়েটি চলে গেল।

দুই ভাই জ্যাক কাকার অস্তিত্ব বেমালুম বিস্মৃত হয়েছিল। কিন্তু পা ঘসটানির শব্দে চকিত হয়ে দেখলো বুড়ো জ্যাক কোনের চেয়ারটি থেকে উঠে তাদের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

—মাস্টার। আপনার ঘড়িটা নিন। একটুও ইতস্ততঃ না করে ঘড়িটা সে প্রকৃত উত্তরাধিকারীর হাতেই তুলে দিল।

*Thimble Thimble

মফঃস্বলের ইতিকথা

গল্পের শহর যদি বলো তো, নিউইয়র্ক, সানফ্রানসিস্কো, নিউ-অর্লিয়েন্স, ন্যাশভিল, শিকাগো এইসব শহর নিয়ে কি আর গল্প হয়?

তা এই ন্যাশভিলেই নামলাম এক সন্ধ্যায়। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে নিগ্রো কোচওয়ানের গাড়ীতে হোটেলে আসতে আসতে নিতান্তই বৈশিষ্ট্যহীন বলে মনে হোল শহরটাকে।

হোটেলটা মন্দ নয়, সদ্য সংস্কার করা হয়েছে মনে হোল। ডিনারের পর নিগ্রো ওয়েটারকে জিগ্যেস করে জানলাম, রাত্রে এখানে কিছু দেখার বা কিছু করার নেই।

দেখাই যাক, হোটেলের বাইরে পা রাখতেই মহা হট্টগোলের মধ্যে পড়ে গেলাম। সারি দিয়ে দাঁড়ানো গাড়ীগুলোর কোচোয়ানরা মহা সোরগোল করে ডাকাডাকি করতে লাগলো। মাত্র পঞ্চাশ সেন্টের বিনিময়ে নাকি শহরের মধ্যে যেখানে খুশী পৌঁছে দেবে।

খানিকটা পায়ে হেঁটে দুচারটে টিমটিমে দোকান ছাড়া ধোঁয়াশার মধ্যে কিছু চোখে পড়লো না। হোটেলে ফিরে প্রথম দেখা হোলো মেজর ওয়েস্টওয়ার্থ ক্যাসওয়েল সঙ্গে। এ ধরনের মানুষ সর্বত্র দেখা যায়, আর এদের দেখলে কেন জানিনা আমার ইঁদুর ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। এখন অবিশ্যি লোকটা যে ভাবে হোটেলের লবিতে পায়চারী করছিল। মনে হচ্ছিল কোন ক্ষুধার্ত কুকুর বুঝি তার লুকিয়ে রাখা মাংসের হাড়টা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আমার সঙ্গে বার-এ এসে বসলো লোকটা, আর শুরু করে দিল বকরবকর। নিজের পারিবারিক পূর্বসূরী হিসেবে সরাসরি আদম পর্যন্ত চলে গেল সে। আর তার স্ত্রী নাকি ইভের পারিবারের কোন শাখার সন্তান। এবং যথেষ্ঠ সম্পদশালীও বটেও। বারে সেই টাকাই খরচ করছে। এই বক্তিয়ার খিলজীর কাছে থেকে মানে মানে সরে পড়াই ভাল। নিজের ঘরের চাবি নেবার সময় কাউন্টারের লোকটি আমাকে ডেকে বললো ঐ ক্যাসওয়েল যদি একটুও বিরক্ত করে, আমি যেন কর্তৃপক্ষের কাছে জানাই। ও লোকটি মাতাল হয়ে প্রায়ই বিরক্তিজনক হয়ে ওঠে, কিন্তু গ্রাহকরা ভদ্রতাবশত নালিশ করেন না বলে হোটেল কর্তৃপক্ষ ওর এখানে আসা বন্ধ করতে পারে না।

আমি একটু ভেবে বললাম, —না, আমার কোনও নালিশ নেই, তবে ঐ লোকটির সাহচর্যের জন্য আমি মোটেই লালায়িত নই, যাই হোক্, তোমাদের শহরটা খুব নিষ্প্রাণ, তাই না। এখানে• বোধকরি কোনদিন কোনও ঘটনা ঘটে না।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে কাজের কথা ভাবছিলাম। একটা সাময়িক পত্রের তরফ থেকে ঐ কাগজের একজন লেখিকা এজেলিয়া এডায়ার-এর কাছে আমাকে পাঠানো হয়েছে, মুখোমুখি কিছু আলোচনা করে নেবার জন্য। তাঁর পাঠানো কিছু কবিতা ও রচনা সম্পাদকমণ্ডলী মনোনীত করেছেন, শব্দ পিছু দুই সেন্ট হারে তাঁরা এজেলিয়ার রচনা সম্ভার প্রকাশ করতে ইচ্ছুক, এই ব্যাপারটাই আমাকে জানাতে হবে।

সকাল নটায় সুস্বাদু প্রাতঃরশ সেরে নিয়ে একটানা ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই পথে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তার মোড়েই আঙ্কল সিজারের সঙ্গে দেখা,সে আসলে একজন বয়স্ক দশাসই চেহারার কৃষ্ণকায় কোচোয়ান। তার গোড়ালী ছোঁওয়া কোটটি দীর্ঘ দিনের রোদে পোড়া, জলে ভেজার পর্ব শেষ করে অবর্ণনীয় চেহারা নিয়েছে। তবু গল্পের শেষে এই কোটটির যে একটা বিশেষ ভূমিকা আছে সেটাই আমরা দেখবো।

কোচোয়ানদের বাঁধা বুলিতে সে আমাকে জানালো, তার গাড়ী একদম সাফ্ সুত্রো, কেননা এখনই গোরস্থান থেকে শোকযাত্রীদের পৌছে দিয়ে ফিরছে সে। পঞ্চাশ সেন্টের বিনিময়ে শহরের মধ্যে যে কোন জায়গায় পৌছে দেবে সে। এখন তার পোশাকটা লক্ষ্য করেছিলাম। মজার কথা, কোটটিতে একটি মাত্র বোতাম অক্ষত আছে। বাকি, বোতামের ফুটোগুলোতে মোটা সুতো ঢুকিয়ে গিট বেঁধে আটকে রাখা হয়েছে।

আমি আটশো একষট্টি নম্বর জেসমিন স্ট্রীটে যেতে চাই শুনে একটু থমকে গেল চালক। জিগ্যেস করলো—ওখানে যাচ্ছেন কেন?

—সেকথায় তোমার কি দরকার?

—না, কিছু না, আসলে ও জায়গাটা শহরের একেবারে ওই প্রান্তে, নির্জন এলাকা। ওখানে তো দেখার কিছু নেই, তাই বলছিলাম।

আটশো একষট্টি নম্বর বাড়ীটা রাস্তা থেকে তিরিশ গজ দূরে। বিশাল কয়েকটি বনস্পতি তার প্রচুর অযত্নে বেড়ে ওঠা ফুলগাছে ঢাকা বাড়িটা দেখলে বোঝা যায়, সমৃদ্ধ ও আভিজাত্য একদিন এবাড়ী চোখে দেখেছে।

বাড়ীর সামনে পৌঁছে দিয়ে কিন্তু অবাক করলো আঙ্কল সিজার, পঞ্চাশসেন্ট নয়, সে চায় দুডলার। মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার, ভেবেছে আমি বিদেশী, অর্থাৎ উত্তরের লোক, তাই ঠকানো যায় না। তাকে বললাম, আমিও আদতে দক্ষিনেরই লোক, কাজেই ভাড়া নিয়ে চালাকি, আমার সাথে যেন না করতে আসে।

নিজের লোক বলে চিনতে পারার হাসি দেখলাম বুড়োর মুখে—হ্যাঁ, বেশিই চাইছে সে, কেননা দু'ডলারই দরকার তার, অথচ আয় তেমন হচ্ছেনা আজকাল।

—তা সে কথা বললেই হয়।

দু'ডলার দিয়ে দিলাম। সে কি কৃতজ্ঞ হাসি বৃদ্ধের মুখে। একটা এক ডলারের নোট দেখলাম শতচ্ছিন্ন, নীল কাগজ আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে তার ওপর।

গেট খুলে ঢুকলাম বাড়ীটাতে, বোধহয় কুড়ি বছরের ওপর রং করা হয়নি বাড়ীটাতেই। মনে হোল চারপাশের বনষ্পতিগুলো যেন দুহাত বাড়িয়ে বাড়ীটাকে সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ঠেকিয়ে রেখেছে।

শুভ্রকেশ প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স্কা এজেলিয়া সস্তা অথচ পরিচ্ছন্ন পোশাকে আমাকে রাণীর মত সহজ সাবলীলতায় আমাকে স্বাগত জানালেন। এঁর পূর্বপুরুষরা বীর যোদ্ধা ও সম্ভ্রান্ত নাগরিক ছিলেন, সেটা ওঁর দিকে একনজর তাকালেই বোঝা যায়।

তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, তিনি চিরদিন দক্ষিণের এই শহরের রক্ষণশীল আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছেন। প্রচুর পড়াশোনা করেছেন, এমন নয়, কিন্তু যেটুকু জ্ঞান অর্জন করেছেন, তার একেবারে গভীরে গিয়েছেন। এতটুকু ফাঁক অথবা ফাঁকি নেই।

আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই তাঁর। এই বাড়ীটি, লাইব্রেরী আর পরনের পোশাকটি ছাড়া আর কোন সম্বল যে তাঁর নেই,সেটা বুঝতে খুব অসুবিধে হোলো না, তবু সেই মুহূর্তে তুচ্ছ টাকাপয়সার কন্ট্রাক্ট-এর কথা বলতে কোথায় যেন আটকালো, এমনই অভিজাত তাঁর উপস্থিতি। কথা হোল পরদিন বিকেলে আবার তাঁর কাছে আসবো সাময়িক পত্রের পক্ষ থেকে কিছু বলতে।

ওঠার সময় বললাম তাদের শহরটা এত শান্ত ও স্তিমিত, এখানে বোধহয় কখনও কোনও আকস্মিক ঘটনা ঘটে না।

এজেলিয়া হাসলেন —আমি ঠিক ওভাবে ভেবে দেখিনি। বই-এর পাতার মধ্যে দিয়েই তো আমার বিশ্বভ্রমণ, সেখানে দেখেছি আপাত নিস্তরঙ্গ তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আন্দোলন। আমাদের এই শান্ত মফঃস্বলের অন্তরে প্রবেশ করলেও দু'একটা ঘটনা ঘটতে দেখা যায় বৈকি।

এমন সময় বাড়ীর পেছনের দরজায় করাঘাত শুনে আমাকে বসতে বলে চলে গেলেন এজেলিয়া। একটু পরেই উজ্জ্বল মুখে ফিরে এসে আমাকে চা খেয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। একটি নগ্নপদ ছোট্ট কৃষ্ণবর্ণ মেয়েকে ডেকে কোনের মিঃ বেকার-এর দোকনে থেকে ভাল

চা (ওই চা টা বাড়ীতে ফুরিয়েছে, আমাকে বললেন) আর কিছু কেক আনতে দিলেন। ছোট্ট পার্স খুলে যখন তাকে একটা ডলার আর কিছু খুচরো দিলেন, আমি অবাক হয়ে দেখলাম, বুড়ো সীজারকে আমি যে ছেঁড়া টাকাটা দিয়েছিলাম, সেটাই।

মেয়েটি ঘরের বাইরে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার গলায় একটা চীৎকার শুনলাম, সেই সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। এজেলিয়া বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করে শান্তভাবে ব্যাপারটা দেখতে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে তেমনি সংযত গলাতেই বললেন, তাঁর একজন মাতাল ভাড়াটে একটু গোলমাল করছিল, কিন্তু মিঃ বেকারের কাছে আজ সেই চা-টা নেই, কাজেই চায়ের আমন্ত্রণ তাঁকে ফিরিয়ে নিতে হচ্ছে। কাল বিকেলের জন্য নতুন করে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন তিনি। আমার অবশ্য বুঝতে কষ্ট হয়নি যে, কথাগুলো বানানো। ইম্পি নামে মেয়েটি এইটুকু সময়ের মধ্যে দোকানে গিয়ে ফিরে আসতেই পারে না।

সেদিন বিকেলেই সেই কোচোয়ান সীজার-এর সঙ্গে আবার দেখা। তাকে জানালাম পরদিন তার গাড়ীতে বিকেলে আবার যেন আমাকে ওই ঠিকানায় নিয়ে যায়। জিগ্যেস করলুম, ঐ মিস এজেলিয়াকে সে চেনে কিনা।

—চিনি বৈকি! ওনার বাবা জাজ এডিয়ার তো আমার মনিব ছিলেন।

—ওনার আর্থিক সম্বল বলতে বিশেষ কিছুই নেই, তাই না?

—উনি উপোষ করে মরবেন না স্যার। ওঁর কিছু সম্বল আছে। কিছু আছে।

দেখলাম এক মুহূর্তের জন্যে সেই গরীব কোচোয়ানের চোখে মুখে যেন রাজকীয় সম্ভ্রম ফুটে উঠলো।

—কাল কিন্তু পঞ্চাশ সেন্ট ভাড়াই দেবো।

—ঠিক আছে স্যার। আজ সকালে আমার দু'ডলার না হলেই হোত না।

হোটেলে ফিরে সম্পাদককে তার করে দিলাম—এজেলিয়া এডেয়ারকে শব্দ পিছু আট সেন্ট করে দিতে হবে।

উত্তর এলো খুব তাড়াতাড়ি।

—ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি কন্ট্রাক্ট করে নাও।

ডিনারের ঠিক আগেই 'মেজর' ক্যাসওয়েল এসে হাজির। তার পেগ-এর দাম চুকিয়ে দিয়ে তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কথা ভাবছি, সে লক্ষপতির ভঙ্গিতে সগর্বে দুটো ডলার বারের কাউন্টারে রেখে দিল। বিস্ময়ে চোখ দুটো ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসার জোগাড় আমার। সেই নীল কাগজ আটকানো ডলারটা! এখানে, ঐ লোকটার কাছে এলো কি করে?

ঘুমোবার আগে পর্যন্ত ঐ রহস্যময় কোন ছেঁড়া ডলার আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো, এ নিয়ে সানফ্রানসিস্কো শহরের পটভূমিকায় দারুন একটা গোয়েন্দা গল্প লিখে ফেলা যায়।

পরদিন মিস অ্যাডেয়ারকে যেন আগের চেয়েও দুর্বল আর নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল। শব্দ প্রতি আট সেন্ট এর কন্ট্রাক্ট সই করার পর তিনি আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে যেন পড়ে যেতে লাগলেন। তাঁকে তুলে নিয়ে সোফায় শুইয়ে দিয়ে আমায় ফেরৎ নিয়ে যাবার জন্য

অপেক্ষমান সীজারকে ডেকে ডাক্তার আনতে বললাম। আশ্বস্ত হয়ে দেখলাম তার মন্থর গতি যানটির ওপর ভরসা না করে পায়ে হেঁটেই দ্রুত রওনা দিল সে, এবং দশ মিনিটের মধ্যেই একজন ডাক্তারকে নিয়ে ফিরে এলো।

আমার কাছ থেকে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে নিয়ে ডাক্তার বাবু শান্তস্বরে কোচোয়ানকে ডেকে বললেন—আঙ্কল সীজার, এক্ষুনি আমার বাড়ী যাও। মিস লুসিকে বলো এক্গ্লাস দুধে একটু পোর্ট ওয়াইন মিশিয়ে তোমাকে দিতে। শোনো, তাড়াতাড়ি আসবে। তোমার গাড়ী নিওনা, পায়ে হেঁটে যাবে।

বুঝলাম ডাক্তার মেরিম্যান-এরও সীজারের ভাঙা ঝড়ঝড়ে গাড়ীর গতির ওপর বিশ্বাস নেই। সীজার দ্রতগতিতে চলে যাবার পর ডাক্তার আমাকে বেশ ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন, মনে হোল তাঁর চোখে আমি পাশ করে গিয়েছি। তারপর বললেন,

—চিন্তার কোন কারণ নেই। ক্রমাগত অনাহার জনিত অপুষ্টিতে ভুগছেন এজেলিয়া। অনেক বন্ধু আছে তাঁর, যাঁরা তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু উনি ঐ আঙ্কল সিজার ছাড়া কারো কাছ থেকে কিছু নেন না। মিসেস ক্যাসওয়েলকে ঐ বুড়োই বাঁচিয়ে রেখেছে।

মিসেস ক্যাসওয়েল? আমি নামটি শুনে অবাক হয়ে গেলাম, কিন্তু পরক্ষণেই কন্ট্রাক্টের কাগজটার দিকে তাকিয়ে দেখি উনি সই করেছেন এজেলিয়া এডেয়ার ক্যাসওয়েল।

—আমার ধারনা ছিল উনি কুমারী।

—একটা মাতাল লোফারকে বিয়ে করেছেন উনি। শুনেছি ঐ বৃদ্ধ সীজারের দেওয়া সামান্য টাকাও সে কেড়ে নেয়।

দুধ আর ওয়াইন আসার পর ডাক্তার অল্প সময়েই এজেলিয়াকে সুস্থ করে হেমন্তের ঝরাপাতার রং আর সৌন্দর্য্য নিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। মূর্চ্ছা যাওয়ার কারন হিসেবে হাল্কা ভাবেই পুরোনো হৃদ্‌রোগের উল্লেখ করলেন তিনি। ইম্পি তাকে বাতাস করতে লাগলো। ডাক্তার শুনে খুশি হলেন লেখার পারিশ্রমিক হিসেবে আমি এজেলিয়াকে বেশ কিছু টাকা অগ্রিম দিতে এসেছি। তাঁর অন্যত্র রোগী দেখতে যাওয়ার ছিল। আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন তিনি।

যাবার আগে বললেন—ভালো কথা, আপনার কোচোয়ানটি যে রাজবংশীয় তা জানেন কি? বুড়ো সীজারের ঠাকুরদা কঙ্গোর একজন রাজা ছিলেন। ওর মধ্যে বেশ কিছু রাজকীয় হাবভাব লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই?

ডাক্তারকে বিদায় দেবার সময় বাইরে থেকে শুনলাম সীজার ঘরে এজেলিয়াকে জিগ্যেস করছে,

—মিস এজিলিয়া, ও তোমার কাছ থেকে ওই দু'ডলার নিয়ে গেছে, তাই না।

—হ্যাঁ সীজার। দূর্বল স্বরে বললেন এজিলিয়া।

তারপর আমি তাঁকে পঞ্চাশ ডলার অগ্রিম দিয়ে কাজটা মিটিয়ে ফিরে এলাম।

সন্ধ্যে ছটার সময় একটু বেড়াতে বেরিয়ে আবার গাড়ীর লাইনে সীজারকে একই বাঁধা বুলি আওড়াতে দেখলাম—আসুন স্যার। পঞ্চাশ সেন্টে সারা শহর। পরিস্কার গাড়ী, এক্ষুনি শবযাত্রা থেকে ফিরেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। লক্ষ্য করলাম, আজ তার সেই সবেধন নীলমনি

বোতামটিও স্থানচ্যুত হয়েছে। রাজকীয় পোশাকের বোতামটিও স্থানচ্যুত হয়েছে। রাজকীয় পোশাকই বটে।

ঘন্টাদুয়েক পরে একটা ওষুধের দোকানের সামনে উত্তেজিত জনতার ভীড় দেখে থমকে গেলাম। ন্যাশভিলে উত্তেজনা?

ভিড় ঠেলে ঢুকে দেখি ভাঙা বাক্স পেঁটরার ওপর পড়ে আছে মেজর ক্যাসনওয়েল। একজন ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে জানালেন, সে যে মৃত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শোনা গেল, এক অন্ধকার গলিতে পড়ে ছিল ক্যাসওয়েলের দেহটা। কয়েকজন লোক দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে এসেছিল এই ওষুধের দোকানে। মরার আগে সে যে কারো সঙ্গে দারুন লড়াই করেছিল, সেটা তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তার হাতের মুঠো এখনও দৃঢ়বদ্ধ। চারপাশে তার পরিচিত যারা ছিল, তারা ক্যাসওয়েল সম্বন্ধে সময়োচিত দু'চারটে কথা বলার চেষ্টায় মাথা চুলকে যাচ্ছিল। শেষমেশ একজন কেবল এইটুকু মনে করতে পারলো যে চোদ্দবছর বয়সে ক্যাসওয়েল স্কুলে সবচেয়ে ভাল বানান জানতো।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ক্যাসওয়েলের বদ্ধমুষ্ঠি আলগা হয়ে একটা কিছু গড়িয়ে পড়লো, আমি চকিতে পা দিয়ে সেটি চাপা দিয়ে দিলাম. আর কেউ দেখে ফেলার আগেই সেটি পকেটে ঢুকিয়ে নিলাম। বুঝতে পারলাম, মারামারি করার সময় প্রতিপক্ষের কোনও জিনিষ সে আঁকড়ে ধরেছিল সেটাই রয়ে গেছে তার বজ্রমুষ্ঠিতে।

সেদিন রাতে হোটেলে ঐ একটাই আলোচনা। একজন লোককে বলতে শুনলাম, টাকার জন্যই খুন হয়েছে ক্যাসওয়েল। সেদিন বিকেলেই অনেককে সে ডেকে দেখিয়েছে, পঞ্চাশটা ডলার আছে তার কাছে। মৃত ক্যাসওয়েলের কাছে কিন্তু কোনও টাকা পয়সা পাওয়া যায় নি।

পরদিন সকালের ট্রেনে ফিরে যাবার সময় আমি কোটের পকেট থেকে আঙ্কল সিজারের কোটের বোতামটা নদীর বুকে বিসর্জন দিলাম।

* A Municipal Report

কবি ও কৃষক

কি আর বলবো, আমাদের এক বন্ধু, যে সারা জীবন প্রকৃতির কোলে তার রূপ রস গন্ধ সমস্ত অস্তিত্ব ভরে পান করেছে, প্রকৃতিকে নিয়ে লেখা তার কবিতা কিনা সম্পাদক এক নজরেই অমনোনীত করে দিলেন। কি? না বড্ডই কৃত্রিম।

তা, সম্পাদকের বিজ্ঞতার খোলসটা ছাড়িয়ে ফেলার জন্যে আমরা ক'জন বন্ধু মিলে একটা পরিকল্পনা করলাম। আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু কনান্ট, যে কিনা আজন্ম এই ইটকাঠের

খাঁচার মধ্যেই লালিত। ফুল বলতে ফ্লোরিস্ট-এর দোকানে সাজানো ফুলদস্তা আর প্রকৃতির প্রাণী বলতে খাবার দোকানের প্লেটে যাদের সাজিয়ে দেওয়া হয়, তা ছাড়া অন্য কিছু চাক্ষুস করেনি, সেই কথা সাজিয়ে সাজিয়ে প্রকৃতির গন্ধমাখা কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিল সম্পাদকের দপ্তরে।

গল্পটা কিন্তু অন্য। সম্পাদকের টেবিলে কবিতাটা পৌঁছবার দিন সকালেই শহরের রাস্তায় সদ্য গ্রাম থেকে আসা এক আগন্তুককে দেখা গেল, সে যে চাষী পরিবারের ছেলে, সেটা তার হাবভাব, পোষাক পরিচ্ছদ, এমনকি চুলে লেগে থাকা খড়ের টুকরোতেই মালুম দিচ্ছে।

শহরের লোক কিন্তু তাকে দেখে বিজ্ঞের হাসি হাসলো। এরকম সার্কাস তারা আগে অনেক দেখেছে। নিশ্চয়ই ওর হাতের ব্যাগে কোনও বিক্রয়যোগ্য পশরা আছে। সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেই বহুরূপীর পোষাকে অবতীর্ণ হয়েছে যুবকটি।

লোক ঠকিয়ে খাওয়াই যার পেশা, সেই ব্যাংকো হ্যারি পর্যন্ত নিজের দলের লোক বলেই মনে করে বীয়ার খেতে ডাকলো তাকে। যুবকটি জানালো ঠাকুমার উইল অনুযায়ী ন'শো পঞ্চাশ ডলার পেয়েছে সে, তাই নিয়ে শহরে এসেছে কোন ব্যবসা করার ধান্দায়, টাকার তোড়াটাও দেখাতে ভুললো না। কিন্তু ব্যাংকো হ্যারী আর তার বন্ধুরা তরুণটির পিঠ চাপড়ে মুচকি হেসে উপদেশ দিল, এই বেশে হবে না। চটকদার শহুরে পোষাকে আর চালচলন না থাকলে নকল টাকা নিয়ে এখানে ব্যবসা করা যায় না।

সারাদিন ধরে কারও বিশ্বাস অর্জন না করতে পেরে তিতিবিরক্ত যুবকটি একপ্রস্থ শহুরে পোষাক কিনে পরে নিল। কিন্তু পোষাকের পছন্দ আর পরার ধরনে শহরের লোক এক পলকেই গেঁয়ো, আনাড়ী বলে চিনে নিল তাকে।

ফল যা হবার তাই হোল। রাত এগারোটার মধ্যেই শহরের শকুনের দল ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। নিমেষেই হাওয়া হয়ে গেল তার ব্যাগসমেত সমস্ত আর্থিক সম্বল।

থানায় উদ্‌ভ্রান্ত যুবকটিকে বহু জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ এটুকু উদ্ধার করতে পারলো যে তার নাম যাবেজ বুলংটন, সে এসেছে উল্টারের লোটাস ভ্যালি ফার্ম থেকে।

এই হোল গল্প। আগের কথায় ফিরে আসি। কনান্ট সম্পাদকের দপ্তরে তার কবিতার জন্য কি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অপেক্ষা করছে জানার জন্য উপস্থিত হোল। তাকে সাদরে সম্পাদকের নিজের ঘরে নিয়ে যাওয়া হোল।

সম্পাদক সোৎসাহে বললেন, এই "হরিনী ও তটিনী" কবিতাটির প্রথম কলিটি পড়েই আমি বুঝতে পেরেছি, এ কবিতায় মাটির ঘ্রাণ লেগে আছে। এই কবি আজীবন প্রকৃতিতে মগ্ন হয়ে আছেন। কবিতার শেষ দিকটায় অবশ্য চেষ্টাকৃত পরিশীলনের ছাপ আছে, কিন্তু সেটা আমাকে বোকা বানাতে পারে নি। এটা কি রকম জানো? কোন গ্রামবাসী যদি একদিনের জন্য শহরে এসে শহুরে পোষাকে ঘুরে বেড়ায়, তবে নাগরিকের অভিজ্ঞ চোখ তার আবরণের অন্তরালে আসল রূপটি চিনে নিতে ভুল করে না।

—ধন্যবাদ, বললো কনান্ট—হ্যাঁ আমার এই কবিতাটির দরুন প্রাপ্য টাকাটা বৃহস্পতিবারের মধ্যেই পেয়ে যাবো আশা করি।

এই গল্পটার মধ্যে থেকে কি নীতিবাক্য উদ্ধার করতে পারলেন, বলুন তো? সব গুলিয়ে গেছে, তাই না?

আমি বলি কি হয় "কদাপি কবিতা লিখো না" বা "গ্রাম আছো, গ্রামেই থাকো" এই দুটোর যে কোন একটাকে পছন্দ করে নিন না।

*The Poet and the Peasant

তৃতীয় মশলা

হেটি পেপার বিষণ্ণতার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে আজ। আজই তার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের চাকরীটি গেছে, কাল থেকেই চাকরীর খোজে জুতোর হিল ক্ষইয়ে ফেলতে হবে। আর আজই কিনা রোজকার মত মাংসের টুকরো কিনতে গিয়ে দেখে, একলাফে তার দাম ছ'সেন্ট থেকে সাড়ে সাত সেন্ট হয়ে গেছে। ঐ চার সেন্ট যদি পকেটে থাকতো তাহলে—

সে কথা এখন থাক। হেটির জীবনকাহিনীতে একটু উঁকি দিই। চারবছর আগে হেটি বিজ্ঞাপন দেখে ঐ দোকানে গিয়েছিল। সেখানে তখন স্বর্ণকেশী সুন্দরীদের মেলা লেগে গিয়েছে। সুন্দরীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে নির্বাচকমণ্ডলী কিংকর্তব্যবমূঢ় হয়ে পড়েছিল, এমন সময় নিতান্ত সাধারণ চেহারার আর কাজের পোশাক পরা উনত্রিশ বছরের হেটিকেই কাজটি দিয়ে দিয়েছিল।

আর এমনি এক মিনিটের নেটিশেই চার বছর পরে তার চাকরীটা চলেগেল। ব্যাপারটা অবশ্য তেমন কিছু নয়। একজন মেয়ে ঘেঁষা খদ্দের হেটির বাহুমূলে একটি রামচিমটি কেটেছিল, হেটিও সময় নষ্ট না করে কষিয়ে দিয়েছিল সপাটে একটি চড়। সঙ্গে সঙ্গে চাকরী নট।

হেটি অবশ্য তা নিয়ে অবশ্য খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছে না, যা হবার তা হবে। উপস্থিত সমস্যা হচ্ছে আতিপাঁতি করে খুঁজেও ঘরে একটুকরো আলু বা পেঁয়াজ পেলো না, পকেটও ঢনঢন, মাংসের দামটা যদি আজই না বাড়াতো। এখন কথা হচ্ছে মাংসের স্টুটা রাঁধে কি দিয়ে।

ঘরের বাইরে টানা বারান্দায় বারোয়ারী জলের কলে স্টু এর জন্য জল নিতে এলো কেটি। সেই আলু, যা সে মনে প্রাণে জপ করছিল। দোতলার একটি মিনিয়েচার শিল্পী ভাড়াটে মেয়ে আনাড়ি হাতে দুটি আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে।

তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসে হেটি জানলো, মেয়েটি তারই মত দুর্দশায় পড়েছে, আজ ডিনারের জন্য এ দুটি আলুই তার ভরসা। সে তার শিল্পের কোনও চাহিদাই দেখতে পাচ্ছে না। শুধু আলুসেদ্ধ খেয়ে কাটাতে হবে ভাবতেই তার কান্না পাচ্ছে। তারপর কাল কি হবে?

তরুণী মেয়েটিকে প্রায় মাতৃস্নেহে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে এলো হেটি। তাকে বুঝিয়ে বললো, তার কেনা মাংস আর মেয়েটির আলুসেদ্ধ দিয়ে চমৎকার স্টু বানিয়ে দুজনে একসঙ্গে ডিনার সারবে তারা। কৃতজ্ঞতায় মেয়েটির চোখে জল এসে গেল।

রান্না বসিয়ে দিল হেটি। তার মনটা কিন্তু খুঁত খুঁত করতে লাগলো, একটা পেঁয়াজ যদি পাওয়া যেত। পয়সা থাকলে এক ছুটে কোনের দোকানে চলে যেত সে, কিন্তু সেটাই যে বাড়ন্ত।

পেঁয়াজের চিন্তায় মগ্ন থাকতে থাকতেই হঠাৎ হেটির খেয়াল হোল, মেয়েটির চোখের জল শুকোচ্ছে না, দেওয়ালে টাঙানো একটা ফেরীবোটের ছবির দিকে তাকিয়ে তার চোখের জল যেন বাঁধা মানছে না।

ঘটনাটা জানতে হচ্ছে। হেটি নানারকম প্রবোধবাক্যে মেয়েটিকে শান্ত করে জেনে নিল ব্যাপারটা কি। মাত্র তিনদিন আগে একটা কাজের খোঁজ পেয়ে জার্সি শহরে গিয়েছিল মেয়েটি। কাজটি হয়নি। ফিরতি বোটে নিউইয়র্ক ফেরার পয়সাটাই মাত্র ছিল তার কাছে। তার উল্টোদিকের আসনেই একটি সুদর্শন যুবক বসেছিল, এক নজরে তার মুখখানা খুব মমতাময় বলে মনে হয়েছিল তার।

কিন্তু একটু একটু করে নিঃসম্বল জীবনের হতাশা গ্রাস করে ফেলছিল তাকে; চারপাশের আনন্দ-উচ্ছল সহযাত্রীদের থেকে দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল তার। উঠে এসে একা নৌকার পেছনে চলে গিয়েছিল সে। তারপর মুহূর্তের উত্তেজনায় ঝাঁপ দিয়েছিল জলে। না, ডুবে মরা হোলো না। সেই যুবকটি হয়তো লক্ষ্য রেখেছিল, পরমুহূর্তেই সেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আর ওপর থেকে সহযাত্রীদের ছুঁড়ে দেওয়া লাইফবেল্টের সাহায্যে টেনে তুললো তাকে। ভেজা পোশাক, ভেজা চুলে কি অপরূপ শ্রীই না খুলেছিল তার।

ছেলেটি অবশ্য লজ্জা থেকেও বাঁচিয়েছিল তাকে। বলেছিল আমার ব্যাগটা জলে পড়ে যাওয়ায় ঝুঁকে সেটা তুলতে গিয়েই জলে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। নিউইয়র্কে পৌঁছে ছেলেটি অনেক চেষ্টা করেও তার নাম ঠিকানা জানাতে পারেনি। লজ্জায় বলেনি সে। তারপর তাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে, ড্রাইভারকে আগাম ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে অপেক্ষমান নিজের গাড়ীতে চেপে চলে গিয়েছিল সে। সর্বাঙ্গ দিয়ে জল ঝড়ছিল যদিও, তবুও অম্লান হেসে ছেলেটি বলেছিল, মেয়েটিকে খুঁজে বার করবেই সে। কিন্তু তিনদিন হয়ে গেল, এখনও তো, এই পর্যন্ত বলেই কান্নায় ভেঙে পড়লো মেয়েটি।

—ও, কি বোকা তুমি, কি যেন নাম তোমার, সিসিলিয়া তাই না?

নীরবে সম্মতি জানালো মেয়েটি। গরম 'স্টু' এর খুশবু ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে। আঃ যদি একটা পেঁয়াজ থাকতো। আর একটু জল আনার জন্য বাইরের কলে আবার এলো হেটি।

ওপার থেকে দ্রুতপায়ে আসছে একটি ছেলে, কি আশ্চর্য, তার হাতে একটি পেঁয়াজ। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না হেটি, একি সত্যি না তার মনের বাসনাই কল্পিত মূর্তি নিয়ে হাজির হয়েছে?

মিষ্টি হেসে হেটি জিগ্যেস করলো, পেঁয়াজটা সে সিঁড়িতে কুড়িয়ে পায়নি তো? আসলে তার বাজারের ব্যাগে একটা ফুটো আছে হয়তো—

ছেলেটি জবাব দেবার আগে দুমিনিট কাশলো. তারপর বল্‌লো, না, তা নয়, আসলে সে তো এবাড়ীতে থাকেই না। তেতলার এক বন্ধুর কাছ থেকে এইমাত্র পেঁয়াজটা নিয়ে এসেছে সে, বাড়ী গিয়েই এক্ষুনি এটা খেতে হবে তাকে। শুধু এটাই।

হেটি তাকে বুঝিয়ে বললো, শুধু কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়াটা কোনও কাজের কথাই নয়, ওতে পেটও ভরে না। তার এবং তার ঘরে এখন যে একটি তরুণী বসে আছে, তাদের জন্য মাংসের স্টু রান্না হচ্ছে, কিন্তু একটা পেঁয়াজের অভাবে সেটা ঠিক জমছে না। এই পেঁয়াজটা দিয়ে ঝোলে সত্যিকারের স্বাদ আনা যাবে, আর যুবকটিও তাদের সঙ্গে ডিনার খেয়ে নিতে পারবে। প্রস্তাবটা সুবিধেজনক নয়কি?

হাসতে গিয়েও আবার কাশিব দমক সামলালো ছেলেটি। শেষে রাজীও হয়ে গেল।

—ঠিক আছে, তবে তুমি একটু বাইরে অপেক্ষা কর। আমি ভেতরে গিয়ে আমার বন্ধুটির মতামত জেনে আসি।

ঘরে ঢুকে সিসিলিয়াকে ডাকলো হেটি।

—শোনো, বাইরে একটি পেঁয়াজ দাঁড়িয়ে আছে, মানে সঙ্গে একটি ছেলেও আছে, ঐ পেঁয়াজটার বদলে তাকে আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছি, তোমার আপত্তি নেই তো?

—না।

বাস্তব জগতে ফেরো খুকী। সে তোমার সেই বিত্তশীল যুবকটি নয়। এ বেচারা আমাদের মতই গরীব। এই পেঁয়াজটা ছাড়া আর কোনও খাবারই জোটেনি তার। তবে ব্যবহারটা খুব ভদ্র, একথা বলেত পারি।

—আমার কোনও আপত্তি নেই। এতো ক্ষিধে পেয়েছে যে, যার কাছে কোনও খাবার থাকবে, তার সঙ্গেই খেতে পারি এখন।

দরজা খুলে বেরিয়ে হেটি দেখলো ছেলেটি টানা বারান্দার ওপ্রান্তে চলে গিয়ে হাতের ইশারায় রাস্তার কাউকে কিছু বলছে। সাড়া না দিয়ে এগিয়ে এসে ব্যাপারটা দেখলো সে।

কঠিন দৃষ্টি নিয়ে ছেলেটির মুখোমুখি হোল হেটি, —সত্যি করে বলোতো, কি করবে ঐ পেঁয়াজটা নিয়ে? ছেলেটি অবাক হয়ে আবার একটু কাশলো।

—কেন যা বলেছিলাম, বাড়ী গিয়ে খাবো।

—কি কাজ কর তুমি?

—আপাততঃ বিশেষ কিছু না।

—তবে তুমি এখনি নিচের সবুজ গাড়ীটার ড্রাইভারকে ওসব নির্দেশ কেন দিচ্ছিলে?

—কারন, ম্যাডাম, গাড়ীটা আমার, ড্রাইভারও আমার, আর এই পেঁয়াজটাও আমি নিজের পয়সায় কিনেছি।

—তা হলে তুমি পেঁয়াজ খেয়ে থাকো কেন?

—খেয়ে থাকি কে বললো? আমি যেখানে থাকি সেখানে খাবার নেই। আমি তো আর সব্জীর দোকানে থাকি না।

—তাই বলে কাঁচা পেঁয়াজ খাবে?

—আমার মার নির্দেশ, সর্দি লাগলেই যেন একটি কাঁচা পেঁয়াজ খাই। দেখতেই পাচ্ছেন দারুন ঠাণ্ডা লেগেছে আমার। কিন্তু এসব কৈফিয়ৎ আপনাকে কেন দিচ্ছি?

—ঠাণ্ডাটা লাগলো কি করে?

এক মুহূর্ত ইতঃস্তত করলো ছেলেটি তারপর দ্বিধা সরিয়ে হেসে উঠলো—

—তিন দিন আগে, নর্থ রিভারয়ে ফেরি থেকে একটি মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাকে তুলতে গিয়ে—। হেটির সদাবিষণ্ণ মুখে দুলর্ভ হাসি ফুটলো।

—পেঁয়াজটা দাও। দুমিনিট সময় দিচ্ছি তোমাকে। যাকে তুমি উদ্ধার করেছিলে সে মেয়েটি আমার ঘরেই বসে আছে, তার সঙ্গে কথা বল। আলু অপেক্ষা করছে, এবার পেঁয়াজের যাবার পালা।

ছেলেটি ঘরে ঢুকে গেলে পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো হেটি।

—সবই ঠিক আছে। শুধু তৃতীয় অনুপানটা যোগানের জন্যেই আমাদের মত লোকেদের দরকার পড়ে।

*The Third Ingredient

গুপ্তধন

মোটামুটি সবরকম বোকামীই জীবনে করেছি। মাটির তলায় লুকোনো গুপ্তধনের সন্ধান করাটা এ যুগে, এ পরিবেশে বোকামী তারই একটা। কিন্তু তাই কি? গল্পটা বলি।

মে মার্থা ম্যাগনামকে প্রথম দেখেই আমি বুঝেছিলাম, এই সেই মেয়ে, যাকে নইলে আমার চলবে না। তার নতুন পিয়ানোর মত গায়ের রঙ, শান্ত সৌন্দর্য্য আর সর্বাঙ্গীন সতেজতা মনে মনে আমাকে তার ক্রীতদাস করে তুলেছিল। মনে হোত এই সেই মেয়ে যাকে নিয়ে বিশাল খামার বাড়ীতে সুখে আনন্দে দিন কাটবে আমার। আমার চটি আর পাইপ সে এমন সযত্নে গুছিয়ে রাখবে, যে সন্ধ্যেবেলায় সেগুলো কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু আমার গোলাপে কাঁটা ছিল একটি নয়, দুটি। এক তো মে মার্থার প্রকৃতিবিজ্ঞানী পিতা। যাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল প্রজাপতি, পতঙ্গ ইত্যাদির পেছনে ঘুরে বেড়ানো। পরীক্ষা নীরিক্ষা করা, আর নিজের সংগ্রহশালায় সেগুলো পিন দিয়ে খাতায় এঁটে রাখা। মেয়েটি ছাড়া তাঁর আর কেউ ছিল না। তাঁর জাগতিক স্বাচ্ছন্দের দিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল কন্যার, তাই মে মার্থা তাঁর কাছেও ছিল অপরিহার্য।

গুড়লো ব্যাংকস ছিল আরেকটি কাঁটা। আমার মতই সে-ও মে মার্থার আশেপাশে গুঞ্জন করে বেড়াত। ব্যাংকস এর সাথে আমার দেখা হলেই দুজনেই দুজনের কাছ থেকে জেনে নিতে চেষ্টা করতাম। মে মার্থা কার দিকে কতটা ঝুঁকেছে।

ব্যাংকস্ অবশ্য আমাকে খুব একটা পাত্তা দিতে চাইতো না। সে অনেক লেখাপড়া শিখেছে, আমার মত অর্ধশিক্ষিতকে মার্থা কিছুতেই বরণ করবে না। কেননা ব্যাংকস-এর পুথিগত বিদ্যা তাকে মোহিত করেছে, এমনই বলতো।

বিজ্ঞানীরা শুনেছি অন্যমনস্ক প্রকৃতির হয়ে থাকে। মার্থার বাবাও তাদেরই একজন। হঠাৎ একদিন বোধহয় কোনও প্রজাপতি এসে তাঁকে বলে গিয়েছিল। এই দুটি ছোকরা, যারা তাঁর মেয়ের আশেপাশে ঘুরঘুর করে, এদের মতলব তাঁর সুবিধে অসুবিধে দেখার একমাত্র মানুষটিকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে। অতএব ইংরেজী আর ল্যাটিন মিশিয়ে তিনি আমাদের সতর্ক করে দিলেন। এরপর তার মেয়ের আশে পাশে দেখতে পেলে তাঁর সংগ্রহশালায় পিন দিয়ে সেটে রেখে দেবেন।

ব্যাপারটা জুড়োতে দেবার জন্য দিন পাঁচ ছয় আমরা ওদিক মাড়ালাম না। তারপর একদিন সাহস করে গিয়ে দেখি চাটিবাটি সমতে বিজ্ঞানী উধাও। একটুকরো নিশানাও রেখে যায়নি মে মার্থা, যার জোরে তাকে খুঁজে বের করবো।

সব রকম অনুসন্ধান চালালাম আমরা আর এ কাজে কে কতদূর এগিয়েছে জানবার জন্য দুজনেই দুজনের সঙ্গে দারুন বন্ধুত্বের ভান করতে লাগলাম। কিন্তু আমার সাধারণ বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা, আর ব্যাংকস তার ক্লাসিক পড়ার বিদগ্ধতা, কোনও কিছু দিয়েই কাজের কাজ কিছুই হোলনা। মে মার্থা অধরাই রয়ে গেল।

এর মধ্যে একদিন হোলো কি, আমার চেনা একটি চাষীর ছেলে শহরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলো। কি ব্যাপার, না, তার ঠাকুরদার কাছ থেকে পাওয়া একটা গুপ্তধনের মানচিত্র তার বাবা মৃত্যুর সময় তাকে দিয়ে গেছে। আমার সাহায্যে সেটা সে উদ্ধার করতে চায়। ভাবলাম, দেখাই যাক না। ম্যাপটিও খুব পুরোনো আর আসল মনে হোলো। কিছু টাকা পয়সা খরচ করতে হবে আমাকে, তার বদলে গুপ্তধনের সিংহভাগটাই আমার পাওনা হবে, এরকমই কথা হোল। ম্যাপ অনুযায়ী বিস্তীর্ণ জায়গা জরিপ করিয়ে অনেক দূরে নদীর উপত্যকায় ক্যাম্প খাটিয়ে ফেললাম। কিন্তু কয়েকদিন ধরে প্রচুর খোঁজাখুজি করেও সেই বিশেষ চিহ্নিত পাহাড়টি কোথাও দেখতে পেলাম না। কি আর করা। ব্যার্থ মনোরথ হয়ে ফিরতেই হোলো শহরে।

ফিরে এসে একদিন ব্যাংকস এর সঙ্গে ডোমিনো খেলতে খেলতে তুললাম কথাটা। প্রথমত সে আমার গুপ্তধনের ওপর বিশ্বাস এখনও আছে জেনে প্রচুর ঠাট্টা তামাসা করলো। তারপর সব শুনে বললো, ঠিকমত লেখাপড়া শিখিনি বলে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান জমির গতিপ্রকৃতির কত হেরফের হয়ে যায় সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারনা নেই। সে এবার আমার সঙ্গে যাবে, এবং ঠিক ঠিক অঙ্ক কষে ঠিক জায়গাটা চিনিয়ে দেবে।

ভালো কথা। আবার নতুন করে সব ব্যবস্থা করে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছালাম। প্রচুর অঙ্কটঙ্ক করেও কিন্তু ব্যাংকস্ আসল জায়গাটায় খোঁজ না পেয়ে দারুন চটে গেল। তারপর ম্যাপটা সূর্যের দিকে তুলে ধরতেই দেখতে পেলো সেই কাগজের জলছাপটা আঠেরোশো আটানব্বই সালের। অথচ চাষীটি আমাকে বলেছিল, এবং ম্যাপে লেখাও আছে, যে সেটি আঁকা হয়েছে আঠারোশো তেষট্টি সালে। এটা কি করে হতে পারে? আমাকে গোমুখ্য বলে গাল দিয়ে পথ চলতি একটা গাড়ী থামিয়ে কাছাকাছি কোনও শহরের দিকে চলে গেল ব্যাংকস্। ডলোরাস অঞ্চলে অ্যালাসিটে নদীর ধারে নিজের গাড়ী নিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম কতক্ষণ। সত্যি কি মুখ্যু আমি, এই সাধরণ জালিয়াতিটা ধরতে পারলাম না। কিন্তু আমার দূর্গমকে আবিস্কারের

মন আমাকে থেমে থাকতে দিচ্ছে না। যাই বলুক ব্যাংকস আর তার স্কুলের বই। সামনের পাহাড়টা পেরিয়ে আমায় দেখতেই হবে একবার, বই-এর পড়ার ওপর কোনদিনই বিশ্বাস নেই আমার। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা এখনও টানছে আমাকে।

পাহাড়টা তন্ন তন্ন করে খুজেও ম্যাপে বর্ণিত একটা চিহ্নও দেখতে পেলাম না কিন্তু জুন মাসের এই দিনটা এত সুন্দর, জীবনে একসঙ্গে এত পাখীও কখনও দেখিনি। আর কত প্রজাপতি, গঙ্গাফড়িং, বিচিত্র বর্ণের ডানা মেলে যেন স্বর্গপুরী করে তুলেছে জায়গাটাকে:

পাহাড় থেকে সেই স্বর্ণালী বিকেলে আস্তে আস্তে অপর দিকে নামলাম। হঠাৎ ঝোপের মধ্যে মনে হোল যেন একটা মানুষ। দূর থেকে যেটুকু লক্ষ্য করতে পারলাম, তাতে মন হোলো কোনও উন্মাদ এলো মেলো চুলদাড়ি নিয়ে একটা বিরাট প্রজাপতির পেছনে ছুটে চলেছে। ভাবলাম পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে আসা কেউ হবে হয়তো। সভ্যতা ও শিক্ষার জগৎ থেকে এত দূর কি করে পালিয়ে এলো?

তারপর আরও কয়েকপা এগিয়ে দেখলাম লতায় ছাওয়া একটি কুটির। আর ছোট্ট জলধারাটির পাশেই মে মার্থা, ঝোপ থেকে বনফুল তুলছে। নীরবে আমি তার পাশে এগিয়ে গেলাম, তার হাত থেকে ফুলগুলো ঝর ঝর করে পড়ে গেল মাটিতে।

প্রসন্ন প্রত্যয়ী গলায় সে বললো—আমি জানতাম জিম, তুমি আসবেই। বাবা আমাকে চিঠি লিখতে দেননি, কিন্তু আমি জানতাম, তুমি আমাকে খুঁজে বার করবেই।

এর পরের কথাটা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা, নদীর ওপারেই তো অপেক্ষা করছিল আমার ঘোড়ার গাড়ী।

আমার প্রায়ই মনে হয়, খুব বেশি লেখাপড়া দিয়ে হবেটা কি, যদি সেটা তার নিজের কাজেই না আসে। হ্যাঁ মে মার্থা আমারই হয়েছে, ওক গাছের তলায় আমার কল্পনার খামারবাড়ী আর স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনই পেয়েছি আমি। সন্ধ্যা বেলা তিন হাজার গবাদি পশুর দেখাশোনা সেরে যখন ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ী ফিরি, তখন অবশ্য আমার পাইপ আর চটি ঠিক জায়গায় খুঁজে পাইনা। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? কিই বা এসে যায়?

*Buried Treasure

বিজয় স্মৃতি

কার্ডিজ এর পোস্টমাস্টার আর ধনী ব্যবসায়ী বেন গ্রাঞ্জারের কাছে শোনা গল্প এটা। বেন যে একটা স্বল্পকালীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এটা তারই স্মৃতিচারণ।

বেন বলেছিলেন—একটা জিনিষ আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনা, কোন প্রেরণায় মানুষ জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে যুদ্ধে, আগুনে, উপবাসে, বিপর্যয়ের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আশে পাশের অন্যসব মানুষের চেয়ে নিজেকে বিশিষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করে। আমার বন্ধু উইলি রবিনসন-এর কথাই ধরো। সে আমাদের সান অগাস্টিনের সমাজে একটি লাজুক সাধাসিধে তরুণ বলেই পরিচিত ছিল। আমি তখন সেখানে চাকরী করতাম। উইলি ও আমি একই ক্রীড়া সংগঠন ও সামরিক ক্লাবে যেতাম। সপ্তাহে তিনদিন তো ওখানে আমাদের নাচগানের আসর বসতোই। ছিপছিপে এই তরুণটির চোখে মুখে মেয়েদের দেখলেই এমন মুগ্ধতা ফুটে উঠতো, যে মেয়েরা তাকে নিয়ে মজা করতে ছাড়তো না।

মুস্কিলটা হোলো উইলি সান অগাস্টিনের সেরা সুন্দরী,বুদ্ধিমতি, প্রাণোচ্ছল মেয়ে মায়রা এলিসনের প্রেমে পড়ে গেল। সবাই জানতো জো গ্র্যানবেরিকেই বিয়ে করবে। অন্য কেউ তাই মায়রাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেও সাহস পেতো না। উইলির মত বোকার পক্ষেই সম্ভব এরকম।

একদিন মিসেস কলোনেল স্প্রগিন্স্ এর ওখানে নাচের আসরেব আগে আমরা ছেলেরা ওপরে ছেলেদেরে ড্রেসিংরুমে ফিটফাট হয়ে নিচ্ছিলাম, উইলি একমনে আয়নার সামনে মাথার অবাধ্য সোনালী চুলগুলোকে বশে আনতে চেষ্টা করছিল। মায়রা মেয়েদের সাজঘর থেকে বেরিয়ে নীচে যাবার পথে উঁকি দিয়ে দৃশ্যটা দেখে মজা করার জন্যে বল্‌লো—

—কি করছো উইলি?

—একটু উড়তে চেষ্টা করছি। আয়না থেকে চোখ না সরিয়েই জবাব দিল উইলি।

—না, তা তুমি কোনদিনই পারবে না।

উইলির দিকে তাকিয়ে দেখি তার মুখ ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে গেছে। বুঝলাম, মায়রার উপহাস তাকে ভালভাবেই বিদ্ধ করেছে।

সেদিন নাচের আসরে মায়রার ধারে কাছে গেল না উইলি। কি জানি, জো গ্র্যানবেরি হয়তো মায়রার আর সব পানিপ্রার্থীদের মত উইলিকেও হাটিয়ে দিয়েছে।

পরের দিনই যুদ্ধজাহাজ মেইন ধ্বংস হোলো তার ফলস্বরূপ স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হোল। সান অগস্টিন রাইফেল-এর পক্ষ থেকে উইলি ও আমি সহ আমাদের পুরো দলটাই কিউবার মাটিতে প্রথম শত্রুদমনে নেমে পড়লো। এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা, অনর্থক রক্তপাত, প্রিয় বন্ধুদের মৃত্যু, আমাকে ক্রমশই বিরক্ত করে তুলছিল। অভিযোগ জানিয়েছি বহুবার।

যুদ্ধ ছেড়ে চলে আসার কথা বলেছি। কিন্তু আশ্চর্য, উইলি যেন সব সময় সবরকম বিপদের মোকাবিলো করার জন্য মুখিয়ে আছে দেখলাম। সৈনিকের মোহর নামা সারা অঙ্গে আঁকার জন্য যতরকম তকমা, পদোন্নতি ইত্যাদি যে সব দুঃসাহসিক কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লে পাওয়া যায়, সবই সে করে চললো একের পর এক। একদিন তাকে বোঝাতে গেলাম, এই উদ্দেশ্যহীন যুদ্ধে প্রাণ বিপন্ন করে সে কি পেতে চাইছে? সে কি খবর পায়নি মায়রার সঙ্গে ইতিমধ্যে জোর বিয়ে হয়ে গেছে? উইলি মুচকি হেসে জানালো এটা তো জানাই ছিল, আর খবরটা সে আগেই পেয়েছে।

আমাদের বিস্মিত চোখের সামনে উইলি দিনের পর দিন ক্যাপ্টেনকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে করে একটার পর একটা বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। বার কয়েক বেশ মারাত্মক ভাবে আহতও হোলো, সুস্থ হয়ে উঠে আবার নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। একবার মাত্র আট জন সাথী নিয়ে পুরো একটা স্প্যানিশ পল্টনকে কব্জা করে ফেললো। ক্রমে উইলি রবিনসনই আমাদের বাহিনীর ক্যাপ্টেন হয়ে গেল।

যুদ্ধ শেষ হোলো, কিন্তু উইলি তার কাঙ্খিত মর্যাদা পেয়ে গেল। দেশের প্রায় সব কটা কাগজে বেশ ফলাও করে তার ছবি সহ কীর্তি কাহিনী প্রায়ই প্রকাশিত হতে লাগলো।

যুদ্ধ শেষে আমরা সান অগাস্টিনোতে ফিরে এলাম। শহরের পক্ষ থেকে আমাদের টেলিগ্রাফ মারফৎ, ডাকহরকরা মারফৎ, বিশেষ বার্তাবহ মারফৎ বার বার জানানো হয়েছিল সান অগস্টিনো আমাদের বাহিনীকে বীরের সম্মান দিতে চায়।

পথের দুধারে জনতাব সে কি উল্লাস। বীরের মতই আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল উইলি, তার খাকি পোশাকে তক্মার সমারোহ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তার সুকুমার বর্ণ রোদে পুড়ে তাম্রাভ হয়ে গেছে। সত্যিই যুদ্ধবিজয়ীর মতই দেখাচ্ছে তাকে।

ঠিক ছিল সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় প্রচুর রোশনাই সহযোগে আমাদের সম্বর্ধনা ও খানাপিনার আয়োজন হবে কোর্ট হাউসে।

বিকেলে উইলি আমাকে অনুরোধ করলো তারসঙ্গে একটু বেড়াতে যেতে। দেখি, সে মায়রার আর জে'র বাড়ীতেই গেল। স্বামী স্ত্রী চুপচাপই বসে ছিল, তাদের খুব উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল না। মায়রার মুখে যে এত ব্রণ, আগে লক্ষ্য করিনি। উইলি মায়রার কাছে গিয়ে অভিবাদন করে একটা কথাই বললো—আমি উড়তে পেরেছি। তারপর ফেরার পথে আমায় বললো, সে খুব ক্লান্ত, বাড়ী ফিরে ঘুমোতে চায়। আমি অবাক হয়ে বললাম, আমাদের জন্যেই যে জুলুস, খানাপিনা, সেখানে যাওয়া তো দরকার। উইলির চোখ দেখে মনে হোল, জীবনের সব কাজ সাঙ্গ হবার ক্লান্তি সেখানে। মৃদু হেসে মাথা নাড়লো সে—আমি ভুলেই গিয়েছিলাম বেন।

কখন কোন প্রেরনায় মানুষ উচ্চাশার পেছনে ছোটে, কে বলবে?

*The Memory of Victory

স্বপ্নদেবতার সঙ্গে সংগ্রাম

টম হপকিন্স যে কি করে এরকম মারত্মক একটা ভুল করে বসলো কিছুতেই মাথায় আসছে না আমার। মাসির অঢেল সম্পত্তি পাওয়ার আগে তো সে রীতিমত ডাক্তারী পড়ে পাশ করেছে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার বেশ যশও আছে।

সেদিন টম আমার কাছে আড্ডা মারতে এসেছিল। কোন কাজে দুমিনিটের জন্যে পাশের ঘরে গেছি। টম আমাকে চেঁচিয়ে বললো—

—বিলি, আমি তোমার ভাঁড়ার থেকে চার গ্রেন কুইনিন খেয়ে নিচ্ছি। শরীরটা ভাল লাগছে না, বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছে।

—ঠিক আছে। বোতলটা দ্বিতীয় তাকে আছে। ওর সঙ্গে ইউক্যালিপটাসের আরক দুচামচ মিশিয়ে নিও, তেতোটা কেটে যাবে।

ফিরে এসে আগুনের ধারে বসে দুজন গল্পগুজব করছি, হঠাৎ দেখি টম আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ছে, সোফায় মূর্ছিত হয়ে পড়লো সে।

ততক্ষনাৎ আমি ওষুধের তাকের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। কুইনিনের শিশিটা ঠিকই আছে, কিন্তু তার পাশে মরফিয়ার শিশিটার ছিপিটা খোলা। বিরক্তিতে গর্জে উঠলাম আমি।

—দেখো, টাকার পাহাড় মানুষকে কেমন গাধা বানিয়ে দেয়।

ওপর তলার বাসিন্দা একজন তরুণ গাইলসকে ডাকতে পাঠালাম। এত টাকা আছে টম হপকিন্সের, তাকে কি আর আমাদের মত উঠতি ডাক্তারদের হেফাজতে রাখা যায়?

ডক্টর গাইলস আসার পর আমরা চিকিৎসাবিজ্ঞানে যা কিছু এক্ষেত্রে প্রযোজ্য সবই করলাম। অনবরতঃ তাকে ধরে ধরে হাঁটালাম, গরম কফি ও অন্যান্য ওষুধ খাওয়ালাম, বুড়ো ডাক্তার টমকে দুচারটে চড়চাপড়ও মারলেন। তরুণ ডাক্তারটি টমের পেছনে একখানা জোর লাথিও লাগিয়ে দিল, তারপর সলজ্জ হেসে বললো—

—কিছু মনে কোরো না। কোটিপতিকে লাথ মারতে কেমন লাগে, দেখছিলাম। আর তো এরকম সুযোগ পাবো না।

ঘন্টা দুয়েক পরে ওরা চলে গেল। ডাক্তার গাইলস বললেন, আরও একঘন্টা ওকে ঘুমোতে দেওয়া চলবে না। ওর নাড়ির গতি আর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে গেলে ওকে ঘুমোতে দিও।

অতএব, এই বুড়ো খোকাকে একঘন্টা জাগিয়ে রাখার দায়িত্ব আমার একার। আমি টমকে তার ভুল আর বোকামী নিয়ে প্রচুর বকাবকি করলাম, কিন্তু শিথিল হাসি আর আধবোজা চোখের টম কেবলই ঘুমোতে চায়। ঐ নেশা তুলে ধরে হাঁটানো আমার শক্তিতে কুলোলো না। কি করা যায়? ভাবলাম, দেখি আঘাত করে ওর মনটাকে জাগিয়ে তুলতে পারি কিনা। যা মনে আসে বললাম। বললাম, গ্রাম থেকে শহরে পড়তে আসার আগে যে বাল্য প্রেমিকাকে

সে কথা দিয়ে এসেছিল, সে হয়তো তার অপেক্ষায় এখনও অনিদ্রা নিয়ে বসে আছে, আর টম, শহর আর হঠাৎ পাওয়া চটাকদার নেশায় লাঞ্ছিত করছে তার প্রেমকে। বলাবাহুল্য টমের ব্যক্তিগত কোনও খোঁজ খবরই আমার জানা নেই। বানিয়ে বানিয়ে নানারকম অভিযোগ করলাম তার বিরুদ্ধে। দক্ষিণের লোকেদের প্রবল জাত্যাভিমানে খোঁচা দিয়ে কথা বলতেও ছাড়লাম না। ফুঁসে উঠতে গিয়েও বারবার এলিয়ে পড়ছিল টম। তার দুই কাঁধ ধরে এমন জোরে ঝাঁকালাম, যে তার কান লটপট করে উঠলো। তারপর তার মুখে বসিয়ে দিলাম দুই মোক্ষম ঘুঁসি। তাকে বললাম—

– একটু ভাল হয়ে নিজের পায়ে জোর পেলেই এখান থেকে চলে যাবে তুমি। তোমার মুখদর্শন করতে চাই না আর। যদি আগে জানতাম কোনও সরলা যুবতীর হৃদয় ভেঙ্গে দিয়েছো, তোমার সঙ্গে কখনও বন্ধুত্ব রাখতাম না। তুমি তো কৃমি কীটেরও অধম।

হাসি লুকোবার জন্য আমি পিছন ফিরতেই টমের অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট গলা শুনলাম—

—আমি এভাবে কখনও তোমার সঙ্গে কথা বলতাম না বিলি, যদি তোমার সম্বন্ধে কোন মিথ্যে কথা শুনতামও। একটু শক্ত হই, ঘাড় ভেঙে দেবো তোমার ভুলো না।

আমার খুবই খারাপ লাগছিল, কিন্তু টমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমার কাছে আর অন্য উপায় ছিল না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙাতেই দেখি টম সাজপোষাক পরে তৈরী, কণ্ঠস্বরে একটু দুর্বলতা আছে, চিন্তিত ভাবে সে বললো—

—কি বোকা আমি। ওষুধটা খাবার সময় একবার মনে হয়েছিল কুইনিনের শিশিটা এরকম দেখতে কেন? আমাকে সুস্থ করতে অনেক ঝঞ্ঝাট হয়েছে না।

আমি বললাম, তেমন কিছু নয়। আসলে আমার মনে হোলো কাল রাতের কোনও ঘটনাই তার মনে নেই। পরে একসময় এসব কথা তুলে হাসি ঠাট্টা করা যাবে।

চলে যাবার জন্যে এগিয়ে গিয়েও ফিরে তাকিয়ে আমার করমর্দন করলো টম—

—তুমি আমার জন্য যা করেছো, তার জন্যে আমি খুবই কৃতজ্ঞ ভাই। বিশেষতঃ তুমি যা বলেছো। আমি এখনই সেই মেয়েটিকে তার করতে যাচ্ছি।

*At Arms with Morpheus

নরমুণ্ড শিকারী

জর্জ ডিউ আর স্পেনের মধ্যে লড়াই শেষ হবার পরেই আমি কিছুদিনের জন্য ফিলিপিন্সে সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছিলাম। তা আমার পাঠানো খবর কাগজের সম্পাদকের ঠিক মনোমত হচ্ছিলনা। অগত্যা ইস্তনামে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দেশে যাওয়ার, সেই একঘেঁয়ে এটিকেট দুরস্ত জীবনের গুহায় প্রবেশ করার বিন্দুমাত্র

ইচ্ছে ছিল না, তাই জাহাজের এক খামখেয়ালী ক্যাপ্টেন যখন তার যাত্রাপথ আচমকা পরিবর্তন করলো, তখন খুশি হয়ে প্যাসিফিক কোস্টের ছোট্ট গ্রাম মোজাদাতে বিশ্রাম নিতে থেকে গেলাম।

ফিলিপিন্সের অরণ্যে নরমুণ্ডশিকারীদের গ্রাম আমাকে সব সবসময়ই আকর্ষণ করতো। মানসচক্ষে দেখতাম এরা যোজন পার হয়ে প্রতিশোধ অথবা নিছক শৌর্যপ্রকাশের তাড়নায় শত্রুর পিছন ছুটে চলেছে নিশিদিন। এদের দরজার গোড়ায় বাঁধা বিশেষ ধরনের বেতের ব্যাগের মধ্যে নিজের বিজয়চিহ্ন স্বরূপ শত্রুর কাটা মুণ্ডুটি রেখে দেয়, তাইদেখে তার কাজলনয়না প্রেমিকা অনাস্বাদিত পূর্ব সুখ অনুভব করে। মনে মনে আমি নিজেকে ওই জীবনের অংশীদার হয়ে যেতে দেখি।

সেকথা থাক। মোজাদার কথা বলি। সেখানেই আমি ক্লো গ্রীনকে প্রথম দেখি। তার বাবার টালির চালের বাংলো বাড়ির দরজায় দাঁড়ানো শুভ্রবসনা সুন্দরীর বঙ্কিম কটাক্ষ, কাত করে ফেললো আমাকে। আমার সঙ্গী ও বন্ধু ডাক্তার স্ট্যামফোর্ড ব্যাপারটা আমাকে সতর্ক করে দিতে ভুললেন না, সারা মোজাদা জানে ক্লো গ্রীনকে বিয়ে করবে লুই ডোয়ী।

লুই এর সঙ্গে দেখা করতেই হচ্ছে। আর সেটা করতে হবে সাদা মুক্তো ক্লোর সঙ্গে দেখা করার আগেই। কেননা, কথায় বলে শত্রুর মোকাবিলা করার আগেই তার শক্তির দৌড়টা ভালভাবে জেনে নিতে হয়।

লুইকে দেখে কিন্তু আমার মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। মোজদার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী লুই, শিল্প ও সংস্কৃতির সাচ্চা সমজদার, সপ্রতিভ অথচ স্বল্পবাক, সুদর্শন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এর সঙ্গে লড়বো আমি কিসের জোরে?

যাই হোক ক্লো-এর বাবা রেভারেণ্ড হোমার গ্রীন এর সঙ্গে ভাব জমিয়ে, তাঁর ঐতিহাসিক রচনার একনিষ্ঠ শ্রোতার দায়িত্ব পালন করে তাঁর বাড়ীতে নিত্যকারের অতিথি বনে যেতে দেরী হেলো না আমার। মুসকিল হোল, ওবাড়ীতে সবাই আমার চেহারা, খোলামেলা স্বভাব ইত্যাদির জন্য আমাকে নিতান্ত নাবালক ভাবতে শুরু করলেন। এমনকি ক্লো পর্যন্ত আমার ছোটখাট প্রেম নিবেদনের ভঙ্গি প্রয়াসগুলোকে ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিত। অথচ ও বাড়ীর অন্য নিয়মিত অতিথি লুই কিন্তু যথাযোগ্য মর্যাদাই পেতো। হিংসে হবেনা, বলুন?

ক্লো, ভারী খামখেয়ালী মেয়ে। কিছুটা স্বপ্নবিলাসীও বটে। একদিন আমাকে বললো, —দেখো টমি, আমি চাই না, যে আমাকে ভালবাসে সে তার ভালবাসার প্রমাণ দেবার জন্য বিশাল বা মহৎ কোনও কাজ করে ফেলে। তার চেয়ে আমার ছোটখাট ইচ্ছে অনিচ্ছাগুলোকে সে যদি ঠিক ঠিক মর্যাদা দেয়, তাহলেই আমি খুশি।

—যেমন!

—যেমন, একবার শুনেই সে যেন কখনো না ভোলে আমার বাঁদিকে কেউ হাঁটে, এটা আমি পছন্দ করিনা, রঙচঙে নেকটাই পছন্দ করিনা, আলোর দিকে পেছন ফিরে বসতে পছন্দ করি, বাদাম আর খেজুর খেতে ভালবাসি, জলে চাঁদের ছায়ার দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকতে ভালবাসি ইত্যাদি ছোট খাট ব্যাপার। আর আমার প্রেমিক আমাকে সবসময় মনে করিয়ে দেবে আমি কি চাই, কেননা আমার নিজেরই তা সব সময় মনে থাকে না।

এসব কথার কোনটা সত্যি আর কোনটা ঠাট্টা, বোঝা মুশকিল। ভাবতে ভাবতে পরদিন রীতিমত জ্বর বাঁধিয়ে বসলাম। প্রায় দুসপ্তাহ তীব্র জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম, ওষুধ বলতে, মাতাল ডাক্তার স্ট্যামফোর্ড-এর দেওয়া কুইনিন। ক্রমে অবস্থাটা অসহ্য হয়ে উঠতে একদিন বিকেলে একশো চার ডিগ্রী জ্বর নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম আমার শ্বেতমুক্তোর বাড়ীর উদ্দেশ্যে। দুর্বল শরীরে মনে হচ্ছিল যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছি, মাটীতে পা পড়ছে না। কতদিন দেখিনা ক্লোকে, আর ব্যাটা লুই এতদিন ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েই চলেছে নিশ্চয়ই।

দুজনকেই পেলাম গ্রীনদের বাগানে। আমাকে দেখেই উচ্ছসিত হয়ে উঠলো ক্লো।

—ওঃ টম, দারুন, দারুন ভাল লাগছে তোমাকে দেখে, তোমার অসুখ শুনে দেখতে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু—

—ঠিক আছে। সামান্য জ্বর, দেখছোইতো ঠিক হয় গেছি এখন।

আমরা তিনজন বাগানে বসেই খানিকক্ষণ গল্প গুজব করলাম। হঠাৎ ক্লোর ইচ্ছে হোলো নারকোলের পুডিং খাওয়ার। আমার মন্তব্য ছিল তার চেয়ে চিংড়ি মাছ বা খরগোশের মাংস অনেক উপাদেয়, আর লুই-এর সুচিন্তিত বক্তব্য, এটা নারকোলের ঋতু নয়, কাজেই পাওয়া প্রায় অসম্ভব। ক্লোএর বাবাও শুনতে পেয়ে জানালেন বুড়ো ক্যামপোস তার দোকানে দুএকটা শুকনো ফল রাখে, কিন্তু ক্লোর এরকম অসময়ে অদ্ভুত বাসনা করা উচিত নয়।

একটু পরেই লুই বিদায় জানিয়ে নিজের কাজে চলে গেল। ক্লো গেল ডিনারের তদারকিতে। একলা অন্ধকারে বসে আকাশপাতাল কত কি চিন্তা করে আচ্ছন্ন মাথাটার মধ্যে খেলা করে গেল। তার ঠিক নেই। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম গ্রীনদের সদর দরজায় ঠিক ফিলিপিন্সের নরমুণ্ডশিকারীদের বেতের ঝুড়ির মত একটা ঝুড়ি টাঙানো আছে। মুহূর্তে মাথার মধ্যে বিদ্যুত চমকের মত একটা উন্মাদনা খেলা করে গেল। আমার প্রিয়াকে জয় করতেই হবে, আর এ কাজে সেই আদিম মানুষগুলোই হবে আমার প্রেরনা।

চুপি চুপি নিজের ঘরে ফিরে এসে দেওয়ালে টাঙানো তরোয়ালটা খুলে নিয়ে সোজা হানা দিলম লুই-এর অফিসে। আমার রুদ্রমূর্ত্তি আর হাতের অস্ত্রটা দেখে বুঝতে কিছুই বাকি রইল না বুদ্ধিমান লুই-এর। সবরকম বাকচাতুরী দিয়ে আমাকে নিবস্ত্র করতে চাইল সে। অবশেষে আমার শক্তির কাছে অসহায় হয়ে পড়লো সে। সাত বা আটবারের চেষ্টায় ধড় থেকে তার মুণ্ডুটাকে আলাদা করতে পারলাম। তারপর আমার রেশমী রুমালে সেটাকে বেঁধে গ্রীনদের বাড়ীর ঝুড়িতে ফেলে দিলাম।

দরজার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে না বসতেই ক্লো-এর আবির্ভাব।

—কোথায় গিয়েছিল টমি? আমি এসে দেখি তুমি নেই।

—ঝুড়িতে দেখো। তোমার জন্যে একটা ছোট্ট উপহার আছে।

ঝুড়ির দিকে তাকিয়েই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো ক্লো,—সত্যি টমি, কি ভীষণ ভাল তুমি। তুমি ঠিক বোঝো, এইসব ছোট ছোট জিনিষগুলো আমাকে কত খুশি করে।

একটা আস্ত নরমুণ্ড ছোট্ট জিনিষ হোলো? হায় সখা। রমনীর মন সত্যিই দেবতারাও জানেন না। বোধহয় একমাত্র নরমুণ্ডশিকারীরাই সেটা জানে।

আমার দিকে গভীর নীল চোখ তুলে ক্লো বললো,—তোমার মত পুরুষের কথাই আমি স্বপ্নে দেখি। তুমিই সত্যি সত্যি আমার কথা ভাবো। এইসব ছোট ছোট বিবেচনা কোনও

নাইট-এর বিশ্বজয়ের চেয়েও বেশি আকর্ষণ করে আমাকে। তুমি আমাকে আজ খুশী করেছো টমি।

আমি হেঁট হেয়ে চুমু খেলাম তাকে, আর সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথার কুয়াশাটা যেন কাটতে লাগলো, খুব দুর্বল লাগলো শরীরটা, আর দেখলাম লুইএর মুণ্ডুটা কোন মন্ত্রবলে যেন একটা আস্ত নারকোল হয়ে গেছে।

—আজ ডিনারে নারকোলের পুডিং করবো, আর তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে, বুঝেছো টমিবয়?

এখন আমি ভেতরে যাচ্ছি।

ক্লো ভেতরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার স্ট্যামফোর্ডের উত্তেজিত প্রবেশ।

—জ্বরের ঘোরে কি সব পাগলামি করে চলেছো টম? এই অবস্থায় বিছানা ছাড়লে কি বলে?

—কি পাগলামি করেছি?

—লুই ডেকে পাঠিয়েছে আমাকে। তার অফিসের জানলা দিয়ে দেখেছে তুমি বুড়ো ক্যামপোজ এর মাপকাঠি নিয়ে তাকে তাড়া করছো, তারপর তার সবথেকে বড় নারকোলটা নিয়ে চম্পট দিয়েছো। এক্ষুনি ঘরে চলো বলছি, নইলে লোকে তোমাকে পাগলাগারদে পুরলো বলে।

নারকোলের পুডিং খাওয়া হোলো না। নরমুণ্ডুশিকারীদের প্রেমিকারাও বোধহয় আজকাল অন্য উপহার চায়, নরমুণ্ডে তাদেরও বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। মোটকথা আমার তো তাদের ওপর আর আস্থা নেই।

*The Head Hunter

ভাগ্যের বিড়ম্বনা

পাবলিক পার্কগুলিকে যে ভবঘুরেরা নিজেদের বাড়িঘরের মত ব্যবহার করে তাদেরও একটা আভিজাত্য আছে। এই সত্যটি জানার চাইতেও ভাল করে বুঝতে পারল ভালান্স, যখন সে নিজের জগৎটা ছেড়ে বাইরে ম্যাডিসন স্কোয়ারে হাজির হল।

সেকেলে স্কুলের মেয়েদের মত কাঁচা ও জড়ানো স্বভাবের তরুণী মে মাসে গম্ভীর নিঃশ্বাস ফেলে বেড়াচ্ছে। ভালান্স কোটের বোতাম এঁটে শেষ সিগারেটটা নিয়ে একটা বেঞ্চে বসল। তিন মিনিট পরে সে ভাবতে লাগল-বাইসাইকেলের মাথাটার অভাবে তার সাইকেল চড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর তার শেষ এক হাজারের অর্থের শেষ একশটা খরচ হয়ে গেছে। প্রতিটি পকেট হাতড়ে সে একটাও পেনি পেল না। সেই দিন সকালেই সে বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, আসাবপত্র বেচে ধার মিটিয়েছে। পরনে যে জামা আছে তা ছাড়া আর কিছু নেই সব চাকরের মাইনে দিতে চলে গেছে। এখন শুধু বেঞ্চে বসে থাকা। সারা শহরে

তার জন্য একটা বিছানা বা বা খাবার নেই। গাড়ীর ভাড়া নেই। সর্বহারা অবস্থা। এটা চলবে যতক্ষন না বন্ধুদের পকেট কেটে বা মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে জিনিসগুলো যোগাড় করা যায়। তাই এক পার্কটাকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

এ সবের জন্য দায়ী তার খুড়ো। তিনি উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন তাকে। কারণ একটা বিশেষ মেয়ের ব্যাপারে ভাইপো তার কথা অবহেলা করেছে। সে মেয়েটি অবশ্য এই গল্পের অংশ নয়। সুতরাং যে সব পাঠক গল্পের শিকড় খুঁজে বেড়ান তাদের সাবধান করা হচ্ছে তারা আর বেশীদূর গল্পটা পড়বেন না। আর তার একটা ভাইপো ছিল যে একসময় তার ভাবী উত্তরাধিকারী ও প্রিয়জন ছিল। কোন রকম আশা ভরসা না দেখে সে অনেক আগেই কেটে পড়েছে। অথচ এখন তাকে ধরে আনার তোড়জোড় চলছে, পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে। আর সেই জন্যই ভালান্স একেবারে তলিয়ে গেছে এবং পার্কটির ছন্নছাড়া ভূতদের দলে মিশেছে।

বেঞ্চে বসেই হঠাৎ সিগারেটের তীরটাকে ছুঁড়ে দিল গাছের ডালগুলোকে লক্ষ্য করে। আকস্মিকভাবে জীবনের সব বন্ধন কেটে মুক্ত, স্বাধীন শিহরিত, আনন্দ উল্লাসের প্রতিমূর্তি যেন। একজন বৈমানিক যখন প্যারাসুটটাকে কেটে দিয়ে তার বেলুনটাকে সুদূরে উড়ে যেতে দেয় তখন মনে যে অনুভূতি জাগে ঠিক সেই অনুভূতিই জেগেছে তার মানে।

তখন সময় প্রায় দশটা। বেঞ্চে খুব বেশি ভ্রমণকারী ছিল না। তাদেরই মধ্যে একজন বার্বার কাছের আসনটি থেকে উঠে ভালান্সের পাশে এসে বসল। সে যুবক বৃদ্ধ কি হতে পারে, সস্তার বাড়ি তাকে ভাজা ভাজা করেছে, ক্ষুর ও চিরুনির সাথে অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। সে একটা দেশালাই চাইল, পার্কের বেঞ্চের যাত্রীরা এভাবেই নিজেদের মধ্যে পরিচয়ের সূত্রপাত করে, তারপর আলাপ শুরু করে।

ভালান্সকে বলল—তুমি তো এখনকার নিযমিত যাত্রী নও, জামা কাপড় সেখানেই আমি চিনতে পারি। কিছু সময়ের জন্য বোধহয় এখানে বসেছ। তা তোমার সঙ্গে বক্‌বক্ করছি বলে কিছু মন করছ না তো? আমার যে একজন সঙ্গী চাই, ও দিককার দু একজনকে বলেছি কিছু তারা ভাবল আমি পাগল। ধর, আমি তোমাকে বলছি, আজ সারা দিনে আমি খেয়েছি কেবল দুটো ব্রেটজেলা ও একটা আপেল। কাল আমাকে লাইনে দাঁড়াতে হবে তিন মিলিয়নের উত্তরধিকারী হবার জন্য, আর দূরে যে রেস্টুরেন্টটা দেখছ যার চার পাশে গাড়ী ভর্তি সেটা হবে আমার কাছে সবথেকে সস্তা খাবার জায়গা। কথাটা বিশ্বাস করতে পারছ না, তাই না?

খুব সহজেই বুঝতে পারছি, ভালান্স হেসে বলল। গতকাল আমি ওখানেই লাঞ্চ খেয়েছি। আর রাতে আমি পাঁচ সেন্টের এক কাপ কফিও কিনতে পারিনি।

—তোমাকে দেখে তো আমাদের একজন বলে মনে হয়না। ঠিক আছে, ধরেই নিলাম যে এ ররকম ঘটনা ঘটেছে। এক সময় আমিও আকাশে উড়তাম তা তুমি ছিটকে পড়লে কেমন করে?

—"আমি, ওঃ চাকরিটা খুইয়েছি"।

—"এই শহরটা হচ্ছে নির্জলা নরক। একদিন তুমি চীনা খবার খাচ্ছ পরদিনেই খাচ্ছ খোদ চিন দেশে বসে-চপসোয়ে। আমার কপালে অনেক দুর্ভোগ গেছে। পাঁচ বছর আগে আমার অবস্থা ছিল খুব খারাপ। তাবপর এখন যেখানে উঠলাম সেখানে ব্যায়বহুল জীবন

যাপন করা যায় আর কিছুই করা যায় না। তোমাকে বলতে কোন বাধা নেই তাছাড়া কারও সঙ্গেতো কথা বলতেই হবে, আজ আমি ভয় পেয়েছি সত্যি ভয় পেয়েছি।

আমার নাম আইডি। তুমি ভাবতেই পারবে না যে, 'রিভার সুইড' এর লাখপতিদের অন্যতম বুড়ো পল্বিং ছিলেন আমার কাকা, ভাবতে পার, এটা সত্যি। আর ঘরে বসে যখনই টাকা চাইতাম পেতাম। আচ্ছা বল তো দু কাপ পানীয়র দাম কি তোমার কাছে নেই। আরে তোমার নামটা কি যেন?

ভালান্স বলল—ডসন আমি দুঃখিত, পয়সা নেই। আইডি বলতে লাগল, আমি এক সপ্তাহ ডিভিসন স্ট্রীট-এর একটা কয়লার দোকানে ছিলাম চোরের সঙ্গে। সকলে তাকে ডাকত 'চোখপিটপিট মরিস' বলে। একদিন যখন বেরিয়েছি তখন একটা ছেলে পকেটে কিছু কাগজ পত্র নিয়ে আমার খোঁজ করছিল। আমি তাকে চিনতাম না কিন্তু বুঝতে পারলাম সে পুলিশের টিকটিকি। তাই সেদিন বার না হয়ে বাড়ীতেই ছিলাম সে আমার জন্য একটা চিঠি লিখে গিয়েছিল। জান ডসন চিটিটা পাঠিয়েছিলেন শহরের এক বড় উকিল নাম মিড। অ্যান স্ট্রীটে আমি তাঁর প্লেট দেখেছি। পল্বিং আবার আমাকে তাঁর ভাইপোর ভুমিকায় দেখতে চান। তিনি চান যে আমি ফিরে গিয়ে উত্তরাধিকারী হই এবং তার টাকার গদিতে বসি। কাল সকালে দশটার সময় তাঁর অফিসে আমায় যেতে হবে, আবার জুতোয় পা ঢাকতে হবে, তিন মিলিয়নের উত্তরধিকারী হতে হবে। বছরে ১০,০০০ ডলার হাত খরচও পাব। আমি ভয় পেয়েছি, ভয় পেয়েছি।

ভবঘুরে লোকটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা হাত মাথার ওপর তুলে দম বন্ধ করে মূর্ছা গেল।

তার হাত দুটো চেপে ধরে ভালান্স তাকে বসিয়ে দিল বেঞ্চে।

"চুপ করে বস!' বিরক্তির সঙ্গে বলল, লোকে ভাববে যে একটা সম্পত্তি পাওযার পরিবর্তে তুমি বুঝি সম্পত্তি হারাতে বসেছ। তোমার ভয়টা কিসের?"

'কেন? আমি ভয় পাচ্ছি যে সকালের আগেই আমার একটা কিছু হবে। সেটা কি তা আমি মানি না এমন একটা কিছু যা আমাকে পেতে দেবে না টাকাটা। আমার মনে হচ্ছে একটা গাছ ভেঙে পড়বে, কিংবা গাড়ি চাপা দেবে, কোন বাড়ির কাছ থেকে একটা পাথর মাথায় পড়বে, বা ঐ রকম একটা কিছু। আগে কখনও ভীতু ছিলাম না আমি। শত শত রাত আমি এই পার্কে বসে কাটিয়েছি পাথরের মূর্তির মত শান্ত হয়ে। তখন জানতামও না প্রাতরাশটা কোথা থেকে আসবে। কিন্তু এখন ব্যাপারটা অন্য রকম। টাকা আমি ভালবাসি ডসন, টাকা যখন আমার হাত উপচে পড়ে যাবে, আর সকলেই আমাকে সেলাম ঠুকবে, চারদিক থেকে গান বাজনা, ফুল ও ভাল ভাল পোশাক আসবে, তখন আমি দেবতাদের মত সুখী। যতদিন জেনেছি যে আমাকে দিয়ে কিছু হবে না ততদিন এসব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। বরং এখানে বসে ছেঁড়া পোশাক পরে ক্ষুধার্ত পেট নিয়ে ফোযারার জলের শব্দ শুনে আর রাস্তার গাড়ি ঘোড়ার চলাচল দেখে আমি সুখেই ছিলাম। কিন্তু আজ সেই টাকা প্রায় আমার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। তাই এখন আর আমার বার ঘন্টাও সইছে না। ডসন, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। পঞ্চাশ রকমের বিপদ হয়ত আমাকে ঘিরে ধরতে পারে। আমি অন্ধ হয়ে যেতে পারি, বুকের ব্যামো হতে পারে। সব কিছ পাবার ঠিক আগের মুহূর্তে হয়ত জগৎটারই মৃত্যু ঘটল।

আইডি বলল—ঠিক আছে, আমার কাছেই থাক তুমি। কিছুক্ষন আমার কাছে হেঁটে বেড়াও। আগেও অনেক কঠিন আঘাত আমি পেয়েছি কিন্তু কখনও এতটা ভেঙে পড়িনি। আমার যা কাহিল অবস্থা তাতে আমার দ্বারা কিছু হবে বলে মনে হয় না। যদি পার একটা লাঞ্চের ব্যবস্থা কর।

ভালান্স তার সঙ্গীটিকে নিয়ে প্রায় জনহীন পঞ্চম এভেনিউ ধরে এগোল। তারপর পশ্চিম দিকে ত্রিশতম এভেনিউ দিয়ে ব্রডওয়েয়ের দিকে। আইডিকে এক নির্জন জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে একটা পরিচিত হোটলে ঢুকে নিশ্চিত মনে বারের দিকে এগিয়ে গেল।

বার পরিচারককে বলল—শোন জিমি, বাইরে এক হতভাগা দাঁড়িয়ে আছে, সে বলছে খুব খিদেয় পেয়েছে, দেখেও তাই মনে হচ্ছে। তুমি তো জান হাতে টাকা থাকলে এরা কি করে? ওর জন্য একটা স্যান্ডুইচের ব্যবস্থা কর, সেটা যাতে ছুঁড়ে না ফেলে আমি দেখব।

বার পরিচারক বলল—অবশ্যই দেব মিঃ ভালান্স। সব লোকই তো ভণ্ডামি করে না। কেউ খিদে কষ্ট পাবে সেটা আমি দেখতে পারিনা।

একটা বিশ পেনীর লাঞ্চ তোয়ালেতে বেঁধে ভালান্স দিল। আইডিকে খাবারটা দিতেই সে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল, আর বলল—'এক বছরের মধ্যে এত ভাল বিশ পয়সার লাঞ্চ আমি খাইনি। তা তুমি কিছু খাবে না ডসন।'

"আমার খিদে পায় না। ধন্যবাদ, ভালান্স।"

আইডি—আমি স্কোয়ারেই ফিরে যাব। সেখানে পুলিশ কোনরকম গোলমাল করবে না। বাকি খাবারটা তোয়ালে জড়িয়ে সকালের জন্য রেখে দিই, বেশি খেলে আবার যদি অসুখ বাধিয়ে বসি। আজ রাতেই যদি আমি মরে যাই। তাহলে তো সেই টাকাটা কোন দিনই হাতে পাবো না। সেই উকিলের সঙ্গে দেখা করার আর এগার ঘন্টা বাকি। তুমি আমাকে ছেড়ে যেওনা ডসন—যাবে না তো? আমার কেবলই ভয় হচ্ছে একটা কিছু যদি ঘটে যায়। আর তোমার কি যাবার মত কোন আস্তানা আছে?"

'না' ভালান্স বলল, 'আজ বাতের মত নেই। দুজন একটা বেঞ্চিতেই শুতে পারব।'

আইডি দার্শনিকেব মত বলল—'মজাব ব্যাপাব কি জান, মানুষ সব কিছু করতে পারে। ডানদিকে এটাই তোমার বেঞ্চ। এখানে শুলে তোমার চোখে আলো পড়বে না। শোন ডসন বাড়ি ফিরে গিয়ে বুড়োটাকে দিয়ে লিখিয়ে তোমাকে একটা চিঠি দেব। যাতে কোথাও না কোথাও তোমার একটা কাজ জুটে যাবে। আজ রাতে তুমি আমাকে অনেক সাহায্য করেছ। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আজকের রাতটাও আমি টিকে থাকতে পারতাম না।'

ভালান্স—ধন্যবাদ, তুমি কি ঘুমের মধ্যে শুয়ে বসেও এই রকম বকবক কর নাকি?

ঘন্টার পর ঘন্টা চোখের পলক না ফেলে ভালান্স গাছের ডালপালার ভিতর দিয়ে তারাগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ডান দিক থেকে ভেসে আসা ঘোড়ার খুরের খট খট শব্দ শুনতে লাগল। তার মন সজাগ, অনুভূতি নিষ্ক্রিয়। সব আবেগই বুঝি ধুয়ে গেছে। মনে অনুতাপ নেই, ভয় নেই, ব্যাথা নেই , অসুবিধা নেই। একবার মেয়েটার কথা মনে পড়ল, সেও যেন নক্ষত্রলোকের বাসিন্দা। আর এই সঙ্গীটির অদ্ভুত হালচালের কথা মনে পড়তেই সে চাপা গলায় হেসে উঠল,সে হাসিতে কেন রকম কৌতুকের ছোঁয়া ছিল না। ভালান্স শক্ত বেঞ্চেটাতে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন দশটার সময় দুজনে এসে দাঁড়াল আন স্ট্রীটের উকিল মিড এর দরজায়। যত সময় যাচ্ছে আইডির স্নায়ু ততই ব্যাকুল হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে, ভালান্সও তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারছে না।

তারা আপিসের মধ্যে ঢুকতেই উকিল অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। উকিল আর ভালান্স পুরনো বন্ধু। বন্ধুকে স্বাগত জনিয়ে উকিল আইডির দিকে চোখ ফেরাল। আসন্ন সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আইডির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, হাত পা কাঁপছে।

মিড বলল—'মিঃ আইডি কাল রাতে আপনার ঠিকানায় আরও একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম আজ সকালে জানতে পারলাম যে আপনি তখন বাড়িতে ছিলেন না, তাই চিঠিও পাননি। সেই চিঠিতে জানান হয়েছিল যে মিঃ পল্বিং আপনাকে উত্তরধিকারী করার প্রস্তবটা পুর্ণর্বিবেচনা করছেন। তিনি স্থির করেছেন যে কাজটা করবেন না এবং আপনাকে জানাতে চেয়েছেন যে আপনাদের মধ্যে সম্পর্কের কোন পরিবর্তন হবে না।

হঠাৎ আইডির সব কাঁপুনি থেমে গেল, মুখে রঙ লাগল, পিঠ সোজা করে দাঁড়াল, চোখে ফুটল নতুন ঝিলিক। এক হাতে যুবকটিকে পিছনে ঠেলে আর একটা হাত বাড়িয়ে উকিলের সঙ্গে করমর্দন করল। একটা বিদ্রুপের হাসি হাসল।

'বুড়ো পল্বিংকে বলবেন সে জাহান্নামে যাক।' গলা ঝেড়ে কথাগুলো বলে মুখ ঘুরিয়ে সদর্পে বেরিয়ে গেল।

উকিল মিড এবার ভালান্সের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, "তুমি এসে পড়ে ভালই হয়েছে। তোমার খুড়োর ইচ্ছা তুমি বাড়িতে ফিরে যাও। যে পরিস্থিতিতে তিনি তাড়াহুড়ো করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেটা সামলে নিয়েছেন। এখন তাঁর বক্তব্য যে সব কিছু আগের মত থাকবে। যেমন —"

কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে উকিল মিড তার করনিককে ডেকে বললেন—'হেই এডামস। এক গ্লাস চল নিয়ে এস, মিঃ ভালান্স মুর্চ্ছা গেছেন।'

* The Shocks of Doom

জন হপকিন্স-এর পূর্ণ জীবনী

কথায় আছে দারিদ্র্য, ভালবাসা ও যুদ্ধকে না জানা পর্যন্ত কোন মানুষ জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ পায় না। সংক্ষিপ্ত দর্শনশাস্ত্রের সারাংশকে যারা ভালবাসে এই ধারনার সত্যতাকে তারা অবশ্যই স্বীকার করবেন। জীবনে যা কিছু জ্ঞাতব্য সে সবই আছে তিনটি শর্তের মধ্যে। যারা ভাসা ভাসা চিন্তায় অভ্যস্ত তারা মনে করেন এই তালিকায় সম্পদটাও যোগ করা উচিত। সেটা সত্যি নয়। একটা গরীব মানুষ যখন দেখতে পায় দীর্ঘদিন আগে হরিয়ে যাওয়া একটা সিকি ডলার একটা ফুটোর ফাঁক দিয়ে তার জামার লাইনিং এর ভিতর ঢুকে গিয়েছিল

তখন জীবনের যে গভীর আনন্দে সে চীৎকার করে ওঠে তার চাইতে গভীর অনুভূতি একজন কোটি পতির জীবনেও কদাচিৎ ঘটে থাকে।

মনে হয় ঈশ্বর এই তিনটি শর্তই মানুষকে শিখিয়ে দিয়েছেন, কোন মানুষই এর বাইরে যেতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে শর্ত তিনটি খুব বেশি অর্থবহ নয়। কেননা দারিদ্র্য অপেক্ষাকৃত কম দুঃখদায়ক, ভালবাসা পরিমিত, যুদ্ধ বিগ্রহ তো জমির সীমানা আর প্রতিবেশীর জায়গাতেই সীমাবদ্ধ। শহরে নগরেই এই বাক্যটি প্রকৃত অর্থে সত্য ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আর জনৈক জন হপকিন্স-এর জীবনে সেটা প্রচুর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সত্য হয়ে দেখা দেয়।

হপকিন্স-এর ফ্ল্যাটটা অন্য হাজারটা ফ্ল্যাটের মত। জানলায় একটা রবারের চারাগাছ, অন্য জানলায় মাছি ভর্তি একটা ছোট কুকুরের বাচ্চা।

জন হকিন্স মানুষটাও ঐ রকম। ন'তলা ইটের বাড়িতে সে কাজ করে সপ্তাহে ২০ ডলার বেতনে। কি কাজ করে সেটা আমাদের অজানা।

মিসেস হপকিন্সও অন্যদের মত। সোনা বাঁধান দাঁত। শুয়ে বসে কাটান মেজাজে, রবিবার অপরাহ্নের ভ্রমন বিলাস, বাড়ির আরাম বিরামের জন্য মুদির দোকানে ধার, সেলের সময় দোকানে ভিড় করা চার তলায় যে মহিলাটি আসল উট পাখির টিপ পরেন এবং ঘন্টার ওপর যার দুটো নাম লেখা থাকে তার প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকান, অবসর সময়ে জানলায় বসে কাটান। পাওনাদারদের উপর সতর্ক নজর রেখে তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা ইত্যাদি গুনে গুননিতা।

এরকম আর কিছুক্ষন চালিয়ে তারপর গল্পটা শুরু করা যাবে।

মহানগরের অনেক আকস্মিক ঘটনা ঘটে থাকে। রাস্তার মোড় ঘুরতে গিয়ে কুটেনাই জলপ্রপাত থেকে আসা আপনার পুরনো বন্ধুর চোখে ছাতার শিকটা ঢুকিয়ে দিলেন। পার্কে বেড়াতে গিয়ে ডাকাত আক্রমণ করল আপনাকে। আপনাকে হাসপাতালে পাঠান হল। যেখানকার নার্সকেই আপনি বিয়ে করে বসলেন, বউ আপনাকে ডিভোর্স করল। আপনার সব সম্বল একদিন ফুরিয়ে যেতে রুটির সন্ধানে গিয়ে দাঁড়ালেন। এক ধনবতী উত্তরাধিকারীকে বিয়ে করলেন। লন্ড্রি থেকে জামা কাপড় আনলেন, ক্লাবের চাঁদা মিটিয়ে দিলেন সব চোখের নিমিষে ঘটে গেল। আবার রাজপথ ধরে হাঁটছেন একটা আঙ্গুল আপনাকে ইশারায় ডাকল, আপনার সম্মুখে একখানা রুমাল পড়ল, মাথায় ইট এসে পড়ল, এলিভেটরের তার কিংবা বাক্স পড়ন! স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটল। আপনাকে নিয়ে ভাগ্য নানান খেলা খেলতে লাগল। মহানগর যেন একটা চটপটে শিশু, আর আপনি তার হাতের খেলনার লাল রঙ, শিশুটি চেটেই খেয়ে ফেলল রঙ।

ডিনার খেয়ে হপকিন্স তার সাজানো গোছানো ফ্ল্যাটে গিয়ে বসল, তার আসনটিতে নানা রঙের পাথর বসান। মিসেস হপকিন্স পাশে বসে হলের দিক মুখ করে অল্প কথা নিয়ে গুনগুন করতে লাগল। কুকুরের বাচ্চাটা দাঁত বার করে বসে রইল।

এখানে দারিদ্র্য ছিল না, ভালবাসা ছিল না, যুদ্ধও ছিলনা। কিন্তু এরকম একটা নির্জীব ডালেও পরিপূর্ণ জীবনের কলস বাঁধা যায়।

হপকিন্সের ইচ্ছা হল জীবনের স্বাদহীন ময়দার তালে মিষ্টি কথার কয়েকটা কিসমিস ছড়িয়ে দেবে। সে বলল ভাববাচ্যে অফিসে একটা নতুন এলিভেটর বসান হল। আর তাতেই

বড় কর্তার মুখের গোঁফ জোড়া উল্টে গেল। মিসেস হপকিন্স টিপ্পনি কাটল—কি বলছ তুমি! সে কিন্তু বলেই চলল মিঃ হুইপ্‌ল্‌স আজ তার নতুন সুটটা পরে এসেছিল, সেটা আমার দারুন ভাল লেগেছে। ধূসর রঙের সঙ্গে—হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল—'এখনই মোড়ের দোকানে থেকে পাঁচ সেন্টের চুরুট আনতে হবে।'

জন টুপিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যার বাতাস বইছে। বাচ্চাদের ছুটোছুটি, বড়দের গল্পগুজব, পাইপ টানা চলছে।

মোড়ের মাথায় চুরুটের দোকানের মালিক ফ্রেশ মেয়ার যে পৃথিবীকে উষর অন্তরীপ বলেই মনে করে।

দোকান ঢুকে চুরুট নিয়ে ধরিয়ে পকেটে হাত ঢোকাল পয়সা দেবে বলে। পকেট হাতড়ে একটা পেনিও হাতে পেল না।

জন বুদ্ধি করে বলল—'দেখ ভাই, খুচরোটা আমি না নিয়ে চলে এসেছি। একটু পরে আমি পয়সা দিয়ে যাব।'

ফ্রেশ মেয়ারের মন নেচে উঠল এই ভেবে যে তার বিশ্বাস প্রমাণীত হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীটা পচে গেছে। মানুষ আর শয়তানে কোন তফাৎ নেই। সামনেই তার জ্বলন্ত প্রমান হপকিন্স। কোন কথা না বলে কাউন্টার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হপকিন্স ছাড়বার পাত্র নয়।

পথ চলতি মানুষ রক্তারক্তি কাণ্ড দেখার জন্য ভিড় করে দাঁড়াল।

তারপরেই এসে পড়ল পুলিশ। জন একজন পুলিশকে ঘুষি মেরে ফেলে দিল আর ফ্রেশ মেয়ারকেও আব একটা 'পাঞ্চ' ঝাড়লে সে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল ক্ষেত্রবিশেযে ধার দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। জন গলি দিয়ে ছুট লাগাল, পিছনে পুলিশ ও দোকানী।

ছুটতে ছুটতে জন বুঝতে পারল একটা বড় রেসের মোটর গাড়ি তার পাশে পাশে ছুটছে। গাড়ীটা গলির এক পাশে দাঁড়িয়ে তাকে ইশারায় উঠে আসতে বলল। জন লাফিয়ে গাড়ীতে উঠতেই তীর বেগে ছুটে চলল।

গাড়ীর চালক-এর বেশ দেখে তাকে চেনাই যাচ্ছিল না।

হপকিন্স কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাকে বলল—আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মনে হচ্ছে আপনার শরীরে খেলোয়াড়ের রক্ত বইছে, তাই দুজনে মিলে একটা মানুষকে ধোলাই দিচ্ছে এটা আপনার ভাল লাগেনি। আর একটু হলে আমি শেষ হয়ে যেতাম।

সোফার যে তার কথা শুনছে তা বোঝা গেল না। চুরুটা ধরাল হপকিন্স। এত গণ্ডগোলের মাঝেও ওটাকে রেখে দিয়েছিলাম।

আরও দশ মিনিট পরে গাড়িটা ঘুরে বাদামী পাথরের একটা বিরাট প্রাসাদের খোলা গেট দিয়ে ঢুকল। সোফার বলল. "তাড়াতাড়ি নেমে আসুন। লেডিই সব কথা বুঝিয়ে বলবেন। এ সম্মান আপনার প্রাপ্য মঁসিয়ে।

হপকিন্সকে নিয়ে সোফার ভিতবে ঢুকে গেল, তাকে নিয়ে ঢুকল বিলাসবহুল ঘরে। অপরূপা সুন্দরী যুবতী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। চোখ আগুনের মত জ্বলছে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে।

অভিবাদন জানিয়ে সোফার বলল—মাই লেডি, সবিণয়ে আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে মঁসিয়ে লণ্ড-এর বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন তিনি বড়ি ছিলেন না। তিনি লড়াই

করছেন পাঁচ দশ-ত্রিশ জনের বিরুদ্ধে। তাছাড়া বিপক্ষে ছিল আটজন পুলিশ। আমি ভাবলাম মঁসিয়ে লঙ যখন বাড়িতে নেই তখন ভদ্রলোককে দিয়েই কাজটা হবে। তাই নিয়ে এসেছি।

মহিলা বললেন—খুব ভাল করেছ আর্মান্দ তুমি এখন যেতে পার।

হপকিন্সের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার সোফারকে পাঠিয়েছিলাম আমার এক সম্পর্কিত ভাই ওয়াল্টার লংকে আনতে। এই বাড়িতে এমন একজন আছে যে আমাকে অপমান করেছে, গালাগালি করেছে। আমার মাসির কাছে নালিশ করেছ কিন্তু সে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে। আর্মান্দ বলেছে আপনি সাহসী। আজকের দিনে সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয় মানুষ দুর্লভ। আপনার সাহায্যের উপর আমি ভরসা করতে পারি তো?

জন চুরুটের বাকি অংশটা পকেটে গোঁজে। এই প্রথম সে রোমান্সের শিহরণ অনুভব করল।

মুখে বলল—আচ্ছা আগে সেই লোকটাকে একবার দেখিয়ে দিন। এতকাল ক্ষমতার অপব্যবহার করেছি। আজ পেয়েছি কাজের মত কাজ।

বন্ধ দরজার দিকে অঙ্গুলি বাড়ির মহিলা বললেন —'ওইতো ওখানে আছেন। এগিয়ে যাও।'

—'আমি! আপনার তোড়া থেকে একটা গোলাপ আমাকে দিন, দেবেন তো?' মহিলা একটা লাল গোলাপ দিলেন। জন চুমু খেয়ে পকেটে রেখে দিলেন। দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। একটা সুন্দর লাইব্রেরী ঘর নরম আলোয় আলোকিত। একটি যুবক পড়াশুনা করছে।

জন আচমকা বলে উঠল—'আপনার চাই ভদ্র ব্যবহারের ওপর লেখা পুঁথি। উঠুন আমি কিছু শিক্ষা দিতে চাই। একটা মহিলার প্রতি রূঢ় ব্যবহার কেন?'

যুবকটি বিস্মিত হয়ে ধীরে উঠে দাঁড়াল, জনের হাতটা ধরে বাড়ির সামানে দরজার দিকে টেনে নিয়ে গেল।

মহিলাটিও ততক্ষনে ঘরে ঢুকছেন, চেঁচিয়ে বললেন—সাবধান রাল্‌ফ্ ব্রান্সকোণ্ড। ঐ যুবকটিকে সমঝে চল।

যুবকটি জনকে ভদ্রভাবে দরজার বাইরে পাঠিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। শান্ত গলায় বলল—'ব্যাস, ওই সব ঐতিহাসিক উপন্যাস পডা তুমি ছেড়ে দাও এটাই আমার ইচ্ছা। ঐ লোকটা কি করে ঢুকল এখানে।'

যুবতীটি বসল আর্মান্দ ওকে এনেছে। আমি মনে করি ফেট কার্পডকে আমার কাছে না দিয়ে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছ। আমি খুব রেগে গেছিলাম তাই ওয়ালটারকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম।

যুবতীর হাত ধরে যুবক বললেন—ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কর ওই কুকুরটা মোটেই নিরাপদ নয়। এবার চলতো মাসিকে গিয়ে বলি আমি যে আমাদের ভাব হয়ে গেছে।

হাত ধরে তারা চলে গেল।

জন তার ফ্ল্যাটে চলে এল। দারোয়ানের পাঁচ বছরের বাচ্চাটা খেলছিল। তাকে গোলাপটা দিয়ে হপকিন্স ওপরে উঠে গেল।

মিসেস হপকিন্স কাগজ নিয়ে কি যেন করছিল।

জিজ্ঞাসা করল—"চুরুট পেলে?"

'নিশ্চয় পেয়েছি। এই ফাঁকে আর একটু ঘুরে এলাম। আজকের রাতটা বেশ সুন্দর। সোফাটায় বসে চুরুটের বাকি অংশটা ধারিয়ে দেওয়ালের ছবির দিকে তাকাল।

তারপর বলল, 'তোমাকে মিঃ হুইপ্‌ল্‌-এর সুটটার কথা বলছিলাম। ধূসর রঙের উপর আবছা চেক কাটা ভারী সুন্দর দেখতে।

* The Complete Life of John Hopkins

গোলাপ কৌশাল ও প্রেম

রাভেনেল, একদিকে পর্যটক অন্যদিকে শিল্পী ও কবি। সেই রাভেনেল ভদ্রলাকটি হাতের পত্রিকাটাকে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। দালাল স্যামি ব্রাউন ঐ ঘরের জানালার পাশে বসেছিল। সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল-'এটা কি হল রাভি? সমালোচকেরা কি তোমার সব লেখা নাকচ করে দিয়েছে?'

রাভেনেল হালকা সুরে বলল--"রোমান্স করে গেছে।" হালকা সুরে কথা বললেন। মুখটা বেশ গম্ভীর, পত্রিকাটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগাল।

গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোর মত একটা সাধারণ লোকের তো এটা জানার কথা স্যানি। এই পত্রিকাতেই একদিন পো, লাউয়েল, হুইটম্যান, ব্রেট হার্ষ্ট, দুবারিয়ের, ল্যানিয়ার প্রভৃতি বড় বড় লেখকদের লেখা ছাপা হত এর থেকেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। বর্তমানে সংখ্যায় এই রকম একটা সাহিত্যের ভোজ তোর জন্য সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, যুদ্ধ জাহাজে যারা ইঞ্জিনে কয়লা দেয় এবং কয়লা জমা করে রাখে তাদের নিয়ে প্রবন্ধ, ওষুধ তৈরীর প্রণালীর উপর রচনা, ধাবাবাহিক গল্প, একটি কবিতা, মহিলা গুপ্তচরকে নিয়ে লেখা, কাল্পনিক গল্প, এ ছাড়াও আছে সম্পাদকীয় বাচালতা। কি জানিস স্যামি সব মিলিয়ে যেন রোমান্স-এর অপমৃত্যু।'

খোলা জানালার পাশে চামড়ার আরাম কেদারাটায় স্যামি ব্রাউন বেশ আরামেই বসে ছিল। পরিধান বস্ত্র, বাদামী রঙের চেক কাটা সুট—ভেস্ট পকেটের চুরুটগুলোও ম্যাচ করা। জুতো জোড়া হালকা বাদামী, মোজা ধূসর রঙের, জামাটা আকাশী নীল। কালারটা তোলা। এত সবের ওপর স্যামির মুখখানার গুরুত্ব সব চাইতে কম। গোল, সুদর্শন-গোলাপি দুই চোখে রোমান্সের কোন আভাস নেই।

রাভেনেলের ঘরের জানালা খুললে গাছ গাছালিতে ভরা একটা পুরানো বাগান চোখে পড়ে। একদিকে উঁচু এপার্টমেন্ট, রাস্তার দিকটা উঁচু ইটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। জানালার উল্টো দিকে অনেক দিনের পুরানো একটা বড় অট্টালিকা গ্রীষ্মকালের গাছপালায় প্রায় অর্ধেক ঢাকা। বাড়িটা যেন দুর্গ। শহরটা ঝড়ের মত গর্জন করে আছড়ে পড়ে তার চওড়া দরজার উপর, দেওয়ালের উপর দিয়ে সাদা চেককাটা পর্দাগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়। ধুলো জমে

গাছের মাথায়, কিন্তু টানা পৃথিবীটা তবু নেমে আসে না। কোন কথাই বুঝি কানে ঢোকে না। ভিতরে থাকেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, তিনি বাড়ীটাকে ভালবাসেন তাই সেটাকে বিক্রী করতে চান না। এইটুকুই যা বাড়ীটার রোমান্স।

সপ্তাহে তিন চারদিন স্যামি রাভেনেল-এর এপার্টমেন্টে আসেন। সে কবি ক্লাবের সভ্য, কারণ পূর্ববর্তী ব্রাউনরা ছিলেন উল্লেখযোগ্য মানুষ, যদিও স্যামি ব্যবসার টানে কিছুটা নীচে নেমে গেছে। যে রোমান্স বিদায় নিয়েছে তার জন্য সে চোখের জল ফেলে না। ব্যবসার লেন দেন ছাড়া কিছু বোঝে না সে, আর জানালার পাশে আরাম কেদারা তার প্রিয় জায়গা। এখানে বসে স্যামির রাভেনেলের কথা শুনতে ভালই লাগে।

ঝানু ব্যবসায়ীর মত স্যামি বলল—'তোমার কি হয়েছে তা আমি বলে দিতে পারি। তোমার নতুন কিছু কবিতা ফেরত আসছে পত্রিকার অফিস থেকে তাই তোমার মন খারাপ।'

রাভেনেল শান্তভাবে বলল—'এই দেখ একটা কবিতা অবশ্য তুমি যদি এটাকে কবিতা বলার অধিকার আমাকে দাও! পত্রিকার এই সংখ্যায় আমার কবিতা ছাপা হয়েছে।'

জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলির দিকে তাকিয়ে বলল-'ওটা আমাকে পড়ে শোনাও।"

রাভেনেল শুরু কবল—

"একটি গোলাপ আমি গুঁজে দিলাম
তোমার চুলে ((সাদা গোলাপ যোগ্যতার প্রতীক)
আর একটি রাখলাম তোমার বুকে—
(লাল গোলাপ, প্রেমের জন্ম চিহ্ন)
আর একটি তুমি, তুলে নিলে বোঁটা থেকে—
(চা-রঙ গোলাপ, যেটা সম্মতির সূচক)
আর একটি দিলে তুমি, সেটা আমাকে এনে দিল
স্মৃতির কাঁটা।"

স্যামি প্রশংসা করে বলল, 'এ তো একেবারে মুচমুচে বিস্কুট।'

রাভেনেল বোধহয় ব্যাঙ্গ করল—'আরও পাঁচটা কবিতা আছে। প্রত্যেকটার পরেই একটু করে বিরতি আছে। অবশ্য—'

স্যামি চেঁচিয়ে বলল, 'আহা বাকিগুলো শোনিও না। তোমার পড়ার মাঝখানে আমি বাধা দেব না। তুমি তো জান কাব্যটা ভাল বুঝি না। বাকিটা শোনাও।'

রাভেনেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে পত্রিকাটা নামিয়ে রাখল। স্যামি খুশি মনে বলল, 'ঠিক আছে পরে একদিন শোনা যাবে। এখন আমি যাই। পাঁচটায় একজনকে সময় দিয়েছি।'

সবুজ বাগানটার দিকে তাকিয়ে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

পরদিন বিকেলে বাগানের দিকটার জানালায় বসে রাভেনেল একটা নতুন সনেটের লাইনগুলোকে ঝালিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ একটা কবিতার লাইন পড়তে পড়তে উঠে বসল।

গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে সেই অট্টালিকা দেখা যায়। সেই সাদা পর্দা-জনালায় হেলান দিয়ে বসে আছে তার রোমান্স ও কাব্যের রাণী। এই প্রথম তাকে দেখল রাভেনেল। এক ফোটা শিশিরের মত তাজা। যে কোন কবির মনের মত ফুলটি যেন। কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে সে ভেতরে চলে গেল।

এই একটা দৃশ্যই রাভেনেলকে শিহরিত করল। এক মুহূর্তে সমস্ত জগৎটায় অণু ও পরমাণু যেন নতুন রূপে দেখা দিল। খবরের কাগজের ছোকরাগুলোর আওয়াজ পাখির গান হয়ে বাজতে লাগল। দারোয়ান হয়ে উঠল এক রাক্ষস, সে নিজে হল তরবারি, বর্শা ও বাঁশিতে সজ্জিত এক নাইট।

প্রেম ভালবাসা যখন শহরের বুক থেকে হারিয়ে যায় তখন তা এভাবেই ইট পাথরের অরণ্যে এসে দেখা দেয়।

বিকেল চারটের সময় আবার বাগানের ভিতর দিয়ে তাকাল। ঐ জানলায় রাখা হয়েছে চারটি ছোট ছোট ফুলদানি, প্রত্যেকটিতে বড় গোলাপ, সাদা ও লালা রঙের একটি করে। সেই সুন্দরী বিষন্ন নয়ণে তারই জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। তারপরই সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, রেখে গেল সুগন্ধি চারটি নিদর্শন।

হ্যাঁ নিদর্শন। এটাও যদি সে না বুঝে থাকে তবে একেবারেই আযোগ্য পাত্র। রূপসী তার কবিতা 'চারটি গোলাপ' পড়েছে। যেটি তার হৃদয় স্পর্শ করেছে এটাই তার প্রেমময় জবাব। অবশ্য তাকে জানাতে হবে যে কবি রাভেনেল তার বাগানেই বাস করে। এই সূক্ষ্ম, সহজ বিনয়ী সপ্রশংস বাণীকে উপেক্ষা করা যায় না।

রাভেনেল আরও দেখল গোলাপ ছাড়াও ফুলদানিতে আছে একটি চারাগাছ। নির্লজ্জের মত আই গ্লাসটা নিয়ে এনে দেখল, জায় ফলের চারা।

সত্যিকারের কাব্যিক প্রবৃত্তির জোরেই তাকের ওপর থেকে টেনে বার করল একটা অপ্রয়োজনীয় তথ্যে ঠাসা বই এবং ফুলের ভাষা শীর্ষক পাতাটা।

'চারা-জায়ফল-একটি মিলনস্থলের ইঙ্গিত। দেখা যাচ্ছে রোমান্স কোথাও আধখানা কাজ করে না। সে যদি তোমার কাছে ফিরে আসে তবে নিয়ে আসবে উপহার আর সেলাই। তুমি চাইলে সে বসবে তোমার চিমনির কাছে।'

এবার রাভেনেল হাসল তার নিজের জয় হয়েছে মনে করে। যে নারী ভালবাসে তার জয় হলে সে হাসি থামায়। পুরুষের যুদ্ধের অবসান হয়। নারী তার যুদ্ধ শুরু করে। প্রেমিক যাতে দেখতে পায় সেইজন্য জানালায় চারটে গোলাপ সাজিয়ে রাখা। এ নারীর হৃদয় মধুর ও কাব্যিক না হয়ে যায় না। এবার একটা মিলনের ব্যবস্থা করা দরকার।

হঠাৎ দরজায় ধাক্কা ও স্যামি ব্রাউনের আগমন।

রাভেনেল আবার হাসল। নবজীবনের দূর বিস্তৃত আলোকরশ্মি স্যামিকেও অলোকিত করে তুলল।

স্যামি জানালার পাশে নিজের আসনে বসে সবুজ গাছপালার দিকে তাকাল। তারপর ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

চেঁচিয়ে বলল—কী আশ্চর্য। আমি তো আর এখানে থাকতে পারছিনা। আমার যে চারটেয় সময় দেওয়া হয়েছে।

রাভেনেল প্রশ্ন করল—ঐ সময় যদি তোমার কাউকে কথা দেওয়া ছিল তো এলে কেন? আমি তো জানি ব্যবসীয়রা মিনিট সেকেণ্ডের হিসাব ভালই রাখে।

একটু ইতস্তত করে ঘুরে দাঁড়াল স্যামি। বোঝাবার ভঙ্গী করে বলল, আসলে ব্যাপারটা কি জান রাভি, এখানে আসার আগে মনে ছিল না কাউকে কথা দিয়েছি। তোমাকে সবই

বলছি-পাশের ওই পুরনো বাড়ির মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেছি। সোজা কথায় বলি আমাদের বাগদান হয়ে গেছে। বুড়োটা না না করছে কিন্তু সেটি হচ্ছে না। বুড়োটা মেয়েটার ওপর কড়া নজর রেখেছে। তার কাছ থেকেই আমি এই জানলার খোঁজ পেয়েছি। সে কখন কেনাকাটা করতে যায় সে খবরটা এডিথই আমায় দিয়েছে। তোমার খবরটা আরও আগে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি জানি এতে তুমি কিছু মনে করবে না। আচ্ছা চলি।"

'আচ্ছা খবরটা তুমি পেলে কি করে?'

'গোলাপ ফুলের কাছ থেকে। আজ চারটে গোলাপ ফুল ছিল। তার অর্থ চারটের সময় ব্রডওয়ের তেইশতম রাস্তার মোড়।'

রাভেনেল শেষ প্রশ্ন করল "কিন্তু জায়ফলের চারটার"?

'সেটার অর্থ আধ ঘন্টা পরে'। স্যামি হল ঘর থেকে চিৎকার করল "কাল তোমার সঙ্গে দেখো হচ্ছে।'

* Roses, Ruses & Romance

চাঁদের কলঙ্ক

মধুচন্দ্রিমার আবেগ ও স্বপ্নের ঘোরে গোলাপী রঙের কিমোনো গায়ে দিয়ে নতুন কণে বসে আছে দোলনায়। সে ভাবছিল তার এই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে। গ্রীণল্যাণ্ড, টাসমানিয়া, বেলুচিস্তানের লোকেরা কিড ম্যাকগ্যারির সঙ্গে বিবাহ নিয়ে কি আলোচনা করছে। অবশ্য এতে তার কিছু যায় আসে না।

'আমাব পিচ ফল খেতে ইচ্ছে করছে।' স্ত্রীর এই আব্দার শুনে কিড ম্যাকগ্যারি কোট, হ্যাট পরে নিল। সে গম্ভীর, আবেগপ্রবণ কিন্তু চঞ্চল।

বলল—'ঠিক আছে, নিচে গিয়ে তোমার জন্য নিয়ে আসছি।'

কনে বলল—'দেরী কোর না কিন্তু, দুষ্ট ছেলেটা কাছে না থাকলে বড় একা লাগবে।'

মোড়ের মাথায় ইতালীয় দোকানটার কমলালেবু, আপেল আর কলার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'পিচ ফল পাওয়া যাবে?'

ফেরিওয়ালা বলল—'ওঃ না, একটাও নেই। এখনও তার সময় হয়নি। ভাল কমললেবু আছে। তাতে চলবে কি?'

ঘৃণা ভরে যেন মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপর এগিয়ে চলল। দোকানে, কাফেতে, বন্ধু ও গুণগ্রাহী জাস্টাস্ ওকালাহান-এর ফলের দোকানে।

কিড বলল—'যা চাই এখনি দিতে হবে। সে বায়না ধরেছে পিচফল চাই। যদি থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি দাও।'

'আরে, এ বাড়িটাই তোমার। কিন্তু পিচ ফল এখন পাবে না, সময় হয়নি। ব্রডওয়েতে খুঁজলেও পাবে বলে মনে হয়না। এখন এটাই তো মুশকিল কোন মহিলার যখন একটা বিশেষ ফল খেতে সাধ হয় তখন অন্য ফল মুখে রুচবে না। তাছাড়া এত রাতে কোন ভাল ফলের দোকানও খোলা পাবে না। তবে তুমি যদি মনে কর কমলালেবু তোমার গিন্নীর পছন্দ হবে তা হলে এক বাক্স কমলালেবু দিতে পারি।'

"না, ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে পিচফলের বায়না । অন্য কোথাও দেখতেই হবে।" হাঁটতে হাঁটতে ওয়েস্টসাইড এভেনিউতে হাজির হল। তখন প্রায় মাঝরাত। কয়েকটা দোকান খোলা ছিল কিন্তু শুনেই তারা তেড়ে এল।

এদিকে তার কণে নিশ্চিত মনে বসে আছে বিশেষ ফলটা পাবার আশায়। যে তার হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন নিয়ে আসবে।

কিড, একটা দোকানে তালা লাগাতে যাচ্ছে দেখে ফেরিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল—'পিচ ফল আছে?'

—'না মশায়, তিন চার সপ্তাহের আগে পাবেন না। কোথায় পাবেন তাও বলতে পারব না। লুকিয়ে চুরিয়ে কিছুটা পেতে পাবেন, কিন্তু সেটা যে কোথায় তা বলা শক্ত। হয়তো দামী হোটেলে পাবেন। আমার কাছে ভাল কমলালেবু আছে, আজই এসেছে।'

কিড কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল পাশের অন্ধকার গলির একটা বাড়ির দিকে যেখানে সবুজ আলো জ্বলছিল।

থানার ডেস্ক সার্জেন্টকে বলল—ক্যাপ্টেন কি কোথাও গেছেন?

ঠিক তখনই ব্যাস্ত সমস্ত বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন।

মুষ্ঠিযোদ্ধাকে বলল--'হেলো কিড, আমি তো জানি তুমি মধুচন্দ্রিমা করতে গেছ।'

—"কালই ফিরেছি। আমি এখন ভাবছি মিউনিসিপ্যাল কাজকর্মে মন দেব। আজ রাতে কি ডেনবার ডিক এর বাড়িতে যাবার সময় হবে ক্যাপ।"

—সে সব চুকে গেছে। ডেনবার দু মাস আগেই ধরা পড়েছে।

কিড—ঠিক কথা। র‍্যাফটি তাকে তেতাল্লিশতম রাস্তা থেকে উৎখাত করে দিয়েছে। এখন সে তোমার এলাকায় আছে। বেশ জমিয়ে তুলেছে। আমিও এই জুয়ার ব্যবসাতে আছি। তোমাকে তার বিরুদ্ধে লাগাতেও পারি।'

ক্যাপ্টেন গর্জন করে উঠল—"আমার এলাকায়? তুমি ঠিক জান? তাহলে তো আমার উপকার হবে। তুমি ঢুকতে পারবে তো? কাজটা কি ভাবে করবে?'

'—হাতুড়ি দিয়ে। দরজায় এখনও ইস্পাত লাগান হয়নি। দশটা লোক লাগবে। আমাকে ওখানে ঢুকতে দেবে না, কারণ আমার ওপর চটে গেছে ডেনবার। তার ধারণা গত বারের হামলাটা আমি করেছিলাম। ওর বাড়িটা তিন ব্লক দূরে। তাড়াতাড়ি কর।"

দশ মিনিট পার হবার আগেই এক ডজন লোক ও গাইডকে নিয়ে ক্যাপ্টেন ঢুকল অন্ধকার বাড়িটাতে। দিনের বেলায় এখানে নানা রকম ব্যবসা চলে।

কিড নীচু গলায় বলল—তিন তলার পিছন দিকে। আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

তার নির্দেশ মতো দুজন কুড়ুলধারী দরজার সামনে দাঁড়াল।

ক্যাপ্টেন সন্দিগ্ধ ভাবে বলল—'সব যে চুপচাপ। তোমার খোঁজাটা ঠিক সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত তো।'

দরজটা কেটে ফেল। সঠিক না হলে দায়টা আমার। কুড়ুলের আঘাতে পলকা দরজাটা ভেঙে গেল। ভিতর দিয়ে এক ঝলক আলো বেরিয়ে এল। আক্রমনকারীরা সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক তাক করে ঢুকে পড়ল।

বড় ঘরটা ডেনবার-এর মনের মত সাজান। নানা রকম জুয়ার খেলা চলছিল। পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। কেউ পালিয়ে গেল।

সেই রাতে ডেনবার হাজির ছিল সেখানে। হামলাকারীকে হটিয়ে দিতে সেও আসরে নেমেছিল, কিন্তু কিডকে দেখামাত্র আক্রমনটা ব্যক্তিগত হয়ে পড়ল।

একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। গড়িয়ে চাতালে এসে উঠে দাঁড়িয়ে কিড ব্যক্তিগত কলা কৌশল দেখাল।

প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে ওপরে গিয়ে বড় হলঘরের পাশেরটায় ঢুকে পড়ল। সেখানে ছিল নামী দামী সব খাবার।

ঘরের মেঝে পর্যন্ত ঝোলান টেবিল ঢাকনার নীচে একপাটি জুতো দেখে টেনে বার করল একজন ওয়েটারকে।

কিড হুকুম করল—'উঠে দাঁড়াও। এই লাঞ্চের তুমিই মালিক তো?'

—"হ্যাঁ তাইতো ছিলাম। ওরা কি আবার আমাদের জালে ফেলেছে?"

—"তিন ডজন ছিল খেলা শুরুর আগে, কিন্তু মনে হচ্ছে সে সব সাবাড় হয়ে গেছে। যদি ভাল কমললেবু চান দিতে পারি। কিড কঠিন স্বরে বলল—'এখনই চলে যাও যেখান থেকে পার নিয়ে এস, নইলে তোমার কপালে দুঃখ আছে। আজ রাতে কেউ যদি আমার কমলালেবু খাওয়ায় তার মুণ্ডটা আমি ঘুরিয়ে দেব।'

ডেনবাবের দামী লাঞ্চকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে পাওয়া গেল একটি মাত্র পিচ ফল। সেটা কিড পকেটে চালান করল আব কর্মীটিও একটি দামী বস্তু নিয়ে সবে পড়ল। নিচে গলিতে অফিসাররা তখন বন্দীদের গাড়ীতে বোঝাই করছিল। সেদিকে না ফিরে সোজা দিকে ছুট লাগাল কিড।

যত এগোচ্ছে তত মন হালকা হচ্ছে। গিন্নি হুকুম করেছে আর সে হুকুম মেনেছে। একথা ঠিক যে একটিমাত্র পিচ ফলই সে পেয়েছিল কিন্তু এই শীতের মাঝরাতে সেটা সংগ্রহ করা সোজা কাজ নয়। পকেটে হাত দিয়ে ধরে রেখেছে যাতে পিচ ফলটা পড়ে না যায়।

ফেরার সময় রাত-দিন খোলা ওষুধের দোকানে ঢুকে চশমা পরা কর্মীটিকে বলল—"আমার পাঁজরের এই হাড়টাকে একটু ভাল করে দেখ তো। এটা ভেঙেছে কিনা। পেটে একটা সংঘর্ষে সিঁড়ি টপকে নীচে পড়ে গেছিলাম।"

ওষুধের দোকানের লোকটি ভাল করে দেখে বলল—'এটা ভাঙেনি, কিন্তু ছড়ে যাওয়া দেখে মনে হচ্ছে ভালই আঘাত লেগেছে।'

কিড বলল—'ঠিক আছে সময় করে তোমার জামার ব্রাশটা একটু দাও।'

সব অলৌকিক ঘটনা এখনও শেষ হয় নি। ঘরের গোলাপী আভায় লনে অপেক্ষা করছে কণে একটা তুচ্ছ জিনিসের জন্য সে তার বরটিকে তো বাইরে পাঠাতে পেরেছে আজ রাতের জন্য।

আর সেই লোকটাই এখন তার পাশে এসে পিচফলটাকে তুলে দিল হাতে।

নববধূটি আদর করে বলল—দুষ্টুছেলে। আমি কি একটা পিচফলের কথা বলেছিলাম নাকি। আমার তো মনে হয় একটা কমলালেবু পেলেই আমি বেশি খুশী হতাম।"

নববধূদের জয় হোক।

* Little Speck in Garnered Fruit

বৃত্ত সম্পূর্ণ হল

যুবক-যুবতীদের বিরক্তির ঝুঁকি আছে জেনেও প্রচণ্ড আবেগের এই কাহিনীটি শুরু করার আগে জ্যামিতিক আলোচনার একটি ভূমিকা অবশ্যই লেখা দরকার।

প্রকৃতি চলে বৃত্তাকারে, কলাকৃতি চলে সরল রেখায়। যা কিছু প্রাকৃতিক সবই গোলাকার, যা কিছু কলানুগ তাই কোন-বিশিষ্ট। একজন মানুষ বরফের রাজ্যে পথ হারালে যতই চেষ্টা করুক একই বৃত্তে ঘুরতে থাকবে। শহরের মানুষের পা দুটি চতুষ্কোন। রাস্তায় ও মেঝেতে চলতে চলতে স্বধর্ম বিচ্যুত হয়ে ক্রমাগত নিজের কাছ থেকে দূরে চলে যায়।

শিশুর গোল চোখ পবিত্রতার প্রতীক, চঞ্চল প্রণয়ীর চোখের সূক্ষ্ম ভাঁজগুলি প্রমান করে যে সে কাল কবলিত। চক্রবল-সমান্তরাল মুখমণ্ডল সংকল্পবদ্ধ চাতুরীর লক্ষণ, অকপট চুম্বনের প্রত্যাশায় গোল হয়ে ওঠা দুটি ঠোঁটের স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দের খেলা কেনা দেখেছে?

প্রকৃতিব পরিপূর্ণতা সৌন্দর্য, চক্রাকার তার প্রধান গুন। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রকে দেখুন, মোহময় সুবর্ণ গোলককে দেখুন, দেখুন আশ্চর্য সব মন্দিরের গম্বুজকে, পরিণয়ের স্মারক অঙ্গুরীকে, সার্কাসের রিংকে আর মদ পরিবেশনের গোলাকার পর্যায়কে।

অপরপাশে সরলরেখাগুলি প্রমান করে প্রকৃতি পথচ্যুত হয়েছে। তবে প্রণয় দেবীর কটিবন্ধ সরল রেখায় পরিবর্তিত হয়েছে সেটা কল্পনা করা যায় কি?

যবে থেকে আমরা সরলরেখায় চলতে এবং মোড় ঘুরতে শুরু করেছি তখন থেকে আমাদের স্বভাবও বদলে গেছে। তার ফলে, প্রকৃতি, শিল্পকলা অপেক্ষা বেশী নমনীয় ও পরিবর্তনশীল হওয়ার জন্য কঠোর বিধি বিধানের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রেই তার ফল হয় অদ্ভুত—যেমন ভাল জাতের ক্রিসান্থিমাস ফুল। কাঠের নির্যাস থেকে তৈরী হুইস্কি, একটি প্রজাতন্ত্রী মিশৌরি। আর নিউইয়র্কের অধিবাসী।

একটা বড় শহরের প্রকৃতি কত তাড়তাড়ি হারিয়ে যায়। তার কারণটা জ্যামিতিক। বড় শহরের রাজপথ ও ভাস্কর্যের সরলরেখাগুলি, তার আইন ও সামাজিক রীতিনীতির চতুষ্কোনত্ব তার একরেখা ফুটপাত, পথ চলার কঠিন কঠোর একগুঁয়ে আইন কানুন এমন কি অবসর বিনোদন ও খেলাধূলা পর্যন্ত—সব কিছুই যেন প্রকৃতির বাঁকা রেখাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

এসব দেখে একটা কথা অন্তত বলা যায় বৃহৎ শহর যেন বৃত্তকে চতুষ্কোণ করে তোলায় একটা জটিল ধাধাঁর সৃষ্টি করেছে। এখানে বলা যেতে পারে এই ভূমিকাটি কেন্টাকি বিবাদেব পরিণতির প্রাক্-কথামাত্র।

এই বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল কাম্বারল্যাণ্ড পর্বতমালায় ফলওয়েল পরিবার ও হার্কনেস পরিবার দুটির মধ্যে। তাই ঘরোয়া 'ভেণ্ডেটা'র প্রথম শিকার বিল হার্কনেস এবং পোষা কুকুর। তার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল ফল্‌ওয়েল বংশের এক প্রধানকে হত্যা করে। ফল্‌ওয়েলরাও পাল্টা আঘাত হানতে দেরী করেনি। তাদের কাঠবিড়ালি মার্কা রাইফেলগুলি নিয়ে বিল হার্কনেসকে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার কুকুরের কাছে।

চল্লিশ বছর ধরে রক্তের বদলা রক্ত। হার্কনেস পরিবারের লোকদের হত্যা করা হত যখন তারা প্রস্তুত বা অপ্রস্তুত অবস্থায় ক্যাম্প মিটিং সেরে ঘুমিয়ে থাকত। এইভাবে ফলওয়েল পরিবারটির ডালপালাও কেটে দেওয়া হল।

এই সর্বনেশে হত্যাকাণ্ডের ফলে এক সময় দুটি পরিবারের একটি করে মানুষ বেঁচে রইল। তখন কাল হার্কনেস ভাবল এটাকে বাড়ালে ব্যক্তিগত ঝগড়ার রূপ নেবে, তাই হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আর ফলওয়েলের শেষ প্রতিনিধি স্যামও প্রতিহিংসার দায় থেকে মুক্ত হল।

এক বছর পরে স্যাম জানতে পারল তার শত্রুটি নিউইয়র্ক শহরে বাস করছে। স্যাম কিছু ঝুল কালি চর্বির সঙ্গে মিশিয়ে জুতো পালিশ করল। সাদা শার্ট কলার পরল। থলেতে কিছু জামা কাপড় নিল, তারপর রাইফেল নিতে গিয়ে আর নিল না। অভ্যাসটা কাম্বারল্যাণ্ড-এ যতই নৈতিক ও সমর্থনযোগ্য হোক নিউইয়র্কে এই অভিযান চলবে না। বুড়োর ড্রয়ারের ভেতর থেকে সেকেলে যে কোল্ট রিভলবারটা বার করেছে প্রতিহিংসা সাধনের পক্ষে সেটাকে সেরা অস্ত্র বলে মনে হল। শিকারী-ছুরিটাকে চামডার খাপে ভরে নিচে রেল রোড স্টেশনের দিকে এগোল। জিনের ঘোড়ার পিঠের ওপর বসে ফলওয়েল পরিবারের সমাধিক্ষেত্রর দিকে তাকিয়ে বসে রইল কিছুক্ষন।

যখন নিউইয়র্কে পৌছল তখন অনেক রাত। সে এতদিন উদার প্রকৃতির বুকেই বসবাস করত। তাই সে বুঝতে পারল না যে এই বড় শহরের দুর্জয়, অস্থির ও হিংস্র কোনগুলির অন্ধকারে অপেক্ষা করে আছে তাকেও নবকলেবর প্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ শিকারের রূপ পরিণত করতে। এক ট্যাক্সি ড্রাইভার তাকে সেই সঙ্কট মুহূর্তে তুলে নিয়ে গিয়ে তার উপযুক্ত একটা হোটেলে তুলে দিল।

পরদিন সকালে ফলওয়েল তার চিরশত্রুর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। একটা সরু চামড়ার বেল্ট দিয়ে রিভলবারটাকে কোমরে বেঁধেছে, ছুরিটা ঝুলছে কাঁধে, বাঁটটা ফলকের তলায়। শুধু এটুকু সে জানে কাল হার্কনেস মালগাড়ি চালিয়ে এসে এই শহরেই কোথায় উঠেছে। স্যাম এসেছে তাকে শেষ করতে। ফুটপাতে পা দিতে তার চোখ লাল হয়ে উঠল, বুকে জ্বলে উঠল প্রতিশোধের আগুন।

প্রধান রাস্তাগুলির হৈ-হট্টগোল তাকে টানল। তার মনে হয়েছিল কালকে সেখানে দেখতে পাবে—জগ ও চাবুক নিয়ে আসছে। কিন্তু সে এলনা। হয়তো কোথাও লুকিয়ে অপেক্ষা করছে, কোন জানালা, দরজা দিয়ে গুলি চালাবে। তাই স্যাম বেশ কিছুক্ষন দরজা জানালার ওপর নজর রাখল।

দুপুর নাগাদ শহরটা হঠাৎ যেন তাকে চেপে ধরল।

শহরের চৌরাস্তা যেখানে পরস্পর ছেদ করেছে, সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল স্যাম। চারদিক দেখল, পৃথিবীটা যখন কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে একটা সমতলে পরিণত হল; জীবন বয়ে চলল বাঁধাধরা সীমানার মধ্যে, পূর্বনির্দিষ্ট পথ ধরে। জীবনের সারিবদ্ধ ভাবে, ভয়ঙ্কর হট্টগোল তাকে বিভ্রান্ত করে তুলল।

স্যাম একটা বাড়ির কোনে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। সবাই পাশ কাটিয়ে চলে গেল কেউ ফিরেও তাকালনা। সে হয়তো মরে গেছে, কেউ দেখতেই পাচ্ছে না এরকম একটা ভয়, একাকীত্ব তাকে গ্রাস করল।

একটা মোটা লোক তাদের মধ্যে থেকে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তার কাছে গিয়ে স্যাম গলা চড়িয়ে বলল—র‍্যাং কিন্সদের শুকরগুলোর ওজন একটা পুরো প্যার্শেল এর চাইতে বেশী। কিন্তু তাদের নিকটবর্তী ফলগুলি আগেব চাইতে ভাল—"মোটা লোকটা সাধারনভাবেই সরে গেল।

একফোঁটা শিশিরের প্রায়োজন বোধ করল স্যাম। একটা ঝিলিক মারা বার ও তার সাজসজ্জা চোখে পড়ল। স্যাম সেখানে ঢোকার চেষ্টা করল কিন্তু দরজার কোন লক খুঁজে পেল না। হাতে পিনের আঘাত পেয়ে ক্ষান্ত হল।

দরজা থেকে সরে এসে সিঁড়িতে বসে পড়ল। একজন পুলিশ এসে বলল, 'নিজের পথে চলে যান। অনেক সময় ধরে আপনি এখানে ঘুর ঘুর করছেন।'

পরবর্তী মোড় থেকে একটা শিস্ কানে এল স্যামের। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল একটা শয়তান চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে রাস্তাটা পার হতে চেষ্টা করল। একটা প্রকাণ্ড ইঞ্জিন শাঁ করে পাশ কাটতে গিয়ে হাঁটুর কাছটা ঘসটে দিল। এক ট্যাক্সি চালক একটা চাকার ধাক্কা মেরে খিস্তি দিতে দিতে চলে গেল। এক বিপুলা মহিলা কনুইয়ের খোঁচা মারল। কাগজ বিক্রেতা ছেলেটা কলার খোলা গায়ে ফেলে বলল—'এ কাজটাকে আমি ঘৃণা করি, কেউ যদি আমাকে দেখে ফেলে—"

এদিকে কার্ল হার্কনেস-এর দিনের কাজ শেষ হল, মালগাড়িটাকে আস্তাবলে ঢুকিয়ে একটা বাড়ির পাশ দিয়ে মোড় ঘুরল। জনসমুদ্রের মধ্যে মাত্র তিন গজ দূরে চোখে পড়ল একটি মাত্র জীবিত চির শত্রুটির ওপর।

সে হঠাৎ থেমে গেল। বিস্মিত ইতস্ততঃ করল কারণ সে অস্ত্রহীন। কিন্তু স্যাম ঠিক তাকে চিনে ফেলেছে।

তারপর একটা লাফ, সোজা শোনা গেল স্যামের গলা—কেমন আছে হে কাল! তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে।

আর ব্রড়ওয়ে, পঞ্চাশ এভেনিউ ও তেইশতম স্ট্রীটের ত্রি-কোণে-দাঁড়িয়ে ঘটাল অঘটন। কাম্বারলাণ্ডের চিরশত্রু দুজন হাত বাড়িয়ে করমর্দন করছে।

* Squaring The Circle

মহানগরের কণ্ঠস্বর

বছর পঁচিশেক আগে স্কুলের ছেলেমেয়েরা বই পড়ত সুরেলা আবৃত্তির ঢঙে। গির্জার পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ ও করাত-কলের ক্লান্ত সুরের মাঝামাঝি এই সুর। এই তুলনা কাউকে ছোট না করেই বলা হল।

জীবন বিদ্যার ক্লাস থেকে পাওয়া একটা সুন্দর ছোট শিক্ষাপ্রদ কবিতার কথা মন পড়ে—সব থেকে উল্লেখযোগ্য পংক্তিটি হল—"জংখাস্থিই মানব দেহের দীর্ঘতম অস্থি।"

মানব সংক্রান্ত সব জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ঘটনাগুলিকে যদি এইভাবে সুরেলা ও সুশৃঙ্খল করে শৈশবেই মনে গেঁথে দেওয়া হত তাহলে আমরা পেতাম অমূল্য উপহার। কিন্তু শরীর সংস্থান বিদ্যা, সঙ্গীত ও দর্শনের কাছ থেকে আমরা অতি সামান্য কিছু পেয়েছি।

সেদিন একটা অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিলাম। একাট আলোক রশ্মির দরকার পড়েছিল। স্কুলের দিনগুলো আমাকে সাহায্য করত। কিন্তু সেদিনের শক্ত বেঞ্চগুলোর কাছ থেকে যে সব সুরের শব্দগুলো আয়ত্ত করেছিলাম তার মধ্যে এমন একটা কথাও মনে পড়ল না যাতে মানব কণ্ঠস্বরের সম্বন্ধে কিছু বলা যায়।

অন্য কথায় সম্মিলিত মানবের মিশ্র-বানীর কথা। অর্থাৎ মহানগরের কণ্ঠস্বর।

একক কণ্ঠস্বরের কিন্তু অভাব নেই। শবের গান, নদীর কলতান, ফুলের ভাষা, সাবধান বানী, ফারাওদের কবরের ওপর খোদিত লিপি। যে লোকটির অবিলম্বে অর্থের প্রয়োজন সখের ধ্বনি আমরা বুঝতে পারি। অনেক লম্বকর্ণ মানুষ আবার আরও সব সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ বুঝতে পারে বলে দাবী করে। কিন্তু সবথেকে বড় কথা মহানগরের কণ্ঠস্বরের অর্থ কে বুঝতে পারে?

সেই ব্যাপারে খোঁজ করতে বেরিয়ে পরলাম। প্রথমে অরলিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে পরেছিল সাদা 'সুইস' এবং ফুল গোঁজা টুপি, আর ফিতে, নানান সুতো উড়ছিল পোশাকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে।

আমার নিজস্ব কোন স্বর না থাকায় আমতা আমতা করে বললাম—'আমাকে বলতো এই বড়-মানে প্রকাণ্ড শহরটা কি কথা বলে? সে কি কখনও তোমার সঙ্গে কথা বলেছে? তার কথার অর্থ তুমি কি বুঝতে পার? ব্যাপারটা গোলমাল কিন্তু একটা সূত্র তো নিশ্চয়ই আছে। "একটা সারাটোগা ট্রাঙ্কের মত?" অরেলিয়া বলল, 'আমি—না, দয়া করে ঢাকনার প্রসঙ্গ তুলো না। আমার মনে হয় সব নগরের একটা ভাষা আছে আর সেই লোকটিই শুনতে পায় যাকে কিছু বলার আছে। তোমাকে কি বলে?'

অরেলিয়া—সব নগর একই কথা বলে। যখনই তারা কিছু বলতে থাকে তখনই ফিলাডেলফিয়াতে প্রতিধ্বনিত হয়।

আমি—"এখানে চল্লিশ লাখ মানুষ একটা দ্বীপে ঠাসাঠাসি করে বাস করে। ছোট জায়গায় বেশী মানুষ থাকলে তাদের মধ্যে এক জাতীয়ত্ব গড়ে উঠতে বাধ্য। আর সেটাই বাইরে প্রকাশ হয় সংঘাতে।

এটাকে তুমি ঐক্যবদ্ধ ভাষান্তরও বলতে পার যা একটা মিলিত রূপ গ্রহণ করে মহানগরের কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়। তুমি কি বলতে পার সেটা?

অরেলিয়া মাথা নিচু করে বসেছিল। মুখে হাসি। দ্রাক্ষালতার একটা উদ্ধত শাখা তার ডান কানের উপর এসে পড়েছে। নাকের উপর চাঁদের আলো পড়েছে। কিন্তু আমি তখন বেপরোয়া।

বলে চলেছি—'আমি নিজেই বাইরে গিয়ে খোঁজ নেব এটা কি? আমাকে জানতেই হবে। আমার হাতে চুরুট গুঁজে দিয়ে যেন না বলে নিউইয়র্ক—আমি প্রচারের জন্য কথা বলতে পারি না। অন্য সবাই উত্তর দিয়েছে। যেমন শিকাগো বলে—'আমি বলব', ফিলাডেলফিয়া—'আমার বল উচিত, নিউ অরলিয়ান্স বলে 'আমিও বলতেই অভ্যস্ত', লুইসভিল—'আমি সে কথা বলতে পরোয়া করিনা।' সেন্ট লুইস বলে—আমাকে ক্ষমা করবেন।' এবার নিউইয়র্কের পালা।

অরেলিয়া থামল।

আমি—অন্য কোথাও গিয়ে নিশ্চয়ই জেনে আসব।

একটা বড় বাড়ীতে ঢুকলাম সেখনাকার পরিবেশক বিলি ম্যাগনামকে বললাম—বিলি তুমি তো দীর্ঘকাল নিউইয়র্কে বাস করছ, এই পুরনো শহরটা কি ধরনের গান উপহার দিয়ে থাকে? মানে আমি বলতে চাই—'

বাধা দিয়ে বলে উঠল—'ক্ষমা করবেন, এক মিনিট! পাশের ঘরে কে যেন বেল টিপছে।'

কিছুক্ষন পর একটা খালি বালতি নিয়ে এসে ভরে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। ফিরে এসে বলল—উনি ম্যাম। দুবার ঘন্টা বাজান। সাপারের সঙ্গে এক গ্লাস বীয়ার খেতে ভালবাসেন তাই, কিন্তু এবার বলুন তো আপনার কি চাই?

আমি বললাম—'সাদা বীয়ার'। বলেই হাঁটতে হাঁটতে ব্রডওয়ে চলে এলাম। মোড়ে একটা পুলিশকে দেখে এগিয়ে গেলাম, বললাম—যদি কিছু না মনে করনে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। আপনি সবচেয়ে কোলাহল মুখর সময়টাকে দেখেন এই শহরের। এই নগরের নিশ্চয়ই এমন একটা ভাষা আছে যা আপনারা বুঝতে পারেন। রাতে নির্জন স্থানে টহল দেবার সময় সে ভাষা শুনতে পান। এই হট্টগোলের সার কথা কি?

পুলিশটি বলে—আমি তো কিছুই বলি না বন্ধু। উপরওয়ালার হুকুমই কেবল শুনে যাই। কয়েক মিনিট এখানে দাঁড়ান এবং চোখ খুলে রাখুন যাতে পরবর্তী টহলদার দেখতে পান।

পাশের রাস্তা থেকে দশ মিনিটের মধ্যে আবার ফিরে এল। আধা কর্কশ গলায় বলল—গত মঙ্গলবার ওদের বিয়ে হয়েছে। ওদের তো আপনি চেনেন। প্রত্যেকদিন রাত নটার সময় ঐ মোড়টার কাছে আসে হেলো বলার জন্য। আমি যেভাবেই হোক ওখানে হাজির হই। ভাল কথা—এই শহরে কি কি আছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন না। তা বারোটা ব্লক পেরিয়ে দু'একটা বাড়ির ছাদে বাগান আছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পার হয়ে একটা ছায়া ঢাকা পার্কের কাছে এলাম। গম্বুজের ওপর সোনালী পাথরে গড়া একটা আকাশরাণী ডায়নার মূর্তি অলোয় ঝকঝক্ করছে। হঠাৎ

দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল আমার কবি—মাথায় টুপি। বাতাসে চুল উড়ছে, মুখে নানা ছন্দের কলি।

আমি বললাম, বিল্ আমাকে একটা লিফট্ দাও। একটা কাজে বেরিয়েছি মহানগরের কণ্ঠস্বর শুনতে। কি জান এটা একটা বিশেষ হুকুম। আমরা চাই শহরের আত্মার ও তাৎপর্যের একটা কাব্যিক রহস্যময় ভাষা। এব্যাপারে তুমি একটা ইঙ্গিত দিতে পার। কয়েক বছর আগে একটা লোক তার স্বরলিপি দিয়েছিল আমায় পিয়ানোর সর্বনিম্ন জি থেকেও সেটা নীচে ছিল। সে ভাবে তো নিউইয়র্কের স্বরলিপি করা যাবে না। কিন্তু যদি মুখটা খোলে তাহলে তার ধারনা একটা আমি পেতে পারি। সে বেশ অতীব শক্তিশালী, সুদূর প্রসারী। সেটাকে পেতে হলে আমাদের একত্রে মেলাতে হবে দিনের যান বাহনের প্রচণ্ড গুরু গম্ভীর শব্দ, রাতের অট্টহাসি ও সঙ্গীত, গাড়ির চাকার কথা ও চাপা গুঞ্জন, সংবাদ পত্রের এজেন্টদের চিৎকার। ছাদের বাগানের ফোয়ারায় ঝিরঝির শব্দ, ফেরিওয়ালার হল্লা, পার্কে প্রেমিক প্রেমিকার গুঞ্জন। এই সমস্ত শব্দ দিয়ে মিশিয়ে নির্যাস বানাতে হবে। আর তার থেকে তৈরী হবে সুরাসার। এক শ্রবণযোগ্য সুরাসার। যার একটি ফোঁটা থেকে গড়ে উঠবে আমাদের প্রার্থিত বস্তুটি।

কবি জিজ্ঞাসা করল—'ক্যালিফোর্নিয়ার সেই মেয়েটির কথা কি তোমার মনে পড়ে যার সঙ্গে গত সপ্তাহে আমাদের দেখা হয়েছিল স্টিভার এর ষ্টুডিয়োতে, শোন আমি তার কাছেই যাচ্ছি। আমার সেই 'বসন্তের উপহার' কবিতাটাকেসে মুখস্থ করে ফেলেছে। বর্তমান সেই তো এ শহরের সবচেয়ে দুর্লভ বস্তু। ভাল কথা এই টাইটা কেমন দেখাচ্ছে বল তো?

'আর যে ভাষার কথা জিজ্ঞাসা করলাম তার কি হলে? ক্রিয়ন বলল—"আহা,সে তো গান করে না, কিন্তু সে যখন আমার 'সৈকত বায়ুর পরী' কবিতাটি আবৃত্তি করে তখন শোনবার মত!"

আমি এগিয়ে গিয়ে মোড়ের মাথায় একটা সংবাদপত্র বিক্রেতা ছেলেকে পেলাম। হাতের কাগজটা আমাকে দিতে আমি পেনি খোঁজার ভান করে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা তোমার কি কখনও মনে হয় না যে এই শহরটাও বোধ হয় কথা বলতে পারে। এই যে প্রতিদিন কত উত্থান পতন, কত মজার কাজ কারবার আর অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে—যদি এই শহরটা কথা বলতে পারত তবে এ ব্যাপারগুলো নিয়ে কি বলত বলে তোমার মনে হয়?

ছেলেটির উত্তর, ওসব বাজে বাজে কথা ছাড়ুন, আপনি কোন কাগজটা চান তাই বলুন, সময় নষ্ট না করে। আজ ম্যাগির জন্মদিন তার জন্য উপহার কিনতে আমার ত্রিশ সেন্ট চাই।

এর কাছ থেকেও কোন সদুত্তর পেলাম না। কাগজটা ছুঁড়ে জঞ্জালে ফেলে দিলাম।

আবার পার্কে গিয়ে চাঁদের আলোয় বসলাম। ভেবে দেখলাম আমি যা চাইছি সেটা কেউ বলতে পারছে না।

হঠাৎ আলোর মত দ্রুত গতিতে জবাবটা আমার মনে এল। উঠে ছুটে গেলাম নিজের পাড়ায়। উত্তরটাকে বুকের মধ্যে চেপে রেখেছে পাছে কেউ নিয়ে নেয়।

অরেলিয়া তখনও সেখানেই দাঁড়িয়েছিল। চাঁদটা আরও ওপরে উঠে এসেছে। দ্রাক্ষালতার ছায়াটা তাকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেছে, আমি পাশে গিয়ে বসলাম। দেখলাম এক টুকরো মেঘ চাঁদের কাছে যেতেই কেমন বিবর্ণ হয়ে পড়ল।

আর তারপরেই সব বিস্ময়ের সেরা বিস্ময় সব খুশীর সেরা খুশী আমাদের অজ্ঞাতেই পরস্পরের হাত দুটো স্পর্শ করে শক্ত বন্ধনে বাঁধা পড়ল।

আধঘন্টা পরে অরেলিয়া তার নিজস্ব ভঙ্গিতে হেসে ফেলল—তুমি কি জান, ফিরে আসার পর থেকে একটাও কথা বল নি।—

মাথা নেড়ে বললাম, "সেটাই মহানগরের কণ্ঠস্বর।"

* The Voice of the City.

মনের মনে বসন্ত

এটা বিশ্বাস করা যায় না যে কোন দেবীর মৃত্যু হবে। তাহলে যে মানুষ বিশ্বাস করে যে ইষ্টাব উৎসব বেঁচে থাকে শুধু কয়েকটা নির্দিষ্ট অংশে, তাদের দেখে বসন্তের দেবী ইষ্টার নিশ্চয়ই আড়ালে হাসবেন।

তিনি তো সমগ্র পৃথিবীর দেবী।

মিঃ টাইগার ম্যাক্কুয়ার্ক একটা অস্বস্তি নিয়ে ঘুম থেকে উঠল। কেন অস্বস্তি সে তা বুঝতে পারে না। মেঝেতে ভাইরা শুয়ে আছে। সে কাঠের টুকরো সরানর মত ভাইদের সরিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল দাড়ি কাটবে বলে।

বৃদ্ধ ম্যাক্কুয়ার্ক অনেক আগে কাজে চলে গেছে। বড় ছেলে কাজে যায়নি। কারণ তার পাথর কাটা জায়গায় ধর্মঘট চলেছ।

তাকে লক্ষ্য করে তার মা বলল—'তোর কি হয়েছে রে? সকালেই মন খারাপ করে বসে আছিস কেন?' বছর দশেকের ছোট ভাই টম বলে উঠল—'ও তো সারক্ষণ এনি মারিয়া ডয়েল এর কথাই ভাবে।'

শুনে 'টাইগার' চেয়ার থেকে টমকে সরিয়ে দিল। বড় ছেলে উত্তর দিল, কেন আমি তো ভালই আছি। আমার কেমন যেন মন হচ্ছে একটা ভূমিকম্প, গানবাজনা বা ঠাণ্ডা লাগা জ্বর অথবা বনভোজন একটা কিছু হতে যাচ্ছে। ঠিক যে কেমন লাগছে তাও বুঝতে পারছিনা।

মিসেস ম্যাক্কুয়ার্ক বলল—'তোমার পাখনা গজিয়েছে। এমন একটা দিন ছিল যখন ভোরের আলোয় শিশিরের ওপর দিয়ে কেঁচোগুলোকে যেতে দেখে আমি ঠিক থাকতে পারতাম না। ওরকম হয়। একটু চা ও শেকড় বাকড় পেটে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মিঃ ম্যাক্কুয়ার্ক বলে উঠল—'চালিয়ে যাও।' এখনও বসন্তের দেখা নেই। চালের উপর এখনও বরফ। গতকাল ষষ্ঠ এভেনিউ লাইনে গাড়ী চলছে, সব দেখে মনে হচ্ছে শীতটা আরও কয়েকদিন থাকবে।

সকালে খাবার পর মিঃ ম্যাক্কুয়ার্ক আরও পনের মিনিট ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজ পোশাক ঠিক করে নিল।

কারখানা বন্ধ হওয়ার দিন থেকে এই বিশেষ বাবুটির এটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, প্রতিদিন সকালে ফ্লাহার্টি ব্রাদার্সের সেলুনে ছুটে যাবে এবং জুতো পালিশওয়ালার কাছে জুতো পালিশ করবে আর রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে যতক্ষন না ঘড়িতে বারটা বাজে আর ডিনারের সময় হয়ে যায়।

মিঃ 'টাইগার' ম্যাক্‌কুয়ার্কের সুদর্শন চেহারা খেলাধুলা ও যুদ্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত বলে শারীরিক গঠন সুন্দর। মুখটা মসৃন, সযত্ন রক্ষিত বেশবাস, সম্পন্ন মানুষের ভাবভঙ্গী, দেখতে বেশ ভালই।

কিন্তু এদিন সকালে মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক তাঁর চিরাচরিত স্থানে গেল না। একটা কিছু আছে যা তার চিন্তাকে বিঘ্নিত করছে, ইন্দ্রিয়কে বিব্রত করছে। কেমন অলস, অসন্তুষ্ট লাগছে।

বসন্তের কথা উঠলে টাইগার তার সন্ধানে চারদিকে তাকাল, সেরকম কিছুই চোখে পড়ল না। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে ইস্ট রিভার থেকে। একটা পুরনো জিনিসের দোকানে বরফের বাক্স ও বেসবল সাজানো হচ্ছে।

এই সব লক্ষণকে পাত্তা না দিয়ে টাইগার এমন একটা জিনিস দেখতে পেল যাতে মনে আশার সঞ্চার হল।

একটা বারে ঢুকে একটা গ্লাস পানীয় নিল পয়সা দিয়ে, কিন্তু চুমুক না দিয়ে রেখে দরজার কাছে চলে গেল।

বার-এর পরিবেশক ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপার কি বোলিনব্রেক? পানপাত্র কি পছন্দ হয়নি।'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াতে ম্যাক্‌কুয়ার্ক বলল, 'তুমি নিজের কাজ করগে। পানীয় মুখে দেবার ব্যাপারে আমার মত বদলে গেছে বুঝেছ, তাছাড়া তুমি তো দামটা পেয়ে গেছ।'

ঘর থেকে বেরিয়ে কিছুটা হেঁটে নাপিত লুৎস-এর দরজা দিয়ে ঢুকল। সে ও লুৎজ পুরানো বন্ধু কিন্তু বন্ধুত্ব প্রীতি সবসময় ঝগড়ার আড়ালে থাকে।

লুৎস বলে উঠল—'আরে আইরিশ বাউণ্ডুলে যে, কেমন আছ? তোমাকে দেখেই তো বুঝতে পারছি যে পুলিশের লোক ও কুকুর ধরার লোকটি এখনও তাদের কর্তব্য কর্মটি করেনি।'

মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক—'আরে ব্যাটা ওলন্দাজ তুমি কি অন্য কিছু ভাবতে পারনা।"

দরজার কাছে গিয়ে জার্মানটি বলল, বাবে! আজ তো আমার মন শুয়োরের খোঁয়াড় ছেড়ে অনেক উচুঁতে বসে আছে। বাতাসে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে যে, আমার মন বলছে পথের কাদা শুকিয়ে আর নদীর বরফ গলে বসন্তের সূচনা হয়েছে। অচিরেই এই দ্বীপে বনভোজনের ধূম পড়ে যাবে আর বীয়ারের ফোয়ারা ছুটবে।

মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক বলল—কি বলছ? বসন্তের কথা নিয়ে সবাই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো? কোথাও বসন্তের হাওয়া ঢোকেনি দ্বিতীয় এভেনিউয়ের ঘরেও না, বাইরের আবহাওয়া এক। এমনকি আমি পরেও আছি শীতবস্ত্র আর খাবার টেবিলে ঐ একই গমের কেক্।

লুৎস বলল—তোমার মনে তো দেখছি কবিতার ক-ও নেই। একথা ঠিক শীত এখনও চলে যায়নি, শহরে বসন্তের লক্ষণও নেই কিন্তু তিন শ্রেণীর মানুষ আছে যারা সকলের আগে অনুভব করতে পারে বসন্তের আগমন ; তারা হল কবির দল, প্রেমিকের দল আর বেচারি পতিহীনদের দল।

এ-সব কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে ম্যাক্‌কুয়ার্ক আবার পথে এল। একটা অভাব বোধ তাকে পেয়ে বসেছে।

দুটো ব্লক পার হতেই দেখা হল পুরনো শত্রু জনৈক কনোভার-এর সঙ্গে। তারা একটা দ্বৈতযুদ্ধের পুরনো চুক্তিতে আবদ্ধ।

মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক এর কপালে যে 'টাইগার' খেতাবটি জুটেছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সঙ্গে সঙ্গে আক্রমন করে বসল কনোভারকে। মিঃ কনোভারাও আশ্চর্য তৎপরতায় পাল্টা আক্রমন করে বসল। সে দ্বৈত যুদ্ধ যেন থামতে চায় না। চারদিকে ভিড় জমে গেল। তারা বলতে লাগল লড়াই মিটিয়ে নাও। সঙ্গে সঙ্গে দুজনই ভিড়ের ভিতর দিয়ে পালিয়ে গেল। মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক ছুটতে ছুটতে বড় রাস্তায় পড়ল। একটা ল্যাম্প পোষ্টের কাছে গিয়ে কি ভেবে একটা খবরের কাগজের দোকানে ঢুকে পড়ল। একটি মেয়ে কাউন্টারের ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক তাকে জিজ্ঞাসা করল—'আচ্ছা মহাশয়, এই গানটা আছে, এমন কোন গানের বই কি এখানে পাব? গানটা এইভাবে শুরু হয়েছে—

'যবে বসন্ত আসবে ফিরে প্রিয়ে

আমরা তখন বেরিয়ে পড়ব মাঠে,

গাইব সুখে পুরানো দিনের গান—

"আমার এক বন্ধু পা ভেঙে বিছানায় পড়ে আছে, সেই আমাকে বইটার জন্য পাঠিয়েছে। সে গান ও কবিতার বড় ভক্ত।"

মেয়েটি বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিল, "না সে রকম কোন বই আমাদের কাছে নেই। তবে একটা গান বেরিয়েছে—যার শুরুটা এইরকম। —

"এস আমরা পুরানো হাতল চেয়ারটায় বসি,

সেখানে চুল্লিতে আগুন জ্বলছে,

তাতে আমরা বেশ আরাম পাব।"

শেষ পর্যন্ত সে এনি মারিয়া ডয়েলের দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ল। মনে হল দেবী-ইষ্টার এতক্ষনে তাকে ঠিক পথে নিয়ে এসেছে।

দরজা খুলেই হাসি মুখে বলে উঠল—'আরে মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক তুমি? (কখনও টাইগার বলে ডাকেনা); তারপর কি খবর?"

চল ঘরে চল। সমতলের আবহাওয়া সম্পর্কে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই।

—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

—তা বোধহয় হয়েছে। সারাটা দিন সকলে আমাকে বলেছে যে বাতাসে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। তারপর সকলেই কি মিথ্যাবাদী না আমি মিথ্যাবাদী।

—বল কি গো! তোমার চোখে পড়েনি? আমার তো মনে হচ্ছে ভায়োলট ফুলের গন্ধ পাচ্ছি। আর ঘাসের রঙ কত সবুজ। অবশ্য এটা এক ধরনের অনুভূতি মাত্র।

—আমি সেটাই জানতে চাইছি। সেরকম একটা অনুভূতি আমারও হয়েছে। প্রথমে আমি সেটা বুঝতে পারিনি,সেদিন ১৪নং স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়েছিল,তখন ভাবলাম মনের ভুল। কিন্তু ভায়োলট ফুলের গন্ধ নাকে আসেনি,সে অনুভূতি কেবল তোমার জন্য

মারিয়া আর তোমাকেই আমার চাই। সামনের সপ্তাহে থেকে আমি উপার্জনশীল হব। দৈনিক আট ডলার তাতে আমাদের দুজনের হবে না, ভেবে দেখ।

হঠাৎ ওভারকোটে মুখ ঢেকে মারিয়া বলল—জিমি তুমি কি দেখতে পাচ্ছনা এই মুহূর্তে বসন্ত ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে।

বসন্তের এত সব শুভ সূচনা সত্ত্বেও বিকেলের বাতাস যেন ঠাণ্ডায় জমে গেল। এমনকি শেষ মার্চেও এক ইঞ্চি পুরু বরফ পড়ল। পঞ্চম এভেনিউয়ে মহিলারা লোমের কোট গায়ে জড়াল, কেবল ফুলওয়ালারা দেবী ইস্টারের আগমনে উল্লসিত।

সন্ধ্যার সময় দোকান বন্ধ করতে যাবে লুৎস-এর কানে এল পরিচিত কণ্ঠের ডাক। হ্যালো! ব্যাটা ওলন্দাজ!

বরফ ঝড়ের মধ্যেই 'টাইগার' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কালো চুরুটের ধোয়া ছাড়ছে।

লুৎস চেঁচিয়ে উঠল—কি ঝড়রে বাবা! শীতকালটাই আবার ফিরে এসেছে দেখছি।

উদার গলায় ম্যাক্কুয়ার্ক বলল—"তুমি একটা ডাহা মিথ্যুক ব্যাটা। ঘড়ি তো বলছে 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।'

* The Easter of the Soul

মহানগরের পরাজয়

রবার্ট ওয়াম্‌স্‌লির মহানগরে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঘটল একটা 'কিককেনি' সংগ্রাম। সংগ্রামে জয়ী হয়ে সে পেল অর্থ খ্যাতি। অপরদিকে মহানগরের ছাপ পড়ে গেল তার গায়ে। মহানগরের ছাঁচে তৈরী হয়ে গেল সে। পোশাকে, অভ্যাসে, চাল-চলনে, প্রাদেশিকতায়, কর্মসূচীতে সবেতে অর্জন করল মনোহারী ঔদ্ধত্য, বিরক্তিকর পরিপূর্ণতা, বিদগ্ধ স্থূলতা, ভারসাম্যহীন ভঙ্গী যা এক ভদ্রলোককে তার মহত্ব সত্ত্বেও ছোট করে রাখে।

ছয় বছর আগে যে অঞ্চলে সে বড় হচ্ছিল সেই অঞ্চলের মানুষ আজ তাকে গর্বের সঙ্গে নিজেদের দেশের সন্তান বলে দাবী করল। এই অঞ্চলের একটা খামার বাড়িতে 'বব' নামে একটি ছেলে পা বাড়িয়েছিল শহরের লাঞ্চ কাউন্টারের দিকে। আর এখন কোন খুনের মামলার বিচার, কোচিং, পার্টি, মোটর দুর্ঘটনা বা নৃত্যানুষ্ঠান হয়নি যেখানে রবার্ট ওয়াম্‌স্‌লির নাম উচ্চারিত হয়নি। দর্জিরা পথে অপেক্ষা করে থাকত তার পোশাকের ছাট দেখার জন্য। বড় বড় ক্লাবের ছেলেরা, বড় পরিবারের ছেলেরা তার সঙ্গে মেলমেশা করতে পারলে খুশীই হত।

এলিসিয়া ভ্যানডারপুলকে বিবহ করে তার সাফল্য চরম শিখরে পৌঁছে গেল। সমাজের উপরতলার মানুষেরা তাদেব আপ্যায়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। স্ত্রীর গর্বে গর্বিত রবার্ট।

একদিন রবার্টের মার লেখা চিঠি এলিসিয়া দেখতে পেল। একটি পাণ্ডিত্যহীন চিঠি। ফসল। মাতৃস্নেহ ও খামরের কথায় ভরা। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে শূকর ছানার স্বাস্থ্য, সদ্যোজাত বাছুরের খবর, সেই সঙ্গে রয়েছে রবার্টের কুশল জানাতে চাওয়ার খবর। চিঠিতে দেশের মাটির গন্ধ, বাড়ির সুবাস মৌমাছিদের জীবন বৃত্তান্ত। দুঃখী বাবা-মার কথা ভরে রয়েছে।

এলিসিয়া জিজ্ঞাসা করল—তোমার মার চিঠিগুলো ফেরাওনি কেন? তোমার মা আমাদের একবার খামারটা দেখে আসতে বলেছেন। আমি কখনও খামার দেখিনি। চলনা রবার্ট দু এক সপ্তাহের জন্য সেখান থেকে একবার ঘুরে আসি।

রবার্ট বলল—বেশ তো যাব। তোমার কাছে প্রস্তাবটি আগে করিনি কারণ আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো যেতে চাইবে না। তুমি নিজের থেকে যেতে চাইছ শুনে খুশী হলাম।

এলিসিয়া—আমি নিজেই তাকে লিখে জানাচ্ছি। ফেলিস, এখনই আমার ট্রাঙ্কগুলো গুছিয়ে রাখুক। সাতটা হলেই চলে যাবো। তোমার মা অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করবে বলে মনে হয় না। তিনি কি পার্টি দেন?

এক সপ্তাহ পরে শহর থেকে পাঁচ ঘন্টা দূরের পথ একটা ছোট্ট গ্রাম্য স্টেশনে ট্রেন থামল। এক রসিক যুবক একটা খচ্চরে টানা মালগাড়ি নিয়ে এস দাঁড়িয়ে আছে তাদের নিয়ে যাবার জন্য। ট্রেন থামতেই রবার্টের নাম ধরে বিশ্রীভাবে ডাকতে লাগল।

রবার্ট দেখতে পেয়ে বলল—হ্যালো মিঃ ওয়াম্‌ম্লি। শেষ পর্যন্ত বাড়ির পথটা চিনতে পেরেছে? তোমার জন্য গাড়িটা আনতে পারিনি বলে দুঃখিত। ভাল পোশাকও পরে আসিনি।

ভাইয়ের হাতটা চেপে ধরে রবার্ট বলল—খুব ভাল লাগছে তোমাকে দেখে টম। হ্যাঁ শেষপর্যন্ত বাড়ীর পথটা খুঁজে পেয়েছি। দুবছরের বেশী হয়ে গেল এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এখন থেকে মাঝে মাঝেই আসব।

বাড়ীব দিকে গাড়ী ছুটে চলল। পড়ন্ত বিকেলে সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়েছে গমে ভর্তি মাঠের উপর। শহর এখান থেকে অনেক দূরে। সরল ফিতের মত রাস্তাটা একে বেঁকে পাহাড় ও সমতলের উপর দিয়ে চলে গেছে। ক্রমে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে খামার বাড়ী দেখা গেল। সারিবদ্ধ বাদাম গাছের ভিতর দিয়ে লম্বা গলিটা রাস্তা থেকে বাড়ি পর্যন্ত চলে গেছে। বুনো গোলাপ ও ভেজা উইলো ফুলের গন্ধ নাকে এসে লাগছে। অদ্ভুত অনুভূতি হল রবার্টের। মনে হল মাটি, গাছপালা সবাই যেন অন্তর থেকে স্বাগত জানাচ্ছে তাকে। যেন বলছে—'শেষ পর্যন্ত তুমি বাড়ীর পথ চিনতে পেরেছ।'

সে শুনতে পাচ্ছে পুরনো কণ্ঠস্বর, সকলেই যেন তার উদাসীন কিশোর কালের পুরনো ভাষায় তাকে ডাকছে। প্রাণশক্তিহীন পাথর , রেল-লোহার ফটক, লাঙল, ছাদ ও পথের মোড়গুলিও যেন মুখর হয়ে উঠেছে। সারা দেশটা হাসছে। তাদের নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে তার দেহে, তার মন চলে এসেছে শহর থেকে বহু দূরে পুরনো প্রিয়জনের কাছে।

তার এই পল্লী-লোলুপতা যেন তাকে পেয়ে বসল। একটা আশ্চর্য জিনিস নজরে এল, এলিসিয়া তার পাশে বসে আছে অথচ যেন তাকে অপরিচিতা লাগছে। এই পরিবেশে সে নতুন লোক। আগে কখনও তাকে বহু দুঃখের মানুষ মনে হয়নি-সে যেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে।

রাত্রে কুশল সংবাদের পালা সেই সঙ্গে খাওয়া দাওয়া শেষ হলে সবাই এসে বসল বাড়ীর বারান্দায়। এমনকি তাদের কুকুর বাঘাও। এলিসিয়া এল নীরবে, এসে বসল। রবার্টের মা তার সঙ্গে মনের সুখে গল্প জুড়ে দিলেন। টম বসেছে সিঁড়িতে, দুই বোন মিলি ও পম বসেছে জোনাকি ধরবে বলে নীচের ধাপের সিঁড়িতে, মা উলোর দোলনায়। বাবা একটা হাতল ভাঙা আরাম কেদারায়। রবার্টের মন চলে গেছে অতীত স্মৃতির রাজ্যে, মনে উদ্দাম দোলা।

বাবার মুখে পাইপটা নেই। রবার্ট পাইপ এনে ধরিয়ে দিল, পা থেকে ভারী বুট খুলে দিল। এমনকি কোট ও বেল্টও। টমকে নিয়ে হুড়োহুড়ি শুরু করে দিল। তারপর পুরনো নিগ্রো চাকর আইচাচাকে ধরে নিয়ে এল গান শোনাবার জন্য। ব্যাঞ্জোর তালে তালে নাচতে লাগল সে। আধ ঘন্টা ধরে চলল সে নাচ। হৈচৈ বাধিয়ে দিল। গান গাইল, এমন সব গল্প বলতে লাগল যে একজন ছাড়া অন্য সবাই হেসে অস্থির। তার রক্তে যে পুরনো জীবনের-স্রোত বইছে তাতে যেন লেগেছে দুরন্ত জোয়ারের টান।

অতি উৎসাহে সে এত উশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল যে তার মা শান্ত গলায় তিরস্কার করল।

এলিসিয়া সারাক্ষণ বসে রইল সন্ধ্যার অন্ধকারে, অনড় অচল। কেউ তাকে প্রশ্নও করল না কিছু জানতে চাইল না।

কিছুক্ষণ পরে এলিসিয়া উপরে নিজের ঘরে উঠে যাবার অনুমতি চাইল, বলল—ক্লান্ত বোধ করছে। রবার্টের পাশ দিয়েই চলে গেল। রবার্ট দরজায় দাঁড়িয়ে আলুথালু চেহারা নিয়ে। যার সঙ্গে শহরের ওয়াম্‌মলিব মিল নেই।

এলিসিয়া তাকে পাশ কাটিয়ে যেতেই তার চমক ভাঙল। তার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। আর কোন তামাসা না করে কিছু কথাবার্তা বলে নিজেও ওপরে উঠে গেল।

ঘরে ঢুকে দেখে এলিসিয়া জানলার পাশে দাঁড়িয়ে রবার্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জানলার কাছে গেল। ভাগ্যের মুখোমুখি হতে সে প্রস্তুত। একজন স্বীকৃত ইতর-ধনীলোক হিসেবে সে আগেই বুঝতে পেরেছিল ধীর স্থির এই শ্বেত বসনা মূর্তি কি রায় দেবে। একজন ভ্যান-ডারপুল কি কঠিন রেখা টানবে তাও জানা। নিজেই নিজের মুখোশটি খুলে ফেলেছে। মহানগর তাকে যা কিছু দিয়েছিল-একটা মার্জিত ভাব, গাম্ভীর্য, এক নতুন রূপ তা ঝোড়ো হাওয়ায় খসে পড়েছে।

বিচারকের শান্ত শীতল কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল—রবার্ট আমি ভেবেছিলাম একজন ভদ্রলোককে বিয়ে করেছি।

রবার্টের মনে হল আগের মত জানালার ঐ পলাশ গাছটার ডাল ধরে উঠে যেতে। সে ভাবল কত ফুল ফুটেছে—চল্লিশ লক্ষ? কিন্তু আবার সেই স্বর—আমি ভেবেছিলাম একজন ভদ্রলোককে বিয়ে করেছি। কিন্তু—

সে যেন পাশে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু এখন দেখছি আমি বিয়ে করেছি তার চাইতে ভাল একজন মানুষকে—ত্বর, প্রিয় আমার, আমাকে চুম্বন কর?

—একি এলিসিয়া!

মহানগর তখন ধীরে ধীরে আরও দুরে সরে যাচ্ছে।

* The Defeat of the City

ম্যাডিসন স্কোয়ারের আরব্য রজনী

কারসন চার্মাস এর কাছে সন্ধ্যাবেলার ডাক-এ আসা চিঠিগুলো দিয়ে গেল ফিলিপস্। গতানুগতিক চিঠি ছাড়াও দুটি চিঠিতে বিদেশী ডাকঘরের ছাপ মারা ছিল।

একটা চিঠির ভিতর মেয়ের ফটোগ্রাফ, অন্য চিঠিটা বেশ বড়, অনেকক্ষন ধরে চিঠিটা পড়লেন চার্মাস। একটা মেয়ের লেখা, যেন মধুতে মাখান বিষের বড়ি। যে ফটোটা এসেছে তারই সম্বন্ধে লেখা অনেক বাঁকা কথা।

চিঠিটাকে ছিঁড়ে ফেলে পায়চারি করতে লাগলেন। জঙ্গলের জন্তুকে খাঁচায় বন্দী করলে যেমন ছটফট করে তেমনি সন্দেহের খাঁচায় বন্দী চামার্স। ক্রমে ক্রমে তার চঞ্চলতা কেটে গেল।

ফিলিপস ঘরে ঢুকল, যেন জিনের মত আর্বিভূত হল। জিজ্ঞাসা করল—'রাতের খাবারটা এখানেই খাবেন, না বাইরে?

এখানেই খাব আধ ঘন্টার মধ্যে। —চামার্স বলল। ফিলিপ্স্ চলে যাচ্ছিল তাকে ডেকে চামার্স বলল, 'দাঁড়াও আমি যখন বাড়ী ফিরছিলাম তখন দেখলাম অনেক মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। একটা লোক কোন কিছুর ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ওখানে কি হয়েছে?'

ফিলিপস্—ওদের চালচুলো কিছু নেই স্যার। বাক্সের ওপর দাঁড়ানো লোকটা রাতের থাকবার মত ব্যাবস্থা করছে। এখানে আসে ওর কথা শুনতে। লোকগুলো কিছু টাকা পয়সাও পায়। ওই টাকায় যে কজনের থাকার ব্যবস্থা করা যায় তাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। সেই আশাতেই সকলে দাঁড়িয়ে থাকে। যে আগে আসে সেই আগে পাবে।

চার্মাস—"আমার রাতের খাবার যখন দেবে তখন ওদের ভিতর থেকে একজনকে এখানে ডেকে নিয়ে এস। সে আমার সঙ্গে বসে খাবে।"

ফিলিপস্ চাকরী জীবনে এই প্রথম আমতা করে কথা বলল—কা -কা কাকে?

—যাকে ইচ্ছা ধরে নিয়ে এস। কেবল খেয়াল রেখ লোকটা যেন ভদ্রগোছের হয়।

মেজাজটাকে একটু হাল্কা করতে, একঘেয়েমি কাটাতে দরকার হয়ে পড়েছিল চড়া মাপের অন্য কিছু।

আধ ঘন্টার মধ্যে ফিলিপস্ তার কাজটা শেষ করে ফেলল। টেবিলে সাজান হল দুজনের খাদ্য সামগ্রী।

ফিলিপস্ আশ্রয় প্রার্থী ভিখারিদের লাইন থেকে তুলে আনল এক শীতার্ত অতিথিকে, তাকে এমন অভ্যর্থনা জানাল যে সে একজন ধর্মগুরু।

কিছুক্ষন আগে তার হাত মুখ ধুয়ে দেওয়া হয়েছে। মোমবাতির আলোয় তাকে লাগছে একটা বেমানান মূর্তির মত। মুখটা রোগাটে,ফ্যাকাসে কলারটা চোখ পর্যন্ত দেওয়া। জট বাঁধা

বাদামী চুলগুলো বাগ মানান যায়নি চিরুনিতে। চোখে ক্ষোভ আর হতাশা। গোল খাবার টেবিল থেকে চামার্স উঠে দাঁড়ালে, তার কোন ভাবান্তর হল না।

গৃহকর্তা বললেন—তুমি যদি অনুমতি কর তো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ডিনার খেতে শুরু করি।

অতিথিটি কর্কশ গলায় বলল, 'আমার নাম প্লুমার। আপনি যদি মানুষ হন তাহলে ডিনার খাবার আগে নামটা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন।'

চামার্স—আমি বলতেই যাচ্ছিলাম যে আমার নাম চামার্স।

ফিলিপস্ যাতে চেয়ারটা ঠেলে দিতে পারে সেই জন্য প্লুমার তার হাঁটুটা ভাঙল। দেখে মনে হল এধরনের আদব কায়দায় সে অভ্যস্ত।

প্লুমার—খুব ভাল! নানা রকমের খাবার আয়োজন করা হয়েছে কি বলেন? আপনিই আমার প্রথম খলিফা যার সঙ্গে প্রাচ্য রীতির কায়াদায় খাদ্য গ্রহণ করার সৌভাগ্য হল। আব আমি কিনা লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। আজ রাতের মত একটা বিছানা পাবার সম্ভাবনা ততটুকুই ছিল যতটুকু পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হবার। আমার জীবনের দুঃখের কাহিনী কিভাবে শুনতে চান? প্রতিটা পদ পরিবেশনের মাঝে মাঝে না ভোজনান্তে।

চামার্স—মনে হচ্ছে এ ধরনের ঘটনা তোমার জীবনে প্রথম নয়।

অতিথি জবাব দিল পয়গম্বরের দোহাই, না। বাগদাদে যেমন মাছির অভাব নেই তেমনি নিউইয়র্কেও দেখছি হারুণ-অল্‌রশিদ্-এ ঠাসা। অন্তত বিশ দিন আমাকে খাওয়ান হয়েছে আমার কাহিনী শোনাবার জন্য। নিউইয়র্কে আপনি এমন কাউকে পাবেন না যে কিছু না নিয়ে আপনাকে কিছু দেবে। কৌতুহল ও কর্তব্য এখানে পাশাপাশি চলে। অনেকেই দু একটা কিছু খাইয়ে. শুনে নেবে পুরো আত্মজীবনী। একেবারে পাদটীকা সমেত। আরে বাবা পাতাল রেলের ছোট্ট স্টেশন বাগদাদে কেউ আমাকে খেতে ডাকলে খাবারের দাম হিসাবে স্থির করে নিই কেমন গল্পটা বলতে হবে। অবশ্যই বানান। প্রথমেই বলি যে আমি পরলোকগত টমি টাকার-এর উত্তরসূরী যিনি একদা খাবারের বিনিময়ে সুর বেচে দিয়েছিলেন।

চামার্স—আমি তোমার গল্প শুনতে চাই না। তোমাকে পরিষ্কার বলছি যে একটা আকস্মিক খেয়ালের বশেই আমার সঙ্গে বসে রাতের-খাবরটা খাবার জন্য একজন অচেনা মানুষকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। আমি কথা দিচ্ছি আমার কৌতূহল মেটাতে কোনরকম কষ্ট করতে হবে না তোমাকে।

লোকটি-কি ছাইপাস বলছেন, আমি ওতে কিছুই মনে করিনা। খলিফারা যখন পথে নামেন তখন আমিও হয়ে যাই একখানি প্রাচ্য পত্রিকা—মলাটটা লাল আর পাতাগুলো কাটা। এই পৃথিবীতে আমাদের এত দুরবস্থা কেন সে কথা অনেকেই জানতে চান। একটা স্যাণ্ডউইচ ও এক গ্লাস বীয়ার যারা খাওয়ায় তাদের বলি মদের জন্যে এই অবস্থা হয়েছে, যারা গো মাংস, বাঁধাকপি ও কফি খাওয়ায়, তাদের শোনাই অত্যাচারী জমিদারের কাহিনী, ছয় মাস হাসপাতালে থাকার ও চাকরী হারাবার কাহিনী। মাংস ও বিছানা দিলে শোনাই 'ওয়াল স্ট্রীটে' ভাগ্য বিপর্যয় ও দুর্দিনের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত পতনের কাহিনী। এরকম বিধি ব্যবস্থা এই প্রথম কপালে জুটল। মিঃ চামার্স আপনি যদি শুনতে চান তো আপনাকে আমি সত্যি কথাই বলব। বানান গল্পের চাইতে এ গল্প বিশ্বাস করা কঠিন হবে।

এক ঘন্টা পরে আরবি অতিথিটি খেয়েদেয়ে আরাম করে হেলান দিয়ে বসল।

বিচিত্র হাসি হেসে লোকটি শুধোল—'আপনি কখনও শেরার্ড প্লুমার এর নাম শুনেছেন?

চামার্স—'নামটা চেনা চেনা লাগছে। আমার ধারনা তিনি ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী। কয়েক বছর আগেও খুব নাম ডাক ছিল।

অতিথি—পাঁচ বছর আগে, তারপরই আমি তলিয়ে গেলাম। আমিই সেই চিত্রশিল্পী। শেষ ছবিটা বেচেছিলাম ২০০০ ডলার দামে। তারপর থেকে বিশ পয়সায় কেউ আমাকে দিয়ে ছবি আঁকাতে চায়নি।

—এরকমটা ঘটল কেন?

—হাস্যকর ব্যাপার। আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারিনি কিছুদিন। ভেবেছিলাম, আমাকে ঘিরে ভিড় যেন উপচে পড়ছে, একটার পর একটা কাজ পেতে লাগলাম। খবরের কাগজেও প্রশংসা ছাপা হচ্ছে। তার পরই আজব ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করল। একটা ছবি আঁকলেই লোকে সেটা দেখতে আসত আর ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলত।

অচিরেই বুঝতে পারলাম আসল গোলমালটা কোথায়। আমার ক্রমশ একটা সহজাত ক্ষমতা তৈরী হল যার ফলে কারও ছবি আঁকতে বসলেই চরিত্রের গোপন কথাটা আমার ছবিতে প্রকাশ হয়ে পড়ত। এটা কেমন করে হত আমি জানতাম না। তবে ব্যাপারটা যে ঘটছে এটা বুঝতে পারতাম। যারা ছবি আঁকাতে আসতেন তারা চটে যেতেন আর ছবিটা নিতেন না। একদিন অতীব সুন্দরী মহিলার প্রতিকৃতি এঁকেছিলাম। আঁকা শেষ হলে তার স্বামী ছবিটা দেখতে এলেন। এক নজর দেখেই তাঁর মুখে পরিবর্তন দেখা দিল। এক সপ্তাহের মধ্যেই বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করে বসলেন।

একজন ব্যাঙ্ক মালিকের কথা মনে পড়ছে, তিনিও নিজের প্রতিকৃতি আঁকাতে এসেছিলেন। ছবিটা আঁকা শেষ হলে প্রকাশ্যে সেটা টাঙিয়ে রাখলাম। এক পরিচিত লোক এসেসেটি দেখলেন, দেখেই বলে উঠলেন রক্ষা করুণ তিনি কি সত্যই এই রকম দেখতে? আমি বললাম হুবহু তাকেই তো এঁকেছি। তিনি বললেন—তার চোখে তো এরকম ভাব আগে দেখিনি। এখন ভাবছি শহরে গিয়ে আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তুলে নেব। শহরে তিনি ঠিকই গিয়েছিলেন কিন্তু ব্যাঙ্ক আকাউন্ট অগাধ জলে আর মালিক উধাও।

আমার ব্যবসা লাটে উঠতে বেশী দিন লাগল না। নিজের গোপন রূপ ছবিতে ফুটুক কেউ তা চায় না। তারা হাসি দিয়ে ও মুখ বেঁকিয়ে আপনাকে ঠকাতে পারে কিন্তু ছবি তা পারে না। তারপর ছবি আঁকার একটা বরাতও পেলাম না। বাধ্য হয়ে ও কাজ ছেড়ে দিলাম। কিছুদিন একটা সংবাদপত্রে শিল্পীর কাজ করলাম, একজন লিথোগ্রাফার হলাম। কিন্তু সেখানেও একই অবস্থা। যদি কোন ফোটগ্রাফ থেকে ছবি আঁকি তবে এমন সব বৈশিষ্ট্য ও ভাব ফুটে ওঠে যা মূল ফটোতে নেই। আমার খদ্দেররা হৈহৈ করে উঠল। বিশেষত মেয়েরা। অতএব চাকরীটাও গেল। আর সুরাদেবীর বুকে আশ্রয় নিলাম। তারপর এই দলে ভিড়ে গেলাম, আর মুখে যতসব বাজে গল্প ছড়ালাম। আপনি কি শুনে ক্লান্তি বোধ করছেন, আপনি যদি চান তো ওয়াল স্ট্রীটের ঘটনাও শোনাতে পারি তবে দুচোখে জল আনতে হবে।

চামার্স—না, না তোমার কথাগুলো ভাল লাগছে। আচ্ছা তোমার আঁকা প্রতিকৃতিতে কি অপ্রীতিকৃত বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠত না কিছু প্রতিকৃতি তুলির নির্মমতা থেকে রেহাই পেয়ে যেত?

প্লুমার—কিছু কিছু ? তা পেত। সাধারনভাবে শিশুরা, অনেক নারী, বেশ কিছু পুরুষও। সব মানুষই যে খারাপ নয় সেটা তো আপনিও জানেন। যেখানে মানুষ ভাল সেখানে ছবিও ভাল হয়। আগেই বলেছি আমি ঠিক বোঝাতে পারি না তবে সত্যি কথাই বলেছি।

চামার্স সেদিনের ডাকে যে ফটোটা এসেছিল তাকে সেটা দিয়ে বলল একটা স্কেচ করে দিতে। এক ঘন্টা পরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হয়ে গেছে। সময়টা বেশী লাগল বলে ক্ষমা করবেন। জানেন তো কাল রাতে ঘুমাইনি, মনে হচ্ছে এবার আমাকে বিদায় নিতে হবে।

চামার্স দরজা পর্যন্ত গিয়ে হাতে কয়েকটা বিল ধরিয়ে দিলেন।

"ও হো এগুলো তো নেবই" প্লুমার বলল। এ সবই তো পতনের লক্ষন, ধন্যবাদ। এত ভাল ভোজটার জন্যও। আজ রাতে পালকের বিছানায় শুয়ে বাগদাদের স্বপ্ন দেখব। আশাকরি সকাল হলে এটাও স্বপ্ন হয়ে যাবে না। বিদায় মহমান্য খলিফা।

পুনরায় চামার্স পায়চারি করতে লাগলেন। কিন্তু প্যাস্টেলে আঁকা স্কেচটা ছিল টেবিলের ওপর। দুবার তিনবার চেষ্টা করলেন ছবিটার কাছে যেতে কিন্তু পারলেন না।

ছবিটার পিঙ্গল. সোনালী ও বাদামী রঙগুলো তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু কোথা থেকে ভয়ের এক দেওয়াল এসে ছবি থেকে তাকে অনেক দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

তিনি শান্ত হবার চেষ্টা করলেন। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ঘন্টা বাজিয়ে ফিলিপস্‌কে ডাকলেন।

বললেন—এই বাড়ীতে একজন তরুণ শিল্পী থাকেন মিঃ রেইনেমান। সে কোন ঘরে থাকে তুমি জান?

—একেবারে ওপর তলায় স্যার।

—উপরে যাও তাকে বলো একবার অনুগ্রহ করে এখানে আসতে।

রেইনেমান নেমে এলেন। চামার্স নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, মিঃ রেইনেমান ওদিককার টেবিলে একটা স্কেচ আছে। শিল্পগত গুন এবং ছবি হিসাবে তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনার মতামত যদি আমাকে বলেন তাহলে খুশী হব।

তখন শিল্পী এগিয়ে গেলেন।

চামার্স চেয়ার হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কেমন লাগছে।

শিল্পী—ড্রয়িং হিসাবে খুবই প্রশংসনীয়, খুব পাকা হাতের কাজ। সাহসী, নিপুন ও বাস্তব, আমাকে কিছুটা ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। অনেক বছর পরে এরকম প্যাস্টেলের কাজ দেখলাম।

—মুখটা-লোকটি-বিষয়বস্তু মূল ফটোটা সে সম্পর্কে কি বলেন?

রেইনেমান—মুখখানিতে তো ঈশ্বরের প্রিয় দেবদূতের একজনের মুখ বসান। মুখটা কার জানতে পারি কি?

"আমার স্ত্রীর" চামার্স চিৎকার করে উঠলেন। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে শিল্পীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতটা চেপে ধরে বললনে—'আমার স্ত্রী এখন ইওরোপ ভ্রমনে গেছেন। এই স্কেচটা নিয়ে যান, ওটা দেখে আপনার শ্রেষ্ঠ ছবিটা আঁকুন, আর দামের ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন।

* A Madison Square Arabian Night

মেয়েলি কাণ্ডকারখানা

রবিন্স ও দুমার্স পরস্পরে ঘনিষ্ট বন্ধু, অনেক উত্থান ও পতনের মধ্যে একসঙ্গে কাটিয়ে তারা সেটা প্রমাণ করেছে। প্রথমজন প্রতিবেদক 'পিকায়ুন'-এর অন্যজন শতাব্দী কালের পুরনো সংবাদপত্র 'লা আবিল' এর প্রতিবেদক। তারা বসেছিল মাদান তিবোল্ত এর দুমাই স্ট্রীটের ছোট কাফেতে। জায়গাটা যদি পরিচিত হয় তাহলে তার স্মৃতি রোমন্থন করলে একটা সুখের আবেশ অনুভব করবেন। কাফেটা ছোট অন্ধকার, ছোট ছোট পালিশ করা টেবিল দিয়ে সাজান। সেখানে বসে নিউ অর্লিয়েন্সের সেরা কফিটি খেতে পারেন। মাদান তিবোল্ত কাউন্টারে বসেন আর মাদামের দুই বোনঝি নিকোলেৎ ও মিমি মনোরম অ্যাপ্রন পরে পানীয় পরিবেশন করে।

একরাশ ধোয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে দুমার্স সোমরস পান করছিল। রবিন্স সকালের 'পিক' এ চোখ বোলাচ্ছিল। বিজ্ঞাপনের কলমে একটা খবর দেখে আগ্রহে চড়া গলায় সেটা বন্ধুকে পড়ে শোনাতে লাগল।

প্রকাশ্য নিলাম; আজ অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় বনহোস্ স্ট্রীটের ভগ্নিসম্প্রদায়ের ভবনে 'লিটল সিষ্টার্স অব সামরিয়া'র সব সম্পত্তি সর্বোচ্চ করদাতার নিকট বিক্রয় করা হবে। সেই সেল-এ বাড়ি, জমি এবং বাসভবন ও গির্জার আসবাবপত্র সব কিছুই বিক্রয় করা হবে।

এই বিজ্ঞাপনটি দেখে দুই বন্ধুর মনে পড়ে গেল দু বছর আগের সাংবদিক জীবনের একটি ঘটনা সম্পর্কিত কিছু কথা। ঘটনাগুলি স্মরন করতে গিয়ে মহাকাল ইতিমধ্যে যে সব পরিবর্তন এনেছে পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাকে নিয়ে তারা আলোচনা শুরু করল।

কাফেতে কোন খদ্দের ছিল না। মাদামের সূক্ষ্ম কানে তাদের আলোচনা পৌঁছে গেল। আর সেও তাদের টেবিলে গিয়ে বসে পড়ল। কারণ তার হারান অর্থ বিশ হাজার ডলার থেকেই ঘটনার সূত্রপাত।

সেই পরিত্যক্ত রহস্য নিয়ে তিনজন মেতে উঠল। 'লিটল সিষ্টার্স অব সামারিয়া'র এই ভবনের এই গীর্জাতেই তো রবিন্স ও দুমার্স দাড়িয়েছিল সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। আর চোখে পড়েছিল কুমারী মেরীর সোনালী মূর্তিটার দিকে।

'ঠিক তাই বাছারা'—আলোচনার উপসংহারে মাদাম বললেন। এই রকম দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ ছিলেন মসিয়েঁ মোরোঁ। নিরাপদে রাখার জন্য যে টাকা আমি তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম সেটা তিনি চুরি করেছিলেন সে বিষয়ে নিশ্চিত। হ্যাঁ যে ভাবেই হোক টাকাটা তিনি খরচ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দুমার্সের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—আমি জানি মসিয়েঁ দুমার্স ঐ সময় আপনি আমাকে বলেছিলেন মসিয়েঁ মোরো সম্পর্কে আমি যা কিছু জানি সব যেন বলে দিই। হ্যাঁ সত্যি আমি জানি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ সব লোক যখন টাকা পয়সা হারায় তখনই আপনারা বলেন 'চেসেজ লা ফেমি'। অর্থাৎ কোথাও না কোথাও মেয়ে মানুষ আছেই; কিন্তু মসিয়েঁ মোরোঁ সে ধরনের লোক নন। তিনি ছিলেন সাধু প্রকৃতির। মসিয়েঁ দুমার্স,

তোমরা তো কুমারী মেরীর ঐ মূর্তির ভিতরেই টাকাটা পাবার চেষ্টা করতে পার, কারণ সেসব ব্যাপারেও মসিয়েঁ মোরোঁ হাজির ছিলেন, আরও চেষ্টা করে দেখতে পার সেখানেও কোন মেয়ে মানুষের হাত আছে কিনা।"

মাদাম তিবোল্‌ত-এর শেষের কথাগুলি কানে আসতেই রবিন্স চমকে উঠে দুমার্সের দিকে তাকাল। সঙ্গীটির কোন ভাবান্তর নেই।

সকাল নটায় দুই বন্ধু কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে ততক্ষণ মাদাম তিবোল্‌ত এবং উধাও হয়ে যাওয়া ডলারের কাহিনী সংক্ষিপ্ত ভাবে জানা যাক—

নিউ অর্লিয়েন্সের লোকেরা সহজেই স্মরণ করতে পারবে সেই শহরেই মিঃ মেরিন-এর মৃত্যুর সময়কার ঘটনাবলীর কথা। তিনি ছিলেন ফরাসী অঞ্চলের এক স্বর্নশিল্পী ও মনিমুক্তা বিক্রেতা। তিনি ছিলেন ফরাসী বংশের সন্তান। প্রত্নতাত্বিক ও ঐতিহাসিক হিসাবে তার খ্যাতি ছিল। তিনি ছিলেন অকৃতদার, বয়স পঞ্চাশ বছরের মত। লোকে তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত। রয়াল স্ট্রীটের বিরল বাসাতে আরামে নির্জনে বাস করতেন। একদিন দেখা গেল নিজের বাড়ীতেই অজ্ঞাত কারণে মারা গেছেন। তাঁর বিষয় সম্পত্তির খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল তিনি প্রায় দেউলে হবার অবস্থায় ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি দিয়ে কোন রকমে ধার দেনটা শোধ করা যেতে পারে। তার পরে জানা গেল মরিন পরিবারের প্রাক্তন প্রধান চাকরানী জনৈক মাদাম তিবোল্‌ত-এর বিশ হাজার ডলার তার কাছে গচ্ছিত রাখা ছিল। আর টাকাটা মাদাম পেয়েছিলেন তার উত্তরাধিকার সূত্রে।

বান্ধবান্ধব ও আইন বিভাগের কেউই টাকাটা খুঁজে পেল না। টাকাটা উধাও হয়ে গেছে কোন চিহ্ন না রেখে। মাদামের কথা মত টাকার নিরাপদ বিনিয়োগের জন্য তিনি যে ব্যাঙ্কে সেটি রেখেছিলেন সেখান থেকে মিঃ মরিন সম্পূর্ণ টাকাটাই তুলেছিলেন স্বর্ণমুদ্রায়। সুতরাং মিঃ মরিনের স্মৃতির ওপর অসততার ছাপ পড়ে গেছিল।

এর পরেই রবিন্স ও দুমার্স নিজ নিজ পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ শুরু করে দিল।

"চেসেজ লা ফেমি'—দুমার্স বলল।

"ওটাই ছাড়পত্র" রবিন্স সায় দিল। 'সব পথই শেষ হয় চিরন্তন নারীতে পৌঁছে। সেই নারীকে আমরা খুঁজে বার করব।'

মিঃ মরিনের হোটেলের বেলবয় থেকে মালিক পর্যন্ত যে যা জানত সব খবর তারা সংগ্রহ করল। মৃতের পরিবারবর্গকে তারা জেরা করল। সুকৌশলে স্বর্গগত স্বর্ণকারের কর্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলল। এমন কি সংবাদের জন্য তার খরিদ্দারদেরও খোঁজ চালাল। শিকারী কুকুরের মত বছরের পর বছর সম্ভাব্য দোষীর প্রতিটি পথ প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুসরন করতে লাগল।

সব রকম চেষ্টা চরিত্রের পরেও মিঃ মরিন নিষ্কলঙ্ক রয়ে গেলেন। দোষী সাব্যস্ত করার মত একটি মাত্র দুর্বলতা, ন্যায়নিষ্ঠার পথ থেকে একটি মাত্র স্খলন, এমনকি নারীর প্রতি আসক্তির ইঙ্গিতটুকুও খুঁজে পাওয়া গেল না। তার জীবন ছিল একজন সন্ন্যাসীর মতই বাধাধরা, পবিত্র, তার স্বভাব ছিল খোলামেলা। যারা তাকে জানত সকলেই একবাক্যে রায় দিল—তিনি ছিলেন উদার দানশীল, ভদ্রতার এক আদর্শ।

ফাঁক? আঙ্গুল বোলাতে বোলাতে বলল রবিন্স—'এবার কি করা যায়?'

দুমার্স বলল—"চেসেজ লা ফেমি। লেডি বেলেয়ার্সকে একবার বাজিয়ে দেখা যাক।"

এ মরশুমে ঘোড়দৌড়ের মাঠে সকলের পছন্দের মানুষ এই নারী। গতিবিধির কোন ঠিকানা নেই। যারা মোটা বাজি হেরেছে শহরের প্রথম এমন কয়েকজনের বিশ্বাস যে সে কখনও সাচ্চা হতে পারে না। প্রতিবেদকরা সংবাদ সংগ্রহের কাজে নেমে পড়ল।

মিঃ মরিন নিশ্চয়ই নয়। তিনি কখনও ঘোড়দৌড় চোখেও দেখেননি। সেরকম লোকই নন। সে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে-এটা ভাবাই যায়না।

রবিন্স বলল—'কাজটা কি আমরা ছেড়ে দেব? গোলকধাঁধা বিভাগকে একবার চেষ্টা করতে দেব?'

দেশলাইয়ের জন্য হাত বাড়িয়ে গুন গুন করে উঠল, 'চেসেজ লা ফেমি।'

লিটিল সিষ্টারের ওখানে শেষ চেষ্টা করে দেখ।

তদন্ত প্রসঙ্গে জানা গেছিল মিঃ মরিন এই পরোপকারী প্রতিষ্ঠানকে খুব ভাল চোখে দেখতেন। সেখানে উদার হাতে দান খয়রাত করতেন। আর ব্যক্তিগত উপাসনাটা ওখানেই সারতেন। পুন্য বেদীতে ভক্তি নিবেদন করতে তিনি রোজ সেখানে যেতেন। প্রকৃত পক্ষে জীবনের শেষের দিকে তার সমস্ত মনটাই গিয়েছিল ধর্মানুষ্ঠানের দিকে, জাগতিক ব্যাপারে তার মন ছিল না।

রবিন্স ও দুমার্স সেখান হাজির হল। এক বৃদ্ধা গির্জা পরিষ্কার করছিল। সে বলল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান সিস্টাব ফেলিসিটে প্রার্থনা করছেন, এখুনি এসে পড়বেন। গর্ভগৃহটি ভারী, কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা। তারা অপেক্ষা করতে লাগল।

অচিরেই পর্দা সরে গেল। সিস্টার ফেলিসিটে বেরিয়ে এলেন। দীর্ঘদেহ, বিষম মুখ, হাড় সর্বস্ব সাধারন চেহারা। পরিধানে কাল গাউন ও ভগ্নী সম্প্রদায়ের শক্ত টুপি।

রবিন্সই কথা বলতে শুরু করল। তারা সংবাদপত্র থেকে এসেছে। লেডি অবশ্যই মরিনের ব্যাপারটা শুনেছে, সেই ভদ্রলোকের স্মৃতির প্রতি সুবিচার করতে ঘটনার রহস্য উদ্ধার হওয়া দরকার। সকলেই জানে তিনি এই গীর্জায় আসতেন।

সিস্টার ফেলিসিটে সব শুনলেন। তিনি যা কিছু জানেন সবই স্বেচ্ছায় বলবেন তবে তা সামান্যই। মসিয়েঁ মরিন ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের একজন সৎ বন্ধু। অনেক সময় একশ ডলার পর্যন্ত দান করেছেন। ভগ্নি সম্প্রদায় একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। তার দাতব্য কাজকর্ম চালাবার জন্য তাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় দান খয়রাতের ওপর। মিঃ মরিন গীর্জাকে উপহার দিয়েছেন রূপোর মোমবাতিদান ও বেদীর আবরণ বস্ত্র। প্রার্থনা করতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আসতেন। তিনি ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ ক্যাথলিক পবিত্রতায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। গর্ভগৃহে কুমারী মাতাব যে মূর্তিটি আছে আর মডেল তৈরী ঢালাইয়ের কাজ সবই নিজে করে মূর্তিটা আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। এরকম ভাল মানুষকে সন্দেহ করা নিষ্ঠুর কাজ।

মাদাম তিবোলতের টাকা দিয়ে মিঃ মরিন কি করেছেন না জানা পর্যন্ত কুৎসার জিভকে তো বন্ধ করা যাবে না। প্রায়ই এই ধরনের ঘটনা প্রসঙ্গে মানে প্রবাদেই জড়িয়ে আছেন মহিলা। সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলছি এখন যদি হয়তো—

সিস্টার ফেলিসিটে বড় বড় চোখ করে গম্ভীর মুখে তাকালেন। ধীরে ধীরে বললেন এমন একটি মাত্র নারী ছিলেন যার কাছে তিনি মাথা নোয়াবেন। যাকে তিনি তার ঝালর দিয়েছিলেন।

হঠাৎ সিস্টার ফেলিসিটে গাঢ় স্বরে বলে উঠলেন সেই নারীকে প্রত্যক্ষ করুন। বলে হাত দিয়ে গর্ভগৃহের পর্দাটা সরিয়ে দিলেন। ভিতরে পবিত্র বেদী জানলা কাঁচের ভিতর দিয়ে আসা নরম আলোয় উদ্ভাসিত পাথরের দেওয়ালে কুলুঙ্গিতে কুমারী মেরির স্বর্ণবরণ মূর্তি।

প্রথামাফিক ক্যাথলিক দুমার্স মাথা নুইয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল। কিছুটা বিমূঢ় রবিন্স অস্পট স্বরে ক্ষমা চেয়ে হঠাৎ সেখান থেকে পিছিয়ে এল। সিস্টার ফেলিসিটে পর্দাটা টেনে দিলেন, প্রতিবেদকরাও বিদায় নিল।

বোনহোস স্ট্রীটের সঙ্কীর্ণ পথ পৌঁছে রবিন্স একটা বাজে ঠাট্টা করে দুমার্সকে বলল, 'আচ্ছা, তারপর কি? গির্জার মেয়ে?'

হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস এইরকম। এবার শোনা যাক্ সেই অনুমানের কথা যেটা রবিন্সের মাথায় ঢুকেছিল মাদামের কথা শুনে।

এটা কি খুবই অদ্ভুত যে এই ধর্মোন্মাদ লোকটির তার সব অর্থ নাকি মাদাম তিবোলতের অর্থ। তার-ভক্তির নিদর্শনটুকু গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। পূজা অর্চনার নামে এর চাইতে অদ্ভুত কাজ অনেক করা হয়েছে। এটা কি সম্ভব নয় যে কয়েক হাজার ডলার গালিয়েই গড়া হয়েছিল এই উজ্জ্বল মূর্তিটি।

সেদিন তিনটে বাজে। রবিন্স সিস্টার্স অফ্ সামারিয়া গির্জায় প্রবেশ করল। আবছা আলোয় তাদের মধ্যে শখানেক লোক নিলাম ডাকতে হাজির।

সব জিনিস বিক্রী হয়ে গেলে। দুজন সহকারী মাতার মূর্তিটি এনে হাজির করল।

রবিন্সই প্রথম ডাক দিল—দশ ডলার। যাজকের পোশাক পরা এক শক্ত সমর্থ লোক পনেরোতে উঠল। এই ভাবে উঠতে উঠতে রবিন্স উঠে গেল একশতে।

আর একজন—'একশ পঞ্চাশ'।

'দু'শ-রবিন্স জোর গলায় বলল।

—দুশ পঞ্চাশ'-

প্রতিবেদক—তিনশ।

অপর কণ্ঠস্বর—তিনশ পঞ্চাশ।

এভাবে চলতে চলতে দুই প্রতিবেদকের দেওয়া ডাকেই মূর্তির নিলাম শেষ হল। দুমার্স ও রবিন্স পুরস্কারটি নিয়ে চলে গেল পুরনো চার্চেস স্ট্রীটে, দুমার্সের ঘরে। কাপড় জড়িয়ে অনেক কষ্টে সেটাকে তুলে রাখল টেবিলের ওপর। মূর্তিটির ওজন একশ পাউণ্ড অর্থাৎ হিসাব মত বিশ হাজার ডলার।

মূর্তিটার আবরণ খুলে রবিন্স ছুরি বার করল পকেট থেকে।

দুমার্স শিউরে উঠে বলল—আরে তুমি করছ কি। এযে খৃষ্টের জননী।

রবিন্স ঠাণ্ডা গলায় বলল—চুপ কর, অনেক দেরী হয়ে গেছে। এখন কোন পথ নেই।

মূর্তির ঘাড়ের কাছ থেকে একটা ছোট টুকরো কেটে বের করে নিল। দেখতে পেল,সোনার পাতলা পাতে মোড়া একটা ম্যাটমেটে ধূসর রঙের ধাতব পদার্থ।

ছুরিটা মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে রবিন্স বলল—সীসা! সোনার পাতে মোড়া।

'ওটা উচ্ছন্নে যাক! আমার পানীয় চাই।' দুমার্স বলল।

একসাথে তারা মাদামের কাফেতে এল। অভ্যাসমত নিজেদের আসনে বসতে যাবে তখন মাদাম এগিয়ে এসে বলল—এই টেবিলে তোমরা বসবে না। তোমাদের জন্য বিশেষ খাদ্য

ও পানীয়ের ব্যবস্থা করেছি। তোমরা এই ঘরে এসে বস। বন্ধুদের ভালভাবে খাওয়াতে আমি পছন্দ করি।

মাদাম তাদের নিয়ে গেল পেছনের ছোট ঘরটায়। বিশেষ বিশেষ খদ্দেরদের এই ঘরেই বসায়। গোধূলির আলো পড়েছে পালিশ করা কাঠের ওপর, বার্নিশ করা কাঁচ এর ওপর। ছোট্ট উঠোন থেকে ঝরনার ঝির ঝির শব্দ আসছে।

রবিন্স কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। মাদাম পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে মোটা দাগের সাজ সজ্জা।

ঘরের দেওয়ালে সস্তা ছবি, জন্মদিনের কার্ড। সংবাদপত্রের জমকালো ছবি। এই সব ছবির মধ্যে কিছু দুর্বোধ্য পাউ লাগান হয়েছে দেখে রবিন্স ধাঁধায় পড়ে গেল। খুঁটিয়ে দেখার জন্য আরও কাছে গেল। দুর্বল মানুষের মত দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বলে উঠল— 'মাদাম তিবোলত' ওঁ মাদাম ! কবে থেকে যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা চার ভাগ সুদের পাঁচ হাজার ডলারের স্বর্ণবস্তু দিয়ে আপনার দেওয়াল সাজানর অভ্যাসটা রপ্ত করেছেন? আমাকে বলুন এটা কি গ্রীসের রূপকথা না আমি চোখে ভুল দেখছি।

কথা শুনে মাদাম ও দুমার্স এগিয়ে এল। মাদাম বলল—কি বলছেন আপনি মসিয়েঁ রবিন্স । ওহো ওই সুন্দর কাগজের টুকরোগুলো। কি জানেন দেওয়ালের ওই জায়গাগুলো ভেঙে গেছে। তাই ফাটল বোজাবার জন্য কাগজের টুকরো আটকে দিয়েছি। ওগুলো পেলাম কোথায়? হ্যাঁ মনে পড়েছে একদিন মসিয়েঁ মোরোঁ আমার বাড়ীতে এসেছিলেন। তা মারা যাবার একমাস আগে। সেই সময় তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন ঐ টাকাটা আমার নামে বিনিয়োগ করবেন. মসিয়েঁ মরিন ঐ কাগজের টুকরোগুলো টেবিলে রেখে কি যেন বললেন আমি সেটা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু সে টাকাটা কোন দিন চোখেও দেখলাম না। মসিয়েঁ মোরোঁ ভারী খারাপ লোক। ঐ কাগজের পৃষ্ঠাগুলোকে আপনারা কি যেন বলেন; বণ্ড!

রবিন্স বুঝিয়ে বলল।

বণ্ডের চারদিকে হাত বুলিয়ে বলল—এই তোমার বিশ হাজার ডলার কুপনগুলো তার সঙ্গে আটকান। তুমি বরং একজন বিশেষজ্ঞকে এনে এগুলো তুলে ফেলার ব্যবস্থা কর। মিঃ মরিন ঠিক কাজই করেছিলেন। এবার আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। তোমার বকবক শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

দুমার্সকে নিয়ে বাইরে চলে গেল। মাদাম চিৎকার করে মিমি ও নিকোলেতকে ডাকলেন, দেখালেন সাধু মসিয়েঁ মোরোঁ তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন।

রবিন্স বলল—আমি যাচ্ছি একটু ফূর্তি করতে। তিনটে দিন আমার সেবা ছাড়াই চলে যাবে। আমার কথা যদি শোন তো তুমিও আমার সঙ্গে যোগ দাও। দেখ যে সবুজ মালটা গেল ওটা ভাল না। আমি তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিই বার বছরের পুরনো বুর্বন 'বেলে অফ কেন্টাকি'র। সঙ্গে তিনপোয়া বোতলে ভর্তি। ব্যাপারটা কেমন মনে হচ্ছে?

এখনই চল! চের্সেজ লা ফেমি—দুমার্স বলল।

* Cherchez La Femme

একটি সামাজিক ত্রিকোণ

আজকাল কি দর্জিদের শিক্ষানবীশ থাকে? আইকে কিন্তু একটা দর্জির দোকানের শিক্ষানবীশ। ঘড়িতে ছটা বাজতেই হাত থেকে ইস্তিরিটা নামিয়ে রাখল। সারাদিন দোকানের ভ্যাপ্‌সা দুর্গন্ধের মধ্যে কাটিয়ে পরিশ্রম করে, কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেলেই কোথায় উধাও হয়ে যায়।

শনিবার আইকে বেতন পেল বার ডলার। আজকে পরিষ্কার হয়ে, গায়ে কোট চড়িয়ে, টুপি আর পুরনো টাইসমেত কলারটা নিয়ে আদর্শের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

দিনের কাজকর্ম শেষ হলে আমাদের প্রত্যেকেই আদর্শ সন্ধান করে—সেটা ভালবাসাই হোক, বা চিংড়ির নিউবার্গই হোক আর পুরনো বইয়ের তাকের মধুর নীরবতাই হোক।

আইকে আজকে গেল 'কাফে ম্যাগিলি' নামের বিখ্যাত ভোজনালয়ে—জায়গাটা বিখ্যাত কারণ পৃথিবীব মহত্তম মানুষ বিলি ম্যাকমাহান আইকের মত যে লোকটি পৃথিবীর আশ্চর্যতম মানুষ, তিনি আড্ডা মারেন এখানে।

বিলি ম্যাকমাহান জেলার নেতা। আইকে ঘরে ঢুকতেই ম্যাকমাহান উঠে দাঁড়াল। মুখে রক্তিম আভা, শক্তিমান বিজয়ীর ভঙ্গিমা তার দেহে, চেলা চামুণ্ডারা তাকে চারিদিকে থেকে ঘিরে রেখেছে।

আইকে তার দেবতার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। বিলি কি চমৎকার দেখতে—মসৃন, হাসিমুখ, বাজপাখির মত তীক্ষ্ণ ধূসর দুটি চোখ, রাজার মতো ভাবভঙ্গি, বিউগল্ এর মত কণ্ঠস্বর, হীরের আংটি, টাকার ছড়াছড়ি, বন্ধু ও কমরেডদের প্রতি আহ্বান; ওঃ ঠিক যেন নরশ্রেষ্ঠ। সহকারীদের প্রতি তার কি তাচ্ছিল্য। কিন্তু আইকের চোখে বিলির যে গৌরবদীপ্ত মুখ ফুটে উঠল তার বর্ণনা ভাষায় দেওয়া যায় না।

বিজয় সঙ্গীতে কাফে ম্যাগিলি ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। হাভানা চুরুটের ধোয়ায় বাতাস ভারী হয়ে উঠল, পরিবেশকের বোতল,কর্ক ও গ্লাসের ওপব ব্যাস্ত হয়ে পড়ল। বিলি ম্যাকমাহানের হাতটা বরাবর নড়তে লাগল। আর হঠাৎ আইকের মনে জেগে উঠল একটা নির্ভীক উত্তেজক অনুভূতি।

যে জায়গায় লোকটি দাঁড়িয়েছিল আইকে সেদিকে গিয়ে নিজের হাত বাড়িয়ে দিল।

বিলি কোন রকম ইতস্তত না করে ঈষৎ হেসে হাতটা একটু ঝাঁকিয়ে দিল।

যে সব দেবতা আইকেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল এখন তারাই তার মাথাটা বিগড়ে দিল।

পরিচিত জনের মত বলল—'আমার সঙ্গে এক পাত্র পান কর বিলি—তুমি এবং তোমার বন্ধুরাও।'

মহান নেতা বলল—বুড়ো খোকা, ঠিকমত চালিয়ে যাবার জন্য আমি যদি কাজটি করি তাহলে কিছু মনে কোরনা বাপু।

আইকের যুক্তি বুদ্ধির শেষ সলতেটাও নিভে গেল। কাঁপা হাতে পরিবেশকদের বলল---'মদ'।

টেবিলে সাজান গ্লাসের দীর্ঘ সারিতে শ্যাম্পেন উপচে পড়তে লাগল। নিজের গ্লাসটা তুলে নিয়ে বিলি হাসিমুখে আইকের দিকে তাকিয়ে মাথাটা নাড়ল। সকলেই গ্লাস তুলে নিয়ে যেন গর্জন করে উঠল। 'তোমার স্বাস্থ্য কামনায়', আইকে বিকারের ঘোরে সুধা পাত্র হাতে নিল।

হাতের মুঠোয় সমস্ত মাইনেটা বারের কাউন্টারে ছুঁড়ে ফেলে দিল আইকে।

পরিবেশক নোটগুলো নিয়ে ঠিক আছে বলতে কিছুক্ষণ বারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আইকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হেষ্টার স্ট্রীট ধরে, ক্রাইস্টি ও ডিলান্সি হয়ে বাড়ী পৌঁছে গেল। সেখানে মা আর তিনটে কালো বোন মাইনেটা হাতাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। সব কথা খুলে বললে আর্তনাদ করে তারা গ্রাম্য ভাষায় গালাগালি করতে লাগল। তাকে মারধর করতে লাগল কিন্তু আইকে যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে। সে যা পেয়েছে তার তুলনায় মাইনেটা উড়ে যাওয়া আর মেয়ে মানুষদের মুখে ঐ সব কথা যেন তুচ্ছ ব্যাপার।

সে করমর্দন করেছে বিলি ম্যাকমাহানের সঙ্গে। বিলি-র স্ত্রী ছিল। আর তার ভিজিটিং কার্ডে নাম লেখা থাকত---'মিসেস উইলিয়াম ডারাখ ম্যাকমাহান কিন্তু কার্ডগুলো নিয়ে কিছু ঝামেলাও ছিল। কারন সেই কার্ডগুলোকে কিছু মানুষ পাত্তা দিত না। বিলি রাজনীতির ক্ষেত্রে একজন একনায়ক, ব্যবসার ক্ষেত্রে চারমিনার গম্বুজ, একজন মোগল বাদশা। সে ধনী থেকে আরও ধনী হচ্ছে, মুখের প্রতিটি বানী প্রচার করার জন্য ডজনখানেক সাংবাদিক সব সময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাবুক খেয়ে কুঁকড়ে যাওয়া বাঘের ছবি দিয়ে তার ব্যঙ্গচিত্র ছেপে তাকে সম্মান জানান হয়।

কিন্তু বিলির মনের মধ্যে একটা দুঃখ মাঝে মাঝেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সব মানুষের কাছ থেকে সে সর্বদাই দুরে থাকতো, কিন্তু তাদেব কাছেই বুঝি ছিল স্বপ্নের দেশ। তার মান ও আদর্শ কিছু ছিলযেমন ছিল আইকের মনে, সেই আদর্শকে না পেয়ে সব রকম সাফল্য বিস্বাদ লাগল। তার স্ত্রীও এ দেখে অসন্তোষ ভোগ করতেন।

একদিন একটা বিলাসবহুল হোটেলের ডাইনিং হলে অনেক গনামান্য মানুষের সমাবেশ হয়েছিল। তারই একটা টেবিলে বসেছিল বিলি ও তার স্ত্রী। মিসেস ম্যাকমাহানের গায়ের হীরের জেল্লাকে টেক্কা দেবার মত কেউ সেখানে ছিল না। পরিবেশক সব চাইতে দামী মদটাই তাদেরকে দিয়ে গেল।

চারটে টেবিল পরে একটি লোক বসেছিল। লম্বা একহারা গড়ন, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, বিষন্ন মুখ, মুখে ভ্যান ডাইক মার্কা দাড়ি। অদ্ভুত সাদা সরু হাত। লোকটি রাতের খাবার খাচ্ছিল। তার নাম কোর্টল্যাণ্ড ভ্যান ডুইকিংক। আশি মিলিয়নের মালিক। উত্তরাধিকার সূত্রে সমাজের ভিতর একটা বিশেষ আসনের অধিকারী।

বিলি কারও সঙ্গে কথা বলছে না কাউকে চেনে না বলে। ড্যান ডুইকিংকের নিজের পাত্রের ওপরই নজর।

এরপরই বিলি জীবনের সব থেকে বিস্ময়কর ও অবিবেচনা প্রসূত কাজ করে বসল। সে ইচ্ছা করেই ভ্যান ডুইকিংকের কাছে গেল এবং হাতটা বাড়িয়ে দিল।

বলল—আচ্ছা মিঃ ডুইকিংক শুনেছি আপনি নাকি বলে বেড়াচ্ছেন আমার জেলায় গরীব মানুষদের মধ্যে আপনি কিছু সংস্কারমূলক কাজকর্ম করবেন। আপনি জেনে রাখুন, আমি ম্যাকমাহান। কথাটা যদি সত্যি হয় তবে আমি আপনাকে সাহায্য করব। ভ্যান ডুইকিংকের কঠিন চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে বিলির হাতটা চেপে ধরল।

গম্ভীর গলায় বলল—'ধন্যবাদ মিঃ ম্যাকমাহান। ওই ধরনের কিছু কাজ করার কথা ভাবছি। আপনার সহায়তা পেলে খুশী হব। আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে ভাল লাগছে।

বিলি তার আসনে ফিরে গেল। ঈর্ষায় ও প্রশংসায় একশোটা চোখ এখন তার উপর। মিসেস ম্যাকমাহান উৎসাহে কাঁপছে ; হীরের ঝিলিক সকলের চোখ ঝলসে দিচ্ছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে অনেক টেবিলেই যারা বসে আছে তাদের মনে হচ্ছে মিঃ ম্যাকমহানের সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে। সকলেই তাকে দেখে হাসছে, মাথা নোয়াচ্ছে। মহত্ত্বের আলোছায়া যেন তাকে ঘিরে ফেলেছে।

সে পরিবেশককে হুকুম দিল সবাইকে আমার খরচায় মদ দাও। প্রত্যেককে।

পরিবেশক তাকে বলল—'এই হোটেলের মর্যাদা ও তার নিয়মকানুনের বিচারে হুকুম তামিল করাটা অবিবেচকের কাজ হবে।'

বিলি বলল—ঠিক আছে এটা যদি নিয়মবিরুদ্ধই হয় তবে আমার বন্ধু ভ্যান ডুইকিংককে একটা বোতল দেওয়া যাবে কি? না? বেশ, তাহলে আজ সারারাত মদের দোকানের দরজা খোলাই থাকবে।

বিলি ম্যাকমাহান আজ খুশী বড় খুশী কোর্টল্যাণ্ড ভ্যান ডুইকিংকের সাথে করমর্দন করেছে সে।

নিম্ন পূর্ব অঞ্চলের ঠেলা গাড়ি ও জঙ্গলের স্তূপের মধ্যে ঝকঝকে ধাতব কাঠামোর ধূসর রঙের গাড়ীটাকে বেমানান লাগছিল। গাড়িটা কিন্তু সেই পথ দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে ভ্যান ডুইকিংকেও। তাঁর মুখে আভিজাত্যের ছাপ, রুগ্ন সাদা হাত দিয়ে। ছিন্নবাস যুবকদের মধ্যে দিয়ে রাস্তা করে আস্তে আস্তে গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। তাঁর পাশে অপরূপ সুন্দরী মিস্ কনস্টান্স শুইলার।

শুইলার নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ওল্ড কোর্টল্যাণ্ড মানুষকে যে এরকম নিদারুন দারিদ্র্যের মধ্যে বেঁচে থাকতে হয় এটা কি দুঃখের কথা নয়? আর তুমি —এটা তো তোমারই মহত্ত্ব যে তুমি তাদের কথা ভাবছ, তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সময় ও অর্থ ব্যায় করছ।

ডুইকিংক উদার চোখে তার দিকে তাকালেন।

বিষাদের সুরে বললেন—আমি তো কিছুই করতে পারিনা। কাজটা খুব বড় মাপের, তাই এটা সমাজের সকলের কাজ। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাও ফেলনা নয়। ঐ দেখ কনষ্টন্স! এই বড় রাস্তাতে আমি অনেকগুলো রান্নাঘর করে দেবার ব্যাবস্থা করেছি। যেখান থাকে কোন ক্ষুর্ধাত মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। আর অপর রাস্তাটার নিচের দিকে পুরনো বাড়ীগুলোকে ভেঙে নতুন বাড়ি তুলব।

ডিলান্সির পথ ধরে তার গাড়িটা এগিয়ে চলল। পিছনে পড়ে রইল একদল শিশু। নিরাশ্রয়, চুলে তেল নেই। পায়ে জুতো নেই। হাতে মুখে জলের ছিটেও পড়েনা কোনদিন। একটা হেলে পড়া নোংরা দুর্গন্ধে ভর্তি বাড়ীতে তারা থামল।

ভ্যান ডুইকিংক গাড়ী থেকে নামলেন দেওয়াল পর্যবেক্ষণ করতে। বাড়ীটার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল একটি যুবক-সে যেন ভাঙা বাড়ীর একটা জীবন্ত প্রতীক। ক্ষীণবক্ষ, বিশীর্ণ, বিবর্ণ যুবকটির মুখে একটি সিগারেট।

ভ্যানের মনে হল সে যেন মূর্তিমান একটা তিরস্কার,আকস্মিক এক আবেগের বশে তিনি তার হাতটাকে চেপে ধরলেন।

আন্তরিকভাবে বললো—আমি তোমাদের জানতে চাই, বুঝতে চাই, সাধ্যমত তোমাদের সাহায্য করতে চাই। আজ থেকে আমরা দুই বন্ধু।

গাড়ীটা ধীরে ধীরে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল।

কোর্টল্যাণ্ড যেন একটা সুখী মানুষ বলে নিজেকে অনুভব করছেন।

তিনি যে করমর্দন করেছেন আইকে স্নিগলফ্রিজের সঙ্গে।

* The Social Triangle

সবুজ দরজা

মনে করুন আপনি রাত্রের খাওয়া দাওয়া সেরে রাস্তায় একটু পায়চারি করতে বেরিয়েছেন। হাতে একটা সিগারেট নিশ্চয়ই আছে, সেটা শেষ করতে দশ মিনিট সময় লাগবে। মনে মনে ভাবছেন কোন নাটক বা নৃত্যনাট্য দেখতে যাবেন। হঠাৎ কেউ আপনার কাঁধে হাত রাখল, ফিরে দেখলেন একটি সুন্দরীর ঝলমলে চোখ, হীরের গয়না আর কালো রুশীয় পোশাকে তাকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে। মহিলাটি অতি দ্রুত আপনার হাতে গরম একটা মাখন মাখান রুটি ও এক জোড়া ছোট কাঁচি বের করে আপনার ওভার কেটের দ্বিতীয় বোতামটা কেটে দিয়ে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে উচ্চারন করল একটা মাত্র শব্দ। সমান্তরাল ক্ষেত্রে তারপর দ্রুত পায়ে রাস্তাটা পার হল।

এটা তো নিছক অ্যাডভেঞ্চার। সে ডাকে কি আপনি সাড়া দেবেন? পারবেন না। বিব্রত বোধ করবেন। আপনার মুখ লাল হয়ে উঠবে। হাতের রুটিটা ফেলে দিয়ে আপনি ব্রডওয়ে ধরে হাঁটতে হাঁটতে বোতামটা খুঁজবেন। নিছক অ্যাডভেঞ্চারের প্রবৃত্তিটা যদি মন থেকে একেবারে চলে যায়, আপনি সেই মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের একজন না হন তাহলে এই কাজটা অবশ্যই করবেন।

প্রকৃত দুঃসাহসী মানুষের সংখ্যা খুব বেশী হয় না। এই ধরনের মানুষের কথা বইতে লেখা থাকে, তারা বেশীর ভাগ ব্যবসায়ী, নতুন নতুন পথের পথিক। যার যা বাসনা তার খোঁজে ছুটে বেড়ায়—সোনার পোশাক, পবিত্র কলম। প্রেয়সী, ধন সম্পত্তি, রাজমুকুট, খ্যাতি প্রতিপত্তির দিকে। যারা সত্যিকারের দুঃসাহসী তারা ছুটে বেড়ায় উদ্দেশ্যবিহীন রথে অজ্ঞাত ভাগ্যের সন্ধানে। তাদের একটি দৃষ্টান্ত বাইবেলের 'বেহিসেবী ছেলেটি।'

যারা আধা দুঃসাহসী, সাহসী আর চমৎকার চরিত্রের মানুষ তারা সংখ্যায় অনেক। জীবনের নানাক্ষেত্রে ইতিহাস, উপন্যাস. ঐতিহাসিক উপন্যাসের ব্যবসাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য ছিল একটা পুরস্কার জয় করা। একটা স্বপ্নকে সফল করা, নিজের নামকে অক্ষয় রাখা, সুতরাং তারা কেউই প্রকৃত দুঃসাহসিক পথের পথিক ছিল না। প্রেম আর দুঃসাহসের খোঁজ যারা করে তারা বড় বড় শহরেই সেটা পেয়ে যায়। হরেক রকমের ছদ্মবেশে তারা আমাদের মুখোমুখি হয়। হঠাৎ লেখা ভুলে জানালার দিকে তাকালে মনে আসে অন্তরঙ্গ মুখের ছবি, ঘুমন্ত রাজপথে চলতে চলতে কানে আসে একটা, যন্ত্রনা-দীর্ণ ভয়ার্ত কান্নার শব্দ। পরিচিত গৃহকোন থেকে আমরা হাজির হই অপরিচিত দরজায়, একজন এসে অভ্যর্থনা জানায়, ভাগ্যের উঁচু মাথা থেকে এক টুকরো কাগজ গায়ের কাছে পড়ে। চলমান জনতার ভিতর থেকে কিছু ধাবমান অপরিচিত মুখের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়। তাতে থাকে ঘৃনা, অনুরাগ ও ভয়। কখনও বৃষ্টি নামে, আমাদের ছাতার নীচে আশ্রয় নেয় কোন চাঁদের দেশের কন্যা বা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মালিকের বোন। নানা বিচিত্র দুঃসাহসিক কাজের— নিঃসঙ্গ মনমাতান, রহস্যময় ও বিপজ্জনক সূত্র আমাদের হাতের মুঠোয় এসে যায়। কিন্তু কজনই বা সেই সূত্রকে হাত পেতে নেয়, সেই অনুসারে কাজ করে। গতানুগতিক জীবনের বোঝা বয়ে আমাদের মন মেজাজ শুকনো ও ঝরঝরে হয়ে গেছে। আমরা আমাদের পথেই চলে যাই এবং একটা একটানা একঘেয়ে জীবন কাঠামোর পর ভাবি আমাদের যত প্রেম ভালবাসা সবই একটা দুটো বিয়ে, আলমারিতে রেখে দেওয়া দু একটা সাধারনের নকল গোলাপ ফুল আর সারাটা জীবন যন্ত্রের সঙ্গে ঝগড়া করে শেষ হয়ে গেছে ।

রুডলফ্ স্টিনার একজন সত্যিকারের দুঃসাহসী মানুষ। প্রতি সন্ধ্যায় সে বেরিয়ে পড়ত অভাবিত কিছুর সন্ধানে। পথের ঠিক একটি মোড়ের পরেই কি রহস্য লুকিয়ে আছে সেটা জানাই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নিয়তির সন্ধানে চলার এই প্রবনতা অনেক সময় তাকে অদ্ভুত সব জায়গায় নিয়ে যেত। সে রাত কাটিয়েছে জেল হাজতে, ঠকবাজদের পাল্লায় পড়েছে, প্রলোভনের মূল্য দিতে ঘড়ি টাকা পয়সা সবই গেছে তবু নতুন আগ্রহে সে ছোটাছুটি করছে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত।

এক সন্ধ্যায় জনবহুল রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। ফুটপাতে ছিল দুমুখী স্রোতা। একদল বাড়ী ফিরতে ব্যস্ত, অন্যদল ছুটছিল হাজার বাতিতে উজ্জ্বল হোটেলে সাদর আমান্ত্রনে সাড়া দিতে।

দুঃসাহসী যাত্রীটি শান্ত ও সতর্কভাবে পা ফেলছিল। দিনের বেলায় পিয়ানোর দোকানে কাজ করার সময় গলার টাইটাকে পিন দিয়ে না আটকে আংটির ভিতর ঢুকিয়ে পড়ত। একবার কোন সাময়িক পত্রের সম্পাদককে লিখেছিল যে মিস্ লির এর লেখা, 'খুনির ভালাবাসার প্রতীক্ষা' নামক বইটা তাকে সবথেকে বেশী প্রভাবিত করেছে।

দাঁতের কড়মড় শব্দে তার মনোযোগ আকৃষ্ট হল একটা রেস্টুরেন্টের দিকে। ভাল করে তাকাতে চোখে পড়ল, পাশের দরজার ওপর জনৈক দাঁতের ডাক্তারের বিজ্ঞাপনের বৈদ্যুতিক আলো দিয়ে লেখা কথাগুলো। একটা বিরাটাকার নিগ্রো অদ্ভুত সাজ সেজে আগ্রহী পথচারীদের কার্ড বিলি করছে।

এরকম অনেক আগে, দেখেছে রুডল্‌ফ। অন্য সময় সে পাশ কাটিয়ে চলে যায় কিন্তু এমন কৌশলে আজকে কার্ড গুঁজে দিল যে হেসে কার্ডটা নিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ পরে অন্যমনস্কভাবে কার্ডটার দিকে তাকাতে সবিস্ময়ে দেখল কার্ডের একটা দিক ফাঁকা অন্য দিকটা কালি দিয়ে লেখা তিনটি শব্দ—'একটি সবুজ দরজা'। তারপরেই দেখল আগের একটা লোক নিগ্রোর দেওয়া কার্ডটা ছুড়ে দিল। রুডলফ্ সেটা তুলে নিল। তাতে দাঁতের ডাক্তারের নাম ও ঠিকানা লেখা এবং দাতের চিকিৎসা সংক্রান্ত কয়েকটা মামুলি কথা এবং 'ব্যাথাহীন' অস্ত্রোপচারের ঢালাও ঘোষনা।

দুঃসাহসী লোকটা কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর রাস্তাটা পার হল; একটা ব্লক হাঁটল, হেটে জনতার স্রোতে মিশে গেল। দ্বিতীয়বার নিগ্রোর পাশে গিয়ে আরেকটা কার্ড নিল। তাতেও লেখা 'একটি সুবজ দরজা'। তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে কজন পথচারীর হাত থেকে তিন চারটে কার্ড রাস্তার ওপর ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ওই কার্ডগুলোতে ডাক্তারী বয়ান।

দুঃসাহসিক কাজে নামতে স্টিনারকে দুবার বলতে হয় না—সেও তো ঐ পথের পথিক।

ধীরে ধীরে রুডলফ সেখানে ফিরে গেল যেখানে নিগ্রোটা দাঁড়িয়েছিল। এবার তার পাশ দিয়ে যাবার সময় কোন কার্ড পেল না। নিজের ঝকঝকে হাস্যকর পোশাক সত্ত্বেও ইথিওপিয়ার অধিবাসীটি বর্বরসুলভ মর্যাদা নিয়েই দাঁড়িয়েছিল। প্রতি আধমিনিট অন্তর এমন একটি কর্কশ দুর্বোধ্য আওয়াজ তুলছিল যেটি শুনতে অপেরার ঘোষকের মত। এবার রুডলফ্‌কে ঘৃণা ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখতে থাকল।

দৃষ্টিটা যেন হল ফোটাল, সেই দৃষ্টির মধ্যে সে যেন পড়তে পারল নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে লোকটার মনের একটা নীরব অভিযোগ। সে যেন অভিযোগ করতে চাইছে যে কার্ডে লেখা হেঁয়ালিটির অর্থ বুঝবার মত বুদ্ধি বা মনোবৃত্তিও তার নেই।

ভিড় থেকে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে যুবকটা দ্রুত বাড়িটা সম্পর্কে একটা ধারনা তৈরী করে নিল। তার মনে হল, এই বাড়িটারই কোথাও আছে তার দুঃসাহসিক অভিযানের মূল লক্ষ্যবস্তুটি। বাড়িটা উচ্চতায় পাঁচতলা। নিচে সিঁড়ির কাছে একটা রেস্টুরেন্ট।

একতলাটা এখন বন্ধ আছে। দোতলাটা দাঁতের ডাক্তারের দখলে। তাছাড়া নানা ভাষায় বিজ্ঞাপনের জগাখিচুড়ি দেখে বোঝা যায় সেখানে ভিড় করে আছে গনৎকার, পোশাক তৈরীর দর্জি, বাজানাদার-এর দল। আরও উচুতে জানালার পর্দা ও দুধের বোতল বলে দিচ্ছে ঘর সংসারের এলাকা।

বাড়িটার দেখাশুনা শেষ করে পাথরের উঁচু সিঁড়িতে দ্রুত পা ফেলে রুডলফ্ বাড়িটার ভিতরে ঢুকে গেল। হলঘরে গ্যাসের বাতি টিম্‌টিম করে জ্বলছিল—একটা ডান দিকে অন্যটা বাঁদিকে। কাছের আলোটার দিকে তাকিয়ে তার আভার মধ্যে দেখতে পেল একটা সবুজ দরজা। সে মুহূর্তকাল ইতস্তত করল, তার পরেই মনে হল আফ্রিকান লোকটার তাচ্ছিল্য করা হাসিটা যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে সে সোজা সবুজ দরজায় ঘা দিল।

ভিতর থেকে কোন উত্তর আসার আগে কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল, তার মনটা সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চারের স্পর্শে কম্পমান। সবুজ দরজাটার পিছনে কত কীই না হচ্ছে। জুয়া খেলা, সাহসিকা সুন্দরীর প্রেমের খেলা চলতে পারে, বিপদ, মৃত্যু, প্রেম, হতাশা পরিহাস—এই অবিবেচক আঘাতের জবাবটা এর যে কোন একটার রূপ হতে পারে।

ভিতরে একটা খস খস আওয়াজ হয়ে দরজাটা খুলে গেল। বিশ বছরের কম বয়সী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখটা সাদা হয়ে গেছে। দরজার হাতলটা ধরে সে দুলতে লাগল।

রুডলফ তাকে ধরে ফেলে দরজার গায়ে লাগান বিবর্ণ কোচটায় শুইয়ে দিল। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে অতি দ্রুত গ্যাস বাতির কাঁপা অলোয় ঘরের চারদিকটা দেখে নিল। ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু চরম দারিদ্রের ছাপ।

মেয়েটি নিঃঝুম হয়ে শুয়ে অছে, রুডলফ্ উত্তেজিতভাবে ঘরের চারদিকে একটা পিপে খুঁজল। হয়তো একটা পিপের উপর মেয়েটিকে চেপে ধরে ঘোরালে কোন উপকার—না না সে ব্যবস্থা ডুবে যাওয়া লোকদের জন্য। নিজের টুপিটা দিয়ে সে মেয়েটিকে হাওয়া করতে লাগল। তাতে কাজ হল পাখার একটা দিক মেয়েটির নাকে ঢুকে যাওয়ায় চোখ মেলে তাকাল। তার দিকে তাকিয়ে যুবকটিও যেন তার মুখে পেল সেই মুখখানির ছবি—এতদিন তার মনের চিত্রপটে যাকে সে ধরে রাখতে পারেনি। সরল ধূসর দুটি চোখ, ছোট টিকোল নাক, দ্রাক্ষালতার মত কোঁকড়ান চুল—কিন্তু মুখখানা বড় শীর্ণ বড়ই বিবর্ণ—এতদিনে নিজের সব দুঃসাহসিক অভিযান সঠিক ঠিকানা খুঁজে পেল—সার্থক হল।

শান্ত দৃষ্টিতে মেয়েটি তাকিয়ে হাসল। দুর্বল গলায় বলল—আমি মূর্চ্ছা গিয়েছিলাম তাইনা? আমার আর দোষ কি? তিনদিন না খেয়ে কাটালে বুঝতে পারবেন।

রুডলফ্ চিৎকার করে বলল—'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।'

এক ধাক্কায় দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। বিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল এক রাশ খাবার নিয়ে।

রুটি, মাখান ঠাণ্ডা মাংস, কেক, মুরগির রোষ্ট, দুধ আর গরম চা।

রুডলফ্ গর্জন করে উঠল—'না খেয়ে থাকাটা তো হাস্যকর ব্যাপার। এ অভ্যাস তোমাকে ছাড়তে হবে।' খাবার প্রস্তুত। হাত ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল—'চাটা ঢেলে দেবার মত একটা কাপ আছে তো।?' মেয়েটি বলল—জানালার গ্যাসের তাকটায় আছে। মেয়েটির চোখ খুশীতে ঝকঝক করছে। কাগজের মোড়কের ভিতর থেকে চাটনির একটা টুকরো মেয়েটি হাতে নিল।

রুডলফ্ বলল ; 'আগে দুধটা খেয়ে নাও তারপর চা দেব। যদি সুস্থ থাক তাহলে এই চাটনি কাল খাবে। তবে এই মুহূর্তে তুমি যদি আমাকে তোমার অতিথি হবার অনুমতি দাও তাহলে নৈশ আহারটা দুজনে এক সঙ্গে করব।'

সে চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে বসে পড়ল। পেটে চা পড়ায় চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুখের রঙও বদলেছে। সে গোগ্রাসে খাবার গিলতে লাগল। যুবকটির উপস্থিতি এবং তার সাহায্য সে সহজভাবে গ্রহন করেছে। এই মানুষটির মহানুভবতা মেয়েটিকে শিখিয়েছে সমস্ত কৃত্রিমতাকে ঝেড়ে ফেলে তার সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করতে। কিন্তু ক্রমশ দেহে শক্তি ও আরামবোধ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে কিছুটা দায়িত্ববোধও ফিরে এল। রুডলফ্-কে সে তার জীবনের কাহিনীটা বলতে শুরু করল। সে দোকানের একটি মেয়ে কর্মচারী অল্প মাইনে। তার ওপর দোকানের লাভকে স্ফীত করে তুলতে 'জরিমানা কাঁচি' চালিয়ে সেই মাইনেটাও স্বল্পতর হয়ে যায়। তার উপর আছে অসুখবিসুখ, চাকরি থেকে ছাঁটাই, আশাভঙ্গ এবং দরজায় দুঃসাহসিক লোকটির আঘাত।

রুডলফের মনে হল তার কাহিনী —'জনির প্রেমের পরীক্ষা'-র মতই মর্মান্তিক।

এত সব ঝড় তোমার ওপর দিয়ে গেছে ভাবতেও কষ্ট হয়। রুডলফ্ বলল।

'বড় ভয়ঙ্কর সে দিন'-মেয়েটি বলল।

'শহরে তোমার কোন আত্মীয় বন্ধু নেই?'

'কেউ নেই।'

একটু চুপ করে বলল—'আমিও এই পৃথিবীতে একলা।'

'শুনে সুখী হলাম', মেয়েটি উত্তর দিল। নিজের বঞ্চিত জীবনের কথা যে মেয়েটির ভাল লেগেছে তা শুনে যুবকটিরও ভাল লাগল।

'তাহলে আমি এখন আসি। একটা রাত ভাল ঘুম হলে তুমিও খুব আরাম পাবে।'

রুডলফ্ তার হাতটা বাড়িয়ে দিল, মেয়েটির হাতখানা ধরে বলল 'শুভরাত্রি'। কিন্তু তার দুটো চোখে একটা প্রশ্ন এত সহজ ভাবে, এত করুণ করে ফুটে উঠল যে রুডলফ্ মুখের কথায় তার জবাব না দিয়ে পারল না।

'আরে তুমি কেমন থাক সেটা দেখতে আমি তো কালই আবার আসছি। এত সহজে তুমি আমার হাত থেকে ছাড়া পাবে না।'

দরজার কাছে এসে মেয়েটি বলল—'আচ্ছা; এত দরজা থাকতে তুমি আমার দরজায় ধাক্কা মারলে কেন?'

রুডলফ্ এক মিনিট তার দিকে তাকাল। কার্ডের কথাটা মনে পড়ল। অন্য কারও হাতে পড়ত তাহলে কি হত? তৎক্ষণাৎ সে স্থির করে ফেলল যে আসল সত্যটা তাকে কোনদিনই জানানো হবে না। মেয়েটি কখনও জানবে না যে সে দুর্দশার মুখোমুখি হয়েছিল সেরকম দুর্দিনের সঙ্গে এক সময় তারও পবিচয় ঘটেছিল।

মুখে বলল—আমাদের একজন পিয়ানোর সুরকার এ বাড়িতেই থাকে। আমি ভূল করে তোমার দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলাম।

মেয়েটি হাসল। সবুজ দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সিঁড়ির মাথায় সে একবার থামল। তারপর সমস্ত তলাটা ঘুরে এল। ফিরে এসে উপরের তলায় উঠে গেল। আর একটার পর একটা যত ঘর দেখল ততই সে অবাক হতে থাকল। বাড়ীটার সবগুলি দরজাই সবুজ রঙ।

অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে গলিতে নেমে এল। অদ্ভুত চোহারার নিগ্রোটি তখনও দাঁড়িয়ে। কার্ড দুটো হাত নিয়ে রুডলফ্ তার কাছে এগিয়ে গেল।

তাকে শুধোল-'তুমি কি আমাকে বলবে কেন তুমি এই কার্ড দুটি দিয়েছিঁলে আর এর মানেই বা কি?'

নিগ্রোটি হাসতে হাসতে ব্যাবসার একটা চমৎকার বিজ্ঞাপন মেলে ধরল। তারপর রাস্তার দিকে আঙ্গুলটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ওই ওখানে দেখুন মশায়, কিন্তু আপনি তো দেরী করে ফেলেছেন। প্রথম অংশটা এই শেষ হয়ে গেল।"

রুডলফ্ দেখল একটা থিয়েটারের ফটকের মাথায় বিদ্যুতের উজ্জ্বল অলোয় লেখা রয়েছে নতুন নাটকের নাম 'একটি সুবজ দরজা'।

নিগ্রোটি বলল—'সকলেই বলছে নাটকটা খুব ভাল হয়েছে, ওদের এজেন্ট আমাকে একটা ডলার দিয়ে বলেছিল আমি যেন ডাক্তারের কার্ডে-র সঙ্গে ওদের কার্ডগুলোও বিলি করি। ডাক্তারের একটা কার্ড কি আপনাকে দেব মশায়।'

যে ব্লকে রুডলফ্ বাস করত তার মোড়েই সে একটু থামল—এক গ্লাস বিয়ার ও একটা চুরুটের জন্য। জ্বলন্ত চুরুটটা মুখে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে কোটের বোতাম আটকাল,

টুপিটাকে পিছনে ঠেলে দিল, তারপর মোড়ের ল্যাম্প পোস্টটাকে লক্ষ্য করে উঁচু গলায় বলল, আর যাই হোক, ভাগ্যই আমাকে হাত ধরে মেয়েটির কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে এ কথাটা মানতেই হবে যে রুডল্‌ফ্ স্টিনার প্রেম ও দুঃসাহসিকতার একজন প্রথম সারির ভক্ত।

* The Green Door

যখন মোটর গাড়িটা অপেক্ষা করছিল

এক নির্জন পার্কের নির্জন মোড়ে গোধূলি শুরু হওয়া মাত্রই হাজির হয় একটি ধূসর পোশাক পরা মেয়ে। এসে বেঞ্চে বসে বই পড়ে।

সাদাসিধে স্টাইল, উঁচু টুপিটা বেশ বড় মাপের একটা জালের ঘোমটা দিয়ে ঢাকা। তার ফাঁক দিয়েই মুখের শান্ত ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য ঝলমল করছে। আগের দিন ঠিক একই সময় এখানে এসেছিল। তার আগের দিনও। এটা খেয়াল রেখেছিল কেবল একজন।

যে খেয়াল রেখেছিল সে এক যুবক, কাছাকাছি ঘুরঘুর করছিল। মহান ভাগ্য দেবতার কাছে সে বোধহয় যজ্ঞ করেছিল। তাই যজ্ঞের পুরস্কার জুটে গেল। পাতা ওল্টাতে গিয়ে মেয়েটির হাত থেকে বইটি পড়ে বেঞ্চে লেগে দূরে মাটিতে পড়ল।

যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে বইটি তুলে নিল, অন্যান্যদের মত সেও সাহস ও আশার সঙ্গে বইটি মালিককে ফেরত দিল। বেশ সরস গলায় আবহাওয়া সম্পর্কে কয়েকটি চিরাচরিত মন্তব্য করেই ভাগ্যের অপেক্ষায় মুহূর্ত কাল দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটি আলস্য ভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে তার পরিচ্ছন্ন পোশাক ও সাধারন চেহারা লক্ষ্য করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—'ইচ্ছা হলে আপনি বসতে পারেন। মানে আপনি বসলে আমার ভালই লাগবে। আলোটা এত অল্প যে পড়া যাচ্ছেনা। তার থেকে একটু কথা বলতে পারলে ভাল হত।'

অনুগ্রহধন্য প্রজাটি সবিণয়ে তার পাশের আসনটায় বসল। পুরনো রীতি অনুযায়ী ছেলেটি বলতে লাগল—'আপনি কি জানেন আপনার মত মন কেড়ে নেওয়া মেয়ে অনেক দিন দেখিনি? গতকালই আপনার উপর আমার নজর পড়েছিল। আপনি বুঝতে পারেননি যে আপনার ঐ চোখের আলোয় একটি মানুষ বোল্ড আউট হয়ে গিয়েছিল, কিছু বুঝতে পেরেছিলেন কি হলুদ ফুল?

বরফ ঠাণ্ডা গলায় মেয়েটি বলল—আপনি যেই হোন আপনার মনে রাখা উচিত আমি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। এইমাত্র যে মন্তব্যটা আপনি করেছেন সেজন্য আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম। কারণ আপনাদের মহলে এই ভুলটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমি আপনাকে বসতে বলেছিলাম। তাতে যদি আমাকে আপনার হলুদ ফুল মনে হয় তাহলে মনে করুন আমি আপনাকে বসতে বলছি না।

যুবকটি সবিনয়ে বলল—আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। দোষটা আমারই, কি জানেন; মানে পার্কে এমন সব মেয়েরা আসে ; আপনি তো জানেন—মানে জানেনও কিছু না, কিন্তু—

"দয়া করে এ প্রসঙ্গ বন্ধ করুন। আমি সব জানি। এবার বলুন তো এই সব পথ ধরে দলে দলে যে মানুষগুলো যাচ্ছে তারা কারা? আর যাচ্ছেই বা কোথায়? তার এত জোরে ছুটছে কেন? তারা কি খুব খুশি?"

যুবকটি গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। এখন তার লক্ষ্য শুধু সময় কাটান, সে যে কি ভূমিকা নেবে বুঝতে পারছে না।

মেয়েটির মনের অবস্থা অনুমান করে ছেলেটি বলল—"ওদের দেখতে বেশ ভাল লাগছে এটাই তো জীবনের আশ্চর্য নাটক। কেউ যচ্ছে খাবার খেতে, কেউ-মানে-অন্য কোথাও, ওদের ইতিহাস কেউ জানে না।"

'আমিও জানি না। সেই কৌতূহলও আমার নেই। আমি এখানে এসেছিলাম একটু বসতে কারণ এখানে এক উদ্বেলিত মহান জনতার কাছাকাছি রয়েছি। যেখানে জীবনের স্পন্দনটি একেবারে অনুভূত হয় না, আমার জীবন এর ভূমিকা সেখানেই নির্দিষ্ট। কেন আমি আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম সেটা কি অনুমান করতে পারেন, মিঃ—'

"পার্কেনস্টাকার'। বাক্যটি পূরণ করে আগ্রহী হয়ে তাকিয়ে রইল।

ঈষৎ হেসে মেয়েটি বলল—'না এখনই আপনি সেটা জানতে পারবেন কারও নামকেই ছাপার অক্ষরের বাইরে রাখা অসম্ভব, এমন কি কারও ছবিটিকেও। এই ঘোমটা আর এই টুপিই আমার পরিচয়কে আড়াল করে রেখেছে। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা ভেবে সাদা লোকটি এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। অকপটেই বলছি পবিত্রতম লোকদের তালিকায় যে পাঁচ ছটি নাম আছে ঘটনাচক্রে জন্মসূত্রে আমিও তাদের মধ্যে একজন। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম মিঃ স্টীফেনপট।

'পার্কেনস্টাকার" যুবকটি ভুল সংশোধন করে দিল্।

"মিঃ পার্কেনস্টাকার, আমি একটি বাবো জন্য কথা বলতে চেয়েছিলাম একজন স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে—যে মানুষ অর্থ ও তথাকথিত সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের ঘৃন্য চাকচিক্যের ফলে চরিত্র ভ্রষ্ট হয়নি ও আপনি জানেন না এই দুইয়ের চাপে আমি প্রচণ্ড ক্লান্ত—অর্থ, অর্থ,অর্থ। আমার আশেপাশে যাদের দেখছি সবই এক ছাঁচে ঢালা। সুখ, ভ্রমন, সমাজ, মণিমুক্তো সব রকম বিলাসিতা পেয়ে পেয়ে আমি ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ছি।

যুবকটি একটু ইতস্তত করে বলল—'সব সময়ই আমার একটা ধারনা ছিল যে টাকা পয়সাটা নিশ্চয় একটা ভাল জিনিস।"

"যা যোগ্য তা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু যখন কোটি কোটি টাকার মালিক হন তখন '—একটা হতাশার সুর মেয়েটার বক্তব্যে। একটু পরেই আবার বলল—অর্থের একঘেয়েমি জীবনকে বিস্বাদ করে তোলে। ভ্রমন, ডিনার; থিয়েটার নাচ, সাপার তার ওপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থের সোনালী মোড়ক। অনেক সময় আমার শ্যাম্পেনের গ্লাসে বরফের টুকরোর টুং টাং আওয়াজ আমায় অস্থির করে তোলে।

মিঃ পার্কেন স্টাকারকে দেখে খুব আগ্রহী মনে হল না। বলল—ধনবান ও ফ্যাশানদুরস্ত লোকেদের কথা পড়তে ও শুনতে আমি সব সময় ভালবাসতাম। মনে হচ্ছে আমি হয়তো

একজন স্নবের মত কথা বলছি। কিন্তু আমি চাই যে খবরটা যেন সঠিক হয়। হ্যাঁ, আমার তো ধারনা ছিল যে শ্যাম্পনকে ঠাণ্ডা করা হয় বোতলে রেখেই, গ্লাসের মধ্যে বরফ ডুবিয়ে নয়।

মজা পেয়ে সুরেলা গলায় মেয়েটি হেসে উঠল। প্রশ্রয় দেবার সুরে মেয়েটি বলল—আপনার জানা উচিত আমাদের মত মানুষ আমোদ প্রমোদের ব্যাপারে প্রথাবর্হির্ভূত পথটাই বেছে নেয়। এই মুহূর্তে শ্যাম্পেনে বরফ রাখাটাই ফ্যাশন। "তাতার দেশের প্রিন্স যখন এ দেশে এসেছিলেন তখন ওয়ালডর্ফ-এ ডিনারের সময় এই ধারনাটার সূত্রপাত করেছিলেন। ঠিক যেমন এই সপ্তাহে ম্যাডিসন এভিনিউ-র একটা পার্টিতে প্রতিটি অতিথির প্লেটের পাশে একটা করে কিড চামড়ার সবুজ দস্তানা রাখা হয়েছিল যাতে জলপাই খাবার সময় সকলেই সেটা হাতে পরে নিয়ে খেতে পারেন।

যুবকটি বিনীত ভাবে জেনে নেওয়ার ভঙ্গি করল—'বুঝেছি। বিশিষ্ট মহলের এই সব পরিবর্তন সাধারন মানুষদের কাছে জনপ্রিয় নয়।'

মাথা নেড়ে ভুল স্বীকার করে মেয়েটি বলল—কখনও কখনও আমি ভেবেছি যে কাউকে যদি ভালবাসি তাহলে সে হবে নিচু তলার কোন মানুষ,যে কাজ করে খায়, অলস, পরগাছা নয়। কিন্তু জাত ও অর্থে দাবীই যে আমার ইচ্ছার চাইতে বড় হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঠিক এই মুহূর্তে দুটি লোক আমার পথ আটকে দাঁড়িয়ে। এক জার্মান রাজ্যের গ্র্যাণ্ড ডিউক। অপর জন এক ইংরেজ মার্কুইস। প্রথমজনের মনে হয় স্ত্রী আছে বা একসময় ছিল। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র ও নিষ্ঠুরতার চাপে সে পাগল হয়ে বেঁচে আছে। দ্বিতীয় জন আবার এতই পিশাচ ও নিষ্ঠুর যে তার তুলনায় ডিউকের পৈশাচিকতা বুঝি ভাল। এইসব কথা আপনাকে কেন বলছি মিঃ প্যার্কেনস্টাকার?

"পার্কেনস্টাকার" যুবকটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সত্যি আপনি জানেন না যে আপনার এই বিশ্বাস আমার কাছে কত মূল্যবান।"

"আচ্ছা মিঃ পার্কেনস্টাকার আপনি কিসের ব্যবসা করেন?"

"খুবই ছোট ব্যবসা। কিন্তু আমি জানি এ পৃথিবীতে একদিন আমি মাথা তুলে দাঁড়তে পারব। আপনি যে বললেন একটি নিচু তলার মানুষকে আপনি ভালবাসতে চান সেটা কি সত্যি আপনার মনের কথা।"

"সত্যি। কিন্তু আমি বলেছি 'যদি'। আপনি তো শুনলেন গ্রাণ্ড ডিউক ও মার্কুইসের কথা। তবে হ্যাঁ সে মানুষটি হবে খাঁটি আশাকরি তার কোন কাজকর্মই খুব বেশি নীচু স্তরের হতে পারে না।'

পার্কেনস্টাকার জোর গলায় ঘোষনা করল, "আমি একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করি।"

মেয়েটি কিঞ্চিৎ কুঁকড়ে গেল। বলল, "ওয়েটারের কাজ তো নয়। পরিশ্রম করা ভাল, কিন্তু—কিন্তু ব্যক্তিগত সেবা বুঝতেই পারছেন—খান খানসামা আর—"

"আমি ওয়েটার নই, আমি খাজাঞ্চি—" পার্কের উল্টো দিকে রেষ্টুরেন্টের দিকে দেখিয়ে বলল—"ওই যে রেস্টুরেন্ট ওটাই।"

মেয়েটি হাতে ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল, বইটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। জিজ্ঞাস করল—"আপনি এখনও কাজে যাননি কেন?"

"আমার আজ রাতে ডিউটি। কাজ শুরু হতে এখনও এক ঘন্টা বাকি। আমি কি আশা করতে পারি যে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে?"

"আমি জানি না। হয়তো—কিন্তু আর একবার সে রকম খেয়াল আমার নাও হতে পারে। আমায় এখনই যেতে হবে। একটা ডিনার আছে, নাটক দেখার জন্য একটা বক্সও ঠিক করা আছে—আর ও সেই পুরনো ঘুরে আসা। এখানে আসার পথে নিশ্চয়ই দেখেছেন সাদা রঙের মোটর গাড়ি।

"আর গিয়ারটা লাল"—যুবকটি ভুরু কোঁচকাল।

'হ্যাঁ সবমসয় আমি ওটাতেই বসি। পিয়ের সেখানেই আমার জন্য অপেক্ষা করে। সে ধরেই নেয় যে ওদিককার বিভাগীয় বিপনিতে আমি কেনাকাটা করব। জীবনের বন্ধনের কথাটা ভাবুন—নিজের সোফারকেও ফাঁকি দিতে হয়। শুভরাত্রি।'

মিঃ পার্কেনস্টাকার বলল—"কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেছে আর পার্কের ভিতরটা বাজে লোকে ভর্তি, আমি কি আপনাকে একটু এগিয়ে—"

মেয়েটি দৃঢ়স্বরে বলল—আমার ইচ্ছার প্রতি যদি আপনার কণামাত্র শ্রদ্ধা থাকে তাহলে আমি চলে যাবার পর দশ মিনিট এই বেঞ্চে বসে থাকবেন। আমি আপনার কাছে নালিশ জানাচ্ছি না। কিন্তু আপনি হয়ত জানেন যে সাধারণত গাড়িগুলোতে মালিকের মনোগ্রাম আঁকা থাকে। আবার বলি, শুভরাত্রি।

রাজকীয় চালে মেয়েটি দ্রুত পায়ে অন্ধকারে পা বাড়াল। যুবকটি দেখল মেয়েটি সেই মোটর গাড়ির দিকেই গেল। নিজে বিশ্বাসঘাতকের মত অসংকোচে পার্কের গাছ গাছালির আড়াল থেকে মেয়েটির ওপর তীক্ষ্ণ নজর বাখল।

মোড়ে পৌছেই মেয়েটি মোটরটার দিকে এক নজর তাকিয়ে রাস্তাটা পার হয়ে গেল। সুবিধামত জায়গায় নিজেকে আড়াল করে তার ওপর নজর রেখে চলল যুবকটি। পার্কের উল্টোদিকের বড় রাস্তাটার একটা গলিতে সেই রেষ্টুরেন্টটায় ঢুকে পড়ল। যেখানে সস্তায় ভাল ডিনার পাওয়া যায়। রেস্টুরেন্টে ঢুকে মেয়েটি পিছনের একটা ছোট ঘরে গিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল টুপি আর ঘোমটাটা রেখে।

খাজাঞ্চির ডেস্কটা সামনের দিকে। লাল চুলেব মেয়েটি যে এতক্ষণ টুলে বসেছিল এবাব সে নেমে এল। নামতে গিয়ে ঘড়িটা দেখল। ধূসর পোশাকের মেয়েটি এবার তাতে বসল।

যুবকটি দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে ধীর পায়ে গলি ধরে ফিরে এল। একটা ছোট বই তার পায়ে ঠেকল। সুদৃশ্য মলাটটা দেখেই চিনতে পারল মেয়েটি এই বইটাই পড়ছিল। তুলে দেখল—বইটির নাম নব আরব্য রজনী, লেখক স্টিভেন্সন। বইটিকে আবার ঘাসের ওপর ফেলে খানিক হেঁটে মোটর গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে মাত্র দুটি কথা বলল—"হেনরি ক্লাব"।

* While the Auto waits

ক্ষণিকের অতিথি

ব্রডওয়েতে এমন একটা বড় মাপের শীতল হোটেল আছে যার খবর গ্রীষ্ম আবাসনের উদ্যোগীরা রাখেন। সেখান খাওয়ার দেশীর ব্যবস্থা আছে। সবুজ গাছপালার সমারোহ আছে। যে কেউ তার চওড়া সিঁড়ি বা এলিভেটরে করে স্বপ্নের আমেজ নিয়ে উঠতে পারে। সঙ্গে গাইডরা তো আছেই। রান্নাঘরে এমন একজন প্রধান রাঁধুনি আছে যার রান্নার তুলনা হয় না।

মানহাটানের জুলাই মাসে, মরুভূমিতে এই মরুদ্যানের খবর অল্প লোকই জানে। পুরো মাসটায় দেখতে পাবেন হোটেলের স্বল্পসংখ্যক অতিথি উঁচু খাবার ঘরটায় পা ছড়িয়ে বসে আছে শীতল গোধূলি আলোর নীচে। খানসামারা সর্তক দৃষ্টি মেলে বাতাসের মত সাবলীল ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখের কথা বের হবার আগেই যেটা প্রয়োজন সেটা পৌঁছে দিচ্ছে। এখানে যেন চিরবসন্ত বিরাজ করছে। সিলিং-এ জলরঙে আঁকা হয়েছে নকল গ্রীষ্মের আকাশ। তাতে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতির মেঘের মত এই মেঘ সরে গিয়ে আমাদের কষ্ট দেয় না।

দূর থেকে ব্রডওয়ের জন কোলাহল সেখানকার অতিথিদের কল্পনায় হয়ে ওঠে ঝর্ণার কুলকুল শব্দ। যে কোন অপরিচিত পদধ্বনি পেলেই অতিথিরা উৎকর্ণ হয়ে ওঠে, এই বুঝি তাদের এই নিরালা নিশ্চিন্ত অবসরের হোটেলটি সেই সব অক্লান্ত সুখ সন্ধানীদের নজরে পড়ে যায় যার সুখ শান্তির সন্ধানে প্রকৃতির কোণে কোণে ঘুরে বেড়ায়।

অল্প কয়েকজন অতিথি গ্রীষ্মকালে এই হোটেলে এসে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজেদের লুকিয়ে রাখে আর মহা আনন্দে উপভোগ করে পর্বত ও সমুদ্র সৈকতে বসবাসের সব রকম আরাম যা শিল্প কলা কৌশলের দৌলতে তাদের জন্য এখানে সর্বদাই মজুত থাকে।

এই জুলাই মাসে এমন একজন অতিথি এসে হাজির হলেন যার কার্ডে নাম লেখা ছিল 'মাদাম হেলর ডি' আর্ক বুমঁৎ"।

মাদাম বুমঁৎ এর মত অতিথিই 'হোটেল লোটাস' এর প্রিয়। তাঁর সম্ভ্রান্তজনের মত আচরনে, সৌজন্যে, স্নিগ্ধ হয়ে দুদিনেই হোটেলের কর্মীরা ক্রীতদাসে পরিণত হল। তার ঘরের বেল বাজলেই বেলবয়রা পাল্লা দিয়ে ছোটে। মালিকানার ব্যাপারটা না থাকলে হয়ত কর্মীরা জিনিসপত্র সমেত হোটেলকে তার নামে লিখে দিত। অন্য অতিথিদের চোখে সেতো নারীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের চরম পরাকাষ্ঠা।

এই অতি সম্মনিত অতিথিটি কদাচিৎ হোটেলের বাইরে বেরুতেন। তাঁর চলন বলন 'হোটেল লোটাস' এর চিরাচরিত রীতিনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামাঞ্জস্য পূর্ণ।

'হোটেল লোটাস' এ সম্পূর্ণ নিসঙ্গ হলেও মাদাম বুমঁৎ রাণীর মর্যদা নিয়েই বাস করতেন। গোধূলি বেলার একটি জুঁই ফুলের মত সহজ উজ্জ্বলতায় চলাফেরা করেন ধীরে সুস্থে, শান্ত ও মধুর পদক্ষেপে।

মাদমের উৎকর্ষ চরমে ওঠে ডিনারের সময়। তখন তিনি পরেন একটি কুয়াশার মত স্বপ্নভরা গাউন। সে গাঁউনটাকে প্রধান পরিচারিকা পর্যন্ত সমীহ করে চলে। গাউনটাকে দেখলেই আপনার মনে হবে প্যারিসের কথা, মনে পড়বে কোন রহস্যময়ী কাউন্টেসকে, ভার্সাইকে, সরু ফলা তরবারিকে এবং মিসেস ফিস্কেকে। এখনি 'হোটেল লোটাস'-এ একটা গুজব রটে গেল মাদাম একজন সংস্কারমুক্ত বিশ্বমানবী, আর যে সব জাতি রাশিয়ার স্নেহধন্য তাদের সকলেই নাকি তিনি তা র সাদা হাতের সুতোর টানে খেলিয়ে বেড়ান। সুতারং গ্রীষ্মের দাবদাহে তিনি যে অবসর সময় কাটাবার উপযুক্ত সময় হিসাবে আমেরিকার হোটেল লোটাসকেই খুঁজেনেবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

মাদাম বুঁমৎ হোটেলে আসার তিনদিন বাদে এক যুবক এসে উঠলেন। তাঁর পোশাক ভদ্রজনের মত, দেখতে শুনতে ভাল, হালচাল বিশ্বমানবের উপযুক্ত। তিন চারদিন হোটেলে থাকবেন। ইওরোপগামী স্টীমার কবে ছাড়াবে সে সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ক্লান্তিতে শুয়ে পড়লেন।

যুবকটির নাম হ্যারল্ড ফ্যারিংটন। 'লোটাস' এর নিজস্ব, শান্ত জীবনস্রোতের সঙ্গে তিনি এমন মিশে গেলেন যে সেখানকার অতিথিদের মধ্যে আশঙ্কার দোলা লাগল না।

হ্যারল্ড ফ্যারিংটন আসার পরের দিন ডিনারের পর মাদাম বুঁমৎ চলে যাবার সময় রুমালটা ফেলে গেলে মিঃ ফ্যারিংটন সেটা তুলে তাকে দিলেন। কিন্তু তার মধ্যে পরিচয় প্রত্যাশীর উৎসাহ বা উচ্ছ্বাসের কোন লক্ষন দেখা গেল না।

হয়তো লোটাসের অতিথিদের মধ্যে এক রহস্যময় ভাতৃত্ববোধ থাকত। এই ব্রডওয়ে হোটেলটিকে আবিষ্কারের পর পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হবার দরুন তারা পরস্পরের প্রতি আকর্ষনবোধ করতেন হয়ত। আসা যাওয়ার পথে দুজনের মধ্যে সৌজন্যমূলক কথাবার্তাও চলল এই সত্যিকারের অবসর আবাসনের হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশের জন্যই পরিচয়ের অঙ্কুরে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। যে বারন্দায় করিডোর শেষ হয়েছে সেখানে অল্প কয়েক মিনিটের জন্য দুজনে এসে কথার বৃষ্টি শুরু করলেন।

মিষ্টি হেসে মাদাম বুঁমৎ বললেন—'পুরনো আবাসে থাকতে থাকতে অনেকেই ক্লান্ত বোধ করে। হৈ হট্টোগোল বা ধুলো ময়লাকে এড়াবার জন্য পাহাড়ে বা সমুদ্র তীরে গিয়ে কি লাভ? ঐ দুটো সেখানেও পিছু ধাওয়া করে?'

ফ্যারিংটন দুঃখের সঙ্গে বলল—'সমুদ্রের ওপরেও অমার্জিত রুচির ফিলিসিয়রা পিছু নেবে। অত্যন্ত সংরক্ষিত স্টিমারগুলিও আজকাল খেয়া নৌকার মত হয়ে গেছে। ভগবান করুন গ্রীষ্মকালের ভ্রমণ পিপাসুরা যেন আমার লোটাস-এর খোঁজটা না পায়।

মাদাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মিষ্টি হেসে বললেন, আশা করি এক সপ্তাহ কালের জন্য আমাদের এই গোপন আস্তানাটা নিরাপদই থাকবে। তারা যদি আমাদের প্রিয় লোটাসে এসেও হানা দেয় তাহলে কোথায় যে যাব তাও জানি না। গ্রীষ্মকালের পক্ষে এরকম আনন্দময় আর একটা জায়গার কথা জানি—সেটা হচ্ছে উরাল পর্বতমালায় অবস্থিত কাউন্ট পোলিন্স্কির দুর্গটা।'

ফ্যারিংটন বলল-শুনেছি 'বাডেন-বাডেন' এবং 'কানেম' নাকি এ মরশুমে প্রায় ফাঁকাই যাচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে পুরনো গ্রীষ্মাবাসগুলির সুনাম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হয়তো আমাদের

মত আরও অনেকেই এই রকম শান্ত নীড় খুঁজে বের করছে যেখানে ভ্রমণ পিপাসুরা দলে দলে এসে ভীড় করে না।

মাদাম বুঁমৎ বললেন—আমি তো স্থির করেই ফেলেছি। এই মনোরম বিশ্রাম সুখটি আরও তিনটি দিন ভোগ করব। সোমবারে সেড্রিক জাহাজ এখান থেকে যাত্রা করবে।

ফ্যারিংটান জানাল-আমিও সোমবারেই যাব। কিন্তু বিদেশে যাব না।

মাদাম বুঁমৎ কাঁধ ঝাঁকালেন।

যত মনোহারিনীই হোক কেউ তো চিরকাল এখানে লুকিয়ে থাকতে পারে না। এক মাসের বেশি হয়ে গেল আমার? ভাবনাটা তৈরী হয়ে আছে। তবু হোটেল লোটাস এর এই এক সপ্তাহকে আমি কোনদিন ভুলব না।

ফ্যারিংটন বলল—আমিও না। আবার সেড্রিকও আমি কোনদিন ক্ষমা করব না।

তিন দিন পরের রবিবারের সন্ধ্যায় দুজনে এসে সেই একই বারন্দায় ছোট টেবিল নিয়ে বসলেন। এক পরিচারক বরফ ও ছোট্ট গ্লাসে মিষ্টি মদ এনে দিল।

মাদাম প্রতিদিন ডিনারে যে গাউনটা পরেন সেটি পরেছিলেন। তাঁকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। আইসক্রিম শেষ করে একটা ছোট্ট শিকল লাগান টাকার থলি থেকে এক ডলারের বিল বার করলেন।

স্মিত হেসে বললেন, 'মিঃ ফ্যারিংটন, আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই। আমি ফিরে যাচ্ছি সকালে প্রাতঃরাশের আগেই, কাজে যেতে হবে। ক্যাসির স্যাময় স্টোর-এর হোসিয়ারি কাউন্টারে আমি বসি। কাল সকাল আটটাতে আমাব ছুটি শেষ। পরের শনিবার বেতন না পাওয়া অবধি এই এক ডলারই আমার সম্বল। আপনি সত্যিকারের একজন ভদ্রজন, আমাকে আপনি ভাল চোখেও দেখেছেন, তাই চলে যাবার আগে কথাটা আপনাকে বলে যেতে ইচ্ছা হল।

একটা বছর ধরে আমি বেতনের টাকা থেকে কিছু জমিয়েছি শুধু এই ছুটি কাটাবার জন্য। আর যদি সুযোগ না পাই তাই একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার মতই এক সপ্তাহ কাটাতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম প্রতিদিন সকাল সাতটার সময় ঘর থেকে মাথা নিচু করে না বেরিয়ে যখন ইচ্ছা বিছানা থেকে উঠব, সব চাইতে ভালভাবে বাঁচব এবং ধনী মানুষদের মত যখন যা চাই ঘন্টা বাজিয়ে পরিচারককে ডেকে বলব, সেবা-পরিচর্যা ভোগ করব। সে কাজটা আমি যথাযথ ভাবেই করেছি জীবনে সব চাইতে সুখের যে দিনগুলির স্বপ্ন দেখেছি আমার সে স্বপ্ন সফল হয়েছে। আমি ফিরে যাচ্ছি, আবার একটা বছরের জন্য সেই কাজের জগৎ আর আমার ছোট শোবার ঘর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব। মিঃ ফ্যারিংটন, আমাকে আপনার ভাল লেগেছে, আমারও আপনাকে। কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত আপনাকে না ঠকিয়ে পারিনি, কারণ আমার কাছে এ সব ছিল রূপকথার গল্পের মত। তাই আমি ইউরোপের কথা বলেছি, অন্য সব দেশের কথা বইতে পড়েছিলাম, তার থেকে বলেছি যাতে মনে হতে পারে আমি একজন মহিয়সী মহিলা।

এই যে পোশাকটা আমি পরে আছি, পরবার মত এই একটাই, কিনেছি কিস্তিতে, ও ডাউড গ্র্যাণ্ড লিভিনস্কি থেকে। দাম নিয়েছিল পঁচাত্তর ডলার। আমি নগদে দিয়েছি ১০

ডলার, বাকিটা তারাই সপ্তাহে ১ ডলার করে কেটে নেবে। হ্যাঁ আর একটা কথা—আমার নাম বোমি সিভিটার, মাদাম বুঁমৎ নয়। আমার প্রতি যেটুকু মনযোগ দিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ। কাল সকালে এই ডলারটা দিয়ে এ কিস্তিটা শোধ করব। আমি আশা করি এবার আমি যেতে পারি।

ফ্যারিংটন অবিচলিত মুখে লোটাস-এর সব চাইতে মনোহরিণী অতিথির কথা শুনলেন। বলা শেষ হলে পকেটথেকে একটা চেক বই বার করে ফাঁকা পাতায় কি লিখে পাতাটা ছিঁড়ে তাকে দিয়ে ডলারটা তুলে নিলো।

মুখে বললেন আমাকেও সকালেই কাজে যোগ দিতে হবে। অতএব আমার কথাও বলে নেওয়া ভাল। এই যে ডলার কিস্তির রসিদ। তিন বছর ধরে ডাউড অ্যাণ্ড লেভিনস্কি'র পক্ষে কিস্তির টাকাটা আমি সংগ্রহ করি! আমরা দুজনে একই রকম চিন্তা ভাবনা নিয়ে ছুটি কাটাতে এসেছি, খুবই মজার ব্যাপার তাই না? সব সময় ভাল হোটেলেই ছুটিটা কাটাতে চাই। আর আমার প্রাপ্ত ক্ষমতার কুড়ি ডলার জমিয়ে রাখি। এরপরও তাই করেছি। আচ্ছা বোমি শনিবার রাতে ওই বোটে করে কোনিতে এক চক্কর ঘুরে আসার ব্যাপারে আপনার মতামতটা কি বলুন তো?

নকল মাদাম হেলর ডি আর্ক বুঁমৎ এর মুখটা ঝলমল করে উঠল।

ওঃ মিঃ ফ্যারিংটন, আমি বাজি রেখে বলছি অবশ্যই যাব, শনিবার বেলা বারটায় দোকান বন্ধ হয়। আমি তো মনে করি, একটা সপ্তাহ ভিড়েব মধ্যে কাটাতে হলেও কোনি আমাদের মনের মতোই হবে।

বারান্দার নীচে ঘামে ভেজা জুলাই মাসের মহানগর কোলাহলে মুখর। 'হোটেল লোটাস' এর ভিতর শীতল ছায়ার রাজত্বে মাদাম ও তার সঙ্গীব সেবায় দাঁড়িয়ে এক উৎসুক পরিচারক।

এলিভেটরের দরজায় মিঃ ফ্যারিংটন আর মাদাম শেষ বারের মত উপবের ঘরের দিকে। নিঃশব্দে নিজের ঘরে পৌছবার আগেই শুনলেন—ফ্যারিংটন নামটা কিন্তু ভুলে যাবেন। আমার নাম জেমস ম্যাকমেনাস। অনেকে আমাকে জিমি বলেও ডাকে।

"শুভরাত্রি জিমি"—মাদাম বললেন।

* Transients in Arcadia

জনৈক কৃপণ প্রেমিক

ম্যাসী নামে মেয়েটি বৃহৎ ভাণ্ডার-এর তিন হাজার মহিলা কর্মীদের মধ্যে একজন। অষ্টাদেশী মেয়েটি পুরষের দস্তানা বিভাগের দোকানী। এখানে দুধরনের মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। এক শ্রেণীর পুরুষ যারা বিভাগীয় বিপনি থেকে নিজেদের জন্য দস্তানা কেনে আর এক শ্রেণীর মহিলা যারা দস্তানা কেনে দুর্ভাগা পুরুষদের জন্য। মানব জাতি সম্পর্কে এই ব্যাপক জ্ঞানটুকু ছাড়া আরও কিছু তথ্য ম্যাসী সংগ্রহ করেছে।

আর বাকী ২৯৯৯ জন মেয়েদের মুখ থেকে শুনেছে জ্ঞানের কথা। সেগুলো মস্তিষ্কে জমা করে রেখেছে। প্রকৃতি দেবী হয়তো আগেই দেখতে পেয়েছিলেন যে মেয়েটির কপালে সৎপরামর্শদাতা জুটবে না। তাই রূপের সঙ্গে সঞ্চয়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিটুকু দিয়েই তাকেই সংসারে পাঠিয়েছিলেন।

ম্যাসী সুন্দরী, ঘন নীলনয়না, বৃহৎ ভাণ্ডারের কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকে, আর টুটি ফ্রুটি চিবোয়। ঘটনাক্রমে একদিন আর্ভিং কার্টার বৃহৎ ভাণ্ডার-এ এল। লোকটি চিত্রকর, কোটিপতি, পর্যটক, কবি ও মোটরবিহারী। এখানে বলে রাখা ভালযে স্বেচ্ছায় সে এ দোকানে ঢোকে নি। পুত্রের প্রতি কর্তব্য তাকে এখানে টেনে এনেছে। আর তার মা ব্রোঞ্জ ও টেরাকোটার মূর্তিগুলো দেখে বেড়াচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে কার্টার দস্তনার কাউন্টারে এল। সত্যি সত্যি তার দস্তানার দরকার ছিল। নিজের দস্তানা আনতে সে ভুলে গিয়েছিল। তবু এখানে এসে পড়েছে বলে তাকে কোন কৈফিয়ৎ দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

কাউন্টারের ও পাশ থেকেই ম্যাসি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কার্টারের দিকে তাকাল। তখন চোখের দৃষ্টিতে ঝড়ে পড়ছিল বরফের টুকরোর ওপর সূর্যকিরনের ঠিকরে পড়া আলো।

আর তখনই চিত্রকর, আর্ভিং কার্টারের ম্লান মুখে ঝিলিক দিল একটি আতপ্ত রক্তিম আভা। কোন রকম হীনতাবোধ নয়, ঝিলিকটি বুদ্ধিদীপ্ত। তার মনে হল অন্য মেয়েদের মত সেও একনজর সোহাগের দৃষ্টি দিক তার দিকে।

দস্তানাব দাম মিটিযে সেগুলো নেওয়া হয়ে গেলেও সে একমুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। ম্যাসীব ঠোঁটের কোন টোলগুলি গভীর হল। একটা হাত ভাঁজ করে সাধকের ভঙ্গিতে শোকেসের কোনায কনুইটাকে বেখে দাঁড়াল।

আগে কোথাও কার্টার এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি। সামাজিক দিক থেকে এই সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা হবার কোন সুযোগই ছিল না। দোকানী মেয়েদের প্রকৃতি ও অভ্যাস সম্পর্কে সে যা কিছু পড়েছে যা শুনেছে মনে মনে সেই সব মেয়েরা মামুলি পরিচয় দেবার ব্যাপারে খুব একটা আমল দেয় না। এই মন-পসন্দ মেয়েটির কাছে সাক্ষাতের প্রস্তাবের কথা ভাবতে বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠল। এই ধুকপুকানিই তাকে সাহস যোগাল।

বন্ধু সুলভ কিছু কথাবার্তার পরে নিজের কার্ডটা কাউন্টারের মেয়েটির হাতে দিয়ে বলল—

আমাব কথাগুলি যদি খুব দুঃসাহসের পরিচয় দেয় তো দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি একান্তভাবেই আশা করছি যে আপনাকে আর একবার দেখতে পাবার আনন্দ আমাকে দেবেন। এতে আমার নাম লেখা আছে; আর আপনাকে শুধু এটুকু বলতে পারি যে সম্মানের সঙ্গে আপনার পরিচিতজন হবার অনুগ্রহটুকু আমি চাই। সেটুকু আশা কি আমি করতে পারি?

ম্যাসী মানুষ চেনে বিশেষ করে যারা দস্তানা কিনতে আসে, অসংকোচে, সহাস্য মুখে কার্টারের দিকে তাকিয়ে বলল—'অবশ্যই পারেন। আমি মনে করি আপনি ঠিক অনুমান করেছেন। যদিও আমি অপরিচিত ভদ্রলোকদের সঙ্গে কোথাও যাইনা। এটা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের ঠিক মানায় না। আপনি আবার কখন আমার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

কার্টার—'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আপনি যদি আমাকে আপনার বাড়ি যাবার অনুমতি দেন তাহলে আমি—'

ম্যাসী সুরেলা গলায় হেসে উঠে জোর দিয়ে বলল—ওঃ না। না। আপনি যদি আমাদের ফ্ল্যাটটা দেখতেন।! তিনটে ঘরে পাঁচ জন থাকি। কোন ভদ্রলোক বন্ধুকে সেখান নিয়ে যাওয়া যায় না।

মোহিত কার্টার বলল—'তাহলে আপনার সুবিধামত যে কোন জায়গায়।'

ম্যাসী বলল ধরুন, বৃহস্পতিবার রাত্রে হলে আমার পক্ষে ভাল হবে। আচ্ছা আপনি যদি ৭.৩০টায় আটম এভেনিউ ও আটচল্লিশতম স্ট্রীটের মোড়ে আসেন। আমি ওই মোড়ের কাছেই থাকি। আমাকে কিন্তু এগারোটার মধ্যেই ফিরতে হবে। মা তারপরে আর বাইরে থাকতে দেয় না।'

কার্টার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কথা দিল যে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতে হাজির থাকবে, বলে মার কাছে চলে এল। একটা ব্রোঞ্জের মূর্তির কেনার ব্যাপারে মাও তাকে খুঁজছিল।

ছোট চোখ ও বোঁচা নাকওয়ালা একটা মেয়ে ম্যাসীকে গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করল—লোকটার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে ফেললে নাকি ম্যাসী।

কার্টারের কার্ডটাকে পকেটে রেখে বেশ চালের সঙ্গে জবাব দিল। ভদ্রলোক দেখা করার অনুমতি চাইলেন তাই—

চাপা হাসি হেসে মেয়েটি বলল—'দেখা সাক্ষাতের অনুমতি! ওয়ালডর্ফ-এ ডিনার খাওয়া, তারপর গাড়ীতে চেপে একটু ঘুরে আসা। এ সব কিছু বলেছে কি?'

ম্যাসী বিরক্তিতে বলে উঠল—আঃ যাও তো! সব কিছু বাড়িয়ে বলাই তোমার স্বভাব। না, সে ওয়ালডর্ফ-এর কথা বলে নি, তবে তার কার্ডে পঞ্চম এভেনিউ এর ঠিকানা আছে। আর সে যদি সাপার খাওয়ায় তাহলে নিশ্চয় তামাক পাতা খাওয়াবে না।'

কার্টার যখন মাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে তখন বুকের মধ্যে একটা বোবা ব্যাথা অনুভব করল, ঠোঁট কামড়ে ধরল। উনত্রিশ বছরের জীবনে এই প্রথম প্রেমের আবির্ভাব ঘটেছে। আর সেই ভালবাসার মানুষটি যে পথের মোড়ে দেখা করার দিন ক্ষণ স্থির করে ফেলেছে সেটা তার মনোমত হলেও দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

দোকানী মেয়েটিকে কার্টার চেনে না। তার বাড়িটা যে কোন রকমে বাস করার মত একটা ছোট্ট ঘর অথবা আত্মীয় স্বজনে ভর্তি একটা সংসার তাও সে জানে না। রাস্তার মোড় তার বৈঠকখানা, পার্ক তার ড্রইংরুম, এভিনিউটাই বেড়াবার বাগান, তবু সেখানেই সে এক সর্বময়ী কর্ত্রী, ঠিক যেমনটি আমার কর্ত্রী তার পর্দা ঝোলান কক্ষে।

দু সপ্তাহ পরে এক সন্ধ্যায় গোধূলি ক্ষণে কার্টার ও ম্যাসী হাত হাত ধরে স্বপ্নালোকিত পার্কে বেড়াচ্ছিল। ছায়াঢাকা নির্জন বেঞ্চে দুজনে বসল।

এই প্রথম কার্টারের হাত ম্যাসীর কোটি বেষ্টন করল। ম্যাসী সোনালী চুল ভর্তি মাথাটা পরম নিশ্চিতে কার্টারের কাধে এলিয়ে দিল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে ম্যাসী কৃতজ্ঞ চিত্তে বলল—একথাটা তুমি আগে কখনও ভাবনি কেন?

কার্টার সাগ্রহে বলে উঠল—ম্যাসী তুমি জান আমি তোমাকে ভালবাসি। মন থেকে বলছি আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। এত অল্প সময়ে আমার যেটুকু জেনেছ তাতে নিশ্চয় আমার সম্পর্কে তোমার কোন সন্দেহ জন্মায় নি। আমি তোমাকে চাই, আর তোমাকে পাবও। আমাদের সমাজের মধ্যে যত ফারাকই থাকুক আমি গ্রাহ্য করিনা।

চাপা স্বরে বলল—তুমি আমাকে বিয়ে কর ম্যাসী। তার পরেই এ শহর ছেড়ে চলে যাব অন্য শহরে। আমরা ভুলে যাব কাজ, দেনা পাওনার হিসাব, জীবন হয়ে উঠবে দীর্ঘ অবকাশ। আমি জানি কোথায় তোমাকে নিয়ে যাব। প্রায়ই আমি সেখানে যাই। এমন একটা সাগর সৈকতের কথা ভাব যেখানে চির বসন্ত বিরাজ করে, সেখানে উর্মিমালা ভেঙে পড়ে মনোরম সৈকতে, যেখানে মানুষ শিশুর মত সুখী ও মুক্ত। যতদিন ইচ্ছা তোমার সেখানেই থাকব। অনেক দূরের সেই সব শহরের একটি শহরে আছে মস্ত বড় প্রাসাদ ও গম্বুজ ; সব কিছুই ছবি ও মূর্তি দিয়ে সাজান। জলই সে শহরের পথ, সকলে পথ চলে—।

'আমি জানি—হঠাৎ ম্যাসী বলে উঠল, 'গণ্ডোলায় চড়ে।'

'ঠিক'! কার্টার হাসল, বলল—'তারপর আমরা ভ্রমনে বের হব। পৃথিবীতে যেখানে যা আছে সব দেখব। ইউরোপের শহরগুলো দেখা হয়ে গেলে যাব ভারতবর্ষে। সেখানকার বড় বড় শহরে নগর দেখব, হাতিতে চড়ব, হিন্দু ও ব্রাহ্মনদের আশ্চর্য সব মন্দির দেখব। জাপানীদের বাগান দেখব., পারস্যের উঠের শোভাযাত্রা ও রথের দৌড় দেখব। আর দেখব বিদেশের সব অদ্ভুত দৃশ্য। তোমার কি মনে হচ্ছে না এসব কিছুই তোমার ভাল লাগবে ম্যাসী।'

ম্যাসী উঠে দাঁড়াল।

ঠাণ্ডা গলায় বলল—'আমি ভাবছি এবার বাড়ি গেলে হয়। বেশ দেরী হয়ে গেছে।'

কার্টার নানাভাবে তাকে তুষ্ট করে চলল। তার মেজাজটা কার্টার বুঝে ফেলেছে। তার কথা অমান্য কর' বৃথা। মনে হল সে জয়ী হয়েছে। ক্ষণকালের জন্য হলেও একটা রেশমি সূতো দিয়ে মনটাকে বাঁধতে পেরেছে। মেয়েটি তো একবারের জন্যও পাখনা গুটিয়েছে, ঠাণ্ডা হাতে জড়িয়ে কিসের ফারাক? ম্যাসীর কৌতুহলী প্রশ্ন।

কার্টার তাড়াতাড়ি বলল—'আরে আসলে কোন ফারাকই নেই। ফারাকটা আছে কেবল বোকাদের মনে। তোমাকে একটা বিলাস বহুল জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা আমার আছে। আমার সামাজিক মর্যাদা তর্কের অতীত, আর আমার সম্পদও প্রচুর।'

'সকলেই তাই বলে।' মন্তব্য করল ম্যাসী। ''আমার ধারনা তুমি রেস খেল। আর আমাকে যতটা তাজা দেখায় আমি কিন্তু তা নই।'

কার্টার শান্তভাবে বলল—'তুমি যেকোন প্রমান চাও আমি দিতে পারি। আমি তোমাকে চাই ম্যাসী। প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছি সেই দিনই তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।'

ম্যাসী হেসে বলল—'ও রকম কথা তো সকলেই বলে থাকে। যদি কখনও এমন একটি লোককে দেখতে পাই যে আমাকে তৃতীয়বার দেখার পরেও আমার পিছনে লেগে থাকে তো তার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি।'

কার্টার অনুণয়ের সুরে বলল—'দয়া করে এ রকম কথাগুলি বোল না। আমার কথা শোন, প্রথম যেদিন তোমার চোখে চোখ রেখেছি সেদিন থেকে এ পৃথিবীতে তুমিই আমার কাছে একমাত্র নারী।'

'তুমি ঠাট্টা করছ না তো!' ম্যাসী হেসে বলল, 'এরকম কথা আর কতজন মেয়েকে তুমি বলেছ?'

তবু কার্টার হাল ছাড়লনা। অবশেষে সে পৌছে গেল মেয়েটির অন্তঃস্থলে। কথাগুলো ম্যাসীর বুকে বিধল। সে কার্টারের দিকে তাকাল, গাল দুটোতে রঙের ছোঁয়া লাগল।

ভীষণভাবে কাঁপতে কাঁপতে পতঙ্গ পাখা দুটি জুড়ে এল, মনে হল এখানেই সে ভালবাসার ফুলটির উপর বসবে।

কাউন্টারের বাইরে দাঁড়ান মানুষটির মধ্যে নেমে এল জীবনের একটা নিষ্প্রভ আলোর রশ্মি। পরিবর্তনটা বুঝতে পেরে কার্টার সুযোগ লুফে নিল। ম্যাসী ধরে কার্টারের হাত।

পরদিন ম্যাসীর এক বন্ধু লুলু কাউন্টারে তাকে পাকড়াও করল।

প্রশ্ন করল—'তুমি আর তোমার মোটা বন্ধু কেমন চালাচ্ছ?

চুল সরিয়ে ম্যাসী বলল-'ওঃ সেই লোকটা? সে আর এ শহরের মধ্যে নেই। আচ্ছা লু বলতো সে আমার কাছে কি আশা করছিল?'

লুলু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—'রঙ্গমঞ্চে যেতে বলেছিল কি?'

না, সে কাজ করার মুরোদ তার নেই। সে চেয়েছিল আমি তাকে বিয়ে করে মধুচন্দ্রিমা কাটানার জন্য কোন দ্বীপে চলে যাই।'

* A Lickpeny Lover

সর্বাধিক বিক্রিত বই

গত গ্রীষ্মকালে একদিন আমি কাজে গিয়েছিলাম পির্টস্‌বার্গে।

আমার চেয়ারকারটা যাত্রীতে ভর্তি ছিল। যাদের মধ্যে আধিকাংশই ছিল সেই সব আধুনিক ফ্যাশানের অবগুণ্ঠিত মহিলা যারা কিছুতেই জানালা খুলতে চাইছিল না। আর ছিল বেশ কিছু পুরুষ যারা যে কোন কাজে যে কোন জায়গায় যেতে পারে। মানব চরিত্র বুঝতে পারে এমন কোন মানুষ আছে যে কোচওয়ান গাড়ীর ভিতরে একটি লোককে বসে থাকতে দেখেই বলে দিতে পারে সে কোথা থেকে এসেছে, কি কাজ করে, পদমর্যাদা, সব কিছু বলে দিতে পারে। কিন্তু আমি সেটা কোনদিন পারি না।

একটা পোর্টার এসে জানলার ঝুল ঝেড়ে আমার ট্রাউজারের ওপরই ফেলল। আমি কিছু না বলে ঝেড়ে ফেললাম। আমি আলস্য ভাবে ৭নম্বর চেয়ারে হেলান দিয়ে সামনের ৯ নম্বরের মাথাটার দিকে তাকালাম।

হঠাৎ ঐ লোকটি একটি বই ছুড়ে দিল তার চেয়ার ও জানলার মাঝখানে মেঝের উপর। তাকিয়ে দেখি বইটি এখনকার সর্বাধিক বিক্রীত 'দি রোজ লেডি অ্যাণ্ড ট্রাভেলিয়ান'। তারপরে সেই লোকটি চেয়ারটা জানলার দিকে ঘোরাতেই তাকে আমি চিনতে পারলাম। পিট্‌সবার্গের জন. এ. পেস্কুড বলে একটা কোম্পানীর ভ্রামম্যান সেলসম্যান। আমার পূর্ব পরিচিত হলেও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি দু-বছর।

আমরা মুখোমুখি হয়ে করমর্দন করলাম, কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। তারপর হয়ত রাজনীতির কথা উঠত। কিন্তু ভাগ্য ততটা খারাপ ছিল না।

আপনারাও হয়তো জন এ পেস্কুডকে চেনেন। ছোটখাট মানুষটি, মুখে হাসি, বিভিন্ন রকম নেকটাই, কাফ লিংক ও ফিতে বাঁধা জুতোর পক্ষপাতী। 'কাম্প্রিয়া স্টীল ওয়ার্কস-এর তৈরী যে কোন বস্তুরই মতন সে খাঁটি।

সে বিশ্বাস করে যে তাদের প্লেট গ্লাস পৃথিবীর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মাল। আর একটা মানুষ যতক্ষন নিজের শহরে বাস করে তখন তার উচিত ভদ্র হওয়া ও আইন মেনে চলা।

'চিররাত্রির শহর'এ যখন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, তখন জীবন, রোমান্স,সাহিত্য ও নীতি শাস্ত্র বিষয়ে তার মতামত কিছুই মানতাম না। যখনই লেখা হয়েছে অন্য বিষয়ে কথা হয়েছে। এবার সে আরও কিছু কথা জানাল। কারবার ভালই চলছে আর কিছুদিনের মধ্যেই কোকটাউন যাচ্ছে।

ফেলে দেওয়া বইটিকে ডান পা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে পেস্কুড বলল। বল তো এই সব বেষ্ট সেলার-এর একখানা কি তুমি পড়েছ? আমি বলছি সেই সব বইয়ের কথা যার নায়ক হচ্ছে. আমেরিকার কোন কুবের বা শিকাগো থেকেও আসতে পারে সে, ইওরোপ ভ্রমনরত কোন রাজকন্যার প্রেমে পড়েছে এবং তার সঙ্গেই ফিরে যাচ্ছে তার বাবার রাজ্যে বা প্রধান শহরে। সকলেই এক রকম। অনেক সময় এই নাগর হয় কোন ওয়াশিংটন সংবাদপত্রের সংবাদদাতা, না হয় নিউইয়র্ক অথবা শিকাগোর জনৈক কোটিপতি গমের দালাল। কিন্তু যাই হোক তাবা সব প্রস্তুত থাকে বিদেশী রাজা রাজড়াদের দলে গিয়ে ভিড়তে যারা তাদের রাণীদের ও রাজকন্যাদের পাঠায় স্বামীর সন্ধানে।

"তারপর—কোন বেষ্ট সেলার বই পড়ে থাকলে কিভাবে এগিয়ে চলে গল্পটা তা ভাল করেই জানবে।"

পেস্কুড তখন বইটা তুলে নিয়ে খুঁজে খুঁজে একটা পৃষ্ঠা বেব করে বলল, এখানটা শোন। টিউলিপ বাগানের পেছন দিকে ট্রেভেলিয়ান রাজকন্যা অলউইনার সঙ্গে প্রেমালাপরত। ব্যাপরটা এই রকম—

"পৃথিবীর সুন্দরতম ফুলের মধ্যে তুমি প্রিয়তম ও মধুরতম। তাই এমন কথা তুমি বোল না। স্বর্গরাজ্যের তারা তুমি তোমার দিকে কি হাত বাড়াতে পারি?"

তবু তুমি তো একটা মানুষ, সাহসে ভর করে কিছু করার মত মন আমার আছে। মুকুটহীন সম্রাট আমি কিন্তু আমার আছে এমন বর্ম ও তলোয়ার আছে যা দিয়ে বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে শুটজেন ফেস্টেন্টিনকে মুক্ত কবা যায়।'

"ভাবতে পার শিকাগোর একটা মানুষ তলোয়ার উঁচিয়ে মুক্তিব বানী প্রচার করছে।"

আমি বললাম—"মনে হচ্ছে তোমাকে আমি বুঝতে পেরেছি জন। তুমি চাও উপন্যাস লেখকরা তাদের দৃশ্য ও চরিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলুক। তুরস্কের পাশাদের সঙ্গে ভেরমন্ট-এর চাষী অথবা ইংরেজ ডিউকদের সঙ্গে লং দ্বীপুঞ্জের খননকারীদের, ইতালীর কাউন্টেসদের সঙ্গে মন্টানার গরুর রাখালদের অথবা সিন্‌সিনাতির চোলাইওয়ালাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজাদের যেন গুলিয়ে না ফেলে।"

পেস্কুড বলল—'অথবা সাধারণ ব্যাবসায়ীদের সঙ্গে অনেক উঁচুস্তরের সম্ভ্রান্ত মানুষদের। এটা কোন বিদ্রূপের কথা নয়। আমরা স্বীকার করি না করি মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছেই আর সকলেই নিজের শ্রেণীর সঙ্গে থাকতে চায়। বাস্তবে এমন কথা শুনিওনি চোখেও দেখিনি যে কাজ করতে বেরিয়ে কেন ওই ধরনের বই কেনে?'

আমি—'দেখ জন। অনেকদিন কোন বেষ্ট সেলের বই পড়িনি, হয়তো তোমার মত আমার এক ধারনা। এবার তোমার নিজের কথা বল। সেটা কোম্পানীতেই আছে তো?

সঙ্গে সঙ্গে পেস্কুড বলল—চমৎকার! তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পরে আমার বেতনটা দ্বিগুণ করে নিয়েছি। একটা কমিশনও পাই। ইস্ট-এণ্ডে একটা জমি কিনেছি বাড়িও করেছি। সামনের বছর কোম্পানীর কিছু শেয়ার কিনব। কি নির্বাচিত হল না হল আমার দেখার নেই। আমি উপরওলার দিকে উঠে যাচ্ছি ক্রমশঃ।

আমি—'আচ্ছা জন, জীবন সঙ্গিনীর দেখা পেয়েছ কি?'

পেস্কুড—'আরে, সে কথা তোমাকে বলি নি বুঝি?'

আমি—'ও-হো! তাহলে প্লেট-গ্লাস থেকে কেটে নিয়ে বেশ কিছুটা সময় প্রেমের পায়ে নিবেদন করেছে?"

পেস্কুড—আরে না-না। প্রেম ট্রেম নয়। সে সব কিছুই না। তোমাকে আমি খুলেই বলছি।

প্রায় দেড় বছর আগে আমি সিনসিনাটিরপথে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিলাম; সেই সময় গীর্জার পাশে চোখে পড়ল একটি সুন্দরী মেয়ের উপর। আহামরি কিছু নয়, তবে জীবন সঙ্গিনী করার জন্য যেমনটি চাও ঠিক তেমনি। সে একটা বই পড়ছিল আর নিজের কাজ করছিল। আমি বাঁকা চোখে বারবার তকে দেখতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল হয়ে উঠল। তার সঙ্গে কথা বলার চিন্তা আমার মনে আসেই নি। কিন্তু আমার ব্যাবসা মাথায় উঠল।

সে সিনসিনাটিতে গাড়ি বদল করে লুইসভিল-এর গাড়ি ধরল। সেখান থেকে সোল্‌বিভিল, ফ্রাংকফোর্ড ও লেক্সিংটন হয়ে এগিয়ে চলল। বেশ কষ্ট করেই সারা পথ আমি তার সঙ্গেই গেলাম ছায়ার মত। আমাকে ও দেখতে পায়নি কিন্তু আমি ওকে চোখে চোখে রেখেছিলাম।

ভার্জিনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা স্টেশনে পৌছে সে ট্রেন থেকে নামল বিকেল প্রায় ছটার সময়। সেখানে গোটা পঞ্চাশ বাড়ি আর শ'চারেক কালো মানুষ। লাল মাটি, খচ্চর ও দাগওয়ালা কুকুর।

পরিষ্কার মুখ ও সাদা চুলের একটি দীর্ঘকায় বৃদ্ধ তার জন্য অপেক্ষা করছিল। পরনে ছিল পুরনো পোশাক। বুড়ো লোকটি মেয়েটার হাত থেকে ছোট থলেটা নিজের হাতে নিল তারপর কাঠের পাটাতন পার হয়ে উপরে উঠে গেল। আমিও পিছু নিলাম।

পাহাড়ের উপরে একটা ফটক দিয়ে তারা ভিতরে ঢুকল। ওপরে তাকিয়ে দেখি বিশাল জঙ্গলের মাথায় গোলাকার সাদা স্তম্ভের উপর প্রায় এক হাজার ফুট উঁচু একটি বাড়ি। গোলাপের ঝাড় ও লিলাক ফুলে ঢাকা বাড়ি, যদি উঁচু না হতো দেখাই যেত না।

আমি নিজের মনে বললাম—'ওখানেই তো আমাকে যেতে হবে।' তাছাড়া মেয়েটাকে তো সাধারণ অবস্থার বলে মনে হস। এটা হয় লাটসাহেবের বাড়ি না হয় বিশ্বমেলার কৃষি ভবন হবে। আমি ফিরে গিয়ে গ্রামের পোষ্ট মাষ্টার কাছ থেকে বা ওষুধ দোকান থেকে খোঁজ নিয়ে আসি। দোকানের মালিককে বললাম কিছু প্লেট গ্লাসের জিনিস এনেছ।

মালিকটি বলল—আমার কোন রকম প্লেটের দরকার নেই। তবে আর একটা কাঁচের গুড় রাখার পাত্র পেলে ভাল হত।

এইভাবে তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম।

সে বলল—আরে আমি তো জানতাম ওই পাহাড়ের উপরে কে বাস করে, তাছাড়া সকলেই তা জানে। তিনি কর্নেল এলিন, শুধু ভার্জিনিয়া নয় অন্য সব জায়গার মধ্যে সব চাইতে বড়লোক ও রুচিবান মানুষ। এরাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম পরিবার। তার মেয়েই তো ট্রেনে করে ইলিয়নতে গিয়েছিল অসুস্থ মাসিকে দেখতে।'

আমি হোটেলে উঠেছিলাম। তৃতীয় দিন সেই মেয়েটিকে ধরলাম উঠোনে পায়চারি করার সময়। একটু থেমে মাথার টুপিটা খুললাম এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

বললাম—ক্ষমা করবেন, মিঃ হিংকাস কোথায় থাকেন বলতে পারবেন?

তরুণী চোখ মিট মিট করে বলল—ও নামের কেউ বার্চটপ-এ থাকে না, মানে যতদূর আমি জানি। আপনি যাকে খুঁজছেন তিনি কি ফর্সা?

তার কথায় যেন ঠাট্টার সুর বাজল। আমি বললাম, 'পিট্সবার্গ থেকে আমি বৃথাই এতদূর আসি নি।'

সে বলল—'আপনি দেখছি বাড়ি থেকে বড় বেশী দূরে চলে এসেছেন।'

আমি—'আরও হাজার মাইল দূরে হলেও আসতাম। সে বলল—শেলবিভিল থেকে যখন ট্রেন ছাড়ল তখন ঘুম না ভাঙলে আপনি তো আসতেই পারতেন না। আমার মনে পড়ে গেল কোন ট্রেনে ওঠে দেখব বলে বসে থেকে বেঞ্চে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম অবশ্য যথাসময়ে জেগে গিয়েছিলাম।'

তার কথা শুনে সম্ভ্রম ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে তাকে জানালাম কেন আমি এখানে এসেছি। আর আমি যে শুধু চাই তার সঙ্গে পরিচিত হতে এবং তার যাতে আমাকে ভাল লাগে শুধু সেই চেষ্টাই করতে। সে কথাও বললাম।

সে হাসল, রক্তিম হল, কিন্তু চোখ নামাল না। আমার দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, আগে কেউ কখনও এ ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলে নি মিঃ পেস্কুড। আপনার নামটা যেন কি—জন?

আমি বললাম—'জন এ'।

সে হো হো করে হেসে উঠল—'আর একটু হলে তো পৌহাটান জংশনে ট্রেনটা মিস করতেন।'

আপনি কেমন করে জানলেন? —আমি প্রশ্ন করলাম।

সে—'মানুষ বড়ই নোংরা। আমি জানতাম আপনি প্রতিটি ট্রেনেই ছিলেন। ভেবেছিলাম কথা বলবো কিন্তু সেটা করেননি বলে আমি খুশি।'

তারপর আমাদের মধ্যে অনেক কথা হয়েছিল। তার মুখে ফুটে উঠেছিল সগর্ব গম্ভীর দৃষ্টি। সে ঘাড় ঘুরিয়ে বড় বাড়িটার দিকে আঙ্গুল তুলে বলল—এলিন পরিবার একশ বছর ধরে ওই 'দেবদারু ভবন'-এ বাস করছে। গর্ব করার মত আমাদের পরিবার। প্রাসাদটার দিকে তাকাও। ওতে পঞ্চাশটা ঘর আছে। স্তম্ভ, ফটক আর বারান্দাগুলো দেখেছ। অভ্যর্থনা ঘর আর নাচ ঘরের সিলিং আঠাশ ফুট উঁচু। আমার বাবা একজন নাইটের বংশধর। আমার বাবা কোন মতেই একজন ঢাকীকে 'দেবদারু ভবন' এ ঢুকতে দেবেন না। তিনি যদি জানতে পারেন যে আমি বেড়ার ওপর দিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলেছি তাহলে আমাকে ঘরে বন্ধ করে রাখবেন।

আমি—আমাকে কি তুমি বাড়িতে ঢুকতে দেবে না? আমি ডাকলে কে সাড়া দেবে?

সে—তোমার সঙ্গে বাক্যালাপই করব না। কারণ কেউ রীতিসম্মত ভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। অতএব বিদায়—মিঃ......

আমি—নামটা বলল, সেটা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি।

—'পেস্কুড'।

—'নামের বাকি অংশটা!'

—'জন'

—'জন কি'?

—'জন. এ' এবার খুশী তো?'

—'নাইট মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করতে কাল আসছি।'

—'তিনি তোমাকে দেখে শিকারী কুকুর লেলিয়ে দেবেন।'

—'তাহলে তো কুকুরের দৌড়টাই বেড়ে যাবে। আমি নিজেও তো একজন শিকারী।'

—'এবার আমাকে যেতেই হবে। তোমার সঙ্গে কথা বলাই আমার উচিত হয়নি। বিদায়।'

—'শুভরাাত্রি। দয়া করে নামটা বলবে কি?

ইতস্তত করে—'জেমি'

—'শুভরাত্রি, মিস্ এলিন।'

পরদিন সকাল এগারটায় আমি বড় বাড়িটায় ঘন্টা বাজালাম। প্রায় এক ঘন্টা পরে এক নিগ্রো এসে জনতে চাইল আমি কাকে চাই। আমার কার্ড দিয়ে বললাম কর্ণেলের সঙ্গে দেখা করতে চাই। সে ভিতরে নিয়ে গেল আমাকে।

ঘরে কিছু পুরনো সেকেলে আসবাব আর ফ্রেমে বাঁধানো পূর্ব পুরুষদের ছবি ছাড়া কিছু ছিল না। কিন্তু কর্ণেল এলিন ঢুকতেই ঘরটা যেন আলো হয়ে গেল। একটা ব্যাঙের আওয়াজ কানে এল। মনে হয় এটাই তার স্টাইল। তবে তার গায়ে সেই নোংরা পোশাক।

তিনি আমাকে বসতে বললেন। আমি সব কথাই তাকে খুলে বললাম। কেমন করে ও কেন তাঁর মেয়ের পিছু নিয়েছিলাম। আমার বেতন ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা. জীবনযাত্রার ধরন সবই। একটা সুযোগ পেয়ে তাকে শুনিয়ে দিলাম সেই পশ্চিমের ভদ্রলোকটার পকেট বই ও সদ্য বিধবাকে হারাবার গল্প। প্রথমে ভেবেছিলাম তিনি আমাকে জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দেবেন কিন্তু না গল্পটা শুনে তার মুখে হাসি ফুটল। আমি হলফ করে বলতে পারি যে সবাই অনেক দিন পরে হাসির শব্দ শুনতে পেল।

আমরা দু ঘন্টা কথা বললাম, যা জানতাম সব বললাম। তারপর তিনি প্রশ্ন করতে লাগলেন। আর তার উত্তরে আমার বাকি কথাগুলোও বলা হয়ে গেল। তার কাছে একটা মাত্র সুযোগ প্রার্থনা করলাম। তাতে যদি মহিলার মন পাই ভাল না হলে চলে যাব। কোন দিন কর্ণেলকে বিরক্ত করব না।

শেষে তিনি বললেন—আমার যতদূর মনে পড়ে প্রথম চার্লস এর সময় জনৈক স্যার কোর্টেন পেস্কুড বেঁচেছিলেন।

আমি বললাম—তা জানতে পারেন, কিন্তু আমার বংশের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না বলে দাবী করছিনা। আমরা চিরকাল পিটসবার্গেই থাকি। পুরনো 'স্মোকি' শহর-এর যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করলেই আপনি আমাদের সব কথা জানতে পারবেন। আচ্ছা আপনি

কি কখনও সেই তিমি ধরা জাহাজের ক্যাপ্টেনের গল্পটা শুনেছেন, যে, তার এক নাবিককে প্রার্থনার বানী বলাতে চেষ্টা করেছিল।

কর্ণেল—'আমার তো মনে হচ্ছে সে রকম সৌভাগ্য কখনও আমার হয়নি।'

গল্পটা তাকে বললাম। শুনে কি হাসি তার। আমি মনে মনে আমার খদ্দের ঠাওড়ে ভাবলাম মোটা বিল কাটব কাঁচের। তখনই তিনি বললেন—দেখুন মিঃ পেস্কুড, হাসির গল্প গাছাই তো বন্ধুত্বের সূত্রকে দৃঢ় থাকে। যদি বলেন তো একটা শিয়াল শিকারের গল্প শোনাতে পারি।

গল্পটা চলল চল্লিশ মিনিট ধরে। আমি কি হেসেছিলাম? সে আর বলতে! সুখের হাসি থামতেই তিনি বুড়ো নিগ্রো চাকরটাকে ডেকে হোটেল থেকে আমার ব্যাগ আনতে পাঠালেন! যে কটা দিন শহরে ছিলাম এই দেবদারু ভবনেই কাটালাম।

দুদিন সন্ধ্যার পর মিস্ জেমিকে একলা পেলাম। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলাম।

বললাম—আজকের সন্ধ্যাটা বড় মধুর।

সে বলল—'বাপিও আসছে। এবার তিনি তোমাকে বুড়ো নিগ্রো ও কাঁচা তরমুজের গল্পটা বলবেন। তার গল্পের কি শেষ আছে? আর একবার তুমি তো প্রায় পড়েই গিয়েছিলে—সেই পুলাস্কি শহরে।'

'আমি বললাম, হ্যাঁ মনে আছে। সিঁড়িতে লাফ দিতে গিয়ে পা টা হড়কে গিয়েছিল, আর একটু হলেই পড়ে যেতাম।'

সে বলল—আমি জানি। আর—আমি তো ভয় পেয়েছিলাম। জন যে তুমি পড়েই গেলে। সত্যিই আমি ভয় পেয়েছিলাম।

আর তার পরেই সে একলাফে বড় জানালাটার ভিতর দিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল।

'কোকটাউন'। গাড়ির ভেতর দিয়ে এগেতে এগোতে পোর্টার ঘুম ঘুম গলায় ডাক দিল।

পেস্কুড ধীরে সুস্থে তার টুপি ও সামান হাতে তুলে নিল। জন বলল, এক বছর পরেই তাকে আমি বিয়ে করলাম। তোমাকে আগেই বলেছি ইস্ট-এণ্ডে এ একটা বাড়ি করেছি। নাইট মহোদয় মানে কর্ণেলও এখানেই থাকেন। কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে যখন আমি বাড়ি ফিরি আমি তখনই তিনি ফটকে অপেক্ষা করে থাকেন। কারণ রাস্তায় ভাল গল্পের হদিশ পেলে তাকে শোনাতে হবে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম, কোকটাউন একটা উঁচু নিচু পাহাড়ি জায়গা ছড়িয়ে আছে গোটা বিশেক কালো কুঁড়ে ঘর। যখন মুষলধারে বৃষ্টি নামে তখন কালো মাটি রেলপথের ওপর জমা হয় নালাগুলোর মধ্য দিয়ে।

আমি বললাম—এখানে তো বেশী প্লেট ও গ্লাস বিক্রি হবে না.কেন পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তে এলে?

পেস্কুড—সে কি! এই তো সেদিন জেমিকে নিয়ে ফিলাডেলফিয়াতে এক চক্কর বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। ফিরে এসে সে বলল—সেখানকার একটা জানালায় রাখা টবে পেটুনিয়া ফুলের চারা দেখেছে, যেমন সে লাগাত ভার্জিনিয়ার বাগানে। তাই ভাবছি রাতটা এখানে থাকব, তার জন্য কয়েকটা কাটিং করে দিয়ে যাব। আমরা এখানেই আছি। ঠিকানাটা তোমায় দিয়েছি। সময় পেলেই এখানে এসে আমাদের দেখে যেও।

শুভরাত্রি!

ট্রেনটা চলতে শুরু করল। বৃষ্টির ঝাপটা আসছে দেখে এক মহিলা জানলাটা তুলে দিতে বলল। পোর্টার এসে সব আলোগুলো জ্বেলে দিয়ে গেল।

নীচে তাকাতেই দেখি বেস্ট সেলার বইটা। বইটা তুলে কিছু দুরে মেঝেতেই রেখে দিলাম যাতে বৃষ্টি পড়ে ভিজে না যায়। হঠাৎ আমার হাসি পেল—মনে পড়ল যে জীবনের কোন ভৌগলিক পরিমাপ বা সীমা নেই।

মনে মনে আমি বললাম—"তোমার ভাগ্য শুভ হোক ট্রেভেলিয়ান, আর তোমার রাজকন্যার জন্য পিটুনিয়া ফুলের চারা যেন খুঁজে পাও।"

* Best Seller

শেষ বিচার ও মোরব্বাওয়ালা

আস্তিনের একটা ঢিলে দড়ি খুলতে খুলতে হনোরিয়া বলল—"সকাল আটটায় 'সেল্টিক' জাহাজে আমরা যাত্রা করছি।"

ইভস টুপিটা লুফতে লুফতে বলল 'আমিও তাই শুনেছি আর তাই তো শুভ কামনা জানাতে এসেছি।'

নিরাসক্ত গলায় হনোরিয়া বলল—'তা তো শুনতেই হবে, কারণ নিজেরা গিয়ে তোমাকে খবরটা জানাতে পারিনি তাছাড়া সুযোগও হয়নি।

মিনতিভরা চোখে ইভস তাকাল। অবশ্য কোন আশা তার চোখে ছিল না।

কে যেন বাইরের রাস্তায় উঁচু পর্দার সুর করে হেঁকে উঠল—মোড়ব্বা-আ-আ! ভাল ভাল তাজা মোরব্বা-আ-আ।

জানলা দিয়ে মুখটা বার করে হাতের ইশারা করে হনোরিয়া বলল—'ওইতো আমাদের পুরনো মোরব্বাওয়ালা। এখনই কয়েকটা খেতে ইচ্ছে করছে। ব্রডওয়েতে এর অর্ধেক ভাল জিনিষও পাওয়া যায় না।'

ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ এবং পুরনো বাড়িটার সামনে মোরব্বাওয়ালা তার গাড়িটা থামাল। রাস্তার ফেরিওয়ালাদের চালচলনের তুলনায় অস্বাভাবিক তার চালচলন। উজ্জ্বল লাল টাইটা নতুন, টাইপিনটাও যেন বড় বেশী ঝলমল করছে। তার বাদামী শুকনো মুখে বোকা বোকা হাসি।

হনোরিয়া বলল—"আমার বিশ্বাস ওর বিয়ে হয়েছে। আগে তো কখনও ওকে দেখিনি। আজই প্রথম ও ফেরি করছে।"

ইভস পয়সা দিতে লোকটি ঠোঙা ভর্তি মোরব্বা দিল।

"আমাদের মন পড়ছে—" ইভস্ বলল

'দাঁড়াও'—হনোরিয়া বলল। লেখার ডেস্কের ভিতর থেকে ছোট পোর্টফোলিও বের করে তার ভিতর থেকে ১/৪"× ২" মাপের একটুকরো কাগজ বের করল। তারপর কঠিন গলায় বলল, 'মোড়ক খুলে যেটা বের করেছিলাম সেটা এই কাগজটি দিয়ে মোড়া ছিল।'

ইভস কাগজটা নেবে বলে হাত বাড়িয়ে বলল—সেটা তো এক বছর আগেকার কথা।

'উপরের আকাশ যতদিন থাকবে নীল

ততদিন, হে আমার প্রিয় ; আমিও থাকব একান্ত তোমারই।'

এটা পড়ল এক টুকরো কাগজ দেখেই।

কথা প্রসঙ্গে হনোরিয়া বলল—আমাদের তো এক সপ্তাহ আগেই যাবার কথা ছিল। এবারে যেন বড্ড বেশী গরম পড়েছে, যাবার মত কোন জায়গা নেই। তবে শুনেছি দু একটা ছাদ বাগানে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

ইভস্‌ও হারবার পাত্র নয়। অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলল—'সেবার তো আমি মোরব্বাওয়ালার পিছু নিয়ে ব্রডওয়ের মোড়ে তাকে পাঁচ ডলার দিয়েছিলাম।'

তারপর হনোরিয়ার কোলের ওপর থেকে একটা মোরব্বা নিয়ে তার মোড়কটা খুলে ফেলল।

হনোরিয়া বলল—'সারা চিলিংওয়ার্থ-এর বাবা তাকে একটু মোটর গাড়ি দিয়েছে।'

মোরব্বায় মোড়া কাগজটা হনোরিয়াকে দিয়ে ইভস বলল—'এটা পড়'।

"জীবন আমাদের শেখায় কি করে বাঁচাতে হবে,

প্রেম আমাদের শেখায় ক্ষমা করতে।"

হনোরিয়ার গাল লাল হয়ে উঠল।

চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ইভস বলল—'হনোরিয়া প্রেমের দেবী।' ভেনাসের মত দাড়িয়ে উঠে ভুল সংশোধনী করে দিয়ে বলল, "মিস ক্লিন্টন! আর আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি ও নাম তুমি কখনও উচ্চারণ কোরনা।"

ইভস্‌ তবুও বলল—হনোরিয়া, আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে। আমি জানি তোমার ক্ষমার যোগ্য আমি নই। কিন্তু ক্ষমা পেতেই হবে। কখনও কখনও এমন একটা পাগলামি মানুষকে পেয়ে বসে যার জন্য তার সত্যিকারের স্বভাব দায়ী নয়। তোমাকে ছাড়া আর সব কিছু আমি ত্যাগ করতে পারি। যে শৃঙ্খল আমাকে বেঁধেছে তাকে আমি কেটে ফেলেছি। যে সাইরেন আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তোমার কাছ থেকে তাকে আমি পরিত্যাগ করেছি। পথের ফেরিওয়ালার কাছ থেকে যে কবিতা আমি কিনেছি সেটাই আমার হয়ে কথা বলুক। একমাত্র তোমাকেই আমি ভালবাসতে পারি। আমি শপথ করে বলতে পারি—'আকাশে যতদিন থাকবে নীল ততদিন আমার ভালবাসাও থাকবে সত্য হয়ে।'

পশ্চিম অঞ্চলে সপ্তম ও অষ্টম এভিনিউর মধ্যে একটা গলি ব্লকটাকে দু ভাগে ভাগ করেছে। গলিটা শেষ হয়েছে ব্লকের ঠিক কেন্দ্র স্থলে। অঞ্চলটার অধিবাসীরা আধডজন ভিন্ন ভিন্ন জাতির একটা জগা খিচুড়ি। আবহাওয়া পুরো বোহোমিয়ান, ভাষা বহু ভাষার মিশ্রণ, অঞ্চলটা বিপদজ্জনক।

গলির শেষ প্রান্তে উঠোনের মাঝখানে মোরব্বাওয়ালার বাস। সাতটার সময় সে ঠেলা গাড়িটাকে রেখে বসল ঠাণ্ডা হবার জন্য। গলিটা দিয়ে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল।

যে জায়গাটাতে সে সবসময়ই তার ঠেলা গাড়িটাকে রাখত তার ঠিক ওপরেই একটা জানালা ছিল। শান্ত শীতল বিকেল বেলায় 'এরিয়েল রক্ গার্ডেন' এর মক্ষিরানী মাদ্‌ময়জেল আদোল সেই জানলায় বসে বায়ু সেবন করত। তার স্বর্নাভ পিঙ্গল কেশরাশি ছড়ানো থাকত যাতে বাতাস তার মধ্যে খেলা করতে করতে চুল শুকোবার কাজে দামী সিফোনিকে সাহায্য করতে পারে। তার যে দুটি কাঁধ ফটোগ্রাফারদের সব চাইতে বেশি আকর্ষণ করত তার উপর ঢিলে করে জড়ান ছিল সূর্যমুখী রংয়ের একটি চাদর। দুটি বাহু কনুই পর্যন্ত অনাবৃত ছিল না–কিন্তু গলির নিরেট ইটের দেয়ালগুলিও বুঝি তাকে দেখে চোখ ফেরাতে পারত না।

ক্রমে ক্রমে মাদময়জেলও লক্ষ্য করত লাগলেন মোরব্বাওয়ালটি তার জানালার নিচেই এসে দাঁড়ায় আর কপালের ঘাম মুছতে মুছতে নিজেকে ঠাণ্ডা করে। এই সময় মাদামের হাতেও কিছু কাজ থাকত না। তাছাড়াও সময় নষ্ট করাও উনি পছন্দ করতেন না। এই মোরব্বাওয়ালা তার যোগ্য শিকার নয় তবুও সে তো পুরুষ জাতির একজন।

তাকে প্রত্যেকদিন অনাগ্রহী দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে হঠাৎ একদিন মাদামের মন যেন গলে গেল। মিষ্টি হেসে সোহাগ মাখা গলায় বলল–'মোরব্বাওয়ালা তোমার কি মনে হয় না যে আমি সুন্দরী?

মোরব্বাওয়ালা চোয়াল শক্ত করে মুখ তুলে তাকাল, তারপর কর্কশ স্বরে হেসে উঠল।

বলল–আপনি তো একটা রঙ চঙে পত্রিকার প্রচ্ছন্দ হবার যোগ্য। সুন্দর কিনা সে বিচার করবে সৌন্দর্যের পূজারী। ওটাতো আমার কাজ নয়। আপনি যদি ফুলের তোড়া চান তো অন্যত্র খোঁজ করুন।

সত্যি মোরব্বাওয়ালা মনকে টানে। ঘন বরফের মধ্যে খরগোস শিকার করতে হয় কি করে তা জানে।

'মোরাব্বাওয়ালা, তোমার কি এরকম লম্বা ও নরম চুলের অধিকারিনী কোন মনের মানুষ আছে? যার হাত দুটিও গোলগাল?' বলে জানালার মধ্যে দিয়ে মাদাম একটা হাত ঝুলিয়ে দিতে কিছু মিঠাই ছড়িয়ে পড়ে গেল।

কর্কশ গলায় খেঁকিয়ে উঠল মোরব্বাওয়াল—'এসব বাক্যি রাখুন তো! শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। এক গোছা চুল আর সদ্য মালিশ করা একটা হাত দেখিয়ে আমার হাত করবেন এমন বোকা আমি নই? এরকম প্রচুর পাউডার রঙ মাখা সাজগোজের বাক্স অনেক দেখেছি। অতএব ঠাট্টা মস্করা রাখুন—কি মনে হচ্ছে এখনই বৃষ্টি নামবে?'

ঠোঁট বেঁকিয়ে মাদাম বলল—"তুমি কি মন কর না আমি সুন্দরী?'

মোরব্বাওয়ালা হাসল, বলল—'নিজেই নিজের প্রেস এজেন্ট হয়ে বেশ টাকা বাঁচাচ্ছেন। আমি চুরুট টানি কিন্তু কোন চুরুটের বাক্সের ওপর তো আপনার ছবি দেখিনি। যাই হোক আমি কিন্তু অন্য ধরনের মেয়েকে সঙ্গিনী হিসেবে পেতে চাই। ওদের আমি আগাপাশতলা চিনি। সারাদিন ভাল বিক্রি বাটা করে, সাতটার সময় কিছু মাংস পেঁয়াজ আর সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা একটা ব্যাস তাহলেই যথেষ্ট। কোন লিলিয়াম রাসেলের আমাকে দেখে চোখ টানল কিনা তা নিয়ে কোন মাথাব্যাথা নেই। বুঝলেন তো?'

মাদ্‌ময়েজেল ঠোঁট ফুলিয়ে নরম গম্ভীর গলায় বলল—তবু তোমাকে বলতেই হবে যে আমি সুন্দরী।

মোরব্বাওয়ালা হেসে বলল—'আচ্ছা আমাকে ফাঁদে পা দিতেই হবে। আমি যে সান্ধ্য পত্রিকাটা পড়ছি তাতে একটা গল্প আছে ; কতগুলো মানুষ গুপ্তধনের খোঁজে সমুদ্রে ডুব দিচ্ছে আর একটা পাহাড় থেকে জলদস্যুরা তাদের উপর নজর রাখছে। কিন্তু সেখানে একটা মেয়েমানুষও নেই।' গুড ইভনিং বলে গাড়ী নিয়ে নিজের বাড়ী চলে গেল।

যে মানুষ মেয়েমানুষকে চেনে না তার কাছে এটা অবিশ্বাস্য মনে হবে। প্রত্যেক দিন মাদাম জানালায় বসে থাকে আর ঘৃণ্য খেলায় মেতে ওঠে। মোরব্বাওয়ালার সঙ্গে লড়াই তার কর্কশ হাসি মাদামের অহমিকায় আঘাত হেনেছে। প্রত্যেক দিনের ব্যার্থ ঢেঙা লোকটাকে রূপ জালে বিদ্ধ না করাব আহত অভিমানে তার চোখ দুটি জ্বলে ওঠে। লোকটির মত দৃষ্টি অন্য কারোর ওপর দিলে সে হাতে স্বর্গে পেয়ে যেত। মোরব্বাওয়ালার ঘৃণা তাকে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকে।

একদিন বিকেলে মাদময়জেল লোকটাকে দেখল কিন্তু কোন রকম বিরক্ত বা আক্রমণ করল না।

মাদাম আদোল বলল—'মোরব্বাওয়ালা উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাও।'

উঠে দাঁড়িয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে কাঁপা হাতে পকেটে পুরল।

ঈষৎ হেসে মাদাম আদোল বলল—'ওতেই হবে। শুভ সন্ধ্যা।' পরদিন সন্ধ্যা সাতটায়। মোরব্বাওয়ালা এল কিন্তু পুরনো নতুন চেহারায়। গায়ে চেককাটা নতুন পোশাক, নেক টাইটা আগুনের মত লাল, জুতো পালিশ করা, হাতে দুটো ধোয়া মোছা। কিন্তু এবার উপরের জানালাটা খালি। মুখ তুলে সে অপেক্ষা করতে থাকে।

মাদাম এল। তার দিকে তাকিয়ে থামল, মাদাম বুঝতে পারল শিকার ধরা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার উৎসাহ নিভে গেল। সে মিদোনির সঙ্গে কথা বলা শুরু করল।

মোরব্বাওয়ালা বলল—'আজকের দিনটা বেশ ভাল। এই মাসের মধ্যে এই প্রথম আমার ফার্স্ট ক্লাস লাগছে। কাল বৃষ্টি হবে কি মনে হয়?'

মাদাম—'তুমি কি আমাকে ভালবাস না?' মোরব্বাওয়ালা উঠে দঁড়িয়ে বলল—লেডি, আজ পর্যন্ত আমি ৮০০ ডলার জমিয়েছি। আমি কি বলেছি যে আপনি সুন্দরী নন? এই সব টাকা আপনি নিন, আর সেই টাকায় আপনার কুকুরের জন্য একটা কলার কিনে নিন।'

মাদামের ঘরে যেন একসঙ্গে অনেক ঘন্টা বেজে ওঠার শব্দ হল। মাদামের উচ্চ হাসি রাস্তাকে ভরে দিয়ে আবার ঘরেই চলে এল। এই হাসি যেমন বিস্ময় তেমনি বিস্ময়কর এর অনুপ্রবেশ। মাদামের হাসি শুনে লোকটি জামা'র পিন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেল। হাসতে হাসতে তার আরক্তিম মুখখানা জানলার দিকে ফিরিয়ে বলল—'মোরব্বাওয়ালা, এখান থেকে চলে যাও। তুমি এখানে থাকলে আমার হাসি থামবে না।'

ঘরে ঢুকে এলিস এসে বলল—মাদামের একটা হাতে চিঠি।

ফিরে যেতে যেতে বলল লোকটি—'ন্যায় বিচার কোথাও নেই।'

একটু এগিয়ে সে থেমে গেল, কারণ মাদামের বাড়ী থেকে আর্তনাদ ভেসে এল। আর কারও মাটিতে পড়ার শব্দ।

'এটা কি হচ্ছে'-সে জিজ্ঞাসা করল।

সিমদোনি জানালা দিয়ে বলল—একটা দুঃখসংবাদ পেয়ে মাদাম আদোল বড়ই ভেঙে পড়েছেন। যাকে তিনি মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন তিনি চলে গেছেন—নাম মঁসিয়ে ইভস্। কাল তিনি জাহাজে চেপে মহাসাগর পাড়ি দেবেন। ওঃ! হায়রে পুরুষ জাত।

* Nemesis and the candy man

শহরের জলপরী

টাকার অঙ্ক দিয়ে মানুষকে বিচার করতে গেলে তিন রকম মানুষকে আমি অপছন্দ করি। প্রথমতঃ যাদের বেশী টাকা আছে অথচ খরচ তাদের কম। দ্বিতীয়তঃ যত টাকা সত্যি খরচ হয় তার থেকে বেশী আছে যাদের, তৃতীয়তঃ যার যত টাকা তার থেকে তার খরচ বেশী। প্রথমোক্তদের আমি মোটেই পছন্দ করি না। স্পেন্সার গ্রেনভিল নর্থ এরকমই একজন মানুষ। তবে মানুষ হিসেবেই তাকে আমি বেশী পছন্দ করি।

গ্রীষ্মকালে সেবার আমি শহরে ছেড়ে কোথাও যাইনি। সাধারণতঃ আমি লংদ্বীপের দক্ষিণ তীরবর্তী একটা গ্রামেই যাই। সেটা মনে রেখে এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কেন যাই। আমি জবাব দিয়েছিলাম নিউইর্য়ক হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে ভাল গ্রীষ্মাবাস।

সেই বছর আমি ছিলাম থিয়েটারের ব্যাবস্থাপক-প্রয়োজক 'বিংকলে এণ্ড বিং' এর প্রেস এজেন্ট। প্রেস এজেন্ট ব্যাপারটা কি সবাই জানেন কিন্তু এটা সেটা নয়। গোপনীয়।

বিংকল তার নতুন 'সি অ্যাণ্ড এন উইলিয়ামসন' গাড়িটা নিয়ে ফ্রান্স পরিভ্রমনে বেরিয়েছে। আর বিং গেছে স্কটল্যাণ্ড-এ চুল কোঁকড়ানো করার যন্ত্র চালান শিখতে। যাবার আগে তারা ছুটি কাটাবার জন্য আগাম বেতন দিয়ে গেছে। কিন্তু আমি যাইনি কারণটা আগেই বলেছি।

জুলাইয়ের দশ তারিখে নর্থ এসে হাজির হলেন তার এডিরনড্যাকস শিবির থেকে। এমন একটা শিবির যাতে আছে ষোলটা ঘর, কাঠের আসবাব, লেপ, একটি খানসামা, একটি টেলিফোন ও গ্যারেজ। অবস্থান জঙ্গলের মধ্যে।

নর্থ এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তার বাদামী চেহারায় সুস্বাস্থ্যর লক্ষন, সাজসজ্জায় বাড়াবাড়ি। এসে একেবারে হৈ চৈ ফেলে দিলেন আমার এই ছোট্ট তিন কামরার ঘরে।

তিনি বললেন—আমার উকিলের তার পেয়ে কিছু কাজের জন্য এখানে এলাম। টেলিফোন করে জানালাম তুমি আছ। তাই চলে এলাম। তা আজকে বাবু এখানে কি করছ। তোমার স্বপ্নের লংদ্বীপ কি হল? প্রত্যেক বারেই তো যাও। তা রাত হলেই যারা নাচাগানা করত, রাজহাঁস তাদের কিছু গড়বড় হয়েছে কি?

আমি বললাম—প্যাতিহাঁস বল, রাজহাঁসের সুর ভাগ্যবানদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের জন্য। ধনবানের কৃত্রিম হ্রদের জলে তারা গলা দুলিয়ে সাঁতার কাটে ভাগ্যদেবীর প্রিয় সন্তানের মনোরঞ্জনের জন্য।

নর্থ বললনে—সেন্ট্রাল পার্কেও তো সাঁতার কাটে বহিরাগত ও ভবঘুরেদের জন্য। কিন্তু গ্রীষ্ম শেষ হয়ে আসছে আর তুমি বসে আছে?

আমি আবার বলতে শুরু করলাম নিউইর্য়ক শহরটা হচ্ছে গ্রীষ্মকালের সব থেকে সেরা—

নর্থ জোর গলায় বলে উঠল, 'না তুমি ও কথা বোল না। তোমাকে আমি ভাল করেই চিনি। আরে বাবা, এবার গ্রীষ্মে তোমার আমাদের সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল। সেখানে প্রেস্টনরা ছিল, তাছাড়া টম ভলনি ও মনরো পরিবার, লুলু স্ট্যানফোর্ড আর মিস কেনেডি ও তার মাসিও ছিল। মাসিকে তো তোমার খুবই ভাল লাগত।'

'মিস কেনেডির মাসিকে আমি কোনদিন পছন্দ করতাম না।'

'সে কথা আমি বলিনি। সেখানে আমাদেব খুব ভাল ভাবে কেটেছে। মাছ ধরেছি খুব, আসলে ওখানে তো পিকেরেল ও ট্রাউট মাছের ছড়াছড়ি। তাছাড়া আমাদের দুটো লঞ্চ আছে। অনেক দূরে তাতে করে চলে যেতাম, সঙ্গে নিয়ে যেতাম ফনোগ্রাফ। সঙ্গে একটা ছেলেও যেত। সেই রেকর্ডগুলো পাল্টাত। আবার ওদিকে বনের মধ্যেও ভাল রাস্তা আছে মোটর চালানর জন্য। আর পাইনক্লিপ ইনম'টাও মাত্র তিন মাইল দূরে। সপ্তাহে দুদিন আমরা সেখানে নাচতে যাই। তুমি কি একটা সপ্তাহের জন্য আমার সঙ্গে সেখানে যেতে পার না?'

আমি হেসে বললাম, 'নর্থ; তোমার আমন্ত্রনের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই শহরই আমার ভাল। সব বুর্জোয়ারা এখন পালিয়েছে, তাই আমি নিরোর মতো এখানে থাকতে পারব। ফ্লোরিডার তাল গাছের নীচে বসে ডালিমের কোয়া খাব। আর বিদ্যুৎ শক্তির দৌলতে স্বয়ং বোরিযাস আমার জন্য বয়ে আনবে মেরু প্রদেশের হাওয়া। আর মাছের কথায় বলি, তাছাড়া তুমি নিজেও জান 'মোরিস'-এর রাঁধুনি জিন ও মিনিসটা পৃথিবীর অন্য যে কোন মানুষের চাইতে ভাল রাঁধতে পারে।

নর্থ বলল—আমার রাঁধুনি নানা উপকরণ দিয়ে ট্রাউট মাছ যা রাঁধে না—একেবারে মোক্ষম। বিলের ধারে আগুন জ্বালিয়ে সেই মাছ দিয়ে আমরা ডিনার খাই।

আমি বললাম, জানি। টেবিল পেতে, চেয়ার সাজিয়ে ভাল কাপড় বিছিয়ে, রূপোর চামচ দিয়ে খাও। তোমরা কোটিপতিরা কি রকম শিবিরে বাস কর সেটাও আমি জানি। বুনো ফুল পেলে নিয়ে স্যাম্পেনের বোতল নিয়ে বসে পড়। এবং ম্যাডাম ট্রেটাজিনি ভোজনের পরে নৌকার ওপর বসে গান করেন।

নর্থ—আর না না, আমরা অতটা গোল্লায় যাইনি এখনও। একথা ঠিক বিচিত্রানুষ্ঠানের একটি দল গিয়েছিল কিন্তু তাতে বিখ্যাত কেউ ছিল না। কিন্তু তোমার ঐ কথাটা আমি বিশ্বাস করব না। যদি তাই হয় তবে কেন গ্রীষ্মকালটা চার বছর ধরে ওখানে কাটিয়েছ। এমনকি রাতের ট্রেন ধরে পালিয়েও গিয়েছিলে, আর এখনও কোন বন্ধুকে ঠিকানা দাওনি গ্রামটা কোথায়।

আমি—তার কারণ তারা আমার পিছু পিছু গিয়ে ব্যাপারটা জেনে ফেলত। আর আমি এখন জানতে পেরেছি যে শহরেই অনেক ভাল ভাল মেয়ে পাওয়া যায়। তোমার আজ কাজ না থাকলে দেখিয়ে আনতে পারি।

নর্থ—আমার কাজ নেই। আর আমার গাড়ীও বাইরে। প্রথমে আমরা সেন্ট্রাল পার্কে কয়েক পাক ঘুরলাম। তারপর জঙলা দিকটায় গেলাম। এর চাইতে তাজা ও বিশুদ্ধ বাতাস তুমি কোথায় পাবে?

নর্থ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—বাতাস! একে তুমি বাতাস বল? এই ময়লা জঞ্জাল দুর্গন্ধ বাষ্পকে? আরে বাবা দিনের আলোয় পাইনের বনে ঢুকে যদি এক ঝলকা বাতাস নিশ্বাসের সঙ্গে টানতে পার তাহলে বুঝবে?

আমি—'তার কথা আমিও শুনেছি। কিন্তু গন্ধ স্বাদ ও নাকের সুখের কথাই যদি বল তাহলে তো লংদ্বীপের এক ঝলকা সাগরের বাতাস পেলে আমি কিছু চাইনা।

নর্থ ঠাট্টা করে বলল—তাহলে এই রুটির কারখানায় সিদ্ধ না হয়ে সেখানেই চলে যেতে পারতে।

আমি নাছোড়বান্দার মত এক কথা বললাম। বাধা দিয়ে নর্থ বলল—বারবার এক কথা বোল না তো। আসলে তুমি নিজেও সেটা বিশ্বাস কর না।

বন্ধুর কাছে মতটা প্রমাণ করতে গিয়ে আমি কিছুটা বিপদে পড়ে গেলাম। আবহাওয়া দপ্তর ও মরশুমটাও যেন ষড়যন্ত্র করে বসল। শহরটা যেন এক জ্বলন্ত উনুনের ওপর বসে আছে। রাস্তায় লোক খুব কম। হোটেলগুলো ভোঁ ভাঁ।

নর্থ ও আমি একটা হোটেলের ছাদে বসে ডিনার খেলাম। সেখানে একটু পূবের ঠাণ্ডা হাওয়া, অর্কেস্ট্রার সুর শুনে মনে হল এবারকার মত জিতে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন মহিলা গ্রীষ্মকালীন পোশাক পরে টেবিলে এল। তাদের দেখে আরও জীবন্ত মনে হল। ডিনারটাও ভাল হল সুতরাং আমার বিচারটা আরও জোর হল। নর্থ কিন্তু মানছে না।

ডিনার শেষ করে ছাদের বাগানে একটা রঙ্গ নাটিকা দেখতে গেলম। সকলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাছাড়া সেখানে পাওয়া গেল ভাল খাবার, কৃত্রিম ঠাণ্ডা হাওয়া, তৎপর পরিসেবা, আর খুশি সুবেশ শ্রোতার ভিড়।

নর্থ বলল—'পয়লা মে তারিখেই আমি অবাধ বরফের ফাণ্ডে পাঁচশ ডলার দিয়েছি। এখানে তো সব কিছুই কৃত্রিম, ফাঁপা। একবার জঙ্গলে গিয়ে ঝড়ের সময় পাইন ও ফার গাছের নাচ দেখে এস। সারা দিন হরিণ শিকারের পর পাহাড়ী ঝর্ণার পাশে শুয়ে শুয়ে বোতলে চুমুক দাও; গ্রীষ্মাবকাশ এইভাবেই কাটাতে হয়। বাইরে বেরিয়ে পড় আর প্রকৃতির কোলে দিন কাটাও।'

আমিও জোর দিয়ে বললাম—'তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।'

আমার এতক্ষণের সতর্কতায় ভাটা পড়ল। সত্যিকারের মনের কথাই বলে ফেলেছি। শুনে নর্থ বহুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তারপর প্রশ্ন করল—তাহলে কেন এতক্ষণ ধরে এই শহরে গ্রীষ্মের গুণগান গাইলে?

আমার মুখে বোধহয় দোষী ভাবটা ফুটে উঠেছিল। নর্থ বলে উঠল—আচ্ছা! তা মহিলার নামটা জানতে পারি কি?

আমি বললাম—অ্যানি এ্যাস্টন। 'বিংকলে এ্যাণ্ড বিং 'এর প্রযোজনায় 'রূপোর রজ্জুর নাটকে সে নানেদের চরিত্রে অভিনয় করেছিল।

নর্থ আমাকে একবার তার কাছে নিয়ে চল।

মাকে নিয়ে এ্যাস্টন একটা ছোট হোটেলে থাকত। পশ্চিমের লোক তারা। কিছু টাকাপয়সাও ছিল তাতেই কোন রকমে চলে যেত। বিংকলে এ্যাণ্ড বিং-এর প্রচার সম্পাদক হিসেবে আমি তাকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

মেয়েটি পরমা সুন্দরী, শান্ত আর খাঁটি বলেই মনে হয়। রঙ্গমঞ্চের উপর টান ও প্রতিভা দুইই ছিল। বাড়ীতে সে পড়াশুনা করত। আর আমার সঙ্গে বন্ধুর মত মিশত। থিয়েটার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে একটা বেসরকারী কাজে আমাকে ডেকেছিল। আমার বন্ধু নর্থ-এর কথা তাকে অনেকবার বলেছি।

নাটকের প্রথম অংশটা শেষ হবার আগেই একটা টেলিফোন পেলাম।

আমার ও মিঃ নর্থ এর সঙ্গে দেখা করতে চায় মিস্ এ্যাস্টন।

সেখানে গিয়ে দেখি মিস এ্যাস্টন তার মা-কে একটা নতুন টুপি পরিয়ে দিচ্ছে। আগে কখনও তাকে এতটা মনমরা দেখিনি।

নর্থ অশোভবন ভাবে নিজেকে জাহির করতে লাগল, আমি এ্যাস্টনের মা-র টুপিটার প্রশংসা করতেই সে আরও টুপি নিয়ে এল আর কাট ছাট নিয়ে বক্তৃতা দিতে লাগল। তারপরেই ওদিকে থেকে কানে এল নর্থ অ্যানিকে শোনাচ্ছে তার বাহারি শিবিরের গল্প।

দুদিন পরেই দেখলাম, নর্থ তার মোটর গাড়িতে মিস এ্যাস্টন ও তার মাকে নিয়ে চলেছে। পরের দিন বিকালে আমার কাছে এল।

আমাকে বলল—আর যাই হোক. পুরনো শহরটা কিন্তু গ্রীষ্মকালের পক্ষে মন্দ নয়। এখানে এসে যত ঘুরছি তত ভাল লাগছে। একটা ভাল জায়গা খুঁজে নিয়ে কিছু নরম পানীয় পেটে ঢাললেই গ্রামের মত ঠাণ্ডা হওয়া যায়। ও সব চুলোয় যাক। এখন দেখছি পল্লী অঞ্চলটা এমন কিছু আহামরি নয়। সেখানে তুমি ক্লান্ত বোধ করবে,রোদে পুড়বে। আর নিঃসঙ্গ হবে, আর রাধুনি যা এনে দেবে তাই তোমাকে খেতে হবে।

আমি বললাম—'একটু তফাৎ আছে কি বল?'

'তা তো আছেই। অনেক তফাৎ।'

সোজা তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললাম, 'তফাৎ একটা আছেই কি বল?'

বলল—দেখ বব্, আমি তোমাকে সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। আমার উপায়ান্তর ছিল না। তোমার সঙ্গে আমি সমানেই পাল্লা দিয়ে যাব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিই জিতব। সে মেয়ে বিশেষ ভাবে আমারই।

আমি বললাম—ঠিক আছে দুজনের কাছেই মাঠ খোলা। অনাধিকার প্রবেশের কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। বৃহস্পতিবার বিকেলে মিস্ এ্যাস্টন নর্থকে ও আমাকে তার বাসায় চা খেতে নেমন্তন্ন করল। নর্থ ভাবে বিভোর। টুপির প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমি দুএকটা কথা বললাম—কথা প্রসঙ্গে মিস্ এ্যাস্টন পরবর্তী মরশুমের নাটকের কথা তুলল।

'ওঃ'-আমি বললাম। সে বিষয়ে আমি কিছু জানি না। পরের মরশুমে আমি বিংকলে অ্যাণ্ড বিং এর সঙ্গে থাকছি না।

সে বলল—সে কি? আমি তো জানি, ওরা একটা দলের ভার তোমাকেই দেবে, তুমি তো সেই রকমই বলেছিলে।

আমি—সেইরকম কথাই ছিল, কিন্তু তা হবে না। আমি কি করব সেটা আগেই বলেছি। আমি লংদ্বীপের দক্ষিণে গিয়ে উপসাগরের তীরে ছোট কুটীর বানাব। দুটো নৌকা কিনব, ছোট বন্দুক, একটা হলুদ কুকুরও কিনব। তার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আমার আছে। সারা দিন আমি শ্বাস টানব সমুদ্র থেকে আসা বাতাসে, পাইনের গন্ধ শুকব আর নাটক লিখে লিখে ট্রাংক ভর্তি করব। আর সবচাইতে বড় কাজ করব একটা হাঁসের খামার বাড়ি কিনব। তাদের ডাক মধুর না হলেও আমার কানে মধুর হয়ে বাজবে।

আর উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগলাম, 'রূপ, বুদ্ধি শৃঙ্খলা ও মিষ্টি কণ্ঠ ছাড়া পাতিহাঁসদের আর কি মূল্য আছে জান? তাদের পালক জমিয়ে আয় করা যায়। আমার জানাশোনা একটা খামারে বছরে ৪০০ স্টার্লিং পাউণ্ড দামের পালক বিক্রী হয়। আর জাহাজে করে বাইরে পাঠালে আরও দাম পাওয়া যায়। হ্যাঁ পাতিহাস আর লোনা হাওয়াই আমার পছন্দ। একটা চীনা রাধুনি রাখব। রোদে পোড়া, অর্থহীন শহরে দিনগুলো দরকার নেই।

মিস এ্যাস্টান অবাক হল, নর্থ হাসতে লাগল। 'আজ রাতেই আমি নাটক লেখা শুরু করব।' —বলে উঠে এলাম।

কয়েকদিন পরে মিস্ এ্যাস্টন আমাকে ফোন করে জানাল আমি যেন বিকেল চারটের সময় তার সঙ্গে দেখা করি।

আমি দেখা করতেই সে ইতস্তত করে বলল—তুমি আমার অনেক উপকার করেছ তাই ভাবলাম তোমাকে জানাই আমি রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিচ্ছি।

আমি বললাম—ঠিক করেছ। আমিও সেই রকমই ভেবেছি। যথেষ্ট টাকা হলে ওরা সাধারণতঃ এটাই করে।

সে বলল—'আমার হাতে কোন টাকা নেই'।

আমি বললাম—'কিন্তু আমি শুনেছি দশ, ত্রিশ অনেক লক্ষ* তার আছে ঠিক কত তা আমি ভুলে গেছি।'

মিস্ এ্যাস্টন বলল—'আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছ। না জানার ভান আমি করব না। আমি মিঃ নর্থকে. বিয়ে করছি না।'

আমি কঠিন কণ্ঠে বললাম—তাহলে তুমি রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিচ্ছ কেন? জীবিকা অর্জনের জন্য আর কি তুমি করতে পার?

সে আমার কাছে এগিয়ে এল। তার চোখের চাউনি আমি এখনও দেখতে পাই।

সে বলল আমি পাতিহাঁসের পালক কুড়োতে পারি।

আর প্রথম বছরেই আমরা পালক বিক্রি করে পেলাম ৩৫০ স্টার্লিং পাউণ্ড।

* Rus in Urbe

সান রোজারিওতে দুই বন্ধু

পশ্চিমগামী ট্রেনটা সকাল ৮.২০ মিনিটে থামল। একটা লোক কালো চামড়ার মোটা থলে ঝুলিয়ে ট্রেন থেকে নেমে দ্রুত পায়ে হেটে শহরের রাস্তায় চলে এল। আরও অনেকে নামল তবে তারা রেলের ক্যান্টিনে ঢুকল অথবা 'সিলভার ডলার' সেলুনে ঢুকল। কেউ বিশ্রাম করতে লাগল।

সেই লোকটির চলাফেরায় কোন রকম অস্থির চিত্ততার লক্ষণ দেখা গেল না। বেঁটে, বেশ শক্ত সামর্থ চেহারা, চুল ছোট করে ছাঁটা, মসৃণ-মুখ আর সোনালী ফ্রেমের চশমা। পাশ্চাত্য শৈলীতে সজ্জিত তার ভাব ভঙ্গিতে কর্তৃত্ব প্রকাশ না পেলেও একটা সচেতন শক্তির প্রকাশ দেখা যায়।

তিন স্কোয়ার পথ হেঁটে শহরের ব্যবসায়িক অঞ্চলের কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা প্রধান সড়কটাকে কেটে বেরিয়ে গেছে। ফলে সান রোজারিওর জীবনযাত্রা ও বাণিজ্যের একটা প্রাণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। কোনে ডাকঘর, আর এক কোণে রাবেনস্কির কাপড়ের দোকান। দুটি পরস্পর বিরোধী কোন দখল করে আছে দুটো ব্যাঙ্ক; ফার্স্ট ন্যাশনাল এবং স্টকমেনস ন্যাশনাল। নবাগত লোকটি ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব সান রোজারিওতে ঢুকলেন এবং সমান দ্রুতগতিতে ক্যাশিয়ারের জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ব্যাংক খোলে নটার সময়। কাজের লোকেরা এর মধ্যেই এসে গেছে। প্রত্যেকেই নিজের বিভাগের কাজে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্যাশিয়ার ডাকের চিঠি খুঁটিয়ে দেখছিলেন। এমন সময় জানালায় দাড়ান আগন্তুকের দিকে নজর পড়ল। সংক্ষেপে বলল-'নটার সময় ব্যাঙ্ক খোলে না।'

ভাঙা গলায় কাউন্টারের লোকটি বলল ; সেটা আমি ভাল করেই জানি। দয়া করে আমার কার্ডটা একবার নেবেন কি?

ক্যাশিয়ার হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিয়ে পড়লেন—জে. এফ. সি. নেট্‌ল্‌উইক। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক পরীক্ষক।

"ওহো, আরে ভিতরে আসুন মিঃ নেট্‌ল্‌উইক। এই প্রথম এলেন তো অবশ্যই আপনার কাজকর্মের ধরনটা ঠিক জানা নেই। দয়া করে ওদিকটা ঘুরে সোজা চলে আসুন।"

দ্রুত পায়ে পরীক্ষকটি ব্যাঙ্কের সুরক্ষিত এলাকায় ঢুকে পড়ল। ক্যাশিয়ার মিঃ এডলিঙ্গার কথাবার্তায়, বিচার বিবেচনায় ও কার্যপ্রণালীতে বিজ্ঞ একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। প্রত্যেক কর্মচারীর সঙ্গে তিনি পরীক্ষকের আলাপ করিয়ে দিলেন।

মিঃ এডলিঙ্গার বললেন—আমি আশা করেছিলাম স্যাম টার্নারই এখানে আসবেন। প্রায় চার বছর ধরে স্যামই আমাদের খাতাপত্র পরীক্ষা করছিলেন। আশাকরি কাজকর্মের বোঝার

কথা মনে রেখে আপনিও দেখতে পারেন যে সব কিছু ঠিক আছে। হাতে খুব বেশি টাকা নেই, তবে ঝড়ঝাপ্টা সামাল দেবার জন্য তো রাখতেই হয়।

পরীক্ষক সিদ্ধান্তমূলক সুরেই বললেন—"মিঃ টার্নার কনট্রোলারের হুকুমেই আমাকে জেলা পরিবর্তন করতে হয়েছে। আমার পুরনো অঞ্চল দক্ষিণ ইলিনয়েস ও ইণ্ডিয়ানার কাজকর্ম তিনিই দেখছেন। প্রথমেই আমি ক্যাশটা দেখতে চাই। গনক পেরি ডর্সি পরিদর্শনের জন্য ইতিমধ্যে নগদ টাকাপয়সা ঠিক করে রাখা শুরু করেছেন। তিনি জানতেন সমস্ত হিসাব ঠিক আছে। ভয়ের কিছু নেই তবুও কেমন দুর্বল ও বিব্রত হয়ে পড়েছেন। ব্যাঙ্কের সকলের অবস্থাই তথৈবচ। এই লোকটির মধ্যে এমনই একটা শীতল, রফাহীনতার ভাব আছে যে তার উপস্থিতিটাকে একটা অভিযোগ বলে মনে হয়। মনে হয় সে যেন ভুল করে না, বা ভুলকেও এড়িয়ে যায় না।

মিঃ নেট্‌ল্‌উইক প্রথমেই নগদ টাকা নিয়ে পড়লেন। যাদুকরের মত বাণ্ডিলগুলো ফেলে বিল গুনতে শুরু করলেন। সোনাগুলো কাউন্টারের ওপর ঢেলে দিলেন, মুদ্রাগুলি পাথরের ফলকের ওপর গড়াতে লাগল। শেষ নিকেল ও ডাইম পর্যন্ত গুনে শেষ করলেন। তুলাদণ্ড আনিয়ে ভল্টের রূপোর বস্তা ওজন করলেন। প্রতিটি ক্যাশ মেমোরাণ্ডা সম্পর্কে ডর্সিকে প্রশ্ন করলেন অতিমাত্রায় ভদ্রতার সঙ্গে, তবু তার কাজকর্মের মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল যাতে গনকও আড়ষ্ট হয়ে রইল।

এই নতুন পরীক্ষকটি স্যাম টার্নারের চাইতে বড় বেশি রকমের আলাদা। স্যামের ব্যাঙ্কে ঢোকা থেকে অন্য সব কাজকর্ম ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকমের। এত সব খুঁটিনাটি ব্যাপারে তিনি এগোতেন না। কিন্তু টার্নার ছিল টেক্সাসের বাসিন্দা। আর ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের পুরনো বন্ধু। ডর্সিকে তিনি জানতেন শিশুকাল থেকেই।

পরীক্ষকটি যখন ক্যাশ গুণছিলেন সেই সময় ফার্ষ্ট ন্যাশনাল-এর প্রেসিডেন্ট মেজর টমাস. বি. কিংম্যান—সকলেই যাকে চেনে মেজর টম নামে—তিনি হাজির হলেন ঘোড়া গাড়ি নিয়ে। পরীক্ষকটি টাকাপয়সার ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত দেখে তিনি তার ছোট্ট গাড়ির ভিতর ঢুকে চিঠিপত্রগুলি দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ আগে ছোট একটা ঘটনা ঘটেছিল, পরীক্ষকটির তীক্ষ্ণ দুটি চোখ সেটা দেখতে পায়নি। তিনি যখন ক্যাশ কাউন্টারে কাজ শুরু করেছিলেন তখনই মিঃ এডলিঙ্গার ব্যাংকের বার্তাবাহক রয় উইল্‌সন-এর দিকে ইশারা করতেই রয় আদায়ের বইটা নিয়ে ছুটে চলে গিয়েছিল 'স্টকমেনস ন্যাশনাল"-এ। ব্যাঙ্কটা তখন সবে খুলতে শুরু করেছে।

বেশ চেঁচিয়ে সে বলল—'আরে বাবা, তোমরাও কি একটা ধাক্কা খেতে চাও নাকি?' 'ফাস্ট'-এ তো একজন নতুন পরীক্ষক এসে কচুকাটা শুরু করেছে।. সে তো পেরির নিকেলগুলো পর্যন্ত গুনছে। মিঃ এডলিঙ্গারই তোমাদের খবরটা দিতে বললেন।'

"স্টকমেনস ন্যাশনাল'-এর প্রেসিডেন্ট মিঃ বাকলে শক্তসামর্থ, বয়স্ক, পিছন দিকে তাঁর অফিসে বসেই রয়ের কথাগুলো শুনতে পেয়ে তাকে ডাকলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন—'মিঃ কিংম্যান কি ব্যাংকে এসে গেছেন?'

রয় বলল—"হ্যাঁ স্যার, তিনি গাড়ি নিয়ে ঢুকলেন আর আমিও বেরিয়ে এলাম।"

"তোমার হাত দিয়ে একটা চিরকুট পাঠাচ্ছি, গিয়ে তাঁর হাতে দেবে।"

মিঃ বাকলে লিখে দিলেন।

রয় ফিরে এসে চিরকুটটা কিংম্যানের হাতে দিল। মেজর সেটা পড়লেন এবং ভেস্টের পকেটে রেখে দিলেন। নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে উঠে ভল্টের কাছে গেলেন। অগ্রিম বাটা কেটে নেওয়া বিল ছাপ মারা মোটা চামড়ার নোটখাতা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। এরপর নিজের ডেস্কে খাতার স্তুপ বানিয়ে বাছাই করতে শুরু করলেন।

ততক্ষণে নেট্‌লউইক ক্যাশ গোনার কাজটা শেষ করে ফেলেছেন। নিজের কালো ওয়ালেটটা খুলে তাতে তাড়াতাড়ি কতগুলো সংখ্যা তুলে নিয়ে চশমার ভিতর দিয়ে ডর্মির দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টি যেন বলছে, "এবারের মত আপনি নিরাপদ কিন্তু—"

পরীক্ষক খেঁকিয়ে উঠল—ক্যাশ ঠিক আছে। তারপর চলে গেলেন হিসাবরক্ষকের কাছে। লেজারের পাতা উড়তে লাগল।

হঠাৎ তিনি জানতে চাইলেন—"কতদিন পরপর আপনি পাশ বইয়ের জমা খরচের হিসাব মেলান?"

হিসাবরক্ষক আমতা আমতা করে বললেন—'মানে মাসে একবার।'

'ঠিক আছে।' বলেই প্রধান হিসাবরক্ষককে নিয়ে পড়লেন। দেখা গেল সেখানেও সব কিছু ঠিক আছে। তারপর স্থায়ী আমানতের সার্টিফিকেটের হিসাবের বই। বাড়তি টাকা তোলার তালিকা, ব্যাঙ্কের অ-স্বাক্ষরিত বিল সব ঠিক আছে।

তারপর এল ক্যাশিয়ারের পালা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন হতে লাগল। সোজা সরল মিঃ এড্‌লিঙ্গার বিচলিত হয়ে পড়লেন।

এরমধ্যে একসময় নেট্‌ল্‌উইক বুঝতে পারলেন ঠিক তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু মাথার লম্বা চওড়া মানুষ। বছর ষাটেক বয়স, সবল সুস্থ, একমাথা পাকা চুল, এলোমেলো দাড়ি, তীক্ষ্ণ চোখ।

ক্যাশিয়ার বললেন—'ইনি আমাদের প্রেসিডেন্ট মেজর কিংম্যান—আর ইনি মিঃ নেটল্‌উইক।'

দুটি ভিন্ন মানুষ পরস্পর করমর্দন করল। একজন সহজ সরল, সব কিছু চিরাচরিত প্রথামাফিক। অপরজন বেশি খোলামেলা, উদার প্রকৃতির কাছাকাছি, টম কিংম্যান কোন একটা ছাঁচে গড়ে ওঠেননি। রাখাল, ভবঘুরে সৈনিক, শেরিফ, খনি সন্ধানী সবেতেই হাত পাকিয়েছেন। এখন ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, তাঁর সহকর্মীরা তার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখতে পায় না। টেক্সাসে যখন গরু মোষের দাম খুব চড়ে গিয়েছিল তখন তার ভাগ্য ফেরে। এবং সান রোজারিওতে ফার্স্ট ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। পুরনো বন্ধুদের প্রতি উদারতা ও বড় অন্তঃকরণ সত্ত্বেও তার ব্যাঙ্ক সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে। তার মানুষ চেনার ক্ষমতার জন্য। সম্প্রতি তার পশু ব্যবসায় মন্দা দেখা দিলেও ব্যাঙ্ক বড় ধাক্কা খায়নি।

ঘড়িটা বের করে পরীক্ষক বলে উঠল "আপনি যদি রাজী থাকেন তবে ধার-এর হিসাবটা দেখব।"

'ফার্স্ট ন্যাশনাল' ব্যাঙ্কের কাজকর্ম দ্রুত করলেও ভালভাবেই করেছেন। সে ব্যাঙ্কটার সবই পরিষ্কার ফলে কাজটাও সুচারুভাবে হয়েছে।

এই শহরে আরও একটা ব্যাঙ্ক আছে। প্রতিটি ব্যাঙ্ক পরীক্ষার জন্য পঁচিশ ডলার পারিশ্রমিক পান। এই সব কর্জ ও বাটার হিসাব দেখতে আধঘন্টা লাগলেও অন্য ব্যাঙ্কের কাজ শেষ

করে তিনি ১১.৪৫ এর গাড়ীটা ধরতে পারবেন। তার বাকি কাজকর্ম যে অঞ্চলে সেদিকে আবার ট্রেন একটা মাত্রই আছে। নয়ত আজ ও কাল এই একঘেয়ে শহরে কাটাতে হবে। সেইজন্য মিঃ নেট্‌ল্‌উইক এত ঝটপট কাজ করে চলেছেন।

মেজর কিংম্যান গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমার সঙ্গে আসুন স্যার। দুজনে একসঙ্গে যাই। ঐ কাগজপত্র আমি যতটা জানি আর কেউ জানে না।'

দুজন প্রেসিডেন্টের টেবিলে গিয়ে বসলেন। প্রথমে পরীক্ষকটি ছোটখাট নোট দেখে ফেললেন বিদ্যুৎগতিতে। তারপর হাত দিলেন বড় অঙ্কের ধার কর্জের খাতাপত্রে। শেষ পর্যন্ত সব কাগজপত্র এক পাশে সরিয়ে দিলেন, কয়েকটা কাগজ রেখে। সেগুলিকে সাজিয়ে রেখে একটা ছোট বক্তৃতা করলেন।

"দেখুন স্যার, এবারকার ফসলের খারাপ অবস্থা আর আপনাদের অঞ্চলে গৃহপালিত পশুর ব্যাবসায় মন্দার তুলনায় ব্যাঙ্কের অবস্থা ভালই। কেরানিরা কাজ সঠিকভাবে সময়মত করে বলে মনে হচ্ছে। একটা জিনিষ তবে এখানো বাকী আছে সেটা করতে পারলেই আমার এ ব্যাঙ্কের কাজ শেষ হয়। এখানে ছটা ঋণ স্বীকার পত্র আছে। মোট পরিমান ৪০,০০০ পাউণ্ড, আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে এর সবটাই ৭০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের স্টক, বণ্ড, শেয়ার ইত্যাদির দ্বারা দ্বায়মুক্ত। এগুলি ঋণ স্বীকার পত্রের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না অথচ এগুলি থাকা উচিত। আমার ধারনা সেগুলি আপনার সিন্দুকে অথবা ভল্টে আছে। সেগুলি পরীক্ষা করার অনুমতি আমাকে দিন।"

মেজর টমের নীল চোখ দুটি পরীক্ষকের ওপর স্থির হয়ে রইল। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—"না স্যার ওই দায়পত্রগুলো সিন্দুকে নেই, ভল্টেও নেই। ওগুলো আমি নিয়েছি। সেগুলো এখানে না থাকার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করতে পারেন আমাকে।"

নেট্‌ল্‌উইক ঈষৎ শিহরিত হলেন। এটা তিনি আশা করেননি। শিকার পর্ব শেষ করার মুখে গুরুত্বপূর্ণ পথ তিনি খুঁজে পেয়েছেন।

বললেন—"ওঃ একটু স্পষ্ট করে বলবেন কি।"মেজর আগের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন—'দায়পত্রগুলো আমিই নিয়েছি। আমার নিজের জন্য নয়, বিপদগ্রস্ত বন্ধুক বাঁচাতে।"

এরপর তিনি পরীক্ষককে সঙ্গে নিয়ে পিছন দিকে একটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘরে ছিল একটা ডেক্স, একটা টেবিল ও আধা ডজন চামড়া মোড়া চেয়ার। পাঁচ ফুট উঁচু শিঙওয়ালা হরিণের মাথা ফ্রেমে বাঁধান, দেওয়ালে ঝোলান। অন্য দিকের দেওয়ালে ছিল মেজরের পুরনো অশ্বারোহী সৈনিকের তলোয়ার, সেটা কোমরে ঝুলিয়ে তিনি শিলোতে এবং পিলো দুর্গে গিয়েছিলেন।

নেট্‌ল্‌উইককে একটা চেয়ার দিয়ে নিজে বসলেন জানালার পাশে যেখান দিয়ে ডাকঘর এবং 'স্টকমেনস ন্যাশানাল' এর সামনেটা দেখা যায়। তিনি কোন কথা না বললেও মুখ খুললেন নেট্‌ল্‌উইক।

এর পরে বলতে লাগলেন—'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আপনার বিবৃতিটা খুবই গুরুতর, আর আমার কর্তব্যবোধ আমাকে কি করতে বাধ্য করবে তাও আপনি বোঝেন। আমাকে যেতে হবে যুক্তরাষ্ট্রে কমিশনারের কাছে এবং—

হাত নেড়ে মেজর টম বললেন—'আমি জানি, আমি জানি, আপনি নিশ্চয়ই ভাবেননি জাতীয় ব্যাঙ্কের আইন কানুন এবং পরিবর্তিত বিধিবদ্ধ আইনগুলি না জেনে আমি ব্যাঙ্ক

চালাচ্ছি। আপনার কাজ আপনি করুন। আমি কোন অনুগ্রহ চাই না। কিন্তু আমি বলছি আমার বন্ধুর কথা। বব সম্পর্কে আমার কথাগুলি আপনি শুনুন।"

নেট্‌লউইক তার চেয়ারে ভাল হয়ে বসলেন আজকের মত তিনি সান রোজারিও ছেড়ে যেতে পারছেন না। তাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে" কনট্রোলার অফ রেভেনিউ" এর কাছে। যুক্তরাষ্ট্র কমিশনারের কাছে শপথ গ্রহণ করে একটা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করতে হবে মেজর কিংম্যান এর জন্য। দায়পত্রগুলি হারিয়ে ফেলার জন্য তার উপর জারী হবে ব্যাঙ্ক বন্ধের আদেশ। পরীক্ষকের এটাই প্রথম অপরাধ খোঁজা নয়। তিনি দেখেছেন একটি মাত্র ভুল করার জন্য ব্যাঙ্কের লোকেরা স্ত্রীলোকের মত কেঁদেছেন একটিমাত্র সুযোগ দেবার জন্য। একজন ক্যাশিয়ার তো ডেস্কের সামনেই গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। তাই নেটল্‌উইক ভাবলেন, প্রেসিডেন্ট যদি তার সঙ্গে কথা বলতে চান তাহলে তার কথা শোনা উচিত। ডান হাতটা চৌকো চিবুকের ওপর রেখে ব্যাঙ্ক পরীক্ষক সান রোজারিওর "ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক" এর প্রেসিডেন্টের মুখে নিজের অপরাধের স্বীকৃতিটা শুনবার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন।

উপদেশ দেবার মত করে টম বলতে শুরু করলেন, "একটি মানুষ যখন আপনার চল্লিশ বছরের বন্ধু হয়, ঝড়, জল, আগুনে আপনাদের একই সঙ্গে কেটেছে, তখন তার কিছু উপকার আপনি করতে পারেন তখন আপনার মন তো সেটাই চায়।"

"আমরা একসঙ্গে গরু চড়িয়েছি, বব এবং আমি একসঙ্গে দুজনে নিউ মেক্সিকোর এরিজোনায় এবং কালিফোর্নিয়ার অনেক জায়গায় সোনা ও রূপোর সন্ধানে ঘুরেছি, একষট্টির যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম, ভিন্ন ভিন্ন সেনাদলে। ইণ্ডিয়ান ও ঘোড়া চোরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি দুজনে দাঁড়িয়ে, এরিজোনা পর্বতমালার একটা ঘরে বিশ ফুট বরফের নীচে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়েছি। যখন প্রচণ্ড বাতাস এত প্রবল বেগে বয়ে গেছে, যে বিদ্যুতও ঝলসে উঠতে পারে না। তার মধ্যেই ঘোড়া ছুটিয়েছি আমরা। আসলে কি জানেন—পুরনো এংকর যার পশুপালন খামারের ঘোড়া দাগানোর শিবিরে প্রথম যখন আমাদের দুজনের দেখা হয়েছিল তারপর থেকে ববকে ও আমাকে অনেক দুর্দিনের ভিতর দিয়ে পথ চলতে হয়েছে। সেই সময়েই বুঝতে পেরেছিলাম যে দুঃখ কষ্টে পড়লে পরস্পরকে সাহায্য করাটা বেশি দরকার, আসলে ব্যাপার হচ্ছে দেওয়া নেওয়ার খেলা। সঙ্গীর বিপদে যদি আপনি সাহায্য না করেন তাহলে আপনার দরকারের সময় তিনিও হাত বাড়াবেন না। কিন্তু বব ছিল এমন একটা মানুষ যে তার থেকেও বেশি দূরে যেতে ইচ্ছুক। সে কখনও সীমা মেনে চলবে না।

বিশ বছর আগে আমি ছিলাম এক কাউন্টার শেরিফ আর বব আমার প্রধান সহকারী। তখন গৃহপালিত পশুর বাজার ছিল গরম, আমরাও তার ফায়দা তুলেছিলাম। ব্যাপারটা তারও আগের। আমি হলাম শেরিফ ও কালেক্টর। ওটাই আমার কাছে বড় ব্যাপার ছিল। আমি বিয়ে করেছি, দুটো ছেলে মেয়ে আছে। তখন তাদের বয়স চার ও ছয়। আদালতের পাশে একটা আরামদায়ক বাড়ি পেয়েছি, কাউন্টির খরচে সাজান গোছান, ভাড়া দিতে হয় না। বেশ কিছু জমিয়েও ফেলেছি। অফিসের বেশির ভাগ কাজ বব করে। দুজনেই অনেক ঝড ঝাপ্টার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে সমৃদ্ধির সব রকম ফসল ভোগ করতে লাগলাম। মনে হয় সুখেই ছিলাম।"

মেজর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। পরীক্ষক স্থান বদলেছেন, চিবুক রাখেন অন্য হাতের উপর।

মেজর বলেই চললেন—"একবার শীতকালে করের টাকা এত দ্রুত এসে জমতে লাগল যে এক সপ্তাহের মধ্যে সেটা ব্যাঙ্কে জমা দেবার সময় হল না। আমি চেকগুলো একটা চুরুটের বাক্সে রাখলাম আর টাকাগুলো বস্তায়। শেরিফের অফিসের সিন্দুকেই সব তালাবন্ধ করে রাখলাম।

সে সপ্তাহটা বেশ পরিশ্রম হয়েছিল। আমি প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমার স্নায়ুর গোলমাল দেখা দিল। রাতে ঘুম হত না। ডাক্তার দেখালাম ওষুধ খেলাম। কিন্তু চিন্তা যেত না। দুশ্চিন্তার কিন্তু কোন কারণ ছিল না, কারণ সিন্দুকটা ভাল জাতের আর আমি ও বব ছাড়া ওটা খোলার কম্বিনেশনটা কেউ জানত না। শুক্রবার থলেতে ছিল প্রায় ৬,৫০০ পাউণ্ড। শনিবার সকালে যথারীতি অফিসে গেলাম। সিন্দুকটা তালাবন্ধ ছিল, বব ডেস্কে বসে লিখছিল। সিন্দুকটা খুলে দেখি টাকা নেই। ববকে ডাকলাম। আদালতের প্রত্যেকটি লোককে ডেকে বললাম ডাকাতির খবরটা ঘোষণা করতে। বব কিন্তু বেশ শান্তভাবে ব্যাপারটাকে নিল, তাতে আমার খটকা লাগল।

দুদিন পেরিয়ে গেল কোন সূত্র পেলাম না। এটা চোরের কাজ নয়, কারণ কম্বিনেশন সঠিক ছিল। এ নিয়ে সাধারণ মানুষ নানা কথা বলতে শুরু করল। একদিন বিকেলে এলিস মানে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা এল। এলিস চোখ লাল করে চিৎকার করে উঠল 'হতভাগা মিথ্যাবাদীর দল টম, টম!' মূর্ছিত অবস্থায় তাকে ধরে ফেললাম। সুস্থ হলে সে টম কিংম্যানের নাম ও সম্পত্তির কথা তুলল। ছেলে, মেয়ে জ্যাক ও জিল্লা চুপচাপ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বব ডেস্কে বসে কাজ করছিল কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল। পরদিন চুরির বিচার চলাকালীন বব তাদের সামনে গিয়ে স্বীকার করল টাকাটা সেই নিয়েছে। পোকার খেলায় সে টাকা হেরেছে। পনের মিনিটের মধ্যে জুরি একটা পরোয়ানা পাঠাল—আমাকে গ্রেপ্তার করতে হবে তাকে এতদিন যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলাম, যে আমার ভাইয়ের মত ছিল।

সে কাজ আমি করেছিলাম, ববকে বলেছিলাম—আমার বাড়ি আছে, অফিস আছে, ক্যালিফোর্নিয়া, আর ফ্লোরিডা-সবই খোলা, পুনরায় আদালত বসার আগে যেখানে ইচ্ছা তুমি থাকতে পার। সব দায়িত্ব আমি নিলাম। যখনই ডাকবো তোমায় তুমি এসে হাজির হবে।

টম যেন বলতে হয় এমন করে বলল—"ধন্যবাদ টম। আমিও কেমন যেন আশা করছিলাম যে তুমি আমাকে হাজতে ঢোকাবে না। আদালত বসছে আগামী সোমবার। তাই তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে, ততক্ষণ আমি অফিসের চারপাশে ঘুরে বেড়াব। কেবল একটা অনুগ্রহ চাই, অবশ্য সেটা যদি খুব বেশি মনে না কর বাচ্চা দুটিকে মাঝে মধ্যে উঠোনে আসতে ও ঘুরে বেড়াতে দিলে খুব ভাল লাগবে।"

আমি জবাব দিলাম "কেন দেব না? তারা সব সময় স্বাগত আর তুমিও আগেকার মতই আমার বাড়িতে চলে এস। দেখুন মিঃ নেটল্‌উইক্‌ একই সঙ্গে আপনি চোরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারেন না, আবার বন্ধুকেও চোর বানাতে পারেন না।"

পরীক্ষক কোন জবাব দিল না। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কর্কশ হুইসল্‌ কানে এল, একটা ট্রেন ডিপোতে ঢুকেছে। নেরো গেজের ছোট ট্রেনটা দক্ষিণ থেকে এসে সান রোজারিওতে

থেমেছে। মেজর কান খাড়া করে এক মুহূর্ত কি যেন শুনলেন। ঘড়িতে দেখলেন—১০:৩৫। ঠিক সময় এসেছে। আবার তিনি বলতে শুরু করলেন—

বব তো খবরের কাগজ পড়ে আর সিগারেট টেনে ঘুরে বেড়াল। কাজগুলো করার জন্য একজন সহকারী রাখলাম। কিছুদিন পরে ব্যাপারটা থিতিয়ে গেল।

একদিন সে আমার অফিসে এল, আমি একাই ছিলাম সেদিন, তাকে কেমন যেন নীল ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

সে বলল—"টম এটা যে উত্তর আমেরিকায় বাস করার চাইতেও শক্ত। কিন্তু আমি শেষ পর্যন্ত লেগে থাকব। তুমি তো জান সেটাই আমার স্বভাব। কিন্তু তুমি যদি আমাকে একটি ইঙ্গিত দিতে বা শুধু বলতে বব আমি বুঝতে পেরেছি, তাহলেই সব কিছু আরও সহজ হয়ে উঠত।"

আমি বিস্মিত হলাম। 'তুমি কি বলতে চাইছ আমি তো কিছুই বুঝছিনা। অবশ্য তুমিও জান তোমাকে সাহায্য করতে আমি সব সময় প্রস্তুত। কিন্তু তুমি তো আমাকে ভাবিয়ে তুললে।' শুধু বলল—'ঠিক আছে টম,' তারপর কাগজটা নিয়ে একটা চুরুট ধরাল।

আদালত বসার আগের দিন রাতে বুঝতে পারলাম সে কি বলতে চেয়েছিল। রাত্রে শুতে যাবার সময় আমি একটা অস্থিরতা বোধ করছিলাম। তারপরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। যখন ঘুম ভাঙল দেখি স্বল্পাবাসে দাঁড়িয়ে আছি আদালত বাড়ির একটা বারান্দায়। বব ধরেছিল আমার একটা হাত, অন্য হাতটা পারিবারিক ডাক্তার। এলিস কাঁদতে কাঁদতে আমাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল। আমার অজ্ঞাতেই সে ডাক্তারকে ডেকে এনেছে। তিনি যখন এলেন তখন দেখা গেল আমি বিছানায় নেই, উধাও হয়ে গেছি, তারপরই সকলে আমাকে খুঁজতে শুরু করল।

ডাক্তার বললেন—এটা ঘুমের মধ্যে হাঁটা। সকলেই বাড়ী ফিরে এলাম। আর ডাক্তার শোনালেন অসাধারণ সব গল্প। ঐ অবস্থায় কত মানুষ কত কাণ্ড করেছে। বাইরে থাকার ফলে আমার বেশ শীত শীত করছিল। আমার স্ত্রীও ঘরে ছিল না তখন। তাই আমি ঘরে পুরনো পোশাকের আলমারী থেকে লেপ বার করতে গেলাম। লেপটা বার করতে গিয়ে একটা টাকার থলি গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। কী আশ্চর্য! এই চুরির দায়েই তো ববের বিচার হবার কথা।

'আমি চিৎকার করে উঠলাম—এই লাফান ঝুমঝমি সাপটা এখানে এল কি করে? আমার বিস্মিত ভাব সবাই দেখতে পেয়েছিল। ববও।

তার মুখে ফুটে উঠল পুরনো দিনের সেই আভাষ। সে বলল—'আরে ঝিমুনে বুড়ো, আমি দেখেছি তুমি ওটা ওখানে রেখে দিয়েছিলে। আমি দেখলাম তুমি সিন্দুক খুলে ওটা বের করেছ। আমি তোমার পিছু নিলাম। জানলা দিয়ে দেখলাম ওটা আলমারীতে রাখলে।'

"তাহলে ব্যাটা তুমি ব্যাপারটাকে কি ভেবেছিল?' বব শুধু বলল—"কারণ আমি জানতামই না যে তুমি ঘুমের ঘোরে ছিলে।'

আমি দেখলাম, সে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। দরজায় দাঁড়িয়ে জ্যাক ও জিল্লা। তখনই বুঝলাম ববের পক্ষে একটা মানুষের বন্ধু হবার অর্থটা কি।

মেজর থামলেন আবার জানালার বাইরে তাকালেন। দেখতে পেলেন—'স্টকমেনস ন্যাশনাল' ব্যাঙ্কের ভিতর কে যেন এসে একটা হলুদ পর্দা টেনে দিয়ে জানালাটাকে ঢেকে দিল।

নেট্‌ল্‌উইক ধৈর্য ধরে গল্পটা শুনলেও তেমন আগ্রহ ছিল না। তার মনে হল এই পরিস্থিতিতে গল্পটা অবান্তর। পরবর্তী ঘটনার ওপর কোন প্রভাব পড়বে না। তিনি ভাবলেন এই সব পশ্চিমী মানুষগুলোর ভাবাবেগ একটু বেশি, তাদের মনোবৃত্তিটা ব্যাবসায়ী সুলভ নয়। বন্ধুদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার দরকার আছে। মেজরের বক্তব্যের কোন অর্থ হয় না।

পরীক্ষক বললেন—'আমি কি প্রশ্ন করতে পারি, ওই সরিয়ে ফেলা দায়পত্রগুলি সম্পর্কে আর কোন কিছু আপনি জানেন?'

'সরিয়ে ফেলা দায়পত্র'। মেজর চেয়ারে ঘুরে বসলেন, 'দুটো নীল চোখ ঝলসে উঠল। আপনি কি বলতে চাইছেন স্যার।'

রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে আটকান এক তাড়া ভাঁজ করা কাগজ পকেট থেকে বার করে নেট্‌ল্‌উইকের হাতে গুঁজে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

'এই সব দায়পত্র এখানেই পাবেন স্যাব—প্রতিটি বণ্ড, স্টক, শেয়ার সব কিছু। আপনি যখন টাকা গুনছিলেন তখন আমি এগুলো সরিয়েছিলাম মিলিয়ে দেখে নিন।'

মেজর আবার ব্যাঙ্কের দিকে পা বাড়ালেন। বিস্মিত, বিচলিত উত্তেজিত, পরীক্ষক তাকে অনুসরণ করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন এমন একটা কিছুর শিকার তিনি হয়েছেন যেটা ঠিক ধাপ্পা নয়। অথচ সেই খেলায় তিনি হেরেছেন, ব্যবহৃত হয়েছেন, বাতিলও হয়েছেন, কিন্তু খেলাটা সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্গ তিনি জানেন না। এখন আর কিছুই করার নেই। এ ব্যাপারে একটা প্রতিবেদন দাখিল করা অসম্ভব। যে ভাবেই হোক, তিনি আরও বুঝতে পেরেছেন যে এই ব্যাপারে তিনি যতটা জেনেছেন তার থেকে বেশী কোনদিন জানতে পারবেন না।

নিরুৎসাহিত হয়ে নেট্‌লউইক দায়পত্রগুলি পরীক্ষা করলেন যান্ত্রিকভাবে। মন্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন। কালো থলেটা নিয়ে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেজর কিংম্যানের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন—'আমি বলতে চাই আপনার এই সব বক্তব্য ভ্রান্ত যাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনটুকু আপনি বোধ করেননি আমার কাছে সঠিক কিছু বলে মনে হয় নি, না ব্যবসায়িক দিক থেকে না কৌতূহলের দিক থেকে। এই সব উদ্দেশ্য ও কাজকর্ম আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

মেজর টম তার দিকে তাকালেন গম্ভীর ভাবে, বললেন—'বাবা বনে জঙ্গলে, তৃণভূমিতে এবং সঙ্কীর্ণ গিরিমালার দুই পারে এমন অনেক কিছুই আছে যা বুঝতে পারেন না। কিন্তু একজন অতিভাষী বৃদ্ধের গদ্যময় গল্পটা যে আপনি মন দিয়ে শুনেছেন সেজন্য ধন্যবাদ। আমরা টেক্সাসের বুড়োরা আমাদের অ্যাডভেঞ্চার ও বৃদ্ধ পুরনো বন্ধুদের কথা বলতে ভালবাসি। 'কোন এক সময়' বলে আমরা যখনই গল্প শুরু করি তখনই এখানকার লোকজনেরা উঠে পালায়। আর সেই জন্য কোন আগন্তুক এলে আমরা গল্প শোনাতে বসে যাই।"

মেজর হাসলেন কিন্তু পরীক্ষক মাথা নীচু করে ব্যাঙ্ক ছেড়ে চলে গেলেন। দেখা গেল রাস্তাটা পার হয়ে তিনি 'স্টকমেনস ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে' ঢুকে গেলেন।

মেজর টম ডেস্কের পাশে বসে ডেস্ক পকেট থেকে বের করলেন ববের লেখা চিঠিটা, একবার তিনি চিঠিটা পড়েছেন কিন্তু খুব তাড়াহুড়ো করে। আবার এখন পড়লেন।

প্রিয় টম,

শুনতে পেলাম স্যামখুঁড়োর কোন শিকারী কুকুর তোমার কাছে যাচ্ছে, তার অর্থ ঘন্টা দুয়েকের জন্য তাকে আমরা মুঠোর মধ্যে পাচ্ছি। এখন আমি চাই যে তুমি আমার জন্য কিছু কর। ব্যাঙ্কে আমাদের আছে মাত্র ২২০০ পাউণ্ড, আর আইনত থাকা উচিত ২০,০০০ পাউণ্ড। গতকাল বিকালে রস ও ফিসারকে ১৮,০০০ পাউণ্ড সহ পাঠিয়েছি ঘোড়া মোষ কিনতে। সেটা হলে ৪০,০০০ পাউণ্ড তারা পাবে। তাতে ওই পরীক্ষকের তো মন ভরবে না। এদিকে দায়পত্রগুলো তাকে দেখাতে পারছিনা। কারণ সেগুলো নেহাতই চিঠি মাত্র। কিন্তু তুমি তো খুব ভাল করে জান যে পিংক রস আর জিম ফিশার সর্বসেরা আর তারা কাজটা ঠিক করবে। জিমফিশারকে নিশ্চয় মনে আছে তোমার সেই লোকটি যে এল্ পামোতে একজন ফারো তামারুকে গুলি করেছিল। আমি স্যাম ব্রাডশা-এর ব্যাঙ্কে তার করেছি—আমাকে ২০০০০ পাউণ্ড পাঠাতে, আর ছোট রেলপথে ১০ : ৩৫ এ সেটা পৌঁছে যাবে। ব্যাঙ্ক পরীক্ষক এসে ২২০০ পাউণ্ড গুনে শেষ করলেই তুমি দরজা বন্ধ করে দেবে এটা তো তুমি করতে পার। তুমি পরীক্ষকটিকে আটকে রেখ। যদি দড়ি দিয়ে বাঁধতে হয় এবং তার মাথায় চড়ে বসতে হয় তাহলেও তাকে আটকাও। ছোট্ট লাইনে ট্রেন ঢোকার পর আমার সামনের জানালার দিকে তাকাবে। নগদ টাকা ব্যাঙ্কে ঢুকলেই সংকেত হিসাবে জানালার পর্দাটা টেনে দেব। তার আগে তাকে ছেড় না। তোমার ওপর ভরসা করে আছি টম।

তোমার পুরনো বন্ধু
বব বাকলে
প্রেসিডেন্ট, স্টকমেনস ন্যাশনাল।

মেজর চিঠি খানা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে বাতিল কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলেন। তারপর জিভ দিয়ে একটা খুশীর শব্দ করলেন।

"হতবুদ্ধি, বৃদ্ধ' খুশিতে মেজরের গলার স্বর গরগর করে উঠল। বিশ বছর আগে লোকটা আমার জন্য যা করেছিল তার কিছুটা অন্তত শোধ করা গেল।

* Friends in San Rosario

জোগান ও চাহিদা

থার্ড এভিনিউ-এর একটা নয় ফুট বাই চার ফুট মাপের ঘরে ফিঙ্ক-এর একটা জরুরীভিত্তিক টুপি পরিষ্কার করার দোকান আছে। একবার তার খদ্দের হলে আপনাকে চিরকাল তারই থাকতে হবে। তার ইস্ত্রি করার গোপন পদ্ধতিটা কি আমি জানি না কিন্তু প্রতি চারদিন অন্তর টুপিটাকে পরিষ্কার করাতেই হবে।

ফিঞ্চ মানুষটি ধীর, বয়স চল্লিশের মধ্যে। হাতের কাজ কম থাকলে গল্প করতে ভালবাসে। ফলে আমার টুপিটাকে প্রয়োজনের চাইতেও ঘন ঘন পরিষ্কার করাতে হয়।

একদিন বিকেলে দোকানে ঢুকলাম। সে একাই ছিল। আমার পানামা টুপিটাকে এমন একটা পদার্থ দিয়ে ঘসতে শুরু করল যেটা চুম্বকের মত সব ময়লা টানতে লাগল।

কথা শুরু করার জন্য বললাম "লোকে বলে আদিবাসীরা নাকি জলের নীচে কাপড় বোনে।"

ফিঞ্চ এসব কথায় বিশ্বাস করবেন না। আদিবাসী হোক আর সাদা মানুষই হোক অতক্ষণ কেউ জলের নীচে থাকতে পারে না। এবার বলুন তো আপনি কি রাজনীতি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন। কাগজে দেখলাম, ওরা নাকি একটা আইন পাশ করেছে যার নাম জোগান ও চাহিদা আইন।

আমি তাকে সাধ্যমত বোঝাতে চেষ্টা করলাম, ওটা একটা আর্থ-রাজনৈতিক নীতি, কোন বিধিবদ্ধ আইন নয়।

ফিঞ্চ—আমি ঠিক জানতাম না। বছরখানেক আগে এ নিয়ে অনেক কথা শুনেছি, কিন্তু সে একপেশে আলোচনা।

আমি—রাজনৈতিক বক্তারা কথাটা বহুল পরিমানে ব্যবহার করে থাকে। আমি তো মনে করি ওই কথাটা ছাড়া তাদের চলে না।

ফিঞ্চ—আমি কথাটা শুনেছি এক রাজার মুখে। দক্ষিণ আমেরিকার উপজাতিদের এক রাজা তিনি।

কথা শুনে আকৃষ্ট হলাম কিন্তু বিস্মিত হলাম না। এই বড় শহরটা মায়ের কোলের মত—যে মানুষ দূরদূরান্তে ঘোরাফেরা করে কোথাও হালে পানি পায় না তারাই এখানে আশ্রয় নেয়। সন্ধ্যা হলে ঘরে ফিরে দরজার সিঁড়িতে বসে পড়ে। একটা সস্তার কাফেতে পিয়ানো বাজায় এমন একটা লোককে আমি চিনি—সে নাকি আফ্রিকায় গিয়ে সিংহ মেরেছে, একটা হোটেলের ছোকরাকে চিনি যে ব্রিটিশ সেনাদলের হয়ে যুদ্ধ করেছে। এরকম আরও অনেক গল্প। কাজেই এই টুপি-পরিষ্কারক এক রাজার বন্ধু ছিল-এ গল্প আমার কানে বাজে নি।

শুকনো হেসে ফিঞ্চ প্রশ্ন করল—এটা কি নতুন?

আমি—হ্যাঁ, পাঁচ দিন হল নতুন টুপিটা কিনেছি।

ফিঞ্চ গল্প শুরু করে দিল, "একদিন রাতে একটা লোক এসে হাজির। গায়ের রঙ বাদামী, পকেট ভর্তি টাকা, খেল একেবারে রাজকীয় খানা।

দুবছর আগে তখন ছিলাম গাড়ির চালক। লোকটি কথায় কথায় সোনার কথা তুলল, দক্ষিনে নাকি গুয়াদিমালা নামে একটা দেশ আছে আর সেখানে একটা পাহাড় সোনায় বোঝাই। ওখানকার আদিবাসীরা নদীর জল থেকে বেশী পরিমান সোনা ছেঁকে ছেঁকে তোলে।

আমি—সেই সোনা নিয়ে কি করে?

ফিঞ্চ—কিছুই করে না তারা কেবল সোনা জমায়, খরচ করে না।

তারপর তার সঙ্গে অনেক কথা হল। এক সময় কথার ঝুলিও ফুরিয়ে গেল। করমর্দন করে বললাম কথাগুলি বিশ্বাস করতে পারলাম না। একমাস পর গুয়াদিমালায় গিয়ে হাজির হলাম সঙ্গে ছিল পাঁচ বছর ধরে জমানো ১৩০০ ডলার। আদিবাসী ইণ্ডিয়ানরা কি পছন্দ

করে তা আমার জানা ছিল। তাই সঙ্গে নিলাম্ পাঁচটা খচ্চরের পিঠ ভর্তি লাল পশমি কম্বল, ঢালাই লোহার বালতি, পাথর বসানো চিরুনি, কাঁচের নেকলেস আর সেফটি রেজার। একটা কালো 'মোজো' কে ভাড়া করলাম। লোকটা খচ্চর চালক এবং দো-ভাষীর কাজ দুইই করবে। পরে দেখা গেল খচ্চর ভাল চালালেও ইংরেজি ভাষাটা খটমটে। তার নামের উচ্চারনটাও অদ্ভুত। আমি তাকে ডাকতাম ম্যাক ক্লিন্টন বলে। সেটাই অনেকটা কাছাকাছি।

তারপর সোনা ভর্তি গ্রামটা ছিল একটা পাহাড়ের চল্লিশ মাইল উপরে। পৌঁছতে সময় লাগল ন'দিন। একদিন বিকেলে ম্যাক ক্লিন্টন তার খচ্চরের দল ও আমাকে নিয়ে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু দুই গিরিচুড়োর উপরকার কাঁচা চামড়ার সেতুটা পার হল।

গ্রামটা কাদা ও পাথরে তৈরী। রাস্তাঘাট বলে কিছু নেই। কিছু হলুদ বাদামী মানুষ দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা বার করে দেখতে লাগল। সব থেকে বড় বাড়ির চারদিকে বারান্দা ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে এল বড় মাপের একজন সাদা মানুষ। গায়ের রঙ ইটের মত লাল, গায়ে হরিণের চামড়ার সুন্দর পোষাক, গলায় সোনার চেন, আর মুখে চুরুট।

লোকটি এগিয়ে এসে আমার দিকে তাকাল। ততক্ষণে ম্যাক ক্লিন্টন খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে কি যেন বলল।

লোকটি আমাক বলল—আরে বুটিনস্কি, তুমি আবার কেমন করে এ ব্যবসাতে নামলে, আগে তো তোমাকে এক টুকরোও কিনতে দেখিনি। এ শহরের খোঁজ তোমায় কে দিল?

আমি—আমি গরিব পর্যটক। খচ্চরের পিঠে ঘুরে বেড়াই। আমাকে মাপ করবেন। আপনি কি এ লাইনে আছেন, নাকি সবই ধাপ্পাবাজ?

তিনি—তোমার আধা-ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ভিতরে এস।

একটা আঙ্গুল তুললে এক গ্রামবাসী ছুটে এল।

বললেন—এই লোকটি তোমার সব কিছু দেখাশোনা করবে, আর তোমার দেখভাল করব আমি।

তিনি আমাকে বড় বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলেন। কয়েকটা চেয়ার টেনে আনলেন। আর দুধের মত একটা পানীয় দিলেন। এত ভাল ঘর আমি আগে কখনও দেখিনি। পাথরের দেওয়াল জুড়ে রেশমি শাল ঝোলান, মেজেতে লাল ও হলুদ কার্পেট পাতা। লাল মাটি ও ছাগল চামড়ার নানা পাত্র, আর এত বেশি বাঁশের আসবাব যা দিয়ে আধডজন সমুদ্রতীরের কুটীর সাজান যায়। তিনি বললেন প্রথম কথা, 'তুমি হয়ত জানতে চাও আমি কে? এই উপজাতি ইণ্ডিয়ানদের আমি একমাত্র ইজারাদার ও মালিক। তারা আমাকে বলে—"বড় ইয়াকুমা', মানে রাজা বা দলের 'বুড়ো আঙ্গুল'। একজন রাষ্ট্রদূত বা ডিনামাইটের একজন ভারপ্রাপ্ত অধিপতির চাইতেও ক্ষমতা বেশী। আর মাঝে মধ্যে আমি খবরের কাগজ পড়ি। এবার তোমার পরিচয় বল। তারপর অন্য সব কথা হবে।'

"আমি—দেখুন, সকলেই আমাকে ডব্লু. ডি. ফিঞ্চ বলে জানে। পেশা-পুঁজিবাদী। ঠিকানা ৫৪১ ইষ্ট থার্টি সেকেণ্ড—'

'নিউইয়র্ক বড় ইয়াকুমা, কথাটা জুড়ে দিলেন। মুচকি হেসে বললেন, আমি জানি।

—কেন এসেছি, কি ভাবে এসেছি সবই এই মুরুব্বিকে খুলে বললাম।

'একটা শিশুর মত বিচলিত ভাব দেখিয়ে বললেন—সোনার গুড়ো? খুব মজার কথা তো। এটা তো সোনার খনির দেশ নয়। আর একটা অপরিচিত লোকের গল্প শুনে তোমার

মূলধন বিনিয়োগ করতে এসেছ। বেশ বেশ, আমার এই ইণ্ডিয়ানরা শিশুর মত সরল। সোনার ক্রয় ক্ষমতার কথাটা কিছুই জানে না। আমার মনে হয় কেউ তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে।'

আমি—তা হতে পারে।

হঠাৎ রাজা বলে উঠলেন—'তোমাকে আমি সত্যি কথাই বলব। একজন সাদা মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আমি বড় একটা পাইনা। তাই তোমার টাকাটা লগ্নি করার একটা পথ আমি দেখিয়ে দেব। আমার এই প্রজারা হয়তো অল্প কিছু সোনার গুঁড়ো পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। যে সব মানপত্র তুমি সঙ্গে করে এনেছ আগামীকাল সেগুলোর প্রর্দশনী করে দেখ কিছু বেচতে পার কি না। এবার যে সরকারীভাবে আমার পরিচয়টা দিচ্ছি। আমার নাম শেইন—প্যাট্রিক শেইন। এই দেশে ইণ্ডিয়ান উপজাতির মালিকানা আমি লাভ করেছি যুদ্ধ জয়ের অধিকারে—এককভাবে, নির্ভীক অন্তরে। চার বছর আগে ভাসতে ভাসতে আমি চলে এসেছি। এখানে এদের জয় করেছি আমার চেহারা, গায়ের রঙ, স্নায়ুর শক্তি দিয়ে। ছয় সপ্তাহের মধ্যে ওদের ভাষাটা আমি শিখে নিয়েছি—শেখাটা খুব সহজ। এক নিঃশ্বাসে যতগুলি পার ব্যঞ্জনবর্ণ একটানা উচ্চারণ করে যাও, আর তুমি কি চাও সেটা দেখিয়ে দাও।

দর্শনীয়ভাবে আমি তাদের জয় করলাম, রাজা শেইন বলতে লাগলেন, তারপর তাদের বোঝাতে লাগলাম আর্য রাজনীতি, আইন, ভোজবাজি এবং নিউ ইংল্যাণ্ডের উপযোগী কিছু নীতি কথা ও মিতব্যায়িতা। প্রতি রবিবার অথবা তার কাছাকাছি কোন দিনে আমি পরিষদ ভবনে তাদের প্রচার করি জোগান ও চাহিদার নীতি। আমি জোগানের প্রশংসা করি আর চাহিদার মাথায় আঘাত হানি। প্রতিবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করি। তোমার কি মনে হয় ডব্লু. ডি. যে তোমার মধ্যে কাব্য আছে?

আমি—আহা সেটাকে কাব্য বলে কিনা তাই তো জানি না।

শেইন—যে কাব্যিক উপদেশামৃত প্রচার করি সেটা টেনিসনের কাছ থেকে ধার করা। আগাগোড়া তাকে প্রধান কবি বলে মনে করি। তার এই কথাগুলি আমি আওড়াই।

"কারণ আমি বাড়িয়ে বলছিনা। কোন মানুষ যদি শিখতে পারে তাহলে সেটাই হবে সেকালের একজন সুলতান হয়ে মশলা বাগানে বেড়ানর চাইতেও বড় কাজ।"

"বুঝতেই পারছ, আমি তাদের শেখাই-চাহিদাকে কেটে নামাও, জোগানটাই আসল কথা। আমি তাদের শেখাই অতি সাধারণ প্রয়োজনের বাইরে কিছু কোর না। একটু মাংস, একটু কোকেন, উপকূল থেকে আনা একটু ফুল-এটা পেলেই তারা খুশি। তারা সব কিছুই শিখেছে। নিজেদের পোশাক আর টুপি তারা নিজেরাই তৈরী করে গাছের আঠা ও খড় দিয়ে। আর তাই নিয়ে তারা সন্তুষ্ট। এই সব ছোট ছোট কাজ নিয়ে একটা জাতিকে সুখী করে তুলতে পারাটাই তো মহৎ কাজ।

পরদিন রাজার অনুমতি নিয়ে আমি ম্যাক ক্লিন্টনকে কাজে লাগালাম। দুটো বস্তার মাল খুলে গ্রামের চত্বরে ভাল করে সাজাল। ইণ্ডিয়ানরা দলে দলে সেখানে ভিড় করল, দেখল, তাদের সামনে কম্বল মেলে ধরলাম, হাতের আংটি, কানের দুল দেখিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিলাম, মুক্তোর নেকলেস, মাথার চিরুনি দেখিয়ে মেয়েদের মন কাড়া হল, ছেলেদের দেখান হল নানা রকম জামা-গেঞ্জী। কিছুতেই কিছু হল না। মূর্তির মত হাঁ করে শুধু দেখল। আমার একটা মালও বিক্রি হল না। ম্যাক ক্লিন্টনকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরকম কেন হল। সে হাই

তুলে সিগারেট পাকাল, পাশের খচ্চরটাকে দু একটি বকুনি দিল, তারপর গলা নামিয়ে বলল, ওদের হাতে টাকা পয়সাই নেই তো মাল কিনবে কি করে?

ঠিক সেই সময় রাজা পেট্রিক বুকে সোনার চেন ঝুলিয়ে হাতে চুরুট নিয়ে রাজ মহিমায় প্রবেশ করলেন।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যবসা বেশ হল ডব্লু. ডি?

আমি—চমৎকার। বিক্রির কী ভিড়। আর এক প্রস্থ মাল বেচেই দোকান বন্ধ করব। কাল সেফটি রেজার দিয়ে একটা চেষ্টা করব। দুই গ্রোস মাল এনেছি নিলাম থেকে।

শেইন হো হো করে হাসতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত কে এক ক্রীতদাস সৈনিক, না আপ্ত সহায়ক বলে হাসি থামাল।

তখন তিনি বললেন—হা আমার স্বর্গীয়া জেরুশা মাসি। আর ডব্লু. ডি. ব্যবসার ব্যাপারে তুমি যে দেখছি একেবারেই অপগণ্ড। তুমি কি জান না কোন ইণ্ডিয়ানরা দাড়ি কামায় না? কামানর বদলে উপড়ে ফেলে।

শেইন হাসতে হাসতে চলে গেলেন, তার হাসি কিন্তু আমার কানে বাজতে লাগল।

আমি ম্যাক ক্লিন্টনকে বললাম—ওদের বলে দাও, আমি টাকা চাইনা, বলে দাও আমি সোনা চাই। আরও বল আমি সোনার দাম দেব আউন্স প্রতি ষোল ডলার হিসাবে। আমার চাই গুঁড়ো।

ম্যাক সেই কথাই ঘোষণা করে দিল। আপনারা কি ভাবছেন যে তখন দলে দলে সৈন্য ডেকে এনে ভিড় সামলাতে হল? মোটেই না। প্রতিটি খুড়োর ভাইপো আর মাসির বোন-ঝি দুই মিনিটের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেল।

সেদিন রাতে আমি আর রাজা রাজবাড়িতে বসে এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলাম।

আমি বললাম—নিশ্চয় সব সোনার গুড়ো তারা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। না হলে সোনার কথা শুনে পালাত না।

শেইন বলল—মোটেই তা নয়। তাদের কাছে কিছু নেই। এই সোনার ভূত কে তোমার মাথায় ঢুকিয়েছে? তুমি কি এ্যালান পো পড়েছ। তাদের কাছে এক রত্তি সোনা নেই।

আমি—সব গুড়ো সোনা তার পাখির পালকের ফাঁপা অংশের মধ্যে রাখে, তারপর তাকে পাত্রের মধ্যে ঢালে, সেগুলোকে খালি করে সব পঁচিশ পাউণ্ডের বস্তায়। একথা আমি শুনেছি।

শেইন চুরুটটা চিবুতে চিবুতে বলল—ডব্লু. ডি. একটা সাদা মানুষের সঙ্গে আমার কালে ভদ্রে দেখা হয়, তাই ভাবছি তোমাকে এখানে রেখে দেব। আমার মনে হয় না তুমি জীবন্ত অবস্থায় এখানে এসেছ।

ঘরের একটা কোন থেকে পর্দা সরিয়ে দিলে দেখা গেল হরিনের চামড়ার স্তূপীকৃত বস্তা।

বললেন—এখানে চল্লিশটা বস্তা আছে ২২০,০০০ ডলার মূল্যের গুড়ো সোনা এর মধ্যে আছে এসবই আমার। বড় ইয়াকুমাই এসবের মালিক। সব তারাই এনে দেব। দুলাখ বিশ হাজার ডলার একবার ভাব, এসবই আমার।

অবজ্ঞায় ঘৃনায় বললাম—এতে আপনার কোন লাভ নেই। তাহলে আপনি এই সব অর্থবিহীন অর্থসৃষ্টিকারী দলের সরকারী কোষরক্ষক? এই সব জমা অর্থের যথেষ্ট সুদ দেন তো?

তিনি বললেন—এগুলি আমি ভালবাসি, দিনরাত এদের স্পর্শ পেতে চাই। আমার জীবনের এটাই সুখ। এই ঘরে ঢুকলে আমি রাজা হয়ে যাই। আর এক বছরের মধ্যে কোটিপতি হয়ে যাব আমি। প্রতিমাসেই স্তুপটা বড় হচ্ছে। গোটা উপজাতি আমার হয়ে খাড়ির বালি ধোয়ার কাজে লেগেছে। পৃথিবীর মধ্যে আমিই সবচেয়ে সুখী মানুষ ডব্লু.ডি। আমি চাই সোনার কাছাকাছি থাকতে। এখন তুমি বুঝতে পারছ কেন আমার ইণ্ডিয়ানরা তোমার মাল কিনছে না। তারা কিনতে পারে না। তারা আমার কাছেই আসে কেননা আমি রাজা। আমিই তাদের শিখিয়েছি কোন কিছু না চাইতে, কিছু দেখে মুগ্ধ না হতে তুমি বরং দোকানটাই বন্ধ করে দাও।

আমি—আপনি যে কি সেটা আমিই আপনাকে বলে দিচ্ছি। আপনি এক ঘৃনিত কৃপন। আপনি প্রচার করেন জোগান বেশি কিছু নয় কিন্তু চাহিদা অনেক বড়। চাহিদার মধ্যে রয়েছে নারী ও শিশুর অধিকার, বদান্যতা, বন্ধুত্ব, এবং রাস্তার মোড়ে ভিক্ষাবৃত্তি পর্যন্ত। দুটোকেই মেলাতে হবে। তাছাড়া এখনও আমার ব্যাবসার থলিতে এমন আরও কিছু জিনিস আছে যা আপনার রাজনীতি ও অর্থনীতির গৃহীত সিদ্ধান্তকে উল্টে দিতে পারে।

পরদিন সকালে আমার নির্দেশমত ম্যাক ক্লিন্টন আরও এক খচ্চর বোঝাই মাল নিয়ে চত্বরে গেল। আবার আগের মতই লোক ভিড় করল।

আমি বেছে বেছে সব গহনা বার করলাম মেয়েদের পরতে দিলাম। তার পরেই বার করলাম তুরুপের তাস।

আমার শেষ বাণ্ডিলটার ভিতর থেকে বের করলাম আধা গ্রোস হাত আয়না। পিছনে নিরেট টিনের পাত লাগান। সেগুলো বিলিয়ে দিলাম মহিলাদের হাতে হাতে। পেচে ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সেটাই আমার প্রথম প্রচলন।

অট্টহাসি হাসতে হাসতে শেইন পাশ দিয়ে চলে গেল।

বললেন—ব্যবসা কি মুখ তুলে চাইছে।

আমি—এই মুহূর্তে নিজেই নিজেকে দেখছে। দেখতে দেখতে ভিড়ের মধ্যে একটা গুঞ্জন ছড়াতে লাগল। সব মেয়েই সেই জাদু কাঁচের দিকে তাকিয়ে দেখল তারা সুন্দরী এবং সেই গোপন কথাটা চুপিচুপি পুরুষদের কানেও তুলল। মনে হল সব পুরুষের টাকার অভাব এবং নির্বাচনের আগে টানাটানির অজুহাতও তুলল। কিন্তু তা মাঠে মারা গেল।

তখন এল আমার পালা।

ম্যাক ক্লিন্টন তখন খচ্চরদের সঙ্গে সরস বাক্যালাপে মত্ত ছিল, আমি তাকে ডেকে এনে দোভাষীর কাজে লাগিয়ে দিলাম।

বললাম—তাদের বলে দাও, সোনার গুঁড়ো দিয়ে তারা এই সব অলংকার কিনতে পারবে যা একমাত্র পৃথিবীর রাজা রাণীদের গায়ে মানায়। ওদের বলে দাও, জল ছেঁকে ছেঁকে তারা যে হলুদবালি বের করে আনে পরম পবিত্র ইয়াকোমে ও জাতির প্রধান গুরুর জন্য, সেগুলি তারা কিনতে পারবে এই সব মহামূল্যবান রত্নরাজি ও তাবিজ কবচ যা তাদের করে তুলবে সুন্দরী এবং রক্ষা করবে ভুত পেত্নীদের হাত থেকে। ওদের বলে দাও পিটসবার্গ ব্যাঙ্কগুলি এইসব জিনিষ জমা রেখে শতকরা চার হিসাবে সুদ ডাকযোগে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ওহে ম্যাক তুমি একটানা বলে যাও যে সোনার গুঁড়োর শ্রমিকরা এক নাগাড়ে তাদের কাজ করে যাক। তাদের মনে করিয়ে দাও টম ওয়াটমনরা জর্জিয়ায় ফিরে গেছে।

ম্যাক ক্লিন্টন একটি খচ্চরের গায়ে আদর করে হাত বুলোতে বুলোতে বেশ কয়েক গোছা ছোট ছোট টাইপ সমবেত খচ্চরদের দিকে ছুঁড়ে দিল।

আমার মাছের আঁশ দিয়ে তৈরী অলঙ্কার ও সকল পাথরের মালার তিন লহর গলায় ঝুলিয়ে একটি আদিবাসী ইণ্ডিয়ান নারী-পুরুষের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর পুরুষটি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে অবিরাম এমন ভাষায় কথা বলে যাচ্ছে যে মনে হচ্ছে একটি লোক ছক্কার গুটিগুলো একটা কৌটতে ভরে ঝাঁকাচ্ছে।

ম্যাকক্লিন্টন বলছে—পুরুষ লোকটা বলছে যে ঐ সোনার গুঁড়ো দিয়ে যে সব কেনা যায় জানত না। মেয়েরা পাগল হয়ে উঠেছে। মহান ইয়াকুমা তাকে বোঝাচ্ছে ঐ অলঙ্কার ভূত পেত্নী ছাড়ান ছাড়া কোন কাজে লাগে না।

আমি বললাম—যেখানে টাকা সেখানেই ভূত পেত্নীর বাসা।

ম্যাক বলতে লাগল—ওরা বলছে ইয়াকুমা তাদের বোকা বানাচ্ছে। তারা প্রচুর হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছে।

আমি—এই তো সবে শুরু। চালিয়ে যাও। সোনার গুঁড়োর টানে আর নগদের টানেই হোক সব মজুদ মাল ফুঁতে উড়ে গেল।

তারপরেই হঠাৎ ভিড়টা উধাও হয়ে গেল। কি যে হল বুঝতে পারলাম না। ম্যাক ও আমি বাকি হাত-আয়না ও অলঙ্কারপাতি নিয়ে বেঁধে খচ্চরের পিঠে চেপে আস্তানায় চলে গেলাম।

সেখানে পৌঁছতে কানে এল প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি, চত্বর দিয়ে ছুটে আসছে শেইন। গায়ের পোশাক ছিঁড়ে গেছে, মুখটা ফালা ফালা হয়ে গেছে।

তিনি বললেন—ডব্লু. ডি. ওরা রাজকোষ লুঠ করেছে। আমাকে খুন করতে চাইছে, তোমাকেও। এখনই দুটো খচ্চরের বাঁধন খুলে দাও। দুই মিনিটের মধ্যে পালাতে হবে।

আমি—যোগান ও চাহিদার আসল সত্যটা ওরা ধরে ফেলেছে।

রাজা—প্রায় সবটাই করেছে মেয়েরা। অথচ ওরাই আমাকে এত ভক্তি করত মান্য করত।

আমি—তখন তো ওরা আয়না দেখেনি।

শেইন—ওদের হাতে ছুরি আছে কুড়ুল আছে তাড়াতাড়ি কর।

আমি—ধূসর সাদা ফুটকিওয়ালা খচ্চরটা আপনি নিন। হায়রে আপনি স্বয়ং ও আপনার জোগান নীতি ঃ আমি নিচ্ছি মেটে বঙটা। ওটা ঘন্টা প্রতি দুই নট জোরে চলে। ওটার একটা হাঁটুতে টান ধরেছে। তবে সে পুশিয়ে দিতে পারবে। আপনি যদি আপনার রাজনীতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক অধিকারের সমন্বয়কে মেনে নিতেন তাহলে মেটে রঙের খচ্চরটাকে আপনাকে দিতাম।

শেইন, ম্যাক ও আমি খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে সবে কাঁচা চামড়ার সেতুটা পার হয়েছি ঠিক তখনই পেচেরা সদলে প্রান্তে পৌঁছে আমাদের লক্ষ্য করে পাথর ও লম্বা ছুড়ি ছুড়তে শুরু করল। যে চামড়ার ফিতে দিয়ে সেতুর দিকটা বাঁধা ছিল সেগুলোকে কেটে দিয়ে আমরা উপকূলের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি লম্বা মোটাসোটা পুলিশ ফিঞ্চ-এর দোকানে ঢুকে শো কেসের উপর কনুই রেখে দাঁড়াল।

পুলিশটা বলল—ক্যাসির দোকানে শুনে এলাম আগামী রবিবার বার্গেন বীচ-এ ইস্ত্রিকারক ইউনিয়ন-এর একটা বনভোজন হবে কথাটা কি সত্যি?

নিশ্চয়ই, খুব মজা হবে সেখানে।

আমাকে পাঁচটা টিকিট দাও, শো কেসের ওপর একটা পাঁচ ডলারের বিল ছুড়ে দিয়ে পুলিশটা বলল।

ফিঞ্চ—সে কি? বাড়াবাড়ি করছেন কেন? আরে, রেখে দিন ওসব—সেখানে কিছু কেনা বেচাও চলবে? তাহলে ক্রেতাও তো চাই। আমার তো যাবার ইচ্ছা—

আশেপাশের লোকজন ফিঞ্চকে এতটা ভাল চোখে দেখে সেটা দেখে আমারও ভাল লাগল।

তারপরই বছর সাতেকের একটি মেয়ে ঢুকল। মুখ ময়লা, চোখ দুটো নীল, নোংরা পোশাক, কর্কশ গলায় একটানা বলে গেল—মা বলেছে তুমি আমাকে অবশ্যই দেবে মুদির জন্য আশি সেন্ট, আর এটা ওটা কেনার জন্য পাঁচ সেন্ট-কিন্তু এটা ওটা কি মা বলেনি।'

ফিঞ্চ টাকাটা বের করে দুবার গুনল। কিন্তু আমি দেখলাম যে ছোট মেয়েটি হাতে পেল মোট এক ডলার চার সেন্ট।

বেশ যত্ন করে আমার টুপির ফিতেটায় আরও কয়েকটা সেলাই খুলতে খুলতে বলল। এটাই হচ্ছে সঠিক নিয়ম—জোগান ও চাহিদার নিয়ম। কিন্তু দুটোকে এক সঙ্গে কার্যকর করতে হবে। তারপর শুকনো হেসে বলল—আমি বাজি রেখে বলতে পারি ঐ নিকেলের মুদ্রা দিয়ে সে কিনবে জেলি বাটার—ওটা সে খুব পছন্দ করে। চাহিদা না থাকলে জোগান দিয়ে কি হবে?

আমি প্রশ্ন করলাম—সেই রাজার কি হল।

ফিঞ্চ—ওহো, সেটা আমারই বলা উচিত ছিল। যে লোকটি দোকানে ঢুকে টিকিট কটা কিনেছিল তিনিই শেইন। তিনি আমার সঙ্গে ফিরে গিয়ে পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন।

* Supply and Demand

স্মারক

মিস্ লিনেটি ডি আরমাণ্ড ব্রডওয়ে থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিল কারণ ব্রডওয়েও তার সঙ্গে এমন ব্যবহারই করেছে। অর্থাৎ ইটের বদলে পাটকেল। রিগিং দ্য হয়ালউণ্ড এর প্রাক্তন নায়িকার ব্রডওয়ের কাছে প্রাপ্য কিছু ছিল, উল্টোটা কখনই নয়।

অতএব লিনেটি ডি, চেয়ার ঘুরিয়ে একটা রেশমি কালো মোজা সেলাই করতে লাগল। নিচের গর্জনমুখর ব্রডওয়ে তাকে টানে না, তাকে টানে তার বিশাল বাড়ীর বদ্ধ বাতাস, হৈ-চৈ হট্টগোল। এদিকে এই একটা জিনিষই তার সঙ্গী-রেশমি কাপড়।

ম্যারাথন যেমন দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে, হোটেল থালিয়াও তেমনই দাঁড়িয়ে আছে ব্রডওয়ের ওপর। হোটেলটা যেন এক বিষাদমগ্ন পাহাড়ের চূড়া, নীচে বড় বড় জলস্রোত আছড়ে পড়ছে। চারিদিকে বুকিং অফিস, থিয়েটার, এজেন্ট স্কুল, প্রাসাদে ভর্তি।

স্বপ্নালোকিত ও দুর্গন্ধময় 'থালিয়ার' অদ্ভুত হলগুলোর ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হবে কোন বড় জাহাজ যেটা এখনই পাল তুলবে অথবা আকাশে উড়বে। বাড়ির চারদিকে ছড়িয়ে আছে অস্থিরতা প্রত্যাশা ক্ষণস্থায়িত্ব, এমনকি উদ্বেগ ও ভয়ের অনুভূতিও। গাইড না থাকলে গোলকধাঁধায় পড়ার সম্ভাবনা।

যে কোন মোড় ঘুরলেই দেখা যাবে ট্র্যাজেডির ধুর্ধর্ষ অভিনেতারা স্নানের পোশাক পরে স্নান ঘরের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ঘরগুলো থেকে ভেসে আসছে গুনগুন, হাসি, ঠাট্টা কথাবার্তা।

গ্রীষ্ম আসার ফলে যে যার দল ছেড়ে যাত্রীনিবাসে আশ্রয় নিয়েছে। আর আগামী মরশুমে কাজ পাবার জন্য ম্যানেজারের গায়ে গায়ে ঘুরছে।

মিস্ ডি' আরমাণ্ডের ঘর ছোট। ড্রেসিং টেবিল ও ওয়াশ স্ট্যাণ্ডের মাঝখানে কোন রকমে দোলনা চেয়ারটার জন্য একটু জায়গা করা হয়েছে। ড্রেসিংটেবিলের ওপর টুকিটাকি জিনিষপত্র, প্রাক্তন নায়িকার নানা সময়ের বই-এর সংগ্রহ, আর প্রিয় ও সেরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের ফটোগ্রাফ।

সাজগোজের ফাঁকে ফাঁকে একটি ফটোগ্রাফের দিকে দু তিনবার তাকিয়ে বন্ধুর মত হাসতে লাগল।

আস্তে আস্তে বলল—খুব জানতে ইচ্ছা করে এই সময় লী কোথায় আছে।

এত প্রশংসিত ফটোগ্রাফটি দেখার সুযোগ যদি পাওয়া যেত তাহলে প্রথম দেখাতেই মনে হত যে একটি ঝড়ে পড়ে যাওয়া শ্বেত পুষ্পের স্তবক। কিন্তু এই বায়ুবিধ্বস্ত শ্বেতবর্নের জন্য ফুলের রাজ্য দায়ী নয়।

দেখা গেল মিস্ রোজালি রে—সূক্ষ্ম সুতোয় বোনা মিনি স্কার্টটাকে ঠিক যখন সে তার লতায় জড়ান শরীরটাকে এক ঝটকায় পাক খাইয়ে দেয় তখন তার গোড়ালি দুটো মাথার উপর উঠে রঙ্গ-মঞ্চ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায় দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় তার নমনীয় অঙ্গ থেকে পাক খেতে খেতে গার্টারটি নেমে আসে দর্শকদের মধ্যে। অবশ্য এসবই ক্যামেরার মধ্যে দেখা।

এই রকম সেরা নৃত্য প্রদর্শনের জন্য দুই বছরের শেষে মিস্ রোজালি রে-র ভাগ্যে জোটে বিয়াল্লিশ সপ্তাহের আনন্দ উপভোগের ছুটি।

সেবার দু বছরের শেষে মিস্ রে, হঠাৎ তার প্রিয়বান্ধবী মিস্ ডি আরমাণ্ডকে জানিয়ে দিল লং আইল্যাণ্ডের উত্তর অঞ্চলে একটি মান্ধাতার আমলের গ্রামেই যে গ্রীষ্মকালটা কাটাতে যাচ্ছে এবং আর কোন দিনই রঙ্গমঞ্চে আর তাকে দেখা যাবে না।

মিস্ ডি আরমান্ড তার বান্ধবীটির গতিবিধ জানতে পারার পরেই দরজায় খট্‌খট্ শব্দ।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভিতরে ঢোকার আদেশ উচ্চারিত হতে, মুখে একটা শব্দ করে ভারী ব্যাগ মেঝের ওপর ফেলে দিল। সত্যিই স্বয়ং রোজালিই হাজির। পরণে একটা ঢিলে দাগ লাগা কোট, বাদামী রঙের অবগুণ্ঠন নামান।

সে অবগুণ্ঠন ও টুপি খুলে গেলে দেখা গেল সুন্দর একখানি মুখ। এই মুহূর্তে কোন অস্বাভাবিক আবেগের ফলে বিচলিত, অস্থির, অসন্তোষ ভরা চোখের উজ্জ্বলতা কিঞ্চিৎ ম্লান।

রোজালি বলল—তোমার ঘরের দু ধাপ সিঁড়ির ওপরের ঘরটা আমি পেয়েছি। কিন্তু ওপরে না উঠে সোজা চলে এলাম এখানে। ওরা না বললে আমি জানতামই না তুমি এখানে আছ।

লিনেট বলল—গত এপ্রিল থেকেই আছি। আর সেন্ট্রাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে পথে নামছি। পরের সপ্তাহে এলিজাবেথ-এই আমাদের শো শুরু হচ্ছে। তারপর এবার তোমার কথা বল।

বেশ কৌশলের সঙ্গে এঁকেবেঁকে রোজালি উঠে বসল পোশাকের ট্রাংকটার ওপর কাগজ আটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে। ভ্রাম্যমান নায়িকারা ও তাদের ভগিনীরা যাতায়াতকে আমরামপদ করে তোলে এভাবে, দেখলে মনে হবে কোন গদি আঁটা চেয়ারে বসে আছে।

যৌবনোদ্দীপ্ত মুখে আত্মসমর্পনের ভাব ফুটিয়ে বলল—সবই তোমাকে বলব লীন। তারপরই পুরনো ব্রডওয়ের পথে পা বাড়াব। আমাকে একখানা রুমাল ধার দাও লীন। জানতো লং আইল্যাণ্ড-এর ট্রেনগুলো কি সাংঘাতিক। ভাল কথা তোমার কিছু পানীয় আছে কি লীন।

মিস্ আরমাণ্ড বোতল বার করল।

'এতে এক পাঁইট মত মানহাটন আছে। পানীয়র গ্লাসে অনেক কার্নেশন আছে, কিন্তু—'

'ওঃ বোতলটা দাও, গ্লাস রেখে দাও, ধন্যবাদ, তিন মাস বাদে এই প্রথম।'

'সত্যি লীন গত মরশুমের শেষে মঞ্চ ছেড়ে দিয়েছি। কারণ জীবনটা ভাল লাগল না। আর বিশেষ এই কারণে মানুষ সম্পর্কে মন ভেঙে গেছে। এই লাইনে সর্বত্র যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়। ম্যানেজার থেকে পোস্টার মারা .লোকেরা পর্যন্ত।'

'আর অভিনয় সেরে যাদের সঙ্গে দেখা করতে হয় তারাই তো সব চাইতে ওঁচা। রঙ্গ মঞ্চের দরজায় ঘুরঘুর করে, নৈশ ভোজে নিয়ে যায়, হীরে মুক্তো দেখায় আর সিনেমায় নিয়ে যায় তারা সব পশু, আমি তাদের ঘৃণা করি।'

'আমি তোমাকে বলছি লীন, রঙ্গমঞ্চের মেয়েরা সত্যিই করুণার পাত্রী। সেই সব মেয়েরা ভাল বাড়ি থেকে আসে উচ্চাকাঙ্খা নিয়ে অভিনয় জীবনে খ্যাতি লাভ-এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। কিন্তু কখনও উপরে উঠতে পারে না। নাচিয়ে মেয়ের দল ও সপ্তাহে পনের ডলার নিয়ে অনেক সহানুভূতির কথা শুনতে পাও। বাজে কথা, নাচিয়ে মেয়েদের দুঃখ কষ্টটা এমন কিছু নয় যা কোন লোক দূর করতে পারে না।

চোখের জল যদি ফেলতেই হয় সেটা পড়ুক সব অভিনেত্রীদের জন্য যারা কুৎসিত দৃশ্যে নায়িকার অভিনয়ের জন্য সপ্তাহে ত্রিশ-পয়ত্রিশ ডলার মাইনে পায়। সে জানে এর চাইতে ভাল সে কোনদিন হতে পারবে না। কিন্তু বছরের পর বছর আশায় থাকে যদি একটা ভাল সুযোগ এসে যায়।

কিন্তু আমি সব চাইতে বেশি ঘৃণা করি সেই সব পুরুষদের যারা তোমায় চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। তোমাকে কিনে নিতে চেষ্টা করে। শ্রোতাদের মধ্যে যারা চিৎকার করে, ভিড় জমায়, লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে একপাল বন্য জন্তুর মত যেন এখুনি তোমাকে খাবে। উঃ কত ঘৃণা যে তাদের করি।'

'দেখ লিন আমি কিন্তু নিজের কথা প্রায় কিছুই বলিনি তাই না?'

'আমি দুশ ডলার জমিয়েছিলাম আর গ্রীষ্মের গোড়াতেই রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিলাম। চলে এলাম এই মিষ্টি গ্রাম সাউথপোর্টে। এখানে গ্রীষ্মকালটা কাটাব, পড়াশুনো করব, একটা ক্লাস খোলার চেষ্টা করব। সমুদ্র তীরের কাছেই এক বৃদ্ধ বিধবা মহিলার বাড়ি ছিল, নিছক সঙ্গী পাবার জন্য মাসে ঘর ভাড়া দিতেন, তিনি আমাকে নিয়ে নিলেন। তার বাড়িতে আরও একজন বোর্ডার আছে রেভারেণ্ড আর্থার লাইলি।

সবটা বলতে এক মিনিট সময় লাগবে।

'তিনি প্রথম পা ফেললেন, কথা বললেন আর—আমাকে জয় করলেন। একদম অন্য ধরণের মানুষ। দীর্ঘকায়, একহারা চেহারা। ঘরে ঢুকলে তার পায়ের শব্দ শুনতে পাবে না, কিন্তু উপস্থিতি অনুভব করবে। মুখটা কোন নাইটের ছবির মতন, কণ্ঠস্বরে মেলোর সুর।

লীন, তুমি যদি জন ড্রুকে তার ড্রয়িংরুমের সেরা দৃশ্যের অভিনেতা রূপে দেখ তাহলে দুজনের তুলনা করে বলা যাবে শান্তিভঙ্গকারী হিসেবে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হোক।

বিস্তারিত বিবরণ তোমাকে শোনাতে চাইনা, কিন্তু একটি মাস পার হবার আগেই আর্থার ও আমি পরস্পর বাগদত্তা হলাম। সে একটা গীর্জার পুরোহিত। তার বাড়িটা ছিল ছোট, বিয়ের সময় মুরগি ও হানিসাফল্ ফুলের ব্যাবস্থা হয়েছিল। আর্থার আমাকে স্বর্গ সম্পর্কে অনেক কিছুই শেখাত কিন্তু সেই ফুল ও মুরগির কথা কোনদিন ভুলবনা।

না, আমি তাকে বলিনি যে আমি অভিনয় করতাম। ও ব্যাপারটাকে ঘৃণা করত বলে অতীতকে খোঁচাতে চেষ্টা করিনি। আমি চিরকালই ভাল মেয়ে ছিলাম। এছাড়া বলার মত কিছু ছিল না। আমার বিবেক ততটুকু পর্যন্ত মেনে নিতে পেরেছিল।

আমি তোমাকে বলছি লীন আমি সুখী হয়েছিলাম। গীর্জায় গান করতাম, সেলাই সমিতির সভ্য হয়েছিলাম। আবৃত্তি করতাম ব্যবসায়িক ভঙ্গীতে, একসঙ্গে নৌকা চালাতাম, বনে জঙ্গলে বেড়াতাম, সারাটা জীবন আমি সুখেই থাকতাম যদি—

'কিন্তু এক সকালে বিধবা বৃদ্ধা মহিলাকে যখন পিছনের বারান্দায় বসে সাহায্য করছিলাম তখন তিনি গল্পে মেতে উঠলেন। মিঃ লাইলি তার কাছে ছিলেন মর্ত্যের এক সাধু পুরুষ, ঠিক যেমন আর্থার। ভদ্রলোকের গুণকীর্ত্তনের শেষে উপসংহারে আমাকে বললেন বেশি দিন আগের কথা নয়, আর্থার একটা রোমান্টিক প্রেমের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল আর তার পরিণতি অত্যন্ত দুঃখজনক। বিস্তারিত তিনি কিছু বললেন না কিন্তু এটা জানতেন আর্থারকে গুরুতরভাবে মারা হয়েছিল। আরও বললেন সে ক্রমেই শুকিয়ে যেতে লাগল, মনমরা হয়ে গেল, আর সেই মহিলার কিছু স্মারক একটা ছোট গোলাপ কাঠের বাক্সে ভরে তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছিল পড়ার ঘরে ডেস্কের ড্রয়ারে।

তিনি আরও বললেন—অনেকবার তিনি দেখেছেন সন্ধ্যা হলে সেই বাক্সটা নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে, অন্য কেউ ঢুকলে সেটাকে তালা বন্ধ করে দেয়।

আচ্ছা এর পরেও আমি কতদিন অপেক্ষা করতে পারি তুমিই কল্পনা কর।

সেইদিন বিকেলে আমরা দুজন উপসাগরের তীরে জলপদ্মের ভিতর প্রমোদবিহার করছিলাম নৌকা চালিয়ে।

তখনই আমি বললাম—আর্থার তোমার যে আগেও একটা প্রেমের ব্যাপার ছিল সে কথা তো তুমি আমাকে বলনি। মিসেস গুরনি আমাকে বলেছেন। আমি যে জেনেছি সেটা তাকে জানিয়ে দিলাম। কেউ মিথ্যা বলছে শুনে আমি তাকে ঘৃণা করি।

সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি এখানে আসার আগে একটা ব্যাপার ঘটেছিল বেশ ভালভাবেই। যেহেতু তুমি জেনেছ অকপটেই বলছি—প্রিয় ইভা ভালবাসাটা ছিল আধ্যাত্মিক। যদিও সেই মহিলা আমার মনে গভীর আবেগের সৃষ্টি করেছিল, আমিও ভেবেছিলাম আদর্শ নারী। কিন্তু কখনও তার সঙ্গে দেখা করিনি কথাও বলিনি। সে এক আদর্শ প্রেম। তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা সেটাও আদর্শ হিসেবে ছোট না হলেও অন্য ধরনের। আমাদের মধ্যে সেই সম্পর্ক গড়ে উঠুক এটা তুমিও চাইবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি সুন্দরী ছিল?

আর্থার—খুব সুন্দরী ছিল—

আমি—তুমি কি প্রায় তার সঙ্গে দেখা করতে?

আর্থার—ফুলের কুঁড়ির মত।

আমি—'সবসময় দুর থেকে?'

আর্থার—সব সময়ই বেশ দূর থেকে।

আমি—আর তুমি তাকে ভালবাসতে?

আর্থার—মনে হত সে আমার আদর্শ লাবণ্যময়ী, আত্মা।

আর এই যে স্মৃতি চিহ্নটা তুমি তালাবন্ধী করে রাখ, মাঝে মাঝে দেখে সময় কাটাও, এটাও কি তার?

আর্থার—একটা স্মারক, অমূল্য সম্পদ হিসেবে সঞ্চয় করে রেখেছি।

সে কি তোমাকে এটা পাঠিয়েছিল?

এটা তার কাছে থেকেই এসেছিল।

আমি—আঁকাবাঁকা পথে কি?

আর্থার—আঁকাবাঁকা আবার সোজাসুজিও বটে।

আমি—কখনও তার সঙ্গে দেখা করনি? জীবনের অবস্থান কি এতই ভিন্ন ছিল।

আর্থার—সে ছিল আমার অনেক ওপরে। দেখ ইভা অতীতের ব্যাপার। এ নিয়ে তুমি ঈর্ষা কোরনা?

আমি—ঈর্ষা। সে কি? এ তুমি কি বলছ? এটা জানবার আগে আমি যতটা ভেবেছি তার থেকে দশগুণ বেশী ভাবতে হচ্ছে।

ব্যাপারটা নিয়ে তাই হয়েছিল লনে—যদি তুমি ব্যাপারটা বুঝে থাক। সেই আদর্শ ভালবাসা ছিল আমার কাছে নতুন জিনিস। আর সেটাই সব চাইতে সুন্দর ও গৌরবের বস্তু। ভাবতে পার একটি পুরুষ এমন একটি নারীকে ভালবাসল যার সঙ্গে সে যখনও একটা কথা বলেনি। নিজের অন্তর দিয়ে নারীর যে ছবি এঁকেছে তারই প্রতি বিশ্বস্ত রইল।

'ওঃ, আমার কানে কথাটা খুব বাজল। এতকাল যে পুরুষকে জেনে এসেছি তারা এসেছে হীরে অথবা মাইনে বাড়াবার টোপ নিয়ে আর তাদের আদর্শ! দেখ এনিয়ে বেশি কিছু বলব না।'

সত্যি, এই ঘটনা জানার পরে আর্থারকে নিয়ে আমি আগের চাইতে অনেক বেশি ভাবতে লাগলাম। যে সুদূরের দেবীকে সে পূজা করত তার প্রতি আমি ঈর্ষান্বিত হতে পারিনি, কারণ আমি নিজেও তো তাকে আপন করতে চলেছি। আমিও বৃদ্ধ মহিলা গুরানির মত তাকে সাধু ভাবতে শুরু করলাম।

আজ বিকেল চারটের সময় একটা লোক আর্থারের খোঁজে বাড়িতে এসে জানাল একটা রোগীকে দেখতে গীর্জায় যেতে হবে। অতএব আমাকে একা রেখেই আর্থার বেরিয়ে গেল।

আর্থারের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখলাম চাবির গোছাটা ড্রয়ারের সঙ্গে ঝুলছে। ভুলে গেছে নিয়ে যেতে। আমার তো মনে হয় আমরা সকলে মাঝে মাঝে মিসেস ব্লুবিয়ার্ড হয়ে যাই। যাইহোক আমি মনস্থির করে ফেললাম—যে স্মারকটিকে সে এত গোপনে রেখেছে সেটা দেখতেই হবে। জিনিসটা নিয়ে আমার মাথাব্যাথ্যা ছিল না কিন্তু ছিল কৌতূহল মাত্র।

ড্রয়ারটা খুলতে খুলতে ভাবলাম—কোন জিনিস হতে পারে শুকনো গোলাপের কুঁড়ি, না কি পত্রিকা থেকে কেটে নেওয়া মহিলার ছবি। কারণ তিনি নাকি উঁচু জগতের মানুষ।

আমি ড্রয়ারটা খুলে পেলাম একটা ছোট গোলাপ কাঠের বাক্স। চাবি দিয়ে খুলে ফেললাম।

জিনিসটা দেখার পর আমি এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ট্রাঙ্ক গুছিয়ে, চুল আঁচড়ে, বৃদ্ধা মহিলাটিকে জাগিয়ে বললাম—'একটু নজর রাখুন। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আমার কাছে আপনার আট ডলার পাওনা আছে, আর টাকাটা ডাক গাড়ির লোক এসে নিয়ে যাবে।' এটুকু করলাম ভদ্রতার খাতিরে আর্থারের কথা ভেবে।

পাওনা টাকাটা তার হাতে দিয়ে সে বলল—মিস্ ক্রসবি। কিছু হয়েছি কি? আমার তো ধারনা তুমি খুশিই ছিলে। কি জান মেয়েদের বোঝা ভার। যেরকম আশা তার থেকে অন্য রকম।

আমি বললাম—'আপনি যথার্থ বলেছেন। কেউ কেউ সে রকমই বটে। কিন্তু পুরুষদের বেলায় একথা বলা যায় না। একটা মানুষকে জানলেই সব পুরুষ মানুষকে জানা হয়ে যায়।

আর তারপরই চারটে আটত্রিশ-এর ট্রেন ধরে এখানে এসে হাজির হলাম।

মিস্ ডি আরমাণ্ড উদ্বিগ্ন গলায় বলল, তা বাক্সটার মধ্যে কি ছিল সেটা তো আমায় বললেনা।

"পুরনো রঙ্গাভিনয়ে নাচের চরম মুহূর্তে লাথি মেরে যে সব হলুদ রঙের রেশমি গার্টার আমি দর্শকদের ছুঁড়ে দিতাম তারই একটা।" যে কোন রকম একটা ককটেল পাওয়া যাবে লিন?

* The memento

শহরের ভয়ঙ্কর রাতটা

আমার বন্ধু কার্নি যে এক্সপ্রেস মালগাড়ির নং ৮,৬০৬ এর চালক, আমায় বলল— সম্প্রতি যে গরম হাওয়াটা দিয়েছিল সেই সময় আমি বাচ্চাদের চোর চোর খেলার মত করেই মানুষের চরিত্রকে বুঝবার সুযোগ এসেছিল।

পার্ক কমিশনার, পুলিশ কমিশনার ও বনবিভাগের কমিশনার একত্র স্থির করলেন যে আবহাওয়া দপ্তরের তাপমান যন্ত্রটি যতদিন না স্বাভাবিক জীবনযাত্রার স্তরে নেমে আসে ততদিন জনসাধারণকে পার্কের ভেতব ঘুমতে দেওয়া হবে। সেই মর্মে প্রকাশ্য সভায় প্রস্তাব রাখলেন এবং কৃষি বিভাগের সচিব মিঃ কম্স্টক এবং দক্ষিণ অরেঞ্জ, এন্ জে-র' পল্লী উন্নয়ন মশক ধ্বংস সমিতির দ্বারা সেই প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন।

বিশেষ মঞ্জুরী হিসাবে যখন পাবলিক পার্কগুলিকে খুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হল তখন সেন্ট্রাল পার্কের সীমান্তবর্তী বাসিন্দারা একযোগে সেখানে ঢুকে পড়তে লাগল। সূর্যাস্তের পরে দশ মিনিটের মধ্যেই সেখানে ভিড় জমে যেতে লাগল। কত পরিবার, কত সমিতি, কত ক্লাব, উপজাতি এসে হাজির হল ঘাসের উপর ঠাণ্ডায় শুয়ে সুখনিদ্রা উপভোগ করার আশায়। পাছে বাইরে ঘুমিয়ে ঠাণ্ডা লাগে তাই সঙ্গে এনেছে প্রচুর কম্বল। গাছের ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে নরম ঘাসের ওপর মোটমাট ৫০০০ মানুষ শুধু সেন্ট্রাল পার্কেই রাত কাটাতে এল।

'তুমি তো জান নিউইয়র্ক সেন্ট্রাল রেলরোডের 'বীয়াশেবা ফ্ল্যাটে'র একটা চমৎকার এ্যাপার্টমেন্টে আমি থাকি। যখন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ জারি হল যে সবাইকে পার্কে গিয়ে ঘুমতে দেওয়া হবে, তখন এ্যাপার্টমেন্টে নেমে এল শোকের ছায়া।

আরামে রাত কাটানর জন্য ভাড়াটেরা পালকের বিছানা, রবারের বুট, দড়িতে ঝোলান রসুন, গরম জলের ব্যাগ, ছোট নৌকা সব প্যাক করতে শুরু করল। ফুটপাত দেখে মনে হল রুশ সৈন্যরা মার্চ করে চলেছে।

নীল মোজা পরা ড্যানি নিচে নেমে দারোয়ানকে বলল—'আমার এত আরামের ফ্ল্যাট ছেড়ে কেন নোংরা ঘাসে শুতে যাব?'

ফুটপাতে দাড়ান কমিশনার বললেন—'চুপ! এটা হুকুম। সবাই বাড়ি ছেড়ে পার্কে চলে যান।'

'দেখুন এই ফ্ল্যাটে আমরা বেশ আরামেই ছিলাম, নানা দেশ, নানা জাতি হলেও মিলেমিশে থাকতাম। আর এই পুলিশের হুকুমে ঘর বাড়ি ছেড়ে কিনা পার্কে যেতে হবে ঘুমতে।'

তারপর অফিসার রিয়েগেন আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল পার্কে। পার্কে গাছের নীচগুলো অন্ধকার। ছোট ছেলেমেয়েরা বায়না ধরল বাড়ীতে ফিরে যাবে।

অফিসার রিয়েগন বলল—'এই গাছপালার মধ্যে তোমাদের রাত কাটাতে হবে। কেউ যদি আপত্তি করে তো সেটা পার্ক কমিশনার ও আবহাওয়া ব্যুরোর প্রতি অসম্মান করা হবে। তার শাস্তি হবে অর্থদণ্ড ও কারাবাস। আমি বলছি কোন রকম গণ্ডগোল করবেন না, ঘাসের ওপর আপনাদের শুতেই হবে। সকালে সবাই চলে যাবেন কিন্তু রাত্রে আবার আসতে হবে।

বীয়ার্শেবা ফ্ল্যাটের ১৭৯ জন বাসিন্দা, আমরা সেই মারাত্মক জঙ্গলের মধ্যে যতটা সম্ভব ভালভাবে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করলাম। এখানে দেখার কিছু ছিল না, পান করারও কিছু ছিল না, কে বন্ধু আর কে শত্রু অন্ধকারে তাও বোঝার উপায় নেই। আমার সঙ্গে ছিল শীতের ওভার কোট, দাঁত মাজার ব্রাশ, কুইনিন বড়ি ও লাল লেপ। একটা রাতের মধ্যেই কে একজন এসে আমার উপর পড়ল আর হাঁটু দিয়ে টুটিটাকে টিপে ধরল। মুখে হাত বুলিয়ে তার চরিত্র বোঝার চেষ্টা করে লাথি মেরে রাস্তায় বার করে দিলাম।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। রাস্তার ধারে গিয়ে বসলাম। পার্কের এক দিকে রাস্তার ও বাড়ীর আলো দেখতে পেলাম। ভাবলাম যে সব মানুষ বাড়ীতে আছে তারা কত সুখেই না আছে।

ঠিক সেই সময় গাড়ী এসে থামল একটা। একজন সুবেশ ও সুদর্শন ভদ্রলোক নামল, জিজ্ঞেস করল আমায়—বলতে পারেন এই মানুষগুলো পার্কের ঘাসের উপর শুয়ে আছে কেন? আমার ধারনা এটা তো আইন বিরূদ্ধ।

আমি বললাম—পুলিশ বিভাগ থেকে এই মর্মে একটা অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে, আর সেটা সমর্থন করেছে ঘাসকাটা সমিতি। অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছে যে সব লোকের গাড়ির চাকায় একটা লাইসেন্স পাথর লাগান না থাকবে তাদের সকলকে পুনরায় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত পার্কগুলিতেই থাকতে হবে। সৌভাগ্যবশতঃ হুকুমটা জারি হয়েছে ভাল মরশুমে। এর ফলে একমাত্র লেকের তীরবর্তী অঞ্চল ও মোটর চলার পথের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছাড়া অন্য সব জায়গাতে মৃত্যুর সংখ্যা স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে খুব বেশি হবে না।'

'আর পাহাড়ের দিকটা যারা আছে তারা কারা?'

আমি বললাম—অবশ্যই তারা বীয়ার্শেবা ফ্ল্যাটের। যে কোন মানুষের কাছেই সেরকম বাসগৃহ হয় না বিশেষ করে গরমের রাতে। দিনের আলোটা তাড়াতাড়ি এলে বেঁচে যাই।'

সে বলল—এরা সকলেই আসে রাত হলে। এখানে আসে খোলা হাওয়ায় শ্বাস নেয়, ফুল ও গাছের সুগন্ধ নেয়। প্রতি রাতে বাড়ীর আগুনের গরম থেকে এখানে এসে আরাম করে।

আমি বললাম—সেই সঙ্গে কাঠ, শ্বেতপাথর, প্লাস্টার ও লোহার কথাও বলুন।

একটা বই বের করে লোকটি বলল, 'অবিলম্বে এ সবই বিবেচনা করা হবে।'

আমি—'আপনি কি পার্ক কমিশনার'।

সে বলল—'আমি বীয়ার্শেবা ফ্ল্যাটের মালিক। যে ঘাস ও গাছপালা একটা মানুষের ভাড়াটেদের বাড়তি সুবিধা দিয়েছে ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করুন। কাল থেকে ফ্ল্যাটের ভাড়া পনের শতাংশ বাড়ান হবে। শুভরাত্রি।

* The city of dreadful night

সেও করে সেবা

আমি যদি আরও এক হাজার বছরের মানে ঠিকঠিক এক হাজার বছরের জীবন পেতাম, তাহলে হয়তো ঐ সময়ের মধ্যে সত্যিকারের একটা প্রেম কাহিনীর এতটাই গভীরে পৌঁছতাম যাতে রাণীর পোশাকের একটি প্রান্ত স্পর্শ করা যায়।

আমার কাছে কত মানুষ আসে জাহাজে চেপে, জনহীন প্রান্তর, অরণ্য, দূরপথ, চিলেকোঠা থেকে এসে তাদের দেখা ও শোনা ঘটনার প্রলাপ আমাকে শোনায় তাদের সেই সব কাহিনীকে লিপিবদ্ধ করাটা কানে শোনা ও লেখার বেশি কিছু না। শুধু দুটি পরিণামকে আমি বড় ভয় করি—বধিরতা ও আঙ্গুলের আক্ষেপ। আমার হাতটা এখনও শক্ত সামর্থ আছে। আমার শিবির বন্ধু হাংকি ম্যাগি যে ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে এই কাহিনীটা শুনিয়েছিল তা যদি ছাপার অক্ষরে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে না পারি বা আনুপূর্বিকতা বজায় না থাকে তাহলে সে দোষ আমার ওপরই থাক।

হাংকির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় যখন সে থার্ড এভেনিউ-এর উপরকার চুব্‌-এর ছোট রেস্টুরেন্টের প্রধান পরিচারক।

তারপর তার সঙ্গে দেখা হয়েছে বারে বারে শহরের ছোট ছোট পথে। আলাস্কা সাফারী, গুপ্তধন সন্ধানী ক্যারিবিয়ান দলের রাধুনি, আর্কানসাস নদীতে মুক্তো শিকারে ব্যার্থ অভিযানের পর সাধারণতঃ সে কিছুদিনের জন্য ফিরে আসত চুবু-এর আস্তানায়। সুখে দুঃখে এটাই ছিল তার আশ্রয়ের বাসর।

কয়েক মাস পরে একদিন সন্ধ্যায় দেখি টুয়েন্টিথার্ড স্ট্রিট ও থার্ড এভিনিউয়ের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। দশ মিনিটের মধ্যে একটা নির্জণ কোণ বেছে বসে তার কথার স্রোতে ভেসে গেলাম। যে মোদ্দা কথাটা বুঝলাম তা হল—

"পরবর্তী নির্বাচনের কথা তো বলছ, তা ইণ্ডিয়ানদের কথা তুমি বিশেষ কিছু জান? না, কুপার, বিড্‌ল বা চুরুটের গুদাম-এর কথা আমি বলছি না ; বলছি তাদের কথা যারা কলেজে গ্রীমক পুরস্কার পায়, আর ফুটবল খেলায় বিপক্ষ দলের হাফ-ব্যাকদের খুলি উড়িয়ে দেয়। বলছি তাদের কথা যারা বিকেল হলে অধ্যাপকের মেয়ের সঙ্গে বসে বাদাম, বিস্কুট, চা খায় আর পৈত্রিক বাঁশের খুপরিতে ফিরে গিয়ে গঙ্গাফড়িং ও ঝুমঝুমি সাপ ভাজা খায়।

দেখ, তারা ততটা খারাপ নয়। যে সব বিদেশী বিগত কয়েকশ বছরের মধ্যে এসে জুটেছে তাদের অনেকের চাইতে তারা ভাল। ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে একটা কথা বলতেই হবে সে যখন সাদা মানুষদের সঙ্গে মেশে তখন নিজের সব দোষগুলির বিনিময় করে পাণ্ডুর মুখের সঙ্গে। আর নিজের গুণগুলোকে রেখে দেয় নিজের কাছে। সে যে অনেক গুণের অধিকারী। কিন্তু চালান হয়ে আসা বিদেশীরা আমাদের গুণগুলোকে গ্রহণ করে নিজেদের দোষগুলি তাদের কাছে রেখে দেয়। আর তার ফলে তাদের সামলাতে আমাদের গোটা সেনাবাহিনীকে মাঠে নামতে হয়।

এবার বলছি হান্ট জ্যাক স্নেকফিডার-এর সঙ্গে আমার মেক্সিকো সফরের কথা। যে পেনসিলভেনিয়া কলেজের গ্র্যাজুয়েট। যে ছিল বন্ধু স্থানীয়। আমার সঙ্গে প্রথম দেখা তাহ্ লেকোয়াতে, তারপরেই আমরা বন্ধু হয়ে যাই। সে ছিল প্রথম শ্রেণীর মানুষ। প্রবন্ধ লিখত এবং বোষ্টন ও অনুরূপ শহরের পয়সাওয়ালা বাড়িতে খাবার জল পেত।

"ম্যাস্কোজিতে থাকত একটা কিয়োকী মেয়ে। কাইজ্যাক তাকে দেখেই বোকা হয়ে গেল। আমি বেশ কয়েকবার তার সাথে দেখা করেছি। নাম ফ্লোরেন্স ব্লুফেদার। এই তরুণীটি তোমার চাইতেও সাদা, আর আমার চাইতে অনেক বেশী শিক্ষিত। তাকে আমার ভাল লাগল এই জন্য যে হাইম্যাজকে সঙ্গে না নিয়েও আমি তার সঙ্গে দেখা করতাম। মাস্কোজী কলেজে মানবজাতি তত্ত্ব নিয়ে সে পড়াশুনা করেছে, সেই বিষয় নিয়ে হাইজ্যাক বই পড়তে আরম্ভ করল।

হ্যাঁ হাইজ্যাকের কথাতে ফিরে যাই। প্রায় ছমাস আগে একটা চিঠি পেলাম। তাতে সে জানিয়েছে ওয়াশিংটনে মানবতত্ত্ব বিষয়ক সংখ্যালঘু প্রতিবেদন ব্যুরো তাকে নিয়োগপত্র পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়েছে সে যেন মেক্সিকোতে গিয়ে কতগুলি খনণ কার্যে প্রাপ্তুলিপির অনুবাদ করে, অথবা ভগ্নস্তুপে পাওয়া কিছু সাংকেতিক লেখার উদ্ধার করে—বা ঐ ধরনের আরও কিছু কাজ করে। আমি যদি তার সঙ্গে যাই তাহলে তার দরুণ ব্যায়ের টাকাটা সে প্রকল্পের খরচের মধ্যেই ঢুকিয়ে দিতে পারবে।

আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, হ্যাঁ যাব। শুনে সে আমাকে টিকিট পাঠাল, তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানলাম ফ্লোরেন্স ব্লুফেদার হঠাৎ তার বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পালিয়েছে?

হাইজ্যাক বলল—হাওয়া হয়ে গেছে। তাকে রাস্তায় দেখা গিয়েছিল একটা মোড় ঘোরার পর আর দেখা যায়নি। সকলেই খোঁজ করেছে কিন্তু পায়নি।

আমি—মেয়েটি খুব ভাল ছিল।

হাইজ্যাক খুব আঘাত পেয়েছে। আমার ধারণা মিস্ ব্লু ফেদারকে সে উঁচু আসনে বসিয়েছিল। দেখতেই তো পাচ্ছি, ব্যাপারটাকে সে মদের পাত্রের উপর ছেড়ে দিয়েছে। অন্য অনেকের মত সেটাই ছিল তার দুর্বলতার একটা দিক। আমি দেখেছি একটা পুরুষ যখন একটি মেয়েকে হারায় তখন সেই ঘটনার ঠিক আগে বা পরে মদ খাওয়া ধরে।

'আমরা রেলপথে ওয়াশিংটন থেকে নিউঅর্লিয়েন্স পৌঁছলাম। সেখান থেকে বেলিজগামী স্টীমারে। একটা প্রচণ্ড ঝড়ে আছড়ে পড়লাম ক্যারিবিয়ান সাগরের তীরে। যে ছোট শহরটাতে আমরা নামলাম তার নাম 'বোকা ডি কোলোউলা।' একটা মৃত শহর। বাইবেলে এমন সব প্রাচীন শহরের কথা পড়ে থাকি। ১৫৯৭ সালের সেন্সাস অনুসারে পাথরের আদালত গৃহের গায়ে খোদাই করা আছে তখন শহরের লোকসংখ্যা ছিল ১৩০০। সব নাগরিকই ইণ্ডিয়ান এবং অন্য ইণ্ডিয়ানদের শংকর উত্তরপুরুষ। কিন্তু আমি দেখে অবাক হতাম যে অনেকের গায়ের রঙ হাল্কা। শহরটা কানসাস-এর সঙ্গে যুক্ত হয়নি মেজর বিং এর জন্য।

'মেজর বিং ছিল মাছির ঝাঁকে মালিশের ওষুধ। তার ব্যাপারটা ছিল এইরকম—স্থানীয় মানুষরা জঙ্গল থেকে নানা রকম কাঠ নিয়ে আসত। তারা মজুরী পেত এক পঞ্চমাংশ। কাজের মানুষরা কাজ বন্ধ করে দিলে বেশী দাবী করলেও দাবী মিটিয়ে দিত।

মেজরের বাংলোটা ছিল সমুদ্রের খুব কাছে। জোয়ারের সময় রান্নাঘরে জল ঢুকত। আমি হাইজ্যাক ও মেজর একসঙ্গে রাম খেতাম। সে বলেছিল তার কাছে প্রচুর অর্থ আছে। ইচ্ছা করলে হাই এবং আমি চিরকাল তার কাছে থাকতে পারি। কিন্তু হাইজ্যাক মানবজাতিতত্ত্বের কথা বলতে শুরু করল।

মেজর বিং বলল—ধ্বংসস্তুপ অনেক আছে এই জঙ্গলের দেশে। সেগুলোর সন তারিখ আমি জানি না তবে আসার আগে এখানেই ছিল।

হাইজ্যাক—এখানকার নাগরিকরা কি ধরনের পূজা আর্চায় অভ্যস্ত?

মেজর—সেটা ঠিক বলতে পারব না। তবে এখানে একটা গীর্জা আছে, যে লোকটা থাকে তার নাম স্কিডার। সে দাবী করে এখানকার লোকেদের সে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছে। আমার ধারনা তারা এখনও অনেক দেবদেবীর পূজা করে।

দিন কয়েক পরে হাইজ্যাক ও আমি ঘুরতে ঘুরতে বনের মধ্যে একটা স্পষ্ট পথ পেয়ে গেলাম। সেই পথ ধরে চার মাইল এগোলাম। বাঁদিক ধরে মাইল খানেক এগিয়ে যাবার পরেই পেয়ে গেলাম একটা চমৎকার ধ্বংসস্তূপ—গাছগাছালি, দ্রাক্ষালতা ও ঝোপঝাড়ে ঢাকা একটা নিরেট পাথর। তার গায়ে খোদাই করা আছে এমন সব জন্তু ও মানুষের ছবি যারা শহরে ঢুকলেই গ্রেপ্তার হয়ে যেত। আমরা পিছন দিক থেকে সেই পাথরটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

বোকাতে নামবার পর থেকে হাইজ্যাক বড় বেশি করে মদ খেতে শুরু করেছিল। একটা কোয়ার্ট ও সঙ্গে করেই এনেছিল।

সে বলল—হাংকি, এই প্রাচীন মন্দিরটাকে আমরা ভাল করে দেখব। আমাদের এখানে টেনে এনে ঝড়টা বোধহয় আমাদের উপকারই করেছে।

ভাঙাবাড়িটার পিছন দিয়ে ঢুকে পেলাম একটা ছোট ঘর। সেখানে ছিল একটা পাথরের টেবিল ও একটা পাথরের হাত মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা, কিন্তু কোন সাবান বা জলনিকাশের ব্যবস্থা ছিল না। আর দেওয়ালের গর্তে ঢোকান কতগুলো কাঠের গজাল।

হাই যখন লিপিচিত্র পরীক্ষা করছিল আমি তখন সামনের ঘরটায় ঢুকলাম। ঘরটার মাপ অন্তত ৩০ × ৪০ ফুট, পাথরের মেঝে, দুটো ছোট ছোট জানালা, তা দিয়ে আলো ঢোকে না।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখি তিন ফুট দূরেই হাইজ্যাক দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম—হাই সব কিছু ফেলে—

তখনই খেয়াল হল তাকে একটু অদ্ভুত দেখাচ্ছে। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, যে কোমর পর্যন্ত পোশাক খুলে ফেলেছে, আমার কথাগুলি শুনতে পেয়েছে বলেই মনে হল না। কাছে গিয়ে ধাক্কা দিলাম। কোন সারা পেলাম না। হাইজ্যাক একটা পাথর হয়ে গেছে, আমি নিজেও তো রাম খাচ্ছিলাম।

জোর গলায় তাকে বললাম—একেবারে হাড় সর্বস্ব হয়ে গেছ। আমি জানতাম ওটা চালিয়ে গেলে এই অবস্থাই হবে।

তখন হাইজ্যাক ছোট ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসে দেখল যে আমি কারও সঙ্গে আলাপ করছিনা। আর তখনই আমরা দেখতে পেলাম ২ নম্বর মিঃ স্নেকফিডারকে। একটা পাথরের মূর্তি অথবা দেবতা, অথবা ওল্টান মূর্তি, আর দেখতে অবিকল হাইজ্যাকের মত। ঠিক তার

মুখ, আকার ও রঙ কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে একটা পাদপিঠের উপর। দেখলেই বোঝা যায় যে কোটি বৎসর ধরে এইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।

'ওই যে আমার এক ভাই'—হাই গম্ভীর হয়ে গেল।

এক হাত আমার কাঁধে ও এক হাত মূর্তির কাঁধে রেখে সে বলল, 'হাংকি আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার পূর্বপুরুষদের পবিত্র মন্দিরে।'

আমি বললাম—চোখে দেখার যদি কোন মূল্য থাকে তো নিশ্চয় তোমার যমজ ভাইয়ের দেখা তুমি পেয়েছ। দুজন পাশাপাশি দাঁড়াও· দেখি কোন তফাৎ আছে কি না।

কোন তফাৎ ছিল না। তুমি তো জান একটি ইণ্ডিয়ান ইচ্ছা করলে তার মুখটাকে লোহার মত নিথর করে রাখতে পারে, অতএব হাইজ্যাক যদি তার চোখ মুখকে বরফ কঠিন করে রাখে তাহলে তুমি অপর মূর্তিটা থেকে তাকে আলাদা করতে পারবে না।

আমি—তার পাদপিঠে কিছু অক্ষর দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমি সেগুলি পড়তে পারছি না। এদেশের বর্ণমালাটাই অন্য রকমের।

এক মিনিটের জন্য হাইজ্যাকের মানবজাতি তত্ত্বের কাছে তার রামের শক্তি হার মানল, সে শিলালিপির পাঠোদ্ধারে লেগে গেল।

বলল—হাংকি এটা টোলটোপাস্কন এর মূর্তি, উনি প্রাচীন এজটেকদের অত্যন্ত শক্তিশালী দেবতার একজন।

আমি বললাম—তাকে চিনতে পেরে খুশী হলাম কিন্তু তার বর্তমান অবস্থা দেখে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে জুলিয়াস সীজারকে নিয়ে শেক্সপীয়ারের একটা রসিকতার কথা। তোমার বন্ধুর সম্পর্কে আমরাও বলতে পারি ঃ

যে মহাপ্রভু মরে পাথর হয়ে গেছে
কি হবে তার নামটি জেনে,
সে নামে তো কোন কাজে লাগবে না
তাকে চিঠি লিখতে যা ফোনে ডাকতে।

আমার দিকে তাকিয়ে হাইজ্যাক স্নেক্‌ফিডার বলল—হাংকি তুমি কি অবতারবাদে বিশ্বাস কর?

আমি বললাম—ও শব্দটার মাথামুণ্ড কিছুই আমি বুঝি না।

সে বলল—আমি বিশ্বাস করি যে আমিই টোলটোপাস্কন এর নতুন অবতার। আমার গবেষণা থেকে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে যে উত্তর আমেরিকার নানা উপজাতিদের মধ্যে একমাত্র চিরাকীয়াই গর্ব করে বলতে পারে যে তারাই গর্বিত এজটেক জাতির প্রত্যক্ষ উত্তরপুরুষ। এটাই ছিল আমার ও ফ্লোরেন্সের প্রিয় মতবাদ। আর সেই মেয়ে-সে যদি—তাহলে কি হবে?

হাইজ্যাক আমার হাতটা চেপে ধরে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে দেখাচ্ছিল অনেকটা খুনী ক্রেজি হর্স এর মত।

আমি বললাম—বেশ, তাই যদি হয়, সে মেয়ে যদি তাই হয় তাহলে কি? মাতাল হয়ে গেছ। মূর্তির উপরে মানুষকে আরোপ করা এবং তাতে বিশ্বাস করা—এটা কি ব্যাপার? অবতারবাদ? ওসব ছেড়ে এস একটু পান করা যাক।

ঠিক তখনই শুনতে পেলাম কে যেন আসছে। হাইজ্যাককে একটা শয্যাহীন শোবার ঘরে নিয়ে গেলাম, যেখানে দেওয়ালে অনেকগুলো ছিদ্র ছিল। তার ভিতর দিয়ে মন্দিরের সামনেটা দেখা গেল। পরে জেনেছিলাম মেজর বিং আমাকে বলেছিল প্রাচীন কালে ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতরা ওই সব ছিদ্রের ভিতর দিয়ে উপাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা ইণ্ডিয়ান বুড়ি খাবার ভর্তি একটা মাটির থালা নিয়ে ভিতরে ঢুকল। মূর্তির সামনে শুয়ে মাথা ঠুকল, তারপর চলে গেল।

হাইজ্যাক ও আমি খুবই ক্ষুধার্ত ছিলাম। বেরিয়ে এসে আমরা থালাটার দিকে ভাল করে তাকালাম। থালাভর্তি ছাগ মাংস, ভাজা পিঠে, কলা, কাঁকড়া সেদ্ধ ও আম।

আমরা পেট ভরে খেলাম—তারপর আরও একপ্রস্থ রাম খেলাম।

আমি বললাম—আজ নিশ্চয় বুড়ো টোবুমলের জন্মদিন। নাকি এরা রোজই তাকে ভোগ নিবেদন করে? আমি তো ভাবতাম দেবতারা কাটাওয়াম্পাস পাহাড়ের শিখরে বসে কেবল ভ্যানিলা পান করেন।

তারপর খাটো কিমোনো পরে আরও অনেক আদিবাসীর দল আসতে লাগল। হাই ও আমি শোবার ঘরে ঢুকে সব কিছু দেখতে লাগলাম। তারা পূজার উপকরণ রেখে যেতে লাগল। প্রণাম করে বনের ভিতর দিয়ে চলে গেল।

হাইজ্যাক বলল—জানি না দেবতার উচ্ছিষ্ট এই সব খাবার দাবার কে পায়?

আমি বললাম—আরে বনের মধ্যে কোথাও নির্ঘাত পুরোহিত বা পাণ্ডা বসে আছে। যেখানেই দেবতা দেখবে যেখানেই দেখবে পোড়া নৈবেদ্যের জন্য কেউ অপেক্ষা করছে।

তারপর বারান্দায় বেরিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে খোলা হাওয়ায় দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম একটি যুবতী মেয়ে ধ্বংসস্তূপের দিকে এগিয়ে আসছে। মেয়েটির খালি পা, সাদা ঢিলে জামা, হাতে সাদা ফুলের মালা। সে আরও কাছে এলে দেখলাম তার কালো চুলে লম্বা নীল পালক গোঁজা। সে যখন কাছে এল তখন আমরা যাতে পড়ে না যাই তাই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম। দেখলাম মেয়েটির মুখ ছিল ফ্লোরেন্স ব্লু ফেদার-এর মত।

আর তখনই হাইজ্যাক নানাজাতিতত্ত্বের মধ্যে ডুবে গেল নেশার ঘোরে। আমাকে টানতে টানতে দেবমূর্তির পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে বলল—এটাকে তুলে ধর হাংকি। আমি অন্য ঘরে নিয়ে যাব। আমি সবসময় অনুভব করেছি যে পবন দেবতার নতুন অবতার আর হাজার বছর আগে ব্লু ফেদার ছিল বিয়ের কনে। একদিন যে মন্দিরে আমি ছিলাম রাজা। আজ সেই মন্দিরে সে আমাকে খুঁজতে এসেছে।

আমি বললাম—ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।

দুজনে মিলে তিনশ পাউণ্ড পাথুরে দেবতাকে তুলে মন্দিরের পিছনে ঘরটাতে নিয়ে গেলাম। হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলাম।

তারপরেই হাইজ্যাক ছুটে বেরিয়ে গিয়ে আদিবাসীদের তৈরী এক জোড়া রেশমি শাল এনে নিজের পোশাক খুলে ফেলল। শরীরে শাল জড়িয়ে নিয়ে দেবতার মত একটা পাদপিঠের ওপর দাঁড়াল। তার কাণ্ড দেখে যেতে লাগলাম।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘরে ঢুকল মালা হাতে সেই মেয়েটি। আরও কাছে এলে মনে হল সে বুঝি হুবহু ব্লু ফেদারের মত দেখতে। আমি নিজের মনে বললাম, সেও কি অবতার হয়েই জন্মেছে। তাহলে দেখতে হবে বাঁ গালে তিল আছে কিনা। কিন্তু পরমুহূর্তে আমার মনে হল গায়ের রঙ ফ্লোরেন্সের থেকে কালো তবুও মেয়েটি বেশ ভাল।

মেয়েটি দেবমূর্তির কাছে এগিয়ে গেল, নাকটা ঘষতে লাগল। আরও কাছে গিয়ে হাইজ্যাক এর পায়ের নীচে পাথর খণ্ডের উপর মালাটা রেখে দিল।

হাইজ্যাক নেমে এমন একটা শব্দ উচ্চারণ করল যেটা শুনতে শিলালিপিরই মতন। মেয়েটি ছিটকে সরে গেল, চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল।

আর এক পাত্র রাম গিলে দেখি তারা বিশ গজ দুরে চলে গেছে। যে পথ ধরে মেয়েটি এসেছিল সেই পথে।

হাইজ্যাককে ডেকে জানালাম—হেই টনজুন শহরে আমাদের খাবার বিল বাকি পড়ে আছে আর তুমি আমাকে নিঃসম্বল অবস্থায় ফেলে রেখে যাচ্ছ। একটু মাথা খেলাও। ওই মেয়ের ফাঁদে পা দিওনা। চল বাড়ি ফিরে যাই।

দুজনে তবু এগিয়ে গেল ফিরেও তাকাল না। বন তাদের যেন গিলে ফেলল। আর সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কখনও আমি তাকে দেখিনি তার কথাও শুনিনি।

কি করি, সাততাড়াতাড়ি বোকায় ফিরে গিয়ে মেজর বিং-এর শারণ নিলাম। পকেটের টাকা খরচ করে আমাকে বাড়ির টিকিট কেটে দিলেন। আবার আমি চুম্ব এর চাকরিতেই ফিরে এসেছি। আর কখনও চাকরি ছেড়ে যাব না।

আমি জানি হাংকি তার নিজের গল্প সম্বন্ধে কি ভাবছে, তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম অবতার এবং নতুন নতুন রূপ সম্পর্কে তার নিজস্ব কোন মতবাদ ছিল কিনা?

হাংকি—সেরকম কিছু না। আসলে অতিরিক্ত মদ্যপান ও শিক্ষাদীক্ষাই হাইজ্যাক এর কাল হয়েছিল।

আমি তবু বললাম—কিন্তু ব্লু ফেদার-এর ব্যাপারটা কি? মুচকি হেসে হাংকি বলল—যে মহিলাটি হাইজ্যাককে ভাসিয়ে নিয়ে গেল যে এক মিনিটের জন্য। আমি কি বলেছি আপনার মনে আছে, মিস্ ব্লুফেদার বাড়ী থেকে উধাও হয়েছিল একবছর আগে। আর ঠিক চারদিন পরেই সে সেখানে হাজির এবং ইস্ট টোয়েন্টি থার্ড স্ট্রীটের একটা পরিপাটি পাঁচ ঘরের ফ্ল্যাট—আর সেদিন থেকে সে মিসেস ম্যাগী হয়েই আছে।'

* He Also Serves

হায়রে বিচার

আমি সব সময় বেশ জোর দিয়েই বলি যে নারী রহস্যময়ী নয় তার সম্পর্কে পুরুষেরা ভবিষ্যদ্বানী করতে পারে, বুঝতে পারে ব্যাখ্যাও করতে পারে। নারী যে রহস্যময়ী এই ধারণাটা বিশ্বাস প্রবণ মানুষের মাথায় সে নিজেই ঢুকিয়েছে। আমি ঠিক কি ভুল বলছি সেটা পরে দেখতে পাব। সেকালে "হারপারস ডয়ার"-এ বলা হত ঃ "নিম্নোক্ত গল্পটি বলা হচ্ছে মিস্—মিঃ—এবং মিঃ—কে নিয়ে।"

বিশপ অমুক এবং 'মানসীর—'কে বাদ দিতেই হচ্ছে কেননা তাঁরা এ দলে পড়েন না।

সেকালে পালোমা ছিল দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী নতুন শহর। পালোমাই ছিল প্রথম এবং শেষ কোলা ব্যাঙের ছাতার মত শহর।

দুপুরবেলা এইখানে ট্রেন থামত, যাত্রীরা জল খাবার খেতে নামত। একটা নতুন হোটেল, একটা পশমের কারখানা আর তিন ডজন বাক্সের মত ঘরবাড়ি ছিল। আর ছিল কিছু তাঁবু, গরু-বাছুর, কাদা, মেস্কিট গাছের সারি-সবই ঘেরা। এই উঠতি শহরে বাড়িগুলো ছিল বিশ্বাসী, তাঁবুগুলো আশায় ভরা, আর দিনে দুটো ট্রেন দাক্ষিণ্যের ভূমিকা ভালই পালন করত।

'প্যারিসিয়ান রেস্টুরেন্ট' ছিল সব চাইতে কর্দমাক্ত অঞ্চলে, আর রোদের সময় সব থেকে গরম। হিংকাস নামে এক বৃদ্ধ এটার মালিক ও শ্রমিক। এই জমান দুধ ও চীনা ঘাসের দেশে ভাগ্যের সন্ধানে এসেছিল ইণ্ডিয়ানা থেকে।

পরিবারটি বাস করত একটা ম্যাড়মেড়ে চার ঘরের বাক্স বাড়িতে। বাঁশের খুঁটির উপর ঘাসের ছাউনি দিয়ে রান্নাঘরটাকে বাড়িয়ে চালাঘর বানিয়েছিল। তার নীচে পালোমার কুটির শিল্পের নিদর্শন হিসেবে একটা টেবিল আর বেঞ্চ পাতা ছিল। সেখানেই পরিবেশন করা হত মাংসের রোস্ট, আপেলের স্টু, সেদ্ধ মটরশুঁটি, সোডা, বিস্কুট, গরম কফি।

রান্নাঘরের দায়িত্বে থাকত হিংকল মা আর বেটি নামে এক সহকারী। পরিবেশন করত বাবা হিংকাস। খুব বেশী ভিড় হলে এক মেক্সিকান যুবক সাহায্য করত। তার ধূমপানের অভ্যাস ছিল। প্যারিসির ভোজ সভায় রীতি অনুসারে মিষ্টি পদগুলো মেনুতে সবার শেষে রাখতাম।

আইলীন হিংকাস—এই নামটাই তাকে লিখতে দেখেছি। আইলীন বাড়ির মেয়ে তো বটেই, উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রথম কোষাধ্যক্ষ। রান্নাঘরের দরজার কাছে একটা উঁচু টুলের উপর সে বসত। একটা তারের বেড়া সামনে থাকে, কেন যে এটা দেওয়া হয়েছে কেউ জানে না। প্যারিসিয় ডিনার খেতে যারা আসে তারা প্রতিটি মিলের দাম এক ডলার ফোঁকড়ের মধ্য দিয়ে দেয় আর সে সেটা তুলে নেয়।

একটা বড় এলাকা জুড়ে রেষ্টুরেন্টটা। বাইরে থেকে অনেকেই এই পালামোতে আসে আইলীন-এর মুখে হাসি দেখতে। সেটুকু প্রাপ্য তারা পায়। একটি মিল—একটি হাসি—

একটি ডলার। কিন্তু যতই নিরপেক্ষ হোক না কেন আইলীন তিনজনের প্রতি যেন একটু বেশী অনুগ্রহ দেখায়।

প্রথমজন কৃত্রিমতার প্রতীক, নাম ব্রায়ান জ্যাক্স এই নামটি বহু উত্থান পতনের সঙ্গে জড়িত। তার পরিচিতি পরিধি ছিল বাঙ্গোর থেকে সান ফ্রান্সিসকো উত্তরে পোর্টল্যাণ্ড, যেখান থেকে ফ্লোরিডার এক বিশেষ অঞ্চল পর্যন্ত। পৃথিবীর সব রকম ব্যবসা, শিকার, ও খেলাধূলায় ছিল পারদর্শী। যতবার জ্যাককে দেখেছি ততবার মনে হয়েছে জি. জি. বায়রণের লেখা একটি বর্ণনা—"অল্প বয়সেই মদ ধরেছিল, মদেই ডুবে থাকত—এত মদ খেত যাতে অনেক মানুষের তৃষ্ণা মিটে যেত। তারপর তৃষ্ণায় গলা শুকিয়েই মারা গেল, কারণ তার কাছে আর মদ ছিল না।

এ কথা জ্যাক্সকেও মানাত কিন্তু সে হাজির হল পালামোতে প্রায় একই অবস্থায়। সে ছিল এক তারবার্তা প্রেরক এবং স্টেশন ও এক্সপ্রেস এজেন্ট। মাইনে মাসে পচাঁত্তর ডলার। এমন একটি যুবক যে সব জানত এবং করতেও পারত। সে কেন একটা সাধারণ চাকরিতে সন্তুষ্ট ছিল সেটাই আমি বুঝতে পারিনি।

তার সম্বন্ধে আর একটা কথা—পড়ত সে উজ্জ্বল নীল পোশাক, হলুদ জুতো, আর তার শার্টের কাপড়ের তৈরী একটা বো-টাই।

দুই নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বাড কানিংহাম। কর্মসূত্রে সে থাকত পালামোর নিকটবর্তী একটা পশু খামারে। কাজ ছিল বেয়ারা ঘোড়াগুলোকে পোষ মানান।

বাডকে দেখেছি ঠিক পশু পালকের মত দেখতে, মাথায় চওড়া পটির টুপি, গলার পিছন দিকে একটা রুমাল বাঁধা।

সপ্তাহে দু'দিন রেষ্টুরেন্টে আসত খেতে। জ্যাক্স ও আমি ছিলাম এখানকার নিয়মিত বোর্ডার।

হিংকল হাউস-এর মুখোমুখি ঘরটা একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট বসবার ঘর। বাঁশের দোলনা বই, শাঁখের কিছু খেলনা সাজান, এককোণে একটা পিয়ানো।

সন্ধ্যায় যখন ভিড় বেশী হত তখন জ্যাক্স, বাড ও আমি সেখানে গিয়ে বসতাম এবং মিস্ হিংকলের সঙ্গে দেখা করতাম।

আইলীন অনেক কিছু ভাবত। সারাদিন একটা কাঁটাতারের ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে ডলার নেওয়া থেকে বড় কিছু পাওয়া ছিল তার ভাগ্য। সে পড়াশুনা করত মনোযোগ দিয়ে, সব কথা শুনত আর ভাবত।

ভুরু কুঁচকে সে প্রশ্ন করত—"আপনি কি মনে করেন না শেক্সপীয়র একজন মহৎ লেখক ছিলেন? আর তখন যদি ইগনেশিয়াস ডোনেলি সেটা দেখতেন তাহলে তিনি হয়তো আর বেকন কে বাঁচাতে পারতেন না।"

আইলীন আরও মনে করে শিকাগোর থেকে বোস্টন অধিক সংস্কৃতিমনস্ক। রোজা বনহুদুর ছিলেন নারী চিত্রকরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, পাশ্চাত্যের লোকেরা প্রাচ্যর চাইতে অনেক বেশী স্বতঃস্ফূর্ত ও দিলখোলা, লণ্ডন একটা কুয়াশা ঢাকা শহর, আর বসন্তকালে ক্যালিফোর্নিয়া বড়ই মনোরম। এরকম আরও অনেক মতামত আছে যা থেকে বোঝা যায় পৃথিবীর সেরা চিন্তা ভাবনার সঙ্গে সে তাল রেখে চলে।

একদিন সন্ধ্যায় বলল সে—"আমার চোখের গুণকীর্তন শুনে শুনে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি জানি যে আমি সুন্দরী নই।"

(বাড আমাকে পরে বলেছিল এই কথাগুলি মিথ্যা)।

আইলীন আরও বলল—আমি মধ্য পশ্চিম অঞ্চলের একটি ছোট মেয়ে মাত্র, আমি শুধু সরল ও পরিছন্ন হয়ে থাকতে চাই, আর বাবা যাতে সাধাসিধে ভাবে বেঁচে থাকতে পারে সেই চেষ্টাই করি।"

(বুড়ো মানুষ হিংকল প্রতি মাসে নিট লাভ এক হাজার রূপোর ডলার পাঠায় সান এন্টোনিওর একটা ব্যাংকে।)

বাড বলে উঠল, তুমি ঠিকই বলেছ মিস্ আইলীন, রূপটা কিছু নয়। আমি সবসময় তোমার প্রশংসা করি তোমার মিষ্টি চাহনির জন্য নয়, মা, বাবার প্রতি সুন্দর ও সদয় ব্যবহারের জন্য। বাবা মার প্রতি ভাল ব্যবহার করে বাড়ির লোকজনদের প্রতি সদয় থাকে যে তার বিশেষ রকম সুন্দরী হবার কোন দরকার হয় না।

আইলীন মধুর হাসি হেসে বলল—'ধন্যবাদ মিঃ কানিংহাম, অনেক দিন পরে একটা প্রশংসার কথা শুনলাম। আমার চোখ ও চুলের কথা ফেলে আপনার কথা শুনতে রাজি। আমি যখন বলি যে তোষামোদ আমার অপছন্দ তখন যে সেটা বিশ্বাস করেন তাতেই খুশি।'

এবার বাড বলল—'ঠিক কথা, যাদের চাউনি ভাল তারাই যে সব সময় জয়ী হয় সেটা ঠিক নয়। শান্ত হোক আর বুদ্ধিমতী হোক মেয়েদের পক্ষে এটাই মূলমন্ত্র। সেদিন মিঃ হিং কল বলছিলেন তুমি যতদিন এখানে কাজ করছ তার মধ্যে একদিনও রূপোর ডলার সরাও নি। একটা মেয়ের এটাই বড় গুণ তাতেই আমি মজেছি।"

আইলীন বলল—ধন্যবাদ মিঃ জ্যাক্স, একটা মানুষ যদি খোলা মনে কথা বলে তাহলে আমি খুব খুশী হই। আমি মনে করি একজন বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা।

তারপরে আইলীন যখন আমার দিকে তাকাল মনে হল একটা প্রত্যাশা দেখতে পেলাম। তখনই ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার একটা উন্মাদ প্রেরণা পেয়ে বসল আমায়। ইচ্ছা হল তাকে বলে দিই যে মহান কারিগরের হাতে সৃষ্ট সুন্দর জিনিষের মধ্যে সেই সুন্দরতম—কাদা ও সবুজ ঘাসের পটভূমিতে একটা নিঁখুত মুক্তো—নিষ্কলঙ্ক ও অপরূপ। সে যদি মা-বাবার প্রতি নিষ্ঠুর হয় অথবা টাকা পয়সা নয়-ছয় করে তবু তার রূপের গুণগান আমি করব।

কিন্তু সে ইচ্ছা আমি সংবরণ করলাম। তোষামোদকারীদের আমার ভয় হয়। বাড ও জ্যাক্স এর কুশলী ও বিচক্ষণ কথা শুনে মনে যে আনন্দ পেয়েছিলাম তা নিজের চোখেই দেখলাম।

মিস্ হিংকলকে চটুল কথা বলে বোঝান যাবে না। তাই আমি সৎ ও সত্যদের দলে গেলাম।

বললাম—'কাব্য ও রোমান্স যাই বলুক, সবসময় নারীর বুদ্ধিমত্তা রূপের থেকে বেশী প্রশংসা পেয়েছে। এমনকি স্বয়ং ক্লিওপেট্রার মধ্যেও মানুষ তার চাউনির চাইতে তার রাণীসুলভ মনটাকে বড় বলে মনে করেছে।'

"বটে! আমিও তাই মনে করি তার অনেক ছবি আমি দেখেছি এমন কিছু নয়। নাকটা ছিল বেশ লম্বা।' আইলীন বলল।

আমি বললাম—'তুমি যদি অনুমতি কর তো একটা কথা বলি, তোমায় দেখলে আমার ক্লিওপেট্রার কথা মনে পড়ে।'

আইলীন তর্জনীটা নাকের ওপর রেখে বলল—'কেন, আমার নাকটা লম্বা?'

আমি বললাম—'সে কি—মানে—আমি বলতে চেয়েছি—মানসিক গুণের কথা।'

হেসে আইলীন শুধু বলল—'ওঃ!' খুব মিষ্টি করে বলল—আমার প্রতি এতটা দিলখোলা ও সৎ মনোভাবের জন্য আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। আমি চাই সব সময় আপনারা এই রকম থাকুন। আপনাদের মনের কথাটা আমাকে সঠিকভাবে বলবেন তাহলেই আমরা হতে পারব শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এই উপলক্ষ্যে একটু গান বাজনা শুনুন আপনারা।'

দশটার সময় যেখান থেকে বেরিয়ে তিনজন চলে যেতাম জ্যাক্স এর ছোট কাঠের স্টেশনে, আর গল্প করতাম।

একদিন পালামোতে এসে হাজির হল একটা অচেনা ঘোড়া, এক উকিল যুবক। নাম মিঃ ভিনসেন্ট ভেসি। সম্প্রতি সে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে দক্ষিণ পশ্চিমের আইন বিদ্যালয় থেকে। তার প্রিন্স কোট, হাল্কা ডোরাকাটা ট্রাউজার, নরম কালো টুপি, মসলিনের টাই সগর্বে ঘোষণা করছে সে ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার লর্ড চেষ্টারফিল্ড, বিউ ব্রুমেল আর ছোট ম্যাক হর্নার এর জগাখিচুড়ি। সে আসাতে পালামো গরম হয়ে উঠল।

অবশ্য নিজের বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এখানকার লোকেদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় তাকে করতেই হবে। অতএব আমরা তিনজনে এই সম্মানটা পেলাম।

ভেসি যদি আইলীনকে না দেখত এবং চতুর্থ প্রতিযোগী না হত তবে অদৃষ্ট বলে কিছু থাকত না। বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে সে রইল হলুদ পাইন হোটেল, কিন্তু হিংকাল হোটেলের নিয়মিত অতিথি হয়ে গেল।

ভেসি প্রচণ্ড কথা বলত। এই বাগ্মিতা ও প্রিন্স অ্যালবার্টের আকর্ষণ যে আইলীন সংবরণ করতে পারবে সে আশা ছেড়ে দিলাম।

এমন একটা দিন এল যখন আমরা সাহসে বুক বাঁধলাম।

এক গোধূলি বেলায় হিংকলদের বৈঠক আমার ছোট বাগানে বসেছিল। আমি বসেছিলাম আইলীনের আশায়। এমন সময় মানুষের গলা পেলাম। বাবার সঙ্গে সে কখন ঘরে ঢুকেছে জানি না। বুড়ো হিংকল কি যেন বলছে। আগেও লক্ষ্য করেছি বুড়োর বেশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কিন্তু অযৌক্তিক নয়।

বৃদ্ধ—'আইলীন আমি লক্ষ্য করেছি বেশ কিছুদিন হল তিন চারটি যুবক নিয়মিত কিছু সময়ের জন্য তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাদের মধ্যে একজনকে কি তুমি বেশী পছন্দ কর?'

মেয়েটি জবাব দেয়—'সে কি বাপি, আমি তো তাদের সকলকে পছন্দ করি। আমার তো মনে হয় মিঃ ক্যানিংহাম এবং মিঃ জ্যাক্স ও মিঃ হ্যারিস সকলেই ভাল ছেলে। মিঃ ভেসির সঙ্গে আমার পরিচয় খুব অল্পদিনের কিন্তু মনে হয় সেও চমৎকার লোক। আমাকে যা বলেন সব খোলা মনে।'

বৃদ্ধ হিংকাল উত্তরে বলল,—দেখ আমিও সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছি। তুমি সব সময় বল যে সেই সব মানুষকে তুমি পছন্দ কর যারা সত্য কথা বলে আর ফালতু প্রশংসা করে

না। এখন ধর তুমি যদি এই ছেলেগুলোকে বাজিয়ে নাও। বা তোমার সঙ্গে কেউ সোজাসুজি কথা বলে তো কেমন হয়?'

'সেটা কেমন করে নেব বাপি?'

"আমি বলে দেব। তুমি একটু আধটু গাইতে পার। দু বছরের বেশী তোমাকে গান শেখাতে পারিনি। এখন ধর তুমি তোমার গান সম্পর্কে ছেলেগুলির মতামত জানতে চাইলে তারা কি বলে সেটা জানতে পারলে। এ ব্যাপারে যে সত্যি কথা বলবে তার স্নায়ুর জোরটা নিশ্চয়ই বেশী, আর তোমার পক্ষে বেছে নেওয়াও সহজ হবে।'

আইলীন বলল—'ঠিক আছে বাপি। ব্যবস্থা ভালই। আমি এটা করব।'

দুজনে ভিতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে। সকলের অগোচরে আমি ছুটলাম স্টেশনে। জ্যাক্স টেলিগ্রাফের টেবিলে বসে আটটার বার্তার জন্য অপেক্ষা করছিল। বাড এলে শোনা কথাগুলো দুজনকে শোনালাম। প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চাই আমি। আইলীন-এর আসল ভক্তদের সেটাই উচিত কাজ।

আমরা প্ল্যাটফর্মেই নাচ শুরু করে দিলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় যে চেয়ারে মিস্ হিংকাল বসেছিল সেটা ছাড়া চারটে দোলনা চেয়ারই ভর্তি ছিল। ভেসিকে আমরা আগে থেকেই বাতিল করে রেখেছিলাম। আমরা বাকি তিনজন উত্তেজিত হয়ে পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রথম পরীক্ষাটা পড়ল বাড-এর কাঁধে।

'যখন পাতা ঝড়ে যায়' গানটি শেষ করে উজ্জ্বল হাসি হেসে আইলীন বলল—'মিঃ কানিংহাম, আমার গলা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? খোলা মনে বলবেন, কারণ আপনি তো জানেন সেটাই আমি পছন্দ করি।'

বাড অকপটেই বলল—'সত্যি কথা বলতে কি মিস্ আইলীন, একটা ভোঁদরের গলার চাইতে তোমার গলাটা এমন কিছু ভাল নয় তবে একটু কর্কশ এই যা। অবশ্য তোমার গান শুনতে আমরা সকলেই ভালবাসি, কারণ আর যাই হোক তোমার গলাটা বেশ মিষ্টি ও শান্ত আর তুমি পিয়ানোর টুলে বসে যখন চারদিক তাকাও তখন তোমাকে ভাল দেখায়। কিন্তু সত্যিকারের গানের কথাই যদি বল তো আমার মতে এটা গান নয়।'

অকপট হতে গিয়ে বাড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে কিনা সেটা বোঝার জন্য আইলীনের দিকে তাকালাম। হাসি দেখে ও মিষ্টি ধন্যবাদ শুনে বুঝলাম আমরা সঠিক।

আইলীনের পরবর্তী প্রশ্ন—'আর আপনি কি মনে করেন মিঃ জ্যাক্স?'

মিঃ জ্যাক্স—'আমার কথা হচ্ছে তুমি প্রথম শ্রেণীর গায়িকা নও। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি শহরে তাদের গান শুনেছি, আর আমিই বলছি যে তোমার কণ্ঠস্বর তাদের ধারে কাছেও যায় না। অন্যদিকে চেহারার দিক দিয়ে যে কোন বড় অপেরাকে সাবানের কারখানায় ঠেলে দেবে।'

জ্যাক্স এর সমালোচনায় মৃদু হেসে আইলীন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

সত্যি বলতে কি গোড়ায় আমি থতমত খেয়ে ছিলাম। অতি খোলামেলা নয়, হয়তো আমি রায় দেবার সময় রেখে ঢেকে বলেছিলাম। কিন্তু আমি সমালোচকদের দল ছেড়ে যাইনি।

আমি বললাম, 'মিস্ আইলীন বিজ্ঞান সম্মত সঙ্গীতে আমার দখল নেই, কিন্তু খোলা মনেই বলছি, প্রকৃতি তোমাকে যে গানের গলা দিয়েছেন তার উচ্চ প্রশংসা করতে পারছি না। দীর্ঘকাল একটা উপমা বলে আসছে যে একজন বড় গায়ক গান করেন পাখির মত। আমি বলতে চাই তোমার কণ্ঠস্বর আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে বুলবুল পাখিকে—উচ্চকণ্ঠ কিন্তু জোরাল নয়, বৈচিত্র্যও নেই কিন্তু তবু মানে মিষ্টি মানে একরকম....."

মিস্ হিংকাল বাধা দিয়ে বলল—'ধন্যবাদ মিঃ হ্যারিস। আমি জানতাম আপনার খোলামন ও সততার উপর নির্ভর করা যায়।"

এবার মিঃ ভিনসেন্ট ভেসি তার বরফ সাদা আস্তিনটা গুটিয়ে নিয়ে শুরু করল বক্তব্যটা। মিস্ হিংকল-এর কণ্ঠস্বরকে প্রভূত প্রশংসায় ভূষিত করতে লাগল। সে জেনি লিণ্ডা থেকে এমমা এ্যাবেট পর্যন্ত সব মহাদেশের মহা অপেরার নক্ষত্রগুলির নাম বলল তাদের গুণাবলীর মূল্যহীনতা বোঝাবার জন্য। যদিও শেষে এটা বলল লিণ্ডার কাছাকাছি মিস্ হিংকল পৌঁছতে পারেনি।

উপসংহারে ভবিষ্যৎবাণী করল দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের এই উঠতি তারকা একদিন কণ্ঠ শৈলীর এমন একটা স্তরে উন্নীত হবে যার জন্য এই প্রাচীন মহান টেক্সাসও এত গর্ববোধ করবে যা ইতিহাসে আগে ঘটেনি।

দশটার সময় যখন সেখান থেকে উঠলাম তখন আইলীন আমাদের প্রত্যেককে উপহার দিল উষ্ণ করমর্দন ও সম্মোহনকারী হাসি আর আসার নিমন্ত্রণ করে। সে যে একজন অপেক্ষা অন্যজনকে অনুগ্রহ দেখাল তেমনটি আমার চোখে পড়ল না। কিন্তু আমরা তিনজনই জানতাম, সততারই জয় হয়েছে আর প্রতিযোগী তিন হয়েছে।

স্টেশনে পৌঁছে জ্যাক্স ভাল মালের একটা বোতল খুলল।

চারদিন কেটে গেল, উল্লেখ করার মত কিছু ঘটল না।

পঞ্চম দিনে জ্যাক্স ও আমি নৈশভোজের জন্য খড়ের কুঞ্জবনে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম সেই মেক্সিকান যুবকটি এখন কাঁটা তারের ভিতরে বসে ডলার নিচ্ছে।

আমরা রান্নাঘরে গেলাম। সেখানে দেখলাম মিঃ হিংকাল দুকাপ কফি নিয়ে আসছেন। আমরা একসঙ্গে প্রশ্ন করলাম, 'আইলীন কোথায়?'

বাবা হিংকল দয়ালু মানুষ, বললেন—দেখ ভদ্রজনেরা সিদ্ধান্তটা সে হঠাৎই নিল। আমি টাকাটা পেলাম আর মত দিলাম। সেও বোস্টন গেল গলা সাধতে।

সে রাতে তিনজনের বদলে চারজন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে পা দোলাতে লাগলাম, আমাদের দলের অন্যতম ছিল তখন ভেসি। আমরা নানা বিষয়ে কথা বলতাম, আর চাঁদ ওঠা দেখতাম, কুকুরের ডাক শুনতাম।

আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল একটি মেয়ের কাছে মিথ্যা কথা না সত্য কথা কোনটা বলা ভাল।

সকলেই যেহেতু যুবক তাই কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলো না।

* A Poor Rule

নিউইয়র্কে এলসি

পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই এটি এলসি ধারাবাহিকের অন্য একটি পর্ব নয়। তবে এলসি যদি এই শহরে বেঁচে থাকত তাহলে তার বইতে এমন একটা অধ্যায় যুক্ত হত সেটা এই গল্প থেকে খুব বেশী তফাৎ নেই।

বিশেষ করে যৌবনের যাযাবর পা দুটির কাছে মানহাটানের চোরা গর্ত ও ফাঁদ খুব বেশি। কিন্তু যুবক যুবতীদের অভিভাবকরা দুষ্ট লোকের ফাঁদগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং অধিকাংশ বিপজ্জনক পথে তাদের লোকজনেরা সবসময় ঘুরে বেড়ায়, আর যারা চলতে গিয়ে বিপদে পা বাড়ায় তাদের সব রকম বিপদ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। কেমন করে তারা এলসিকে সব রকম বিপদের ভিতর দিয়ে সঠিক পথটি দেখিয়ে তাকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল সে কথাই আপনাদের বলা হবে এ গল্পে।

এলসির বাবা ছিলেন নিম্ন ব্রডওয়ের পোশাকের দোকান 'ফক্স এ্যাণ্ড ওটার' এর কাটিং মাস্টার। বুড়ো মানুষ, ধীরে চলতেন। একদিন দোকানে যাবার সময় অনভিজ্ঞ শোফার তাকে চাপা দিয়েছিল। একবছর শয্যাশায়ী থেকে মারা গেলেন। রেখে গেলেন ২.৫০ ডলার আর মিঃ ওটার-এর একটা চিঠি। যাতে জানিয়েছেন, তার এই বিশস্ত বৃদ্ধ কর্মচারীটিকে সাধ্যমত সব কিছু সাহায্য করবেন। বৃদ্ধ দর্জিটি মেয়েকে সেই চিঠিটা দিয়ে মারা গেলেন।

বাড়ির মালিকও সেই সুযোগটা নিল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করল। এলসি নীরবে বেরিয়ে গেল। এলসির চেহারা ছিল ভাল। চোখ দুটো সমুদ্রের মত নীল, নিস্পাপ, গায়ের কোটটা ছিল ফক্স এণ্ড ওটার-এর সেরা স্টাইলের। সঙ্গে ১ ডলার ও সেই চিঠিটা। এই চিঠিটাই এ গল্পের সূত্র।

অতএব এলসি এইভাবে বৃহত্তর জগতের পথে পা বাড়াল ভাগ্যের সন্ধানে। চিঠির ব্যাপারে একটা অসুবিধে দেখা দিল। সেই দোকানটা অন্যত্র উঠে গেছে, কিন্তু নতুন ঠিকানাটা লেখা নেই। এলসি ভাবল ঠিকানাটা খুঁজে নিতে পারবে। সে জানে পুলিশের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইলে ঠিকানা পেয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত সে ১৭৭ নম্বর স্ট্রীটে একটা গাড়িতে চেপে দক্ষিণে ৪২ স্ট্রীটে পৌঁছাল। সেখানে গাড়ি থেকে নেমে শহরের ভিড় ও হট্টগোল দেখে থতমত খেয়ে গেল।

একটি যুবক টুপি মাথায় দিয়ে এলসির পাশ দিয়ে গ্রাণ্ড সেন্ট্রাল ডিপোর দিকে এগিয়ে গেল। ছেলেটির নাম হ্যাংক রস. বাড়ি ইডাহোর "সূর্যমুখী পশু খামার"। সে পূর্বাঞ্চল থেকে ফিরে যাচ্ছে। তার মনটা ভারী কারণ খামারটি নির্জন, নারীবর্জিত। আশা করেছিল সেখানে থাকার সময় এমন একজনের দেখা পাবে যে সাগ্রহে তার সম্পদ ও সংসারের অংশীদার হবে। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হয়নি। এখানে পথে এলসির মিষ্টি সরল মুখ ও একাকিত্বের ভঙ্গী দেখে সে প্রাণ ফিরে পেল। তার মনে হল তাকে সে ভালবাসতে পারবে, আদর যঃ

দিয়ে ভরে দেবে, আরামে রাখবে, সুখে রাখবে। একদিন যে খামারে ফুটত একটা সূর্যমুখী এখন সেখানে দুটো করে সূর্যমুখী ফুল ফুটবে।

হ্যাংক মেয়েটির কাছে গেল। তার মনটা যে সাদা এটা বোঝাতে টুপিটা খুলে ফেলল মেয়েটির কাছে গিয়ে। এলসি সবে তার দিকে তাকিয়েছে এমন সময় স্থূলকায় একটি পুলিশ হ্যাংক এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এদিকে একটা চোর যে বাসন নিয়ে এপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল সেদিকে নজর পড়ল না।

পুলিশটা চীৎকার করে বলল—'তোমার সাহস তো বড় কম নয়, আমার চোখের সামনেই ফস্টিনস্টি করছ? মহিলাদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় আজ তোমায় শিখিয়ে ছাড়ব।'

খামারের লোকটিকে টানতে টানতে নিয়ে যেতে দেখে এলসি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। লোকটির তামাটে রঙের ওপর নীল চোখের আভাটি বড় ভাল লেগেছে। সে মুখ ঘুরিয়ে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে লাগল, তার ধারণা এই অঞ্চলেই সে দোকানের হদিশ পাবে।

কিন্তু সত্যি কি মিঃ ওটারকে খুঁজছে? স্বাধীন মনোবৃত্তি বাবার কাছ থেকে সে পেয়েছে। তাই মনে হল মিঃ ওটারের সাহায্য না নিয়ে নিজেই একটা কাজ পেলে ভাল হয়।

'কর্মসংস্থান এজেন্সি' লেখা একটা ঘরে সে ঢুকল। দেওয়ালের গায়ে সাজান চেয়ারগুলোতে অনেক মেয়ে বসে আছে। কয়েকটি সুবেশা মহিলা তাদের দেখাশুনা করছে। পাকা চুল, সাদা মুখের এক বৃদ্ধ মহিলা এলসির কাছে ছুটে এল।

মিষ্টি গলায় বলল—'তুমি কি চাকরীর খোঁজে এসেছ সোনা? তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেছে. আমি এমনই একটা মেয়েকে খুঁজছি যে আমার পরিচারিকা বনাম সঙ্গিণী হবে। তুমি একটা ভাল ঘর আর মাসে ৩০ ডলার পাবে।"

এলসি কোন কথা বলার আগেই নাকের ওপর চশমা আঁটা জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক যুবতী তাকে যেন ছোঁ মেরে অন্য পাশে সরিয়ে নিয়ে গেল।

যুবতী বলল—"আমি মিস্ টিকল্‌বম্। কর্মসন্ধানী কাজের মেয়েদের কর্মসংস্থান বিরোধী সমিতির সদস্য। গত সপ্তাহে সাতচল্লিশটা মেয়েকে চাকরি নিতে দিইনি। এখানে আছি তোমাদের রক্ষা করতে। তোমাদের যে কাজ দেবে তার সম্পর্কে সাবধান থেক। তুমি কি করে জানবে যে এই স্ত্রীলোকটি তোমাকে কয়লা খনির শ্রমিকের মত খাটাবে না, অথবা তোমার দাঁতগুলোর জন্য তোমাকে খুন করবে না? আমাদের সমিতির অনুমতি না নিয়ে যদি কোন কাজের প্রস্তাব গ্রহণ কর তাহলে আমাদের এজেন্ট তোমাকে গ্রেপ্তার করবে।"

এলসি প্রশ্ন করল—"কিন্তু আমি কি করব এখন? আমার বাড়ি নেই, টাকা নেই। কোন না কোন কাজ তো করতেই হবে। কেন আমি এই দয়ালু মহিলার কাজ গ্রহণ করব না?"

'তা আমি জানি না। সেটা আমাদের চাকরী প্রথা বিলোপ কমিটির ব্যাপার। তুমি যাতে কোন কাজ না পাও সেটা দেখা আমার কাজ। তোমার নাম ঠিকানা আমাকে দাও, আর প্রতি বৃহস্পতিবার সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করে সব জেনে নেবে। আমাদের তালিকায় ৬০০ মেয়ের নাম আছে, আমাদের কাছে 'উপযুক্ত নিয়োগকারী'দের যে তালিকা আছে তাদের প্রতিষ্ঠানে কোনো চাকরী যখন খালি হবে তখনই ওই মেয়েদের এই পদগুলি দেওয়া হবে। আমাদের 'উপযুক্ত নিয়োগকারী'দের তালিকায় সাতাশটি নাম লিপিবদ্ধ আছে, প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবারে ভোজনালয়ে প্রার্থনা সঙ্গীত হয় ও লেমোনেড বিতরণ করা হয়।" সময়োচিত

সতর্কবাণী ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য মিস্ টিক্ল্বমকে ধন্যবাদ জানিয়ে এলসি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়ল। তার মনে হল মিঃ ওটারকে খোঁজাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আরও কয়েকটা ব্লক হেঁটে পার হবার পর রুটির দোকানের জানালায় 'ক্যাশিয়ার চাই' লেখা একটা সাইনবোর্ড তার চোখে পড়ল। ভিতরে ঢুকে আবেদন করার আগে দেখল চাকরী-বিরোধী মহিলা পিছু নিয়েছে কিনা।

রুটির দোকানের মালিক রসিক বৃদ্ধ। এলসিকে নানা রকম প্রশ্ন করে স্থির করলেন যে এই রকম একটি মেয়েকে তার চাই। আর এই মুহূর্তে তাকে কাজে যোগ দিতে বলা হলে এলসিও কৃতজ্ঞচিত্তে কাউন্টারের দিকে এগোতে যাবে তার আগেই চশমা ও দস্তানা পরা এক কৃশকায় মহিলা সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'যুবতী নারী থাম!"

এলসি থেমে গেল।

মহিলাটি বলতে লাগল—'তুমি কি জান যে, এই চাকরীটা গ্রহণ করলে আজই তুমি একশটি প্রাণীর দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ এবং সমসংখ্যক আত্মার নরকবাসের কারণ হবে।'

এলসি ভয়ার্ত গলায় বলল—'সে কি? জানি না ত। আমি কেন তা করব?'

মহিলাটি বলল—'আসব, রাক্ষুসে আসব, তুমি কি জান একটা রঙ্গমঞ্চে আগুন লাগলে এত বেশী জীবনহানি ঘটে কেন? তার কারণ ব্রাণ্ডি বল। মেয়েরা যখন রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের আসনে বসে তখন এই সব ব্রাণ্ডিভরা মিছরির টুকরো মুখে দিয়ে তারা নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। রাক্ষুসে আগুন যখন তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন পালাবার শক্তিটুকুও থাকে না। মিছরির কারখানাগুলো শয়তানের চোলাইখানা। এই প্রবঞ্চক মিঠাই মিছরির কাজে তুমি সাহায্য করলে সেটা তোমার ভাই বোনদের ধ্বংসে সাহায্য করা হবে। তার সঙ্গে জেলখানা, গারদখানা ও ভিক্ষুক নিবাসগুলিও ভরে যাবে। তাই বলছি—যে টাকা ব্রাণ্ডি বল বিক্রি করে পাওয়া গেছে সেটা স্পর্শ করার আগে ভেবে দেখ।'

হতবুদ্ধি এলসি বলে উঠল—'হায়! হায়! ব্রাণ্ডি বলে যে আসব থাকে তা আমি জানতাম না। কিন্তু আমাকে তো বাঁচতে হবে। আমি কি করব?'

'ও চাকরীটা নিওনা, আমার সঙ্গে চল। তুমি কি করবে সেটা আমিই তোমাকে বলে দেব।'

এলসি কারখানার মালিককে বলে মহিলাটির সঙ্গে একটা গলিতে এল। একটা ভিক্টোরিয়া গাড়ি দাঁড়িয়েছিল সেখানে। 'অন্য কোন কাজ খুঁজে নাও' বলে মহিলাটি ভিক্টোরিয়ার চেপে চলে গেল।

এলসি রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগল—'মনে হচ্ছে আবার আমাকে মিঃ ওটার কাছে যেতে হবে। তার চেয়ে আমি কারও সাহায্য ছাড়াই পথ খুঁজে নিই।'

চোদ্দ নম্বর স্ট্রীটে এলসি দেখল দরজার পাশে সেঁটে দেওয়া একটা প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা "থিয়েটারের পোশাকের জন্য ভাল সেলাই জানা পঞ্চাশটা মেয়ে চাই। ভাল মাইনে,'

ভেতরে ঢুকতে যাবে এমন সময় কালো পোশাক পরা একটা গম্ভীর লোক তার কাঁধে হাত রাখল।

বলল—"প্রিয় মেয়েটি, আমি মিনতি করছি শয়তানের সাজঘরে তুমি ঢুকো না।"

ধৈর্য হারিয়ে এলসি বলে উঠল—'কী সর্বনাশ! এতো দেখছি নিউইয়র্ক-এর সব ব্যবসাতে শয়তান ঢুকে পড়েছে। তা-এ জায়গাটা আবার কি দোষ করল।'

গম্ভীর লোকটি বলল—'এই জায়গাতে শয়তানের রাজচিহ্ন তৈরী করা হয় অর্থাৎ সাজসজ্জা, অস্ত্রশস্ত্রাদি, রঙ্গমঞ্চই হচ্ছে ধ্বংস ও বিনাশের পথ। তোমার হাতের কাজ দিয়ে একে সমর্থন করে আত্মাকে বিপন্ন কোর না। রঙ্গমঞ্চের যবনিকা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ওপর নেমে আসার পর তারা কোথায় যায় তা কি জান?'

এলসি বলল—'অবশ্যই জানি। রঙ্গাভিনয়ের দিকে। কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে আমি যদি সেলাইয়ের কাজ করে বেঁচে থাকার মত কিছু অর্থ উপার্জন করি সেটা কি খুব খারাপ কাজ হবে? অবিলম্বে আমাকে কিছু করতে হবে।'

লোকটি দু হাত তুলে গলা ছেড়ে বলল—'আমি মিনতি করছি মেয়ে, এই পাপ ও অনাচারের রাজ্য ছেড়ে তুমি চলে যাও।'

এলসি—'কিন্তু জীবিকা অর্জনের জন্য আমি তাহলে কি করব? আপনার কথাই যদি সত্যি হয় তাহলে এই নাটকের পোশাক সেলাই করার ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু একটা কাজ তো আমার চাই।"

লোকটি বলল—"প্রভুই তোমার কাজের ব্যবস্থা করে দেবেন। গীর্জার পাশে চুরুটের দোকানে নীচের তলায় প্রতি রবিবারে অপরাহ্নে একটা বিনা মাইনের বাইবেলের ক্লাস হয়। তুমি সেখানে গিয়ে শান্তি লাভ কর। আমেন, বিদায়।"

এলসিও এগিয়ে গেল, পৌঁছাল বস্তি অঞ্চলে যেখানে প্রচুর কলকারখানা। একটা ইটের বড় বাড়ীর মাথায় সোনালী অক্ষরে লেখা—'পোমি এ্যাণ্ড ট্রিমার। নকল ফুলের ভাণ্ডার।' তার নীচে টাঙান ক্যানভাসে লেখা—কাজ শেখার জন্য পাঁচশ মেয়ে দরকার। ভাল বেতন। উপরে এসে যোগাযোগ করুন।

এলসি দরজার দিকে এগোতে কাছেই যে বিশ ত্রিশটা মেয়ে ছিল তাদের মধ্য থেকে টুপি পরা একটা মেয়ে এসে বলল—'চাকরীর খোঁজে কি তুমি ভিতরে যাচ্ছ।'

—'হ্যাঁ', একটা কাজ আমার চাই-ই।'

—'এ কাজ কোর না। আমি এখানকার স্ক্যাব কমিটির চেয়ারম্যান। আমাদের ৪০০ মেয়েকে ছাটাই করা হয়েছে। কারণ আমরা পঞ্চাশ সেন্ট বৃদ্ধি ও বরফ জলের দাবী করেছিলাম। আর চেয়েছিলাম ফোরম্যানের গোঁফ কামিয়ে ফেলা হোক। তোমার মত সুন্দরী মেয়ের এখানে চাকরী পোষাবে না, তুমি বরং অন্য কোথাও দেখ।'

—'আমি অন্যত্রই দেখব।'

ব্রডওয়ে ধরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এগিয়ে চলল এলসি। এক সময় একটা উঁচু বাড়ির সামনে 'ফক্ এ্যাণ্ড ওটার' লেখা চোখে পড়তেই মনটা নেচে উঠল। মনে হল অদৃশ্য পথ প্রদর্শক তাকে সঠিক রাস্তায় এনে দিয়েছে।

সে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে নিজের নাম ও চিঠিটা একজন লোককে দিয়ে পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাজির করা হল মিঃ ওটার-এর ব্যক্তিগত অফিসে।

এলসি ঘরে ঢুকতেই মিঃ ওটার ডেস্ক থেকে উঠে আন্তরিক হাসি দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। মানুষটি মাঝবয়সী, ঈষৎ স্থূলকায়, মাথায় ছোট টাক, চোখে সোনার চশমা, ভদ্র সুসজ্জিত ঝক্‌ঝকে।

"আচ্ছা, আচ্ছা তাহলে এই ছোট্ট মেয়েটি, তোমার বাবা ছিলেন আমাদের একজন সুদক্ষ ও মূল্যবান কর্মচারী। সে কি কিছুই রেখে যায়নি? ঠিক আছে। আশা করি তার বিশ্বস্ত কাজকর্মের কথা ভুলিনি। আমার একটা মডেলের পদ খালি আছে। এটা খুবই সোজা কাজ।'

মিঃ ওটার ঘন্টা বাজাতে একজন কেরাণী এসে দরজায় দাঁড়াল।

'মিস্ হকিন্সকে পাঠিয়ে দাও।' ওটার বললেন।—'মিস হকিন্স, টেলিফোন করে মিস্ বিয়েট্রির একটা টেস্ট নেবার ব্যবস্থা করে দাও, আর ভাল করে সাজিয়ে নেবার ব্যবস্থা কর।'

এলসি একটা বড় আয়নার সামনে দাঁড়াল। তার গালে গোলাপি ছোপ, ছোট চোখ দুটি জ্বলছে, নিঃশ্বাস দ্রুত হয়েছে। হায় রে! সত্যিই সে সুন্দরী।

গল্পটা এখানেই শেষ করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু না আরও কিছু দূর যেতে হবে। এটা আমার তৈরী নয় কেবল পুনরাবৃত্তি করছি।

এলসি যখন আয়নায় নিজেকে নিয়ে ব্যাস্ত তখন ওটার একটা ফোন করলেন। নম্বরটা কি তা জানাতে পারব না।

তিনি বললেন—"অস্কার, আমি বলছি, আজ সন্ধ্যায় সেই টেবিলটা আমার জন্য রিজার্ভ করে রাখ...কি? লতাপাতার বাগানের বাঁদিকের বড় ঘরের টেবিলটা হ্যাঁ, দুই....হ্যাঁ সেই পুরনো মালটা, আর রোস্টের সঙ্গে ৮৫ জোহানিস্ বার্জার...না মেয়েটির নয়।................ না সত্যি বলছি........ একটা নতুন মাল......... একেবারে পাকা ফলটি অস্কার, পাকা ফল।"

ক্লান্ত ও বিরক্ত পাঠক, আপনি চান তো আমি গল্পটা শেষ করব তার লেখা কয়েকটি কথার বিস্তারিত বিশ্লেষণ দিয়ে। 'গডস্ হিল' এর সেই লোকটির লেখা যার সামনে যদি টুপি না খোলেন তাহলে অভদ্রতা হবে।

ইয়োর এক্সেলেন্সি হারিয়ে গেল। হারিয়ে গেল সব সমিতি ও সমাজ। হারিয়ে গেল সঠিক বেঠিক সর্বস্তরের শ্রদ্ধেয়জনেরা। হারিয়ে গেল সেই সব সংস্কারক ও আইন প্রণেতারা যারা জন্মেছে আপনাদের অন্তরের স্বর্গীয় অনুকম্পা নিয়ে, অথচ সেই সঙ্গে আপনাদের অন্তরের অর্থের কামনা নিয়ে। এইভাবে আমাদের চারপাশ থেকে প্রতিদিন হারিয়ে যাচ্ছে।

* Elsi in New-York.

উচ্চতর কার্যকারিতাবাদ

একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছে—জ্ঞান অর্জনের জন্য কার কাছে যাব। প্রাচীনরা বাতিল, প্লেটো অপাত্র, এরিস্টটল স্খলিত পদ, মার্কাস অরেলিয়ামের মাথা ঘুরছে, ঈশপের স্বত্ব এখন ভারতীয়দের হাতে, সলোমন বড় গম্ভীর, এপিটেটাসের কাছ থেকেও কিছু পাওয়া যাবে না।

যে পিপীলিকাকে এতকাল স্কুলের পাঠ্য বইতে বুদ্ধি ও পরিশ্রমের আদর্শ হিসাবে ধরা হত এখন দেখা যাচ্ছে তারা নির্বোধ, অকারণে সময় নষ্ট করে। পেঁচাও আজ অবজ্ঞার পাত্র, পাকা চুল লোকেরা নতুন চুল গজানর ওষুধের প্রশংসা করছে। দৈনিক সংবাদপত্রে টাইপের ভুল হচ্ছে। কলেজের অধ্যাপকরা হয়েছে—

কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের কথাই যাক। ক্লাসে বসে, শব্দ কোষে মাথা গুঁজে, অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টে আমরা জ্ঞানী হতে পারব না। কবি বলেছেন—'জ্ঞান আসে কিন্তু বিজ্ঞতা থেকে যায়। বিজ্ঞতা হচ্ছে শিশির যা আমাদের অজান্তে সিক্ত করে রাখে, তাজা করে বড় করে তোলে। জ্ঞান এমন একটা প্রচণ্ড জলধারা যা আমাদের শিকড়কে নাড়িয়ে দেয়।'

এখন আগে গল্পটা বলে নেওয়া যাক। বেঞ্চে দশ সেন্ট মূল্যের একটি পত্রিকা পড়েছিল। দামটা জানলাম কেননা বেঞ্চে বসার সময় ঐ দামটাই আমার থেকে চেয়েছিল। পত্রিকাটা নোংরা ও ছেঁড়া ছিল তাতে কয়েকটা অদ্ভুত গল্প ছিল, যা সংবাদপত্র থেকে কেটে জুড়ে দেওয়া সংবাদ ও ছবি। তাকে পরীক্ষা করতে আমি বললাম—'আমি একজন প্রতিবেদক। যে সব হতভাগ্যরা এই পার্কে সন্ধ্যা কাটায় তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা বিস্তাড়িত প্রতিবেদন লিখতেই আমাকে পাঠান হয়েছে। আমি কি জানতে পারি কেমন করে তোমার পতন ঘটেছে।"

সে এমনভাবে হেসে উঠল যে আমার নিশ্চিত ধারণা হল এই প্রথম তার কাছে এই প্রশ্ন করা হল।

বলে উঠল—'আরে না, না তুমি প্রতিবেদক নও। ওরা এভাবে কথা বলে না। আমি তাদের দেখলেই চিনতে পারি। আমাদের মত পার্কের মস্তানরা মনুষ্য প্রকৃতিটা ভালই বোঝে। এখানে বসে কত মানুষকে যেতে দেখি আর পাশ দিয়ে যারা হেঁটে যায় তারা কেমন তাও বলে দিতে পারি।'

'আমি বললাম—'বেশ তো বল আমাকে কোন জাতের মাল মনে হয়।'

কিছুটা ইতস্তত করে বলল—'আমি বলতে চাই, তুমি দিন মজুরির চুক্তিতে কাজ কর— অথবা কোন দোকানে, কোন সাইন বোর্ড চিত্রকরের কাজ। হাতের চুরুটটা শেষ করার একটু থেমেছিলে এখানে। যাইহোক এখন অন্ধকার হয়ে আসছে, তুমি কিন্তু বাড়ীতে ধূমপান করতে পারবে না।'

আমি গম্ভীর হলাম। মানব চরিত্রের পাঠকটি বলে চলল—'আমার মনে হয় তোমার কোন স্ত্রী নেই।'

অস্থির হয়ে বললাম—'না, না, বউ নেই। কিন্তু কামদেবের ধনুকের টানে বৌ আসবে। অর্থাৎ যদি—'

লোকটি বলে উঠল—'আরে এতে দেখছি তোমার নিজেরই একটা গল্প আছে। তোমার গল্পটাই না হয় শোনাও। পার্কে সন্ধ্যাবেলায় যারা আসে তাদের উত্থান পতন জানতে আগ্রহী আমি।'

যে কারনে হোক, কথাগুলো আমার ভাল লাগল। সংসারের দিকে চোখ ফিরিয়ে ভাবলাম আমার গল্পটা ওকে বলতে বাধা কি? আমি চিরদিন মুখচোরা। তবুও কিছু বন্ধুকে বলেছি। তবে এই ভবঘুরে লোকটিকে জানাবার বাসনা কেন হল তাতে নিজেই অবাক হলাম।

আমি বললাম—'জ্যাক'।

সে বলল—'ম্যাক'।

আমি—'ম্যাক তোমাকে একটা গল্প বলব।

সে—'ডাইমটা কি আগে ফেরত চাও?'

এক ডলার দিয়ে বললাম—'ডাইমটা ছিল তোমার গল্পটা শোনার দাম।'

সে—'ঠিক জবাব দিয়েছ। এবার বলে যাও।' যে জগতের প্রেমিকরা তাদের দুঃখের কথা কেবল রাতকে, চাঁদকে জানায় তারা বিশ্বাস করবে না যে আমি গোপন কথাগুলো তুলে ধরলাম ধ্বংস স্তুপের কাছে।'

মিলড্রেড টেলফেয়ারকে ভালবেসে যে সব দিন, সপ্তাহ, মাস বছর কেটে গিয়েছিল আমার সবই তাকে শোনালাম। আমার হতাশা, দুঃখের দিন, নিদ্রাহীন রাত, ব্যার্থ আশা, মানসিক যন্ত্রণা কিছুই বাদ দিলাম না। এমনকি প্রেমিকার রূপ, মর্যাদা, সামাজিক প্রতিপত্তি, বনেদী কোটিপতির ঘরের বড় মেয়ে হবার সুবাদের সুখ ও প্রাচুর্যের বিবরণ।

ম্যাকের প্রশ্নে আমি পৃথিবীতে নেমে এলাম—'সেই মহিলাটিকে তুমি পুলিশে দিচ্ছনা কেন?'

আমি বুঝিয়ে বললাম—'আমার উপার্জন এত কম, সামর্থ্য অল্প, কিন্তু ভয়টা এত বেশী যে প্রেম পূজার ব্যাপারটা তাকে বলার মত সাহস হয়নি। সে সামনে এলে আমি লজ্জায় লাল হয়ে যেতাম আর আমতা আমতা করতাম। তাই দেখে সে পাগল করা হাসি হাসত।'

ম্যাক—'সেকি একেবারে পেশাদার মেয়ে?

আমি গর্বের সঙ্গে বললাম—'টেলফেয়ার পরিবার'।

ম্যাক বাধা দিল—'আমি পেশাদার রূপসীর কথা বলছি'।

আমি জবাব দিলাম—'সকলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

ম্যাক—'তার কোন বোন আছে?'

আমি—'একটি।'

ম্যাক—'আর কোন মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?'

আমি—'তা বেশ কয়েকজন আছে।'

ম্যাক—'তাই বল, তোমার কথা শুনে আমার নিজের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। সবই তোমাকে বলব।

আমি ক্ষুব্ধ হলাম, কিন্তু সেটা চেপে গেলাম। এই নীচ লোকের সঙ্গে আমার তুলনা? তাছাড়া আমি তাকে আগেই এক ডলার, দশ সেন্ট দিয়েছি।'

আমার সঙ্গীটি বাইসেপ ফুলিয়ে বলল—'আমার মাংস পেশীটা হাত দিয়ে দেখ।'

দেখলাম—ঢালাই লোহার মত শক্ত।

ম্যাক বলল—'চার বছর আগে পেশাদারী রিং এর বাইরে নিউইয়র্কে যে কোন মুষ্টিযোদ্ধাকে আমি কাত করে ফেলতে পারতাম। তোমার আমার কেস এক। আমি পশ্চিম অঞ্চলের লোক। তবে ঠিকানা দেব না। হাতে খড়ি হয়েছিল দশ বছর বয়সে, কুড়ি বছর বয়সে কোন সৌখীন মুষ্টিযোদ্ধা আমার সঙ্গে চার রাউণ্ড লড়তে পারত না। জীবনে অপেশাদারভাবে অনেক লড়েছি কিন্তু হারিনি।

কিন্তু প্রথম যেদিন পেশাদার মুষ্টি যোদ্ধার সঙ্গে লড়তে গিয়ে রিং এর ভিতর পা রাখলাম সেই দিনই হারলাম। কি করে হল আমি জানি না আমার ধারণা আমি কল্পনাপ্রবণ ছিলাম,

আনুষ্ঠানিক পর্ব এবং প্রচুর লোকজন দেখে স্নায়ু যেন দুর্বল হয়ে পড়ত। রিঙ-এ দাঁড়িয়ে কোন দিন হারিনি। যখনই আমার চোখের সামনে জনতার ভিড় দেখি, পেশাদার যোদ্ধারা দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে তখনই দুর্বল হয়ে যাই।

অচিরেই আমি ছিটকে গেলাম। আমার দুর্বল অনুভূতিই আমার কাল হল।

তারপর সেই কাজটা থেকে ছিটকে যাওয়ার পরে একটা বাতিক আমাকে পেয়ে বসল। শহর ঘুরে ঘুরে যখন তখন যাকে তাকে মেরে দিতে লাগলাম। যে কোন ছুতোয় মারামারি করতে লাগলাম। রিং-এর বাইরে সেই মানুষগুলোকে তুলোধোনা করার যে আত্মবিশ্বাস আমার ছিল সেটা যদি রিঙয়ের ভিতরও থাকত তাহলে আজ আমার গলায় ঝুলত কালো মুক্তো আর রেশমি মোজা।

একদিন সন্ধ্যায় বাওয়ারির কাছে আপন মনে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হাজির হল বস্তীবাড়ির ছয় সাত জন লোক। সকলেই পরে ছিল ঝোলা কোট আর ম্যাটমেটে রেশমি টুপি। তাদেরই একজন ঠেলে রাস্তায় সরিয়ে দিল। তিন দিন পেটে কিছু পড়েনি, 'খুব মজা না!' বলে আমাকে মারল। আমিও শুরু করে দিলাম, তাকে কাত করতে পাঁচ মিনিটও লাগল না।

কয়েকজন তাকে দূরে নিয়ে গিয়ে বাতাস করতে লাগল। আর একজন এসে বলল—'তুমি কি করেছ তা জান?'

'মেরেছি, এই তো? পাঞ্চিং ব্যাগের একটু ভেল্কি দেখালাম'—আমি বললাম।

সে বলল—'দেখ ভাই, তুমি কে খুব জানতে ইচ্ছা করছে। যাকে তুমি মাটিতে ফেলে দিলে সে বিশ্বের মিডল ওয়েট চ্যাম্পিয়ন—রেডডি বার্নস। জিম্ জেফ্রিস এর সঙ্গে একটা ম্যাচ খেলতে গতকালই নিউইয়র্ক থেকে এসেছে। তুমি যদি—'

কিন্তু আমার ঘোর কেটে গেলে দেখি একটা ওষুধের দোকানে শুয়ে আছি। আমি যদি জানতাম সে পেশাদার তবে কখনো সামনা সামনি যেতাম না।

শেষে ম্যাক বলল—"এ সবই অতি কল্পনার কারসাজি। তাই বলছিলাম তোমার ও আমার এক কেস। পেশাদারদের সঙ্গে কখনো তুমি পারবে না, তোমার স্থান এই পার্কের বেঞ্চে।"

ম্যাক কর্কশ গলায় হাসতে লাগল।

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম—'আমি কিন্তু কোন মিল দেখতে পাচ্ছিনা। বড় মাপের রিঙ-এর সঙ্গে পরিচয় অতি সামান্য।'

সে তবু বলল—'যতই যা বল, তুমিও আমার মত হারবে।'

আমি—'তুমি কেন ভাবছ যে আমি হারব?'

সে—'কারণ তুমি রিঙ-এ যেতেই ভয় পাও। তোমার সাহসই নেই।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম—'এবার আমাকে যেতে হবে।'

আমি দশ ফুট দূরে যাবার পরে বেঞ্চির লোকটা আমাকে ডেকে বলল—'ডলারটার জন্য খুবই বাধিত হলাম আর ডাইমের জন্যও। কিন্তু তুমি কোনদিন জয়ী হবে না।'

আমি নিজেকে বললাম—'যেমন একটা ভবঘুরের সঙ্গে আলাপ করতে গেছিলে তেমনই তার ফল পেলে। অপরিণামদর্শী।'

হাঁটতে হাঁটতে তার কথাগুলো মাথায় বাজতে লাগল। মনে হল লোকটার উপর আমার রাগ হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আমি গলা ছেড়ে বলে উঠলাম—"আমি তাকে দেখিয়ে দেব, দেখিয়ে দেব যে রেড্‌ডি বার্নস এর সঙ্গে আমি লড়তে পারি।'

তাড়াতাড়ি টেলিফোন বুথে গিয়ে টেলফেয়ার ভবনে ফোন করলাম।

মিষ্টি গলায় জবাব এল। স্বরটা চেনা মনে হতে হাতটা কাঁপতে লাগল।

গতানুগতিক ভাবে বললাম—'আরে তুমি?'

নীচু স্পষ্ট গলায় জবাব এল—'হ্যাঁ আমি, আপনি কে বলুন তো?

আমি বললাম—'আমি! কয়েকটা কথা তোমাকে সোজাসুজি বলতে চাই।'

কণ্ঠস্বর বলল—'কী আশ্চর্য। তুমি মিঃ আর্ডেন।'

আমি বললাম—'হ্যাঁ সেই রকমই আশা করছি। এবার আসল কথায় আসি, তুমি তো জান তোমাকে ভালবাসি। এ ব্যাপারে আমি আর বোকা হয়ে থাকতে চাই না। মানে বলতে চাই যে এখনই তোমার কাছ থেকে একটা জবাব চাই। তুমি আমাকে বিয়ে করবে না করবে না? দয়া করে ফোনটা রেখ না। বল করবে কি করবে না?'

থুতনির উপর একটা 'আপারকাট' পড়ল। জবাব এল—'সে কি, ফিল, প্রিয়, অবশ্যই করব। আমি জানতাম না মানে তুমি কখনও বলনি। দয়া করে বাড়িতে চলে এস ফোনে কিছু বলা যাবে না। তুমি বড় নাছোড়বান্দা। দয়া করে বাড়িতে চলে এস। আসছ তো?'

টেলফেয়ার ভবনের ঘন্টাটা বাজালাম। একজন আমাকে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেল।

সিলিং এর দিকে তাকিয়ে বললাম—'প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রত্যেকে কিছু শিখতে পারে। ম্যাক-এর দার্শনিক তত্ত্বটা বেশ ভাল। নিজের অভিজ্ঞতার সুযোগ নেয়নি কিন্তু সুফলটা আমি পেলাম। তুমি যদি পেশাদারী দলে যেতে চাও তাহলে আমাকে—আমার চিন্তা থেমে গেল কার পায়ের আওয়াজে। আমার হাঁটু দুটো কাঁপতে লাগল। বুঝতে পারলাম একজন পেশাদার যখন রিঙে ঢুকত তখন ম্যাকের অবস্থা কি হত। পালিয়ে বাঁচার মত একটা রাস্তা খুঁজতে লাগলাম। অন্য কোন মেয়ের ব্যাপারে হলে আমি হয়ত—

কিন্তু ঠিক তখনই দরজাটা খুলে মিলড্রেড এর ছোট বোন বেস ঘরে ঢুকল। আগে কখনও পরীর মত সুন্দরী দেখিনি। পায়ে হেঁটে সে আমার দিকে এগিয়ে এল, আর—

আগে কখনও লক্ষ্য করিনি এলিজাবেথ টেলফেয়ার-এর দুটি চোখ ও চুল আশ্চর্য সুন্দর।

টেলফেয়ারসুলভ মিষ্টি সুরে বলল—'ফিল তুমি আগে কেন কথাটা আমাকে বলনি। কয়েক মিনিট আগে টেলিফোন করার আগে পর্যন্ত ভেবেছি এতদিন তুমি দিদিকে চেয়েছ।

আমার মনে হয় ম্যাক ও আমি চিরকাল হতাশ থেকে যাব। কিন্তু ব্যাপারটা ঘুরে যেতে আমি খুব খুশী হলাম।

* The Higher Pragmation

নরকের আগুন

কয়েকজন সম্পাদক আছেন যাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সৌভাগ্য হয়েছে। ইদানি তাঁরাও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এ দুইয়ের মধ্যে একটা তফাৎ আছে। তাঁরাই আমাকে বলেছেন যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি তাঁদের কাছে জমা পড়ে তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লেখক ঘোষণা করেন যে গল্পে বর্ণিত ঘটনাগুলি আসলে সত্য ঘটনা। সেই সব লেখার গন্তব্যস্থল কোথায় হবে সেটা নির্ভর করে লেখার সঙ্গে পাঠান ডাকটিকিট এর উপর। কতগুলো ফেরত পাঠানো হয় আর বাকিগুলো ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় একটা ওল্টানো মূর্তির এক জোড়া রবারের জুতোর মধ্যে অথবা বাজে কাগজের ঝুড়ির মধ্যে।

সত্য ঘটনা নিয়ে লিখিত গল্প সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক করে দেবার জন্যই এটি লেখা হল। গল্পটা এবার সোজাসুজি বলতে হবে। একটা বড় শহরের সাহিত্য জীবন নিয়েই গল্পটা লেখা হয়েছে। 'গস্‌পোর্ট ইশু' এর বসবাসকারী প্রত্যেক লেখকই এই গল্পটি সম্পর্কে আগ্রহী হবেন।

এই পত্রিকাটির ডেস্কে একটি গল্পের পাণ্ডুলিপি এসেছে যার শুরুটা এই রকম—মনোনয়ন পাবার পরে আদালত ঘরটা যখন সোল্লাসে চীৎকারে মুখরিত হয়ে চলেছে তার মধ্যেই স্বীয় দলবদলের করতালিধ্বনিতে অভিনন্দনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসে হাউউড ছুটে গেলেন বিচারক ক্রেমওয়েল-এর বাড়িতে তার খোঁজে।

পেটিট আলাবামা থেকে আগত একজন উপন্যাস লেখক। দক্ষিণী পত্রিকাগুলি আটটি গল্প ছেপেছে, তাতে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছে যে লেখক "আমাদের আগের কাউন্টি এটর্নি এবং লুক-আউট পর্বতের ধারে যোদ্ধা মেজর পেটিংগিল পেটিট-এর পুত্র।"

পেটিট লোকটি লাজুক ও কড়া ধাতের হলেও আমার প্রিয় বন্ধু। ছোট শহর হোসিয়াতে তার বাবার একটা দোকান ছিল। পেটিট কিন্তু বনে জঙ্গলে ঘুরে ফিরেই বড় হয়েছে। তার হাতের থলির মধ্যে ছিল দুটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি যার বিষয়বস্তু, ১৩২৯ সালের ভাইকোঁত দ মঁত্রেপের" গ্যান্টন লাবুলায়ে নামে জনৈক ভদ্রলোকের পিকার্ডি অভিযান। এটা কিছুই না। যেদিন একটি মানুষ ও তার খোঁড়া কুকুরকে নিয়ে লেখা একটা ছোট স্কেচবাজার মাতিয়ে দেয় তখন সম্পাদক তার অন্য একটা লেখা ছাপিয়ে দেন আর সেই লেখা নিয়ে হৈচৈ পড়ে যায়। ১.২৫ ডলার দিয়ে সেই বই একখানা করে কিনে নিই আমরা।

পেটিটকে আমি এমন একখানা বাড়ীতে এনে তুললাম যার উল্লেখ থাকবে একদিন 'প্রাচীন নিউইয়র্ক সাহিত্যের' দর্শনীয় মূল প্রবন্ধে। বাবার দোকানের পয়সাতেই সে একটা ঘর ভাড়া নিল। আমি শহরটা ঘুরিয়ে দেখালাম, সে কিন্তু কোন তুলনামূলক আলোচনায় গেল না। কাজেই আমি তাকে পরীক্ষা করার জন্য বললাম—'ধর, ব্রুকলিন সেতু থেকে নিউইয়র্ক শহরটাকে কেমন দেখায় সে সম্পর্কে তোমার প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত একটা বিস্তারিত প্রতিবেদন লিখতে বললে। নতুন কি তুমি বলবে—"

পেটিট উত্তর দিল—'বোকার মত কথা বল না। আগে চল একটু বীয়ার খেয়ে নি। এই শহরটাকে আমার ভালই লেগেছে।'

আমরা এক আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠলাম। প্রতিদিন আমরা শ্বেত পাথর, কাঁচ টালির কারুকার্য করা সেই সব প্রাসাদে হানা দিতে লাগলাম যেখানে সর্বক্ষণ শুনতে পাবেন জীবনের শব্দ বহুল মহাকাব্য। শিল্প ও শব্দের এক বিরাট ও সার্থক সংমিশ্রণ। এক কান ফাটানো সমুজ্জ্বল শোভাযাত্রা। এখানে দশ সেন্ট দিলেই বীন্‌স্‌ পাওয়া যায়। আমরা অবাক হ্‌তাম এই ভেবে যে কেন সহকর্মী শিল্পীরা বোহেমিয়ান রেস্টুরেন্টের ছোট বাজে টেবিলে বসে ডিনার খায়। আর ভয় পেতাম পাছে তারা এই আড্ডাটার খোঁজ পেয়ে যায়।

পেটিট অনেক গল্প লিখলেও সম্পাদকরা সেগুলি ফেরত পাঠাল কারণ তারা প্রেমের গল্প চায়। তাদের বক্তব্য মেয়েরা প্রেমের গল্পই পড়ে। পেটিট প্রেমের গল্প লিখলেও আমি কোনদিন লিখিনি।

প্রেমের গল্প পড়ার ব্যাপারে সম্পাদকের ধারণা ভুল। মেয়েরা পড়ে পোকার খেলা মার্কা গল্প আর কাঁকুড়ের তেলের প্রস্তুত প্রণালী। গল্পগুলির পাঠককূল পেট মোটা চুরুট টানা বুড়োরা ও ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা। সম্পাদকের মতামত নিয়ে সমালোচনা করছি না। তাঁরা বেশীর ভাগই ভাল মানুষ। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব মতামত ও রুচি থাকে। এক পত্রিকার দুই যুগ্ম সম্পাদককে আমি চিনতাম যারা প্রায় সব বিষয়েই একমত ছিলেন অথচ একজন ফ্লবের ভক্ত, অন্যজন জিনের।

পেটিটের যে গল্পগুলি ফেরত আসত সেগুলি পড়ে বুঝতে চেষ্টা করতাম কেন নির্বাচিত হয়নি। তবে আমার গল্পগুলো বেশ ভাল লাগত। লেখার স্টাইলও ভাল। তাই পুরো লেখাটাই শেষ করে ফেলতাম।

গল্পগুলির গঠনভঙ্গী ও ঘটনাবলী সুবিন্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও জীবনের স্পর্শ নেই। তাই আমি তাকে বললাম বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হয়ে লেখা উচিত।

পেটিট বলল, গত সপ্তাহে যে গল্পটা বিক্রি হল তাতে একটা বন্দুকের লড়াই প্রসঙ্গে লেখা ছিল যে খনি শহর এরিজোনায় গল্পের নায়ক তার ·৪৫ কোল্ট দিয়ে সাতটা ডাকাতকে দরজার কাছে খুন করল। এখন একটা ছয় ঘড়া পিস্তল হলে—"

আমি বললাম—"সেটা তো আলাদা ব্যাপার। এরিজোনা নিউইয়র্ক থেকে বহু দূরের পথ সেখানকার ব্যাপারে যা খুশী লেখা যায় কিন্তু এটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, প্রেম ভালবাসার ব্যাপার। এর রূপ সবজায়গায় এক। একটা আজগুবি ছবির বর্ণনা দিয়ে সম্পাদককে বোকা বানান যায়, কিন্তু ভালবাসার গল্পে গরুকে গাছে চড়ান যায় না। অতএব আগে প্রেমে পড় তারপর আসল প্রেমের গল্প লিখতে চেষ্টা কর।"

পেটিট তাই করেছিল। তবে সে কি আমার পরামর্শমত কাজ করেছিল না হঠাৎ ভালবাসার শিকার হয়েছিল আমি জানতে পারিনি।

স্টুডিয়োতেই একটা ভাল দেখতে দিলখোলা স্বভাবের মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। নিউ ইয়র্কের মেয়েরা এমন ভাবে এড়িয়ে যাবে যে বুঝতেই দেবে না।

পেটিটের ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। সে ভেঙে গেল। এতদিনের বেদনা, অন্তরের জ্বালা, সন্দেহ বাতিক প্রেমিকের মন যা সে এমনিই এতকাল লিখেছে তাই আজ জীবনে সত্য হয়ে উঠল। শাইলকের চেয়ে কামদেব পেটিটের কাছ থেকে বেশী সূদ আদায় করল।

একদিন রাত্রে মলিন চেহারা ছন্নছাড়া ভাব অথচ উল্লসিত মন নিয়ে আমার কাছে এল। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলল—'মনে হচ্ছে আজ রাতে সেই গল্পটা আমি লিখতে পারব—জান তো সর্বজয়ী গল্পটা। ব্যাপারটা আমি অনুভব করছি তবে ফুটিয়ে তুলতে পারব কিনা জানি না।

তাকে ঠেলে পাঠিয়ে বললাম—'নিজের ঘরে গিয়ে লিখে ফেল, নইলে আমিই তোমাকে শেষ করে দেব। রাতের মধ্যে লেখা শেষ করে সেটাকে দরজার নীচে রেখে যাও। কালকের জন্য অপেক্ষা কোর না।"

রাত্রিবেলা আমার প্রিয় লেখক মন্তেন পড়ছিলাম, এমন সময় মড়মড় আওয়াজ, দেখি গল্পের পাতা।

পড়তে পড়তে শুনতে পেলাম হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক ঘুঘু-র ডাক, গাধার কর্কশ স্বর, চড়ুইয়ের কিচির মিচির, 'এযে বেদনাহত সাফো!' আমি চিৎকার করে উঠলাম। একি সেই স্বর্গীয় দীপ্তি যা প্রতিভাকে উজ্জ্বল করে ও কার্যকর ও জীবিকা অর্জনের উপায় করে তোলে।

গল্পটা অর্থহীন প্রলাপ, আবেগ সর্বস্ব, আর আত্মম্ভিরতায় ভরা। গল্প রচনার যে কৌশল পেটিটের আয়ত্তাধীন ছিল তার চিহ্নমাত্র নেই।

সকালে পেটিট আমার ঘরে আসতেই নির্দয়ভাবে রায়টা জানিয়ে দিলাম। সে হাসতে লাগল বোকার মত।

তারপর খুশি মনেই বলে উঠল, 'ঠিক আছে দোস্ত, চুরুটের আগুন দিয়ে ওগুলো পুরিয়ে ফেল। তাতে কি হবে? আজই আমি মেয়েটিকে নিয়ে লাঞ্চ খেতে যাচ্ছি "ক্লারে মত"-এ।

মাসখানেক পর একদিন পেটিট হাজির হল উদ্‌ভ্রান্তের মত। সে আবোল তাবোল বকতে লাগল, তাকে সহজ করে তুলতে আমার সারা বিকেল চলে গেল। বাইরে গিয়ে প্রয়োজনমত হুইস্কি খাইয়ে বললাম—'এই তোমার সত্য ঘটনা! এভাবে লিখলে কপালে অনেক দুঃখ আছে।' দুই সপ্তাহ ধরে হুইস্কি ও ওমর খৈয়াম তাকে পেটে পুরে দিলাম, আর শোনালাম নারী সৌন্দর্যের গোপন কথা।

এবার সে আরও গল্প লিখতে লাগল। লেখাটা হয়ে উঠল সাবলীল ও বেশ ভাল। এর পরেই তৃতীয় অঙ্কের শুরু।

নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে আসা একটি ছোট শান্ত মেয়ে পেটিটের প্রেমে ডুবে গেল। মেয়েটি পড়াশুনো করছিল, বিষয় ব্যাবহারিক নক্সা। পেটিটেরও তাকে ভাল লাগায় তাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। মেয়েটি তাকে ঠাকুরের মত পূজা করত আবার বিরক্ত করত মাঝে মাঝে। ব্যাপারটা চরমে উঠল মেয়েটি আত্মহত্যার চেষ্টা করাতে। মেয়েটির অনুরাগের গভীরতা আমাকেও বিচলিত করে তুলল। তার ভালবাসার ছোঁয়ায় বাড়ী ঘর, বন্ধু, বান্ধব, প্রথা বিশ্বাস সব কিছুই উড়ে গেল।

একদিন রাত্রে পেটিট আমার ঘরে ঢুকে বলল যে তার যেন মনে হচ্ছে সে এবার একটা বড় মাপের গল্প লিখতে পারবে। আমিও আগের মতই তাকে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়তে বললাম। রাত একটার সময় দরজার তলায় এল কয়েকটা পাতা।

গল্পটা পড়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। পেটিট এক অপূর্ব গল্প লিখেছে। মনে হল যেন রক্তের আখড়ে নারী হৃদয়ের কথা ফুটে উঠেছে প্রতিটি পংক্তিতে। আমি পেটিটের ঘরে ঢুকে তাকে অভিনন্দন জানালাম কিন্তু সে তখন ঘুমের রাজ্যে ফেরত যেতে চাইছে।

সকালে তাকে নিয়ে এলাম সম্পাদকের কাছে। গল্পটি পড়ে পেটিটের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সম্পাদক মহাশয়। পেটিট লাভ করল সোনার পদক, জয়ের মালা উপার্জনের নিরাপত্তা।

পেটিট মিটি মিটি হাসছে। তাকে মনে মনে ডাকলাম 'ভদ্রলোক' বলে। ছাপার অক্ষরে বাজে লাগলেও শুনতে বেশ ভালই লাগে কথাটা।

গল্পটাকে চেয়ে নিয়ে পেটিট সেটাকে ছিঁড়ে ফেলে বলল—'এবার আমি খেলাটাকে ধরতে পেরেছি কালি দিয়ে লিখলে হবে না, নিজের বুকের রক্ত দিয়েও নয়। লিখতে হবে অন্য কারও বুকের রক্ত দিয়ে। শিল্পী হবার আগে হতে হবে অমানুষ। তার থেকে বুঝলে দোস্ত্ আমার এলবাম ও দোকানই ভাল।

পেটিট ডিপোতে চলে গেল। আমিও শেষ চেষ্টা করার জন্য বললাম—"শেক্সপীয়রের সনেট, গুলো?"

পেটিট—'অমানুষ। তারা তোমাদের হাতে তুলে দেয় আর তোমরা বিক্রি কর। কি? না-প্রেম ভালবাসা। এর থেকে আমি বাবার জন্য লাঙল বিক্রি করব সেও আচ্ছা।'

আমি প্রতিবাদ করে বললাম—'কিন্তু তুমি তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের রায়কেই পাল্টে দিচ্ছ।'

পেটিট বলল—'বিদায় দোস্ত্'।

আমি তাও বললাম—'আমি সমালোচকদের কথাই বলতে চাইছি। কিন্তু তুমিই বল, একজন ভাল বিক্রেতা ও হিসাবরক্ষককে দিয়ে মেজরের কাজ চলবে তো? সেটাই আমাকে জানাবে, জানাবে তো?

* The Plutonian Fire

বিলির মুক্তি

প্রাচীন, বহু প্রাচীন চতুষ্কোন থামযুক্ত একটা প্রাসাদ। ঘরের জানলার পাল্লাগুলো বাঁকা বাঁকা, দেওয়ালের রঙ বিবর্ণ। সেই প্রাসাদে বাস করতেন শেষ সামরিক রাজ্যচালকদের অন্যতম এক বৃদ্ধ।

সেকালের মহাযুদ্ধের শত্রুতার কথা দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষেরা ভুলে গেছে কিন্তু ভুলতে পারেনি সেকালের অতীত ঐতিহ্য ও তার প্রতিনিধিদের কথা। 'রাজ্যপাল পেম্বার্টন'- এর (এখনও লোকে ঐ নামেই ডাকে) মধ্যেই এলম শহরের মানুষরা দেখতে পায় তাদের রাজ্যের প্রাচীন মহত্ত্ব ও গৌরবকে। তাঁর সময় সবদেশের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন বড় মাপের মানুষ। তাঁর রাজ্য সব রকম সম্মানে তাঁকে ভূষিত করেছে। আর আজ ; তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন,

জন জীবনের খরস্রোতে বাইরে যথা যোগ্য শান্তিতে দিন কাটাচ্ছেন। আজও শহরের মানুষরা তাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে।

এলম শহরের প্রধান রাজপথের উপর ভেঙে পড়া প্রাচীরের কয়েক ফুট পরেই দাঁড়িয়ে আছে রাজ্যপালের ধংসোম্মুখ 'প্রসাদ'। প্রতিদিন সকালে বাতগ্রস্থ বৃদ্ধ রাজ্যপাল আস্তে আস্তে পা ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নামেন, তারপর ইটের উঁচু নীচু গলিপথ দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করেন, সোনার হাতলওয়ালা বেতের লাঠির শব্দ করে। তাঁর বয়স এখন আটাত্তর বছর প্রায়। কিন্তু এই বয়সেও চেহরাটা সুঠাম ও সুন্দর। মাথার লম্বা চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, ঝুলে পড়া গোঁফ জোড়া বরফ সাদা। মাথায় উঁচু রেশমি টুপি। গায়ে ফ্রককোটের বোতামগুলো সুচারুভাবে আটকান। প্রায় সব সময় হাতে দস্তানা। চালচলন কেতাদুরস্ত, অতি সৌজন্যে কিছুটা মাত্রাতিরিক্ত।

প্রধান রাজপথ লী এভেনিউ পর্যন্ত রাজ্যপালের চলার পথটা কালক্রমে একটা স্মরণীয় বিজয় গৌরবময় শোভাযাত্রায় পরিণত হয়েছে। সবাই সসম্মানে রাজ্যপালকে অভিবাদন করে। মাথার টুপি খুলে সম্মান দেখায়। তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্মান যারা লাভ করেছে তাঁরা করমর্দন করে। তারপর শুরু দক্ষিনী সৌজন্য বিনিময়ের আদর্শ প্রদর্শনী।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে দ্বিতীয় স্কোয়ার পর্যন্ত হেঁটে রাজ্যপাল একটু দাঁড়ান। সেখানে চাষীদের কয়েকটি মাল-গাড়ি, কোন ফেরিওলার একটা কি দুটো গাড়ির কিছুটা ভিড় হয়। এই চৌমাথায় ফার্স্ট ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক আছে। জেনারেল ডেফেনবাউয়ের শ্যেন দৃষ্টিতে পরিস্থিতি ধরা পরতেই ব্যাঙ্কের অফিস থেকে বেড়িয়ে আসেন পুরনো বন্ধুকে সাহায্য করতে।

যখন দুজনে কুশল বিনিময় করে তখনই বিসদৃশভাবে ধরা পড়ে আধুনিক চাল চলনের ত্রুটি বিচ্যুতি। জেনারেলের বিশাল দেহটি খুব বেশি নীচের দিকে ঝুকে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপালের বাতের ব্যাথাটাও যেন উধাও হয়ে যায়। জেনারেলের হাত ধরে নিরাপদে রাস্তাটা পার হয়ে যান। এইভাবে বন্ধুর তত্ত্বাবধানে ডাকঘর পর্যন্ত গিয়ে মহামান্য কূটনীতিক আবার একপ্রস্থ আড্ডা জমান সকালের ডাক নিতে আসা লোকেদের সঙ্গে। সেখানে থেকে আইন, রাজনীতি ও বংশকৌলিন্যে প্রতিষ্ঠিত দু তিন জন বিশিষ্ট নাগরিককে সঙ্গে নিয়ে তিনি রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে এভেনিউ ধরে হেঁটে প্যালেস হোটেলের সামনে দাঁড়ান। হোটেলের অতিথি তালিকায় যদি কোন নবাগত থাকে যারা রাজ্যের এই সম্মানিত ও বিখ্যাত সন্তানটির সঙ্গে পরিচিত হবার মত যোগ্যতার অধিকারী, তাহলে সেখানেই হয়তো আরও দু এক ঘন্টা সময় কেটে যাবে রাজ্যপালের দীর্ঘ বিস্মৃত শাসনকালের স্মৃতি রোমন্থনে।

সেখান থেকে ঘোরার পথে জেনারেল প্রস্তাব করবেন মিঃ এপলবি আর ফেল্ট্রেস-এর দোকান ড্রাগ এম্পোরিয়াম-এ।

মিঃ এপলবি আর ফেল্ট্রেস একজন ক্লান্তিহরণ বিশেষজ্ঞ। ওষুধের ফর্মুলাটা জানা, দক্ষ হাতে তৈরী করে গ্লাসটা রাজ্যপালেব হাতে তুলে দেন।

এই মিশ্রণটি পরিবেশনের ব্যাপারে কোন দিন এতটুকু হেরফের ঘটে না। প্রথমে দুটি মিশ্রণ তৈরী করে দেন রাজ্যপালের হাতে অপরটি জেনারেলের হাতে। এরপর শুরু হয় রাজ্যপালের ক্ষীণ কম্পিত কণ্ঠে বক্তৃতা।

না মহাশয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি নিজের জন্যও তৈরী করছেন ততক্ষণ আমরা এক ফোঁটাও দেব না মিঃ ফর্ল্ট্রেস। আরে মশায় আমার শাসনকালে আপনার পিতৃদেব ছিলেন

আমার সমর্থক ও বন্ধুদের একজন। অতএব তার ছেলেকে শ্রদ্ধা জানানোটা কেবল খুশীর ব্যাপার নয়, কর্তব্যও।

এই রাজকীয় উদারতায় খুশী হয়ে ওষুধের দোকানী রাজী হলেন, পানীয় মুখে তোলার আগে বললেন — ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের মহান প্রাচীন রাজ্যের সমৃদ্ধির মাঝে রাজ্যের গৌরবময় অতীতকে স্মরণ করে—তার প্রিয় সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য।

পুরনো রক্ষী বাহিনীর কেউ না কেউ রাজ্যপালকে বাড়িতে পৌঁছে দিত। কোন দিন যদি নিজের কাজকর্মে আটকে যান তো সেদিন বিচারক ব্রমফিল্ড যা কর্ণেল টাইটাস বা অন্য কেউ এসে কাজটা করে দিত।

রাজ্যপালের প্রাতঃকালীন ভ্রমণের এই হল ইতিবৃত্ত। কিন্তু তিনি যখন প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন, জেনারেল আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতেন এই শুভ্রকেশ প্রতিনিধিকে - তখন সে দৃশ্যটি আরও কত বেশী আশ্চর্যজনক, আকর্ষনীয় ও দর্শনীয় হত।

জেনারেল ডেফেনবাউ এলম শহরের বালী স্বরূপ। অনেকে বলে তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ এলম শহর। এক কথায় মুখপাত্র হিসেবে তিনি অপ্রতিদ্বন্দী। ডেইলি ব্যাশর পত্রিকার এত শেয়ার তার কেনা ছিল যে সেটি তাঁর কথামত চলত। ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্কেরও তাই। আর খোলা ভোজ সভার, বিদ্যালয়ের উদ্বোধনে এবং সাজসজ্জা দিবসে যুদ্ধের কৃতিত্ব তাঁকে এনে দিয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বীহীন প্রথম স্থানটি। এসব ছাড়াও তাঁর অনেক দান খয়রাত ছিল। ব্যক্তিত্ব ছিল উৎসাহ ও বিজয়বর্ধক। বিতর্কাতীত প্রভুত্ব করে তুলেছিল তাকে রোমক সম্রাটের সমতুল। কণ্ঠস্বর ছিল শঙ্খের মত। সব থেকে বড় জিনিষ তাঁর উদার হৃদয়। সত্যি, জেনারেল ডেফেনবাউ ছিল সাক্ষাৎ এলম্ শহর।

রাজ্যপালের প্রাতঃকালীন ভ্রমণের একটা ছোট ঘটনা অনুল্লেখ রয়ে গেছে। ভ্রমণের সময় এভেনিউর উপর অবস্থিত একটা ছোট বাড়ির অফিস ঘরের সামনে একবার থেমে যেতেন। বাড়ির সামনে কয়েক ধাপ কাঠের সিঁড়ি, ঘরের দরজায় সাধারণ টিনের ফলকে লেখা ছিল 'উইলিয়াম বে. পেস্বার্টন' এটর্নি-অ্যাট-ল'।

ভিতরের দিকে তাকিয়ে জেনারেল গর্জন করে বলতেন, 'ওহে বিলি, বাছা আমার' রাজ্যপালও হাঁক দিতেন — 'গুড মর্নিং উইলিয়াম'।

তখন এক ধৈর্যশীল আধপাকা চুলের ছোট মানুষ নেমে এসে সকলের সঙ্গে করমর্দন করত।

আলাপ পরিচয় শেষ হলে আবার তিনি টেবিলে ফিরে যান।

বোঝা যায় বিলি একজন আইন ব্যবসায়ী। সব দিক থেকেই বাপকা বেটা। এই গর্তের ভিতর থেকে উপরে ওঠার চেষ্টা অনেক দিন ধরে করছে। বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্য অন্য অনেক ছেলের থেকে ভালভাবে পালন করেছে। সেই সঙ্গে আশাও পোষণ করেছে যে নিজের কাজকর্ম ও যোগ্যতা দিয়ে সে সমাজে পরিচিত হবে।

বহু বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তার পরিচিত ছড়িয়ে পড়েছে একজন আইনজ্ঞ হিসাবে। দুবার ওয়াশিংটনের সর্বোচ্চ আদালতে গেছে এবং তীক্ষ্ণ যুক্তি ও পাণ্ডিত্য দিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। আইন ব্যবসা থেকে তার উপার্জন ক্রমে বেড়েছে। বাবাকে সঙ্গে নিয়ে তাদের প্রাচীন পারিবরিক প্রাসাদে সে বাস করছে (যতই জরাজীর্ণ হোক বাড়ি

ছেড়ে যাবে না) পুরনো দিনের বহুল ব্যায় সাপেক্ষ আরাম ও বিলাসের মধ্যেই। এই শহরে তবু আজও রয়ে গেছে আমাদের বিশিষ্ট সম্মনিত নাগরিক 'প্রাক্তন রাজ্যপাল পেম্বার্টন' এর ছেলে বিলি পের্ম্বাটন। সে যখন মাঝে মধ্যে জনসভায় বক্তৃতা করে তখনও থেমে থেমে এই পরিচয়টাই ঘোষণা করা হয়। কোন আগন্তুকের কাছে এমনকি আদালতের কাজে আগত আইনজীবীদের কাছেও তার পরিচয় এই ভাবেই দেওয়া হয়। 'ডেইলি ব্যানার' পত্রিকাতেও তার এই পরিচয় ছাপা হয়। 'অমুকের পুত্র' হওয়াই বিড়ম্বনা। জীবনে তার যত কৃতিত্ব ও প্রতিষ্ঠা সেসব কিছু বলি দিতে হয়েছে পিতৃ পরিচয়ের বেদিমূলে।

বিলির উচ্চাকাঙ্খার বৈশিষ্ট্য ও সব থেকে দঃখের বিষয় এই যে এলম শহরটাকে জয় করাই ছিল তার বাসনা। আত্মবিশ্বাসের অভাব, আত্ম-গুণকীর্তনের অক্ষমতা ছিল। জাতীয় অথবা রাজ্য স্তরের সম্মান তাকে পীড়িত করত। সব কিছু দূরে ঠেলে দিয়ে তার মন চাইত বাল্যকালের বন্ধুদের কাছে প্রশংসা পেতে তার বাবার গলায় যত ফুলের মালা পরান হয়েছে তার থেকে একটা পাপড়িও সে কোন দিন ছিঁড়তে চায়নি। গাছের শুকনো ফুল পাতা দিয়েই যে প্রাপ্য মালাগুলি গাঁথা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু তার চাপা আক্রোশ সত্ত্বেও এলম শহরটা চিরকাল তাকে বিলি ও ছেলে বানিয়েই রেখেছে। শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে জনতার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে ডুবে গেছে পুঁথিপত্রের মধ্যে।

একদিন সকালে বিলি ডাকে একটা চিঠি পেল কোন এক উপর মহল থেকে। আমাদের দেশের কোন এক দ্বীপময় উপনিবেশের গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় পদে তাকে নিয়োগ করা হয়েছে। সম্মানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই পদটির জন্য একজন যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করতে গোটা জাতিই একমত হয়েছে যে এই পদে একমাত্র তাঁকেই নিয়োগ করা হবে যিনি চরিত্রে, শিক্ষাদীক্ষায়, মানসিক ভারসাম্যের বিচার সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবেন।

এলম্ শহরে বিলির জয়জয়কার পড়ে গেল। ছেলের এই যোগ্য সম্মনের জন্য আমরা অভিবাদন জানাই রাজ্যপাল পেম্বার্টনকে — পুত্রের এই সাফাল্যে পেম্বার্টনের সঙ্গে গোটা এলম্ শহরই আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। 'জজ সাহেব বিলি পেম্বার্টন স্যার, আমাদের রাজ্যের অনেক যুদ্ধের সাহসী নায়ক ও জনগণের গর্ব রাজ্যপালের পুত্র তিনি' - লোকের মুখে মুখে আর সংবাদ পত্রের পাতায় পাতায় এই বার্তা ছাড়াতে লাগল।

বাবাকে নিয়ে বিলি তাদের পুরনো প্রাসাদেই বাস করত। এই দুজন ও আর একটি বর্ষীয়সী মহিলা—এই তিনজনকে নিয়েই সংসার। রাজ্যপালের খানসামাকেও ধরা উচিত। বুড়ো জেফ। সে বাড়িতে আরও চাকর ছিল স্যার টমাস জেফার্সন, পেম্বার্টন ঐ পরিবারের একজন।

জেফই এল্‌ম্ শহরের একমাত্র লোক যে বিলিকে জানাল পিতৃপরিচয়ের খাদ না মেশানো স্বীকৃতি। আর চোখে 'মার্স উইলিয়াম' টালবট জেলার শ্রেষ্ঠ সন্তান। যদিও সে সাবেক কালের প্রতি বিশ্বস্ত তবু তার মন প্রাণ বিলির নামে নিবেদিত। সে এক নায়কের খাস চাকর, পবিবারের একজন কাজেই সঠিক বিচারের সুযোগ তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব।

বিলি খবরটা প্রথমে জানাল জেফকে। 'এবার কি হল!' বুড়ো লোকটি বলল, 'এরকম ডাক আসবে আমি আগে জানতাম। ঐ ইয়াংকিরা তোমায় জজসাহেব করেছে তাই না? আচ্ছা মার্স উইলিয়াম তুমি কি ঐ ফিলিপিনদের দেশে চলে যাবে, না কি এখান থেকেই বিচার করবে?'

অবশ্যই বেশির ভাগ সময় থাকতে হবে।

জেফ এবার একটু ভেবে বলল— জানিনা এ ব্যপারে গভর্ণর কি বলবেন।

বিলিও ভাবনায় পড়ে গেল। সান্ধ্য আহারের সময় অভ্যাসমত দুজনে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসল। রাজ্যপাল মাটির পাইপ ধরালেন। বিলি চুরুট। ছেলে নতুন চাকরির কথা জানাল।

রাজ্যপাল একমনে পাইপ টানতে লাগলেন, বিলি খুশী মনে দোল খেতে লাগল দোলনায়, আবেদন না করেও এতবড় চাকরী পেয়েছে।

অবশেষে মুখ খুললেন— তার কথাগুলি অবান্তর মনে হলেও ঠিকই বললেন। কাঁপা কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হল শহীদের সুর।

"দেখ উইলিয়াম, গত কয়েক মাস ধরে আমার বাতের ব্যাথাটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে"।

— 'আমি দুঃখিত বাবা'।

—'আমার বয়স প্রায় আটাত্তর। বুড়ো হয়েছি। আমার শাসনকালে যে সব লোকের নাম শোনা যেত তাদের মধ্যে দু তিন জনের নাম মনে আছে। তোমার জন্য যে চাকরীটা এসেছে সেটা কি ধরণের উইলিয়াম?'

— 'যুক্তরাষ্ট্রের বিচারকের পদ, আমার মতে বেশ লোভনীয় চাকরী। চাকরীটা রাজনীতির বাইরে, আর এর মধ্যে কোন দলবাজীও নেই।'

— 'তাতে কোন সন্দেহ নেই। পেম্বার্টন বংশের কেউ কোন দিন এই পদে অধিষ্ঠিত হয়নি। তোমার মায়ের বংশের দু একজন আইন বিভাগ ছিলেন। তুমি কি চাকরীটা নেবে স্থির করেছে?

— 'আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি'।

— 'তুমি বেশ ভাল ছেলে ছিলে।'

বিলি মুখ কালো করে বলল -- 'সারা জীবন তো তোমার ছেলে হয়ে আছি।'

প্রশংসার ছোঁয়া দিয়ে বললেন—'তোমার মত একটি জ্ঞানী ছেলের জন্য অভিনন্দিত হই বলে অনেক সময় আমি কিছুটা শান্তি পেয়ে থাকি। বিশেষ করে এই শহরের লোকরা তাদের কথাবার্তায় তোমার নামের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে ফেলে।'

—'একত্রে জড়িয়ে ফেলার ব্যাপারটা কেউ কখনও ভুলে গেছে বলে আমার মনে হয় না।'

—'আমার নাম ও রাজ্যের সেবার দরুন যতটা মর্যাদার অধিকারী আমি হয়েছি তার ফল তুমি ভোগ করতে পার। সুযোগ যখন এসেছে তখন তোমার কল্যাণে সেটাকে কাজে লাগাতে ইতস্তত করিনি। সেটা যে তোমার প্রাপ্য। তুমি তো আমার সেরা ছেলে। এখন এই চাকরীটা তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। আর কদিনই বা আমি আছি, আমি এখন পরনির্ভরশীল সবকিছুতে, তাই তোমাকে ছেড়ে কেমন করে থাকব বাবা?'

রাজ্যপালের মুখ থেকে পাইপ পড়ে গেল, চোখে জল, কণ্ঠস্বর ভাঙা।

বিলি উঠে দাঁড়িয়ে বাবার কাঁধে হাত রাখাল। খুশিতে বলে উঠল—'ভেবনা বাবা। আমি এ চাকরী নেব না। এলম্ শহরই আমার পক্ষে যথেষ্ট। চিঠি দিয়ে তাদের জানিয়ে দিচ্ছি।'

লী এভেনিউতে রাজ্যপাল ও জেনারেলের দেখা হওয়ার পর বিলির চাকরীর সংবাদ শোনান হল।

জেনারেল শিস দিয়ে উঠে বললেন—'বিলির কাছে এ তো বড়ই সুখবর। কে জানাত যে বিলি—আরে রেখে দিন এসব কথা, চাকরী তার বাঁধাই ছিল। এল্‌ম্‌ শহরের গৌরব এটা। আমাদের রাজ্যের সম্মান। সে কবে যাচ্ছে, আমাদের একটা সম্বার্ধনা দিতে হবে। এ চাকরীতে তো বছরে আট হাজার বাঁধা। একবার ভাবুন তো আমাদের সেই ছোট্টখাট কাঠকাটা, মুখচোরা বিলি।

সবিনয় গর্বের সঙ্গে রাজ্যপাল বললেন, 'চাকরির প্রস্তাবটা উইলিয়াম ফিরিয়ে দিয়েছে। এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। বড় ভাল ছেলে।'

চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে জেনারেল তর্জণীটা বন্ধুর বুকের ওপর ঠেকালেন। বড় বড় চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি নির্ঘাৎ বিলির কাছে আপনার বাতের ব্যাথার কাঁদুনি গেয়েছিলেন।'

রাজ্যপাল বললেন কঠিন গলায়—'প্রিয় জেনারেল; আমার ছেলের বয়স বিয়াল্লিশ। এসব প্রশ্নের মীমাংসা করার মত ক্ষমতা তার আছে। আর তার বাবা হিসেবে এটা বলা কর্তব্য মনে করি যে বাতের ব্যাথার কথা আপনি যা বললেন নেহাতই একটা ছোট নলের বন্দুকের গুলির মত।'

'জেনারেল যদি অনুমতি করেন তো বলি, এই বাতের ব্যাথার কথা বলেই বেশ কিছু দিন এখানকার মানুষজনকে ব্যাতিব্যস্ত করে রেখেছেন, তখন কিন্তু নলটা ছোট ছিল না।'

দুই পুরানো বন্ধুর এই ঝগড়া বিরাট আকার নিত যদি না কর্ণেল উন্টার্টাস ও অন্য এক বন্ধু সেখানে আসত।

এইভাবে নিজের উচ্চাকাঙক্ষাকে সমাধি দিয়ে বিলি অনুভব করল তার বুক অনেক হালকা হয়ে গেছে, সুখের মাত্রা বেড়ে গেছে। শহরের উত্তাপে অন্তরটাও আরাম বোধ করছে। সে তখন ভাবতে শুরু করেছে 'মহামান্য বলে অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে বসে বিজ্ঞ কৌসুলিদের সওয়াল শোনার চাইতে বিলি' হয়ে বাবার সঙ্গী হয়ে বৃদ্ধের কাতর আর্তনাদ শোনা ও প্রতিবেশী বন্ধুদের অভিনন্দন পাওয়াটা অনেক শ্রেয়।

সেই থেকে রাস্তা দিয়ে শিস্‌ দিতে দিতে এমন ভাবে যেত—লোকে অবাক হয়ে যেত। মামলা নিয়ে আগের মত ব্যস্ত থাকলেও বেশির ভাগ সময় কাটাত বন্ধুদের সঙ্গে। সে যে বিস্মরনের মধ্যে ডুবে যেতে চায় তার প্রকৃষ্ট প্রামাণ পাওয়া গেল। যখন তার ছিপি টুপিটাকে রবিবার এবং রাজকীয় অনুষ্ঠানের জন্য তুলে রেখে দিল, আর মাথায় দিল বাজে টুপি।

নির্বিঘ্নে এল্‌ম্‌ শহরের দিন এগিয়ে চলল। জেনারেলকে পথপ্রদর্শ করে রাজ্যপাল তার ডাকঘর পর্যন্ত বিজয় যাত্রা চালাতে লাগলেন।

কিন্তু একদিন উত্তেজনা দেখা দিল। খবর এল প্রেসিডেন্টের একটি ভ্রাম্যমান দল বিশ মিনিটের জন্য এল্‌ম্‌ শহরে আসবে। দলের কর্মকর্তারা বলেছেন—প্যালেস হোটেলের বারান্দা থেকে পাঁচ মিনিটের ভাষণ দেওয়া হবে।

গোটা এল্‌ম্‌ শহর রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিত্বটিকে যথাযোগ্য সম্মান জানাতে জড় হল। ইঞ্জিনের মাথায় ছোট ছোট তারকা ও ডোরা কাটা পতাকা উড়িয়ে ট্রেন এল। এল্‌ম্‌ শহর সবকিছু করল—ব্যাণ্ড বাজাল, ফুল ছিটোল, গাড়ি ঘোড়া, পোশাক, পতাকা ও কমিটির দল। উচ্চ বিদ্যালয়ের মেয়েরা যে যেভাবে পারল ভ্রাম্যমান দলের সিঁড়িগুলো ফুলে সাজিয়ে দিল। জেনারেল ডেফেনবাউ আগে এগুলো অনেকবার দেখেছেন তবু এমনভাবে দেখলেন যেন এই প্রথম।

'প্যালেস হোটেলের' দোতালার গোলঘরে গন্যমান্য ব্যক্তিরা জড়ো হয়েছেন। বিশিষ্ঠ অতিথিদের সঙ্গে পরিচিত হবার আশঙ্খা, হোটেলের বাইরে রাস্তায় নামগোত্রহীন সাধারণ মানুষ।

এদিকে হোটেলের মধ্যে আটকে আছে এল্‌ম্‌ শহরের তুরুপের তাস। এই তুরুপের তাসটি একটি ব্যক্তি। তিনি এসে হাজির হলেন প্রথাসিদ্ধ ভঙ্গিতে।

যথাসময় রাজ্যপাল পেম্বার্টন—সৌজন্যে শ্রদ্ধেয়, প্রাচীনতায় আশ্চর্য, দীর্ঘদেহ সর্বাধিনায়ক—জেনারেলের কাঁধে হাত রেখে এগিয়ে গেলেন।

গোটা শহর রুদ্ধশ্বাস হয়ে দেখছে—আর শুনছে। আমাদের এই দিনটিতে যুক্তরাষ্ট্রের—একজন উত্তর অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট যখন প্রাক্তন সামরিক রাজ্যপাল পেম্বার্টনের সঙ্গে হাত মেলাবেন তার আগে কখনও এমনভাবে সব বিচ্ছেদের অবসান ঘটেনি—সারা দেশ এক ও অখণ্ড হয়ে ওঠেনি। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম সব একাকার। তাই এল্‌ম্‌ শহর উত্তজনায় টগবগ করছে, মহান ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শোনার আশায়।

আর বিলি! বিলিকে আমরা ভুলেই গেছি। তার ভূমিকাটা পুত্রের, সেই হিসাবে সে অপেক্ষামান মানুষের সারিতে অপেক্ষা করছে, তার হাতে নিজের ছিন্ন টুপিটা, মনে গভীর প্রশান্তি। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাবার বিশেষ ভঙ্গিতে, যাই হোক যে মানুষটি এমন সাহসিকতার সঙ্গে তিন পুরুষের চোখের মনি হয়ে থাকতে পারে তার ছেলে হওয়াটা কিছু কম নয়।

জেনারেল ডেফেনবাউ গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন। জনতা ঘাড়ে চড়ে বসল। জেনারেল হাসিমুখে নিজের হাতটা তুলে ধরলেন। পেম্বার্টনও হাত বাড়ালেন। কিন্তু জেনারেল কি বলেছেন?

"মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এমন একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে আপনার কাছে উপস্থিত করছি যিনি আমাদের বিশিষ্ট নাগরিক পুরোধা, শিক্ষিত সম্মানিত বিচারক, শহরের সকলের প্রিয়পাত্র, একজন আদর্শ দক্ষিণী ভদ্রলোক—মাননীয় উইলিয়াম বি পেম্বার্টনের পিতা।"

*The Emancipation of Billy

দু'রকম শিক্ষালয়

বৃদ্ধ জেরোম ওয়ারেন এর বাসস্থান ; ৩৫, ইষ্ট ফিফটি ফোর্থ স্ট্রীট—এর একটি লক্ষ টাকা মূল্যের বাড়ি। শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের একজন দালাল ও ঐশ্বর্যশালী মানুষ তিনি। তাঁর শরীরের জন্য প্রতিদিন কয়েকটা ব্লক পায়ে হেঁটে তারপর অফিসে যেতেন ট্যাক্সি করে। পোষ্যপুত্র ছিল একজন পুরনো বন্ধু গিলবার্টের ছেলে। সিরিল স্কট। যখন সে সবে টিউব থেকে রঙ বার করতে শিখেছে তখন থেকে একজন সফল চিত্রকর

হয়ে উঠেছে। সংসারের অপর এক সদস্য বারবারা রস, দত্তক ভ্রাতুষ্পুত্রী। দুঃখ কষ্ট সহ্য করতেই বোধহয় জন্মগ্রহণ করা তার। তাই জেরোম অন্যের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন।

গিলবার্ট ও বারবারা সুখেই বড় হতে লাগল। তারা হয়ত মনে মনে জানত এভাবেই কেটে যাবে কিন্তু তা হল না। দুর্যোগ দেখা দিল।

ত্রিশ বছর আগে যখন জেরোম যুবক ছিলেন সেই সময় ডিক নামে এক ভাই ছিল তার। সৌভ্যেগের সন্ধানে সে পশ্চিমে চলে গিয়েছিল। অনেক দিন কোন খোঁজ খবর ছিল না। তারপর একদিন বুড়ো জেরোম ভাইয়ের কাছ থেকে চিঠি পেলেন। যে কাগজে চিঠিটা লেখা হয়েছিল তাতে মাংস ও কফির গন্ধ, হাতের লেখাটা ছিল হাঁপানি রোগীর মত, বানানগুলো সেন্ট ভেটুসির মত।

জানা গেল সৌভাগ্যের কাছ থেকে কিছু পাওয়া দূরের কথা ডিক নিজেই বন্দী হয়ে শত্রুর দেশে চলে গেছে জামিনদার হয়ে। অর্থাৎ সর্ব্বনাশের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে ডিক। ত্রিশ বছর বয়সের কন্যা, আর তাকেই সে খরচ খরচা দিয়ে জাহাজে চাপিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে জেরোমের কাছে—মেয়ের খাওয়া পড়া, লেখাপড়া, আরাম-আয়েস থেকে শুরু করে বাকি জীবনের সব দায়িত্ব জেরোমের ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়ে।

বুড়ো জেরোম ছিলেন এক সর্ববাহী বাহন। সকলেই জানে এটলাস ধারন করে আছে পৃথিবীকে, এটলাস দাঁড়িয়ে আছে রেলের বেড়ার উপর, সেই রেলের বেড়া বসান হয়েছে কচ্ছপের পিঠের ওপর। এখন কচ্ছপেরও তো দাঁড়বার মত একটা কিছু চাই। সেটাই হচ্ছে একটা সর্ববাহী বাহন যা তৈরী হয় জেরোমের মত মানুষদের দিয়ে।

মানুষ কোন দিন অমরত্ব লাভ করবে কিনা জানি না। তা যদি না করে তাহলে জানতে ইচ্ছা করে বুড়ো জেরোমের মত মানুষেরা কবে তাদের প্রাপ্য পাবে?

তারা স্টেশনে নেভাডা ওয়ারেনের সঙ্গে দেখা করল। ছোট মেয়ে, একেবারে রোদে পোড়া, দেখতে মোটামুটি ভাল, চালচালনও সহজ সরল। দেখলেই মনে হবে সে বুঝি শিকারে যায়। কিন্তু তার সাদা কুর্তা আর কাল ঘাঘরা দেখে অন্য কথা ভাবতে হয়। তার ভারী মালটা তুলতে কুলি গলদঘর্ম হচ্ছে অথচ মেয়েটা সেটাকে ঘাড়ে তুলে নিল সহজেই।

তার রোদে পোড়া গালে চুমু খেয়ে বারবারা বলল—আমি নিশ্চিত আমাদের খুব ভাব হবে।

—'আমিও তাই আশা করছি।'

বুড়ো জেরোম বললেন—'আদরের ভাই-ঝি আমার তোমাকে স্বাগত। মনে কর এটা নিজেদের বাড়ি।'

—'ধন্যবাদ'। নেভাডা বলল।

গিলবার্ট হেসে বলল—'আমি তোমাকে বোনটি বলে ডাকব।

নেভাডা—'দয়া করে এই ব্যাগটা ধর। এটার ওজন দশ লক্ষ পাউণ্ড। বাবার ছ'টা পুরনো খনি থেকে সংগ্রহ করা নমুনাগুলো এর মধ্যে আছে।

[২]

যখন একটি পুরুষ ও দুটি মহিলা অথবা একটি মহিলা ও দুটি পুরুষ এবং একজন সম্ভ্রান্ত লোক—এদের মধ্যে কোন স্বাভাবিক জটিলতা দেখা দেয়, তখন সে সমস্যাকে বলা

হয় ত্রিভূজ। অতএব নেভাডা ওয়ারেন, গিলবার্ট ও বারবারা রস মিলে ত্রিভূজ গড়ে উঠল। বারবারা হল অতিভূজ।

একদিন সকলে বুড়ো জেরোম প্রাতরাশের পর কাগজ দেখছিলেন। নেভাডাকে তার খুব ভাল লেগেছে, মৃত ভাইটির শান্ত, স্বাধীন চিত্ত এ অকৃত্রিম সরল স্বভাবের পরিচয় তার মধ্যে রয়েছে।

এক পরিচারিকা মিস্ নেভাডাকে একটা চিরকুট এনে দিয়ে বলল—একটি পত্রবাহক ছেলে দরজায় দাঁড়িয়ে এটা দিল। উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে।

নেভাডা শিস দিতে দিতে রাস্তার গাড়ি দেখছিল। হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল। চিঠিটা খোলার আগে বাঁ দিকের উপর সোনালী চিহ্নটা দেখেই সে বুঝতে পারল গিলবার্ট পাঠিয়েছে।

চিঠিটা পড়ে গম্ভীর মুখে জ্যেঠার কাছে এসে দাঁড়াল।

'জেরোম জ্যেঠু, গিলবার্ট খুব ভাল ছেলে তাই না?'

জেরোম বললেন—'তাই বুঝি সোনা মা। ভাল ছেলে হবে না, আমি নিজের হাতে মানুষ করেছি।'

নেভাডা বলল—'এই চিঠিটা পড়ে বল এটা কি উচিত হয়েছে? কি জান, শহরের লোকজন ও তাদের চাল-চালন আমি ঠিক জানি না।'

জেরোম কাগজটা রেখে চিঠিটা খুব মন দিয়ে দুতিনবার পড়লেন।

তারপর বললেন—'মা গো, তোমার কথা শুনে আমি তো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, অবশ্য ও ছেলেকে আমি ভালই চিনি। একেবারে বাবার ছাঁচে গড়া। হীরের টুকরো ছেলে। তুমি ও বারবারা আজ বিকেল চারটের সময় মোটরে চেপে লং আইল্যাণ্ডে খাবার জন্য তৈরী থাকতে পারবে কিনা তাই জিজ্ঞাসা করেছে। এর মধ্যে নিন্দের কিছু দেখছিনা, তবে চিঠির কাগজটা ছাড়া নীল রঙের কাগজ আমি দেখতে পারি না।'

নেভাডা প্রশ্ন করল—'যাওয়াটা ঠিক হবে?

'হ্যাঁ-হ্যাঁ বাবা নিশ্চয়। কেন ঠিক হবে না? তবু তুমি যে এত সাবধান হয়েছো তাতে খুশি হয়েছি। যাবে অবশ্যই যাবে।'

—'আমি বুঝতে পারি নি। তাই ভাবলাম তোমায় জিজ্ঞাসা করি। তুমিও আমাদের সঙ্গে চল না জ্যেঠু।'

—'আমি? না না। আমি একবারই গাড়ি চেপেছি। তাও ছেলে চালিয়েছিল। আর যাইনি। কিন্তু তোমার ও বারবারার যেতে বাধা নেই। কিন্তু আমি যাব না।'

একছুটে দরজার কাছে গিয়ে নেভাডা পরিচারিকাকে বলেল—'আমরা নিশ্চয় যাব, মিস্ বারবারার হয়ে আমি বলছি। ছেলেটাকে বলে দাও সে যেন মিঃ ওয়ারেনকে গিয়ে বলে আমরা নিশ্চয় যাব।'

জেরোম হাঁক দিলেন—'নেভাডা' আমাক মাপ কর। কিন্তু বলছিলাম কি, তাকে একটা চিঠি লিখে জবাবটা জানিয়ে দিলে ভাল হয় না। কেবল একটা লাইন লিখলেই চলবে।'

নেভাডা—'না, তার কোন দরকার হবে না। গিলবার্ট ঠিকই বুঝতে পারবে। আমি জীবনে কখনও মোটরে চড়িনি। কিন্তু শাল্‌তি চালিয়ে লস্ট হর্স গিরিখাতের ভিতর দিয়ে লিটল ডেভিল নদীতে গিয়েছি। মোটরে যাওয়াটা কেমন তা জানতে ইচ্ছা করছে।'

ধরে নেওয়া যাক,মাস দুই কেটে গেছে।

বারবারা বসে আছে এক লক্ষ ডলারের বাড়ির পড়ার ঘরে। ঘরটা বেশ ভাল। পৃথিবীতে সময় কাটাবার মত অনেক জায়গা আছে তার মধ্যে পড়ার ঘর সেরা।

সাধারণতঃ অতিভূজই একটা ত্রিভূজের সব থেকে বড় রেখা সেটা বুঝতে অনেক দিন সময় লাগে। কিন্তু সেই দীর্ঘ রেখাটার কেন বাঁক থাকে না।

বারবারা একা ছিল, জেরোম ও নেভাডা গিয়েছিল থিয়েটারে। বারবারা ইচ্ছা করেই যায়নি, সে চেয়েছিল বাড়িতে পড়াশুনা করবে।

ওক কাঠের লাইব্রেরী টেবিলে বসে সে একটা সিল করা চিঠি নাড়াচাড়া করছিল। চিঠিটা নেভাডাকে লেখা। খামের ওপরে সোনালী চিহ্ন। নেভাডা চলে যাবার পর পিওন চিঠি দিয়ে গেছে।

চিঠিতে কি লেখা আছে সেটা জানবার জন্য বারবারা মুক্তোর নেকলেসটা দিয়ে দিতে রাজী কিন্তু যে কোন উপায়ে চিঠিটা খুলে পড়তেও পারে না, কারণ তার মর্যাদাই এ পথে বাঁধা। উজ্জ্বল আলোর সামনে খামটিকে ধরে চিঠির কয়েকটি লাইন পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু যে ধরনের খাম ও কাগজ তাতে সে চেষ্টা ব্যর্থ হল।

জেরোম, নেভাডা দুজনে ফিরল, সাড়ে এগারটার সময়। ট্যাক্সি থেকে দরজা পর্যন্ত আসতে বরফের টুকরোয় ভিজে গেল সর্বাঙ্গ। জেরোম কিছুক্ষণ ট্যাক্সি পরিষেবার অব্যবস্থা ও রাস্তার যানজট নিয়ে বকবক করলেন। নেভাডা তার নীলকান্ত মনির মত চোখে ঝিলিক টেনে বলতে লাগল, তার বাপের বাড়ির ঝড়ের রাতের গল্প। আর বারবারা ঠাণ্ডা মাথায় কাঠ কাটতে লাগল তার থেকে ভাল কোন কাজ মাথায় এল না।

জেরোম সঙ্গে সঙ্গে উপরে গিয়ে, গরম জলের বোতল ও কুইনল খুঁজতে লাগলেন। নেভাডা পড়ার ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে দেখে আসা নাটকটার দোষ ত্রুটি বলতে লাগল।

বারবারা বলল—তোমার চিঠি আছে ভাই। তোমরা বেরিয়ে যাবার পর একটা লোক দিয়ে গেছে।

—'কার চিঠি?'

বারবারা হেসে বলল—'সত্যি জান না, তবে আমি অনুমান করতে পারি, খামের কোনে চিহ্ন দেখে মনে হল গিলবার্টের।'

বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে নেভাডা বলল—'আমাকে আবার সে কি লিখেছে তা তো জানি না।'

বারবারা বলল—'আমরা মেয়েরা সকলেই এক, ডাকঘরের ছাপ দেখেই চিঠিতে কি লেখা আছে অনুমানের চেষ্টা করল। শেষে কাঁচির সাহায্যে উল্টো দিক থেকে পড়বার চেষ্টা করি। এই নাও তোমার চিঠি।'

চিঠিটাকে নেভাডার দিকে ঠেলে দিল। 'যত সব বাঘা বনবিড়াল' নেভাডা চেঁচাল, 'এই বোতামগুলো খুব গোলমেলে, আঃ বারবারা, দয়া করে খামটা ছিড়ে চিঠিটা পড়, দস্তানা খুলতে রাত বারটা বেজে যাবে।'

—'সে কি সোনা? তুমি নিশ্চয়ই চাও না যে তোমাকে লেখা গিলবার্টের চিঠিটা পড়ে দেব। এটা তোমার চিঠি অন্য কেউ পড়বে কেন?'

নেভাডা শান্ত চোখে একবার তাকাল। বলল—'কেউ আমাকে কখনও এমন কিছু লেখে না যা অন্য কেউ পড়তে পারে না। তুমিই পড় বারবারা। গিলবার্ট হয়তো চাইছে কাল আবার তার গাড়ী করে বেড়াতে যাই।'

অনিচ্ছা সত্বেও বারবারা খামটা খুলল। বলল—'ঠিক আছে তুমি যখন বলছ এখন পড়ছি।'

খামটা ছিঁড়ে দ্রুতবেগে চিঠিটা পড়ে নিল, আবার পড়ল। তারপর বাঁকা চোখে নেভাডার দিকে তাকাল। নেভাডাকে দেখে মনে হচ্ছিল দস্তানাটাই তার আগ্রহের বস্তু। আর চিঠিটা মঙ্গল গ্রহ থেকে পাঠানো বার্তা যেন।

বারবারা পনেরো সেকেণ্ড মত স্থির দৃষ্টিতে নেভাডার দিকে তাকাল। এত সূক্ষ্ম হাসি হাসল কেন বোঝা গেল না।

সৃষ্টির আদি কাল থেকে কোন নারী অন্য নারীর কাছে রহস্যময়ী হয়ে থাকতে পারেনি। আলোকরশ্মির মত তীব্র গতিতে একটি নারী অপর এক নারীর অন্তর ও মনের মধ্যে প্রবেশ করে তার ভঙ্গীমার প্রতিটি সূক্ষ্মতম বাণীর ইঙ্গিতকে ধরতে পারে, তার গোপনতম বাসনাকে বিশ্লেষণ করতে পারে।

বারবারা কিছুটা ইতস্তত করল। তারপর কিছুটা বিচলিতভাবে বলল—'সত্যি নেভাডা আমাকে দিয়ে চিঠিটা খোলান তোমার উচিত হয়নি। আমি নিশ্চিত এ চিঠির কথাগুলো অন্য কেউ জানুক তা সে চায়নি।'

মুহূর্তের জন্য নেভাডা তার দস্তানার কথা ভুলে গেল।

বলল—'তাহলে সকলকেই পড়ে শোনাও। তুমি যখন পড়েই ফেলেছ. তখন আর তফাৎ কি হবে? ওয়ারেন যদি আমাকে এমন কিছু লিখে থাকে যা অন্যের জানা উচিত নয়, তাহলে তা শুধু সেই জন্যই সকলেরই সেটা জানা উচিত।'

বারবাবা বলল—'বেশ, চিঠিতে লেখা আছে—'প্রিয়তম নেভাডা—রাত বারটার সময় স্টুডিয়োতে চলে এস। অবশ্যই এস।'

উঠে গিয়ে চিঠিটা নেভাডার কোলে ফেলে দিল বারবারা। বলল—'সব কথা জেনে ফেলেছি বলে আমি দুঃখিত। গিলবার্টের মত লোকের এ কাজ করা উচিত হয়নি। একটা ভুল নিশ্চয় হয়েছে। তুমি কি ধরে নিতে পার না নেভাডা যে আমি এসব জানি না। চিঠির মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝছিনা। হয়তো গিলবার্টই বুঝিয়ে বলবে। আমি উপরে যাচ্ছি, বড্ড মাথা ধরেছে। শুভরাত্রি।'

[৪]

নেভাডা পা টিপে হলঘরে চলে গেল। তার কানে এল বারবারার ঘরের দরজা বন্ধের শব্দ। পড়ার ঘরের ঘড়িতে তখন বারটা বাজতে পনের। সে সদর দরজায় ছুটে গেল। বরফের ঝড়ের মধ্যেই ছয় স্কোয়ার দূরে ওয়ারেনের স্টুডিয়োর দিকে পা বাড়াল।

ইষ্ট রিভার থেকে আসা বরফে শহর ছেয়ে গেছে। রাস্তায় এক ফুট গভীর বরফ জমে গেছে। বড় বড় রাজপথগুলো পম্পেইর রাস্তার মত স্তব্ধ। গাড়িগুলো বরফের ভিতর দিয়ে চলেছে। চন্দ্রালোকিত সমুদ্রের উপর শ্বেত পক্ষ ঈগলের ঝাঁকের মত। মাঝে মাঝে দু একটা মোটর গাড়ি হিস্ হিস্ শব্দ করে এগিয়ে চলেছে।

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে ছোট একটা সামুদ্রিক পাখির মত ছুটতে লাগল নেভাডা। রাস্তার মোড়ে পুলিশ তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল—'আরে মাবেল। এত রাতে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

চলতে চলতে নেভাডা বলল—'আমি, আমি একটু ওষুধের দোকানে যাচ্ছি।'

এ অজুহাতে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ মানুষেরও মন গলে। এতেই কি প্রমাণ হয় না যে নারী জাতি চিরদিনই এক এবং অদ্বিতীয়া অথবা বুদ্ধিতে এবং ছলনায় পরিপক্ক হয়েই সে সাহসের পাঁজরা থেকে বেরিয়ে আসে।

হঠাৎ এক সময় চোখের সামনে ভেসে উঠল স্টুডিয়োর বড় বাড়িটা। সেখানে বানিজ্য ও আর শত্রু প্রতিবেশী চারুকলার সহ অবস্থান। এলিভেটরটা দশ তলায় গিয়ে থামল।

নরকের সিঁড়ির আটটা ধাপ উঠে ৮৯ নম্বরের ঘরে ধাক্কা দিল। বারবারা ও জেরোম জ্যেঠুর সঙ্গে অনেকবার সে এখানে এসেছে।

গিলবার্টই দরজা খুলল। হাতে পেন্সিল, চোখের ওপর সবুজের ছোপ, মুখে একটা পাইপ। পাইপটা মেঝেতে পড়ে গেল। নেভাডা বলল—'আমার কি খুব দেরী হয়ে গেল? আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসেছি। জ্যেঠু ও আমি থিয়েটারে গিয়েছিলাম। তুমি আসতে বলেছ, আমি এসেছি, চিঠিতে এইটুকু ছিল, ডেকেছিল কেন?'

—'আমার চিঠিটা তুমি পড়েছ ?'

—'বারবারই আমাকে শুনিয়েছে। আমি পড়ে দেখেছি। তাতে লেখা ছিল রাত বারটার সময় আমার স্টুডিয়োতে অবশ্যই এস। আমি অবশ্য ভেবেছিলাম তোমার অসুখ করেছে। কিন্তু তোমাকে দেখে সে রকম মনে তো হচ্ছে না।'

গিলবার্ট বলে উঠল — 'আহা! কেন যে তোমাকে আসতে লিখেছে সেটা এখনই বলছি। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আজ রাতেই। আর আজই কী বরফ ঝড়। তুমি রাজী তো?'

নেভাডা — 'তুমি হয়ত বুঝতে পেরেছ যে অনেক আগে থেকেই আমি রাজি। আর আমি নিজেও এই রকম ঝড় বৃষ্টির রাতের কথা ভেবেছিলাম। এই যে ফুল দিয়ে সেজে গীর্জায় গিয়ে দুপুর বেলায় বিয়ে, ওটাকে আমি চিরকালই ঘৃণা করি গিলবার্ট। এই ভাবে বিয়ের প্রস্তব করার মত মনের জোব যে তোমার আছে সেটা আমি ভাবতেও পারিনি। ওদের অবাক করে দেব — এটা আমাদের শোকযাত্রা, তাই না?'

— 'কী আশ্চর্য! কথাটা কোথায় যেন শুনেছি। এক মিনিট অপেক্ষা কর। একটা ফোন করে আসি।'

ছোট ড্রেসিং রুমে ঢুকে ফোন করল গিলবার্ট।

— 'কে? জ্যাক? আরে ঘুম কাতুরে! হ্যাঁ উঠে পড়, আমি বলছি— হ্যাঁ আমি। এখনই আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ তোমার বোনকেও ঘুম থেকে তোল, আমাকে আর কিছু জানাতে হবে না, ওকেও সঙ্গে নিয়ে এস। হ্যাঁ অবশ্যই। হ্যাঁ নেভাডা এখানেই আছে। বেশ কিছুদিন আগে আমাদের বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে। এগ্নিসকে আনা চাই-ই। আনবে? কী ভাল ছেলে!'

গিলবার্ট নেভাডার কাছে এসে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল — 'আমার পুরনো বন্ধু জ্যাক পের্টাক ও তার বোন এখানে আসছে পৌনে বারটার সময়, কিন্তু জ্যাক সবসময় বেশ দেরী করে। এইমাত্র তাদের আসতে বললাম। এখুনি এসে যাবে। আজ আমি পৃথিবীর সব থেকে সুখী মানুষ নেভাডা। আজ তোমাকে যে চিঠিটা লিখেছি সেটা কোথায়?'

নেভাডা চিঠিটা বের করে বলল —'এখানেই রেখে দিয়েছি।'

চিঠিটা ভালভাবে পড়ে চিন্তিতমুখে তাকাল নেভাডার দিকে —'মাঝ রাতে স্টুডিয়োতে আসতে ডাকায় খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলে না?'

চোখ ঘুরিয়ে তাকাল নেভাডা — 'না। কেন? মোটেই না, যত রাতই হোক আর যত ঝড় জলই হোক, তবু না।'

গিলবার্ট পাশের ঘর থেকে একগাদা ওভারকোট এনে বলল — 'এটা এখুনি পড়ে নাও, সিকি মাইল পথ যেতে হবে। জ্যাক ও তার বোন দু মিনিটেই এসে যাবে। নিজেও ওভারকোটটা গায়ে দিতে দিতে বলল —'ওঃ নেভাডা টেবিলের ওপর আজকের সান্ধ্য কাগজটা আছে। ওটার শিরোনামগুলোতে চোখ বুলিয়ে নাও তো পশ্চিম অঞ্চলের খবর আছে। আমি জানি তোমার ভাল লাগবে।'

গায়ে দিতে দেরী হচ্ছে, এমন ভান করে এক মিনিট অপেক্ষা করে ঘুরে দাঁড়াল গিলবার্ট।

নেভাডা নড়েনি, বিস্মিত, বিষণ্ণ মুখে দাড়িয়ে আছে। গালের রঙ বদলে গেল, চোখ দুটো স্থির। বলল — 'আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম যেভাবে হোক, আগে তুমি — আগে আমরা — মানে সব কিছুর আগে। বাবা আমাকে একদিনের জন্যও স্কুলে পাঠায়নি, আমি নিরক্ষর। এখন যদি —'

কানে এল জ্যাকের ও এগ্নিসের পায়ের শব্দ।

[৫]

মিঃ ও মিসেস গিলবার্ট যখন অনুষ্ঠানের শেষে ঢাকা গাড়িতে করে ফিরছিল তখন গিলবার্ট বলল — 'নেভাডা, তুমি কি সত্যিই জানতে চাও, সেদিন রাতে যে চিঠিটা তোমাকে পাঠিয়েছিলাম তাতে কি লিখেছিলাম?'

— 'এসব ছাড়'।

— 'ঠিক এই কথাগুলি লিখেছিলাম, প্রিয় মিস ওয়ারেণ, ফুলের ব্যাপারে তোমার কথাই ঠিক। ফুলটি ছিল হাইড্রেঞ্জির, লাইলাক নয়।

নেভাডা ডাকল —'ঠিক আছে। কিন্তু ওটি ভুলে যাওয়াই ভাল। আসলে ঠাট্টা তো বারবারাকে নিয়েই করা হয়েছিল।'

* Schools and Schools

সালভাডর-এ স্বাধীনতা দিবস

দেশভক্তির আলোড়নে শহর যখন উত্তাল সেই সময়। এক গ্রীষ্মের দিনে বিলি কাসপারিস আমাকে এই গল্পটা বলেছিল।

চাল-চলনে বিলি একটি ইউলিসিস, ক্ষুদে শয়তান একটি, শহরময় টো টো করে বেড়ায়। আপনাদের প্রাতবাশের সময় হয়ত সে চলে যাবে ওকিচোবি হ্রদের মাঝখানে, শহরাঞ্চলে বাজার গরম করতে অথবা ঘোড়ার বেচা-কেনা করতে।

একটা ছোট টেবিলে বসে ছিলাম আমরা। দুজনের মাঝখানে ছিল বরফের টুকরো ডোবান গ্লাস আর মাথার ওপর ছিল নকল তালগাছ। এই দৃশ্য দেখে তার মনে পড়ে গেল অন্য এক দৃশ্য। আর বিলিও উত্তেজিত হয়ে কাহিনী শুরু করল।

বলল —— 'এই দৃশ্যটি আমাকে মনে করিয়ে দিল এক চতুর্থী উৎসবের কথা যেটা সালভাডরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমার সাহায্যে। আমি সেখানে একটা বরফ কারখানা চালাচ্ছিলাম। তার আগেই আমার কলোরাডোর খনি থেকে সব রূপো তুলে এনেছিলাম। সমানে একটা শর্তহীন ছাড়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। আমি ছমাস সমানে বরফ তৈরী করব এই শর্তে নগদ এক হাজার ডলার জমা রাখতে হবে। যদি তা করতে পারি তাহলে জমা অর্থ আমি ফেরত পাব। তা যদি না পারি তাহলে সরকার টাকাটা নিয়ে নেবে। অতএব ইন্সপেক্টররা যখন তখন হানা দিতে লাগল যাতে আমাকে মালবিহীন অবস্থায় ধরতে পারে।

একদিন তাপমান ১১০-এ নেমে গেল। ঘড়িতে দেড়টা বাজে। সেদিন ছিল ৩রা জুলাই। এমন সময় ছোটখাট, বাদামী ও লাল ট্রাউজার পরা দুজন লোক এল পরিদর্শন করতে। এদিকে তিন সপ্তাহ ধরে এক পাউন্ড বরফও তৈরী হয়নি দুটি কারণে, সাল্‌ভাডরের পৌত্তলিকরা সে মাল কিনতে চায় না। ওরা বলে এ বস্তু যাতে রাখি সেটাই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমিও আর বরফ বানাতে পারি না কারণ মন ভেঙে গেছে। মাঝে ভেবে রেখেছিলাম কোন রকমে জমা হাজার ডলার পেলেই এ দেশ ছেড়ে চলে যাব। ছ মাস পূর্ণ হবে এই ৬ই জুলাইয়ে।

যাই হোক্ যতটা বরফ ছিল তাদের দেখালাম। জালার ঢাকনাটা তুলে দেখলাম ১০০ পাউন্ডের একটা বরফের খণ্ড। ঢাকনাটা বন্ধ করতে যাব এমন সময় সেই দুই কালো শিকারী কুকুরের একজন হাঁটুর ওপর বসে পড়ে সজোরে যন্ত্রটি ধরে টান দিল। দু মিনিটের মধ্যেই ঢালাই কাঁচের সুন্দর খণ্ডটি টেনে মেঝের ওপর নামাল। এটাকে জাহাজ থেকে নামাতে খরচ হয়েছিল পঞ্চাশ ডলার।

যে লোকটি আমার সঙ্গে এই চাতুরির খেল' খেলল সে বলে উঠল। 'বরফ ঠাণ্ডা? খুব গরম বরফ। হ্যাঁ দিনটাও বড় গরম। বাইরে নিয়ে গেলে হয়ত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ঠিক।'

আমি বললাম —'হ্যাঁ ঠিক। কেউ হয়ত বলতে পারে যে তোমাদের ট্রাউজারের বসার জায়গাটা আকাশী নীল, কিন্তু আমার মতে সেটা লাল, যেখানে সেখানে হাত চালাবার মজাটা একবার দেখাই।' জুতোর দুই ধাক্কায় দুজনকে দরজার ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে দিলাম। তারপর সেই কাঁচ খন্ডকে ঠান্ডা করতে বসলাম।

আমি বসে থাকতেই জ্বলন্ত রোদের মধ্যেই এসে হাজির রবার ও গোলাপগন্ধী কাঠের রসিক ম্যাকসিমিলিয়ন জোন্স। আমেরিকার মানুষ, পরণে পরিচ্ছন্ন সাদা পোশাক।

ভেতরে আসতেই বললাম — 'মহান কারাম্বস!' তখন আমার মেজাজটা ছিল তিরিক্ষি, আমার কি যথেষ্ট ভোগান্তি হয়নি? আমি জানি তুমি কি চাও। আর একবার বলতে চাও জনি আগ্নিগার ও বিধবার গল্পটা। সে গল্পটা নয় বার শুনেছি একমাসের মধ্যে।'

সবিস্ময়ে দরজার কাছে থেমে জোন্স বলল, 'এই গরমে মাথাটি গেছে। বেচারি বিলি। বরফের ওপর বসে প্রাণের বন্ধুদের যা তা বলছে।' মুচাচো! বলে আমার ভৃত্যকে ডাকল। বাইরে থেকে এসে দাঁড়াতেই তাকে বলল সে যেন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসে।

আমি ডাকলাম—'ফিরে এসো এখানে ম্যাক্সি। আমার কথা ভুলে যাও। এটা বরফ নয় আর যে বসে আছে সেও পাগল নয়। আমি একজন নির্বাসিত মানুষ যার দেশের জন্য প্রাণ কাঁদছে তার ওপর এক হাজার ডলার চোট হয়েছে। এখন বল, জনি বিধবাটিকে কি বলল? আমি আর একবার শুনতে চাই। ম্যাক্সি-লক্ষ্মী ছেলে, রাগ করো না।'

আমরা দুজনেই গল্প করতে বসে গেলাম, দুজনেরই দেশের জন্য প্রাণ কাঁদছে। যেখানে থাকতে গ্লাসের প্রতি অতি-আসক্তির ফলে আমি বিলি কাসপারিস ধনী থেকে হয়েছিলাম নির্ধন ভিখারী। এখন আমার দুর্দিন কেটে গেছে আমি হতে চাই পৃথিবীর সব থেকে বড় দেশের মুকুটহীন সম্রাট, আর জোন্স তার রাগ ঢালতে লাগল একটা বিশেষ সম্প্রদায় চালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা. ও সর্বশক্তিমান রাজাদের ওপর। আমরা ঘোষণা করলাম যে সালভাডার-এ জুলাই মাসের চতুর্থ দিনটি পালিত হবে সাড়ম্বরে, সব রকম অভিবাদন হবে। বাজি ফাটান হবে, যুদ্ধকালীন সম্মান বিতরণ, বক্তৃতা, আর চিরকালের ঐতিহ্য পানীয়ের ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে। আমরা দেশের জন্য এইটুকু নিশ্চয়ই করতে পারি।'

ঠিক এই সময় জেনারেল মেরি এস্পেরাঞ্জা নামে জনৈক স্থানীয় অধিবাসী কারখানায় এল। লোকটি আমাদের বন্ধু। রাজনীতি ও বর্ণের ব্যাপারে অজ্ঞ হলেও ভদ্র ও বুদ্ধিমান। ডাক্তারী পড়ার সূত্রে ফিলাডেল্‌ফিয়াতে দু বছর বাস করার ফলে দ্বিতীয়টা শিখে নিয়েছে। প্রথমটা বজায় রেখেছে। সবসময় সাহেব-বিবি-গোলাম নিয়ে খেললেও একজন সালভাডরের বাসিন্দার কাছে সে খুব বিপজ্জনক ছিল না।

জেনারেল মেরি আমাদের সঙ্গে বসে পড়ল, বোতল নিল।

এক সময় বলল জেনারেল ডিঙ্গো— "হিষ্ট! (ওটা তার মুদ্রাদোষ)। (টেবিলের ওপর ঝুঁকে) প্রিয় বন্ধু সেনিওরদ্বয়, আগামীকাল মুক্তি ও স্বাধীনতার মহান দিবস। আমেরিকা বাসী ও সাল্‌ভাডরবাসীদের হৃদয়ই এক তালে চলা উচিত। তোমাদের ইতিহাস ও তোমাদের মহান ওয়াশিংটনের কথা আমি জানি, তাই তো?"

আমি ও জোন্স দুজনেরই ভাল লাগল এই ভেবে যে ৪ঠা জুলাই-এর কথা মনে রেখেছে জেনারেল। এক সময় ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের যে একটা গোলযোগ বেঁধেছিল সে খবরটা হয়ত ফিলাডেলফিয়াতে জেনেছিল।

আমি ও ম্যাক্সি বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ আমরা আগে থেকেই এটা জানাতাম। ঐ বিষয় নিয়ে তোমার আসার আগে আলোচনা করছিলাম। তুমি নিশ্চিত করে বলতে পার যে আগামীকালের বাতাস হৈ হট্টগোলে ভারী হয়ে উঠবে। আমরা সংখ্যায় খুবই অল্প কিন্তু আকাশটা হয়তো নীচে নেমে এসে আমাদের জাগিয়ে তুলবে।'

দুম্ করে নিজের বুকে আঘাত করে বলল — 'আমিও সাহায্য করব এই মুক্তির পক্ষে, আমেরিকার মহান নাগরিক হিসেবে ঐ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখব।'

জোন্স বলল —'আমরা আমেরিকানরা চাই হুইস্কি, তোমাদের স্কচ স্মোক অথবা থ্রি স্টার হেনেসি মোটেই কাল চলবে না। আমরা রাষ্ট্রদূতের পতাকাটি ধার করব, বুড়ো বিল্‌ফিঙ্গার বক্তৃতা করবে। আর আমরা শহর-চত্বরে ভোজের আয়োজন করব।'

আমি বললাম—'আতস বাজি পুড়বে, কিন্তু আমাদের বন্দুকের জন্য দোকানের সব কার্তুজ আমরা কিনে নেব। আমার একটা ডেনভার থেকে আনা বন্দুক আছে।'

জেনারেল —'এখানে কামান আছে বেশ বড়। সেটা থেকে গোলা ছোড়া হবে, আর রাইফেলধারী তিনশ লোক গুলি ছুড়বে।'

জোন্স —'এটাকে আমরা সম্মিলিত আর্ন্তজাতিক উৎসব করে তুলব। জেনারেল, একটা সাদা ঘোড়া একটা নীল চাদর ও একজন উঁচুদরের রাজপুরুষকে আনার ব্যবস্থা কর।'

চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে জেনারেল বলল — 'মুক্তির নামে যে মানুষরা সমবেত হবে তাদের সকলের আগে ঘোড়ায় চড়ে যাব আমি তরবারি নিয়ে।

আমরা প্রস্তাব দিলাম —'তুমি বরং সেনানায়কের সঙ্গে দেখা করে বলে দাও ঐ উৎসবের দিন যেন অস্ত্র আইনকে কিছুটা শিথিল করেন। সৈন্যরা যদি বাধা দেয় তো তাদের সঙ্গে গণ্ডগোল করে হাজতে যেতে চাই না বুঝলে?'

জেনারেল —'হিস্ট! সেনানায়ক তো মনে প্রাণে আমাদেরই পক্ষে। তিনি আমাদের সাহায্য করবেন।'

সেদিন বিকেলে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। সালভাডরের অন্তর্গত জর্জিয়া থেকে এক নিগ্রো সেখানে হাজির হয়েছিল মেক্সিকোর নতুন গড়ে ওঠা কালো মানুষেদের উপনিবেশ থেকে ছিটকে। ভোজসভার নাম শুনে সে আনন্দে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। সেও কাজে লেগে গেল। আমি ও ম্যাক্সি অন্য অ্যামরিকানদের খবর দিতে বেরিয়ে পড়লাম। অনেকদিনের প্রচলিত চতুর্থ দিবসের জমকালো অনুষ্ঠানের কথা শুনে সকলেই আনন্দিত।

সব মিলিয়ে আমরা ছজন ছিলাম, কফি চাষী মার্টিন ডিলার্ড, রেলপথের কর্মী হেনরী বার্নেস, বুড়ো বিলফিঙ্গার, আমি ও জোন্স, আর ভোজসভার প্রধান মক্কেল জেরি। শহরে তখন স্টেরেট নামে একজন ইংরেজ ছিলেন। তিনি এসেছিলেন 'পতঙ্গ জগতের ঘর-কন্যার নির্মাণ শিল্প' নিয়ে বই লিখতে। তারই দেশের ব্যাপার নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় একজন ব্রিটিশকে নিমন্ত্রণ করতে আমরা সংকোচবোধ করছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝুঁকিটা নিলাম।

স্টেরেটের কাছে পৌঁছে দেখলাম, তিনি পাজামা পরে তার পান্ডুলিপি নিয়ে কাজ করছেন, একটি ব্র্যান্ডির বোতলকে পেপার-ওয়েট হিসাবে ব্যবহার করছেন।

জোন্স —'দেখুন ইংলিশম্যান, ছারপোকার ঘর-বাড়ি নিয়ে আপনার প্রবন্ধ-রচনায় একটু বিঘ্ন সৃষ্টি করতে এলাম। আগামীকাল জুলাই মাসের চতুর্থ দিন। আপনার মনে আঘাত দিতে

চাই না কিন্তু সেই দিনটাকে স্মরণ করতে যাচ্ছি, যখন আপনাদের নিয়ে কিছু হৈ-হট্টগোল ও অর্থহীন কান্ড করেছিলাম। আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে একটু পান-ভোজন করার মত মানসিক উদারতা যদি আপনার থাকে, তাহলে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। যোগ দিলে আমরা খুশী হব।'

চশমা পরতে পরতে স্টেরেট বললেন ---'আমি যোগ দেব কিনা এ প্রশ্ন করার সাহস যে আপনাদের আছে সেটা ভাল লাগছে। আপনাদের জানা উচিত ছিল যে না ডাকলেও আমি যেতাম। আমার দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হয়ে নয়, একক সমৃদ্ধশালী জাতির মৌলিক আনন্দের অংশীদার হতে।'

৪ঠা জুলাই-এর সকালে বরফ কারখানার পুরনো ছোট ঘরে ঘুম ভাঙতে আমার খুব খারাপ লাগল। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে আমার সর্বস্ব সম্পত্তির ধ্বংসাবশেষ। মেজাজটা বিগড়ে গেল। খাটে শুয়ে জানালা দিয়ে তাকাতে চোখে পড়ল রাষ্ট্রদূতের বাড়ির মাথায় পুরনো শতছিন্ন 'তারকা ও ডোরাকাটা' মার্কা পতাকাটি উড়ছে। নিজের কানে বললাম, 'বিলি কাস্‌পারিস তোমরা সব বোকার দল, এভাবে দিনটা পালন করার কোন মানে হয় না। তোমার ব্যবসা উঠে গেছে। তোমার হাজার হাজার ডলার দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের বাক্সে গিয়ে ঢুকছে। তোমার হাতে আছে মাত্র পঞ্চাশ চিলি-ডলার; কাল রাতে তার দাম ছিল ছেচল্লিশ সেন্ট আর সেটা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। আজ ঐ পতাকা নিয়ে মাতামাতি করে শেষ সেন্টটিও উড়িয়ে দেবে, আর কাল খাবে শুধু কলা আর পানীয় বাবুদের ঘাড়ে চেপে। ঐ পতাকা তোমার জন্য কি করেছে? যতদিন ঐ পতাকার ছায়ায় ছিলে ততদিন খাটা খাটুনি করেই পাওনা পেয়েছো।

বুঝতেই পারছ যে নিজেকে একটি নীলের গাছের মত মনে হচ্ছিল, কিন্তু হাত মুখ ধুয়ে যখন নাবিকের পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম তখন অনেকটা ভাল বোধ করলাম। সমবেত জনতার সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেকে ফিরে পেলাম। তখন আবার নিজেকে বললাম : বিলি, আজ সকালে তো তুমি পকেটের ডলার ও একটা দেশের মালিক। ডলারগুলো উড়িয়ে দাও, আর একজন আমেরিকান ভদ্রলোকের মতই স্বাধীনতা দিবসে এ শহরটাকে মাতিয়ে তোল।

মনে পড়েছে প্রথাগত ভাবেই দিনটা শুরু করেছিলাম। আমরা ছজন কারণ-স্টেরেট ছিল আমাদের আগে। পথে নামলাম। বাতাসে ছড়িয়ে দিলাম যুক্তরাষ্ট্রের গৌরব ও প্রাধান্যের বাণী, অন্যান্য জাতিকে পদানত করার ক্ষমতা। জোন্স আশা করছে যে মিঃ স্টেরেট আমাদের উৎসাহ দেখে অপরাধ নেবে না। হাতের বোতলটা নামিয়ে রেখে স্টেরেটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলল --- দুই শ্বেতাঙ্গের মধ্যে ব্যাপার যখন তখন তার মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের কোন বাদবিবাদ থাকার কথা নয়। বাংকারহিল, প্যাট্রিক হেনরি, আর ওয়ালডর্ফ এস্টর এবং ঐ ধরণের যে কোন অন্যায় আচরণ আমাদের দুই জাতির মধ্যে থাকুক না কেন ক্ষমা করে দেবেন।

স্টেরেট বললেন --'আমুদে বন্ধুগণ, মহারাণীর পক্ষ থেকে আমি জানাচ্ছি সবেতেই একটু নুন ছড়িয়ে দিন। মার্কিন পতাকার আড়ালে শান্তিভঙ্গকারীদের অতিথি হওয়াটা আমার কাছে বিশেষ সম্মান।'

বুড়ো বিলফিঙ্গার মাঝে মাঝেই অলঙ্কারের ফুলঝুরি জ্বালিয়ে বক্তৃতা করতে করতে চলেছে।

হৈ হট্টগোল আরও বাড়তে লাগল। এমন সময় পাশের গলি থেকে একটা খটাখট শব্দ শোনা গেল। হাজির হলেন জেনারেল মেরি এস্পেরাঞ্জা ডিঙ্গো ঘোড়ায় চড়ে, পেছনে দু'শ কালো ছেলে কালো শার্ট পরে খালি পায়ে এগিয়ে এল দশ ফুট লম্বা বন্দুক নিয়ে। জোন্স ও আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম যে তিনি এতে যোগ দেবেন, তাকে অভিনন্দন জানালাম, করমর্দন করলাম।

জোন্সও বলল —'ওঃ জেনারেল আপনি মহান, ঘোড়া থেকে নেমে একটু পানীয় গ্রহণ করুন।

জেনারেল — 'পান? না পান করার সময় নেই। ভিভা লা লিবার্টিড! (মুক্ত মানুষেরা দীর্ঘজীবী হোক!)

হেনরি বার্নেস বলল — 'ই প্লুরিয়াম ইউনাম — ও ভুলে যাবেন না!'

আমি বললাম — 'সেই সঙ্গে আরও বলুন ভিভা জর্জ ওয়াশিংটন, ঈশ্বর ইউনিয়নকে বাঁচিয়ে রাখুন। পরে স্টেরেটকে অভিবাদন করে বললাম —'আর মহারাণীকেও বাদ দেবেন না!'

স্টেরেট বলল —'ধন্যবাদ এবার আমার পালা , সকলেই বারে ঢুকুন।'

কিন্তু তা হল না কারণ কিছু দূরেই গুলির আওয়াজ। ব্যাপারটা কি জানতে জেনারেল ডিঙ্গো সেদিকে ঘোড়া ছোটালেন। সৈন্যরাও তাকে অনুসরণ করল। .

শুনে মনে হল জেনারেলও পাল্টা জবাব দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর কানে এল কামানের শব্দ, আমাদের বুক গর্বে ফুলে উঠল, ডিঙ্গোর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। স্টেরেট শহর-চত্বরে বসে একটা রসাল হাড়ে কামড় দেবেন এমন সময় একটা বুলেট এসে মুখ থেকে সেটা ছিনিয়ে নিল।

আর একটা নিতে যাবেন তখন বললেন, —'কারা যেন কার্তুজ নিয়ে উৎসবে যোগ দিয়েছে। একজন অনাবাসী দেশভক্তের পক্ষে এটা বাড়াবাড়ি, তাই না?

আমি বললাম — 'কিছু মনে করবেন না এটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। জানেন তো, চতুর্থ দিবসে—এটা অনেক সময় ঘটে যায়। নিউইয়র্কে স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রের ঘোষণার পর — আমার বেশ মনে আছে সব হাসপাতালে ও থানায় 'এস আর.ও'-র বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

তখনই জেরির আর্তনাদ শোনা গেল, তার পায়ে বুলেট লেগেছিল। তারপরই শোনা গেল হৈ হল্লার শব্দ। ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন জেনারেল মারি এস্পেরাঞ্জা ডিঙ্গো, পিছনে পিছনে সৈন্যরা। সকলের পিছনে তাড়া করে এল নীল ট্রাউজার ও টুপি পরা একদল উত্তেজিত যোদ্ধা।

জেনারেল চেঁচাতে লাগলেন — 'বাঁচাও দোহাই, বাঁচাও।'

জোন্স বলে উঠল, 'আরে! ওই তো প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী কোম্পানির আজুল। কী লজ্জার বিষয়। বেচারি বুড়ো মারি আমাদের সাহায্য করছিলেন বলে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। এগিয়ে চল ভাই সব আজ আমাদের চতুর্থ দিবস'— সামান্য একটা সেনাদল এসে এটা ভেঙে দেবে?'

উইনচেষ্টারটা হাতে নিয়ে মার্টিন ডিলার্ড বলল, 'আমার ভোট 'না'। চৌঠা জুলাই পান ভোজন করে, কুচকাওয়াজ করা, সাজগোজ করা এবং ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা যে কোন আমেরিকান নাগরিকের এক বিশেষ অধিকার।'

বুড়ো বিল্‌ফিঙ্গার বলল — 'নাগরিক ভাই সকল মুক্তির জন্মলগ্নে আমাদের সাহসী পূর্বপুরুষরা যখন মৃত্যুহীন স্বাধীনতার মূলকেন্দ্র প্রণয়ণ করেছিলেন তখন তারা ভাবতে পারেননি যে বার্ষিক উৎসবটা এভাবে নস্যাৎ হবে। 'প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্র '-কে আমরা রক্ষা করবই।

'এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত হতাম যে যার বন্দুক হাতে নিয়ে নীল সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে তারা পালিয়ে গেল। আমাদের ভোজ সভাটা নষ্ট হয়ে যাওয়াতে মেজাজটাই এত চড়ে গিয়েছিল যে তাদের ক'জনকে আচ্ছা করে পিটুনি দিলাম, জেনারেলও সৈন্যদের নিয়ে যোগ দিল। শেষ পর্যন্ত তারা একটা ঘন কলার ঝোপে লুকাল। তাদেরকে আর না দেখতে পেয়ে সেখানেই বিশ্রাম নিলাম কিছুক্ষণ।

'মনে হয় সেখান থেকে ফেরবার পথে কিছু লোকের একটা জটলা দেখতে পেয়েছিলাম। একটা লম্বা লোক — বিলফিঙ্গার নয়, বারন্দায় দাঁড়িয়ে জুলাই মাসের 'চতুর্থ দিবস' উপলক্ষে বক্তৃতা করছে। গল্পটা এখানেই শেষ।'

কেউ পুরনো বরফ কারখানাটাকে টেনে বসিয়ে দিয়েছিল আমি যেখানে ছিলাম সেখানে। কেননা ঘুম থেকে উঠে কোন পরিবর্তন দেখিনি। সবকিছু মনে পড়তে খোঁজ শুরু করলাম। আমার কাছে কিছু নেই, সর্বশান্ত।

তারপরেই একটা সুন্দর কালো গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়াল। নামলেন জেনারেল ডিঙ্গো সঙ্গে টুপি ও ট্যান করা জুতো পরা একটা লোক।

আমি নিজেকে বললাম —'ঠিক এবার বুঝতে পারছি , আপনারা পুলিশের লোক, আর অতিমাত্রায় দেশভক্তি ও ইচ্ছাকৃত আঘাতের দায়ে বিলি কাসপারিসকে খুঁজজেন। হয়তো সে জেলেই আছে।'

কিন্তু মনে হল জেনারেল হাসছেন, অপর লোকটি আমার সঙ্গে করমর্দন করে আমেরিকানদের ভাষার কথা বললেন—

সেনিওর কাস্‌পারিস আমাদের আদর্শের জন্য আপনার সাহসপূর্ণ সেবার কথা জেনারেল ডিঙ্গো আমাকে বলেছেন। আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনার এবং অন্যান্য সেনিওর আমেরিকানদের সাহসিকতায় এই মুক্তিযুদ্ধে আমরা জয়লাভ করেছি। এই ঘটনা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে।

আমি বললাম —'যুদ্ধ? কোন যুদ্ধ?'

জেনারেল ডিঙ্গো —সেনিওর কাস্‌পারিস বিনয়ী। সেই ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের মধ্যেও তিনি পরিচালনা করেছিলেন সাহসী বন্ধুদের। সত্যি তাদের সাহায্য না পেলে এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যেত।'

আমি—'তাই নাকি? একটা বিদ্রোহ হয়েছিল? ওটা তো ছিল চতুর্থ—।'

এটুকু বলেই ইতি টানলাম।

সঙ্গী লোকটি —সেই সংঘর্ষের পর প্রেসিডেন্ট বোলানো পালিয়ে যেতে বাধ্য হন; আজ কাসলোকেই প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। আমি হয়েছি 'বানিজ্যিক সুযোগ সুবিধা বিভাগের' প্রধান।

আমার ফাইলে এই মর্মে একটা প্রতিবেদন পেয়েছি যে আপনি সেনিওর কাসপারিস চুক্তি অনুযায়ী বরফ তৈরী করেননি।' বলে তিনি হাসলেন।

আমি — 'হ্যাঁ এটা ঠিক। তারা আমাকে ঠিকই ধরেছিল। ব্যাপারটা ঐখানেই শেষ'।

সঙ্গীটি — 'একথা বলবেন না ' দস্তানাটি খুলে সেই কাঁচের চাঙরের ওপর হাত রাখলেন। গম্ভীরভাবে মাথাটা নেড়ে বললেন —'বরফ।'

জেনারেল ডিঙ্গোও হাত রাখলেন, বললেন —'বরফ।'

সঙ্গীটি বললেন —'সেনিওর কাসপারিস যদি ছ' তারিখে ট্রেজারিতে আসেন তাহলে জমা রাখা টাকাটা ফেরত পাবেন।'

বিদায় জানিয়ে দুজনে বেরিয়ে গেলেন। আর গাড়িটা যখন বালির ওপর দিয়ে যেতে লাগল আমি মাটি স্পর্শ করে মাথা নোয়ালাম। কিন্তু এ অভিবাদনটা তাদের জন্য নয়, রাষ্ট্রদূতের ছাদের ওপর পুরনো পতাকাটিকে জানালাম আমার প্রগাঢ়তম অভিনন্দন।

*The Fourth in Salvador

জয়ের মুহূর্তে

বেন গ্র্যাঞ্জরের বয়স উনত্রিশ, মেক্সিকো উপসাগরের তীরবর্তী ছোট শহর কাডিজ এর একজন বড় ব্যবসায়ী ও পোস্টমাস্টার, তাছাড়া সব থেকে বড় কথা একজন যুদ্ধ বিশারদ। তার থেকেই যুদ্ধের নমুনাটা জানা যাবে।

একদিন সন্ধ্যায় চাঁদের আলোয় আমরা দুজন তার বাক্স প্যাঁটরার ওপর বসেছিলাম। এক সময় প্রশ্ন করল, আচ্ছা কিসের জন্য নানান বিপদ, অগ্নিকাণ্ড, গোলযোগ, অনাহার, দুর্ভিক্ষ এই সব বিপদের মধ্যে মানুষ ঢুকে যায়? কেন এসব কাজ করে? কিসের জন্য অন্য সব মানুষকে ছাড়িয়ে যেতে চায়? এমন কী যারা তার থেকে বেশী সাহসী, বেশী শক্তিশালী তাদের থেকেও। তার ইচ্ছেটা কী, কী আশা করে এর থেকে? শুধু খোলা হাওয়া ও অনুশীলনের জন্য তো এসব করে না। আচ্ছা বিল, যখন একজন সাধারণ মানুষ সাধারণতঃ হাটে বাজারে, বক্তৃতামঞ্চে, শিক্ষায়তনে, রণক্ষেত্রে, বনপথে এবং পৃথিবীর সভ্য ও অসভ্য দেশের নানা কর্মক্ষেত্রে উচ্চাকাঙ্খা ও অসাধারণ ঠেলাঠেলির চেষ্টা চালায় তখন তার কি প্রত্যাশা থাকা উচিত?

আমি বেশ ভেবেচিন্তে বললাম—'দেখ বেন যে মানুষ খ্যাতির পিছনে ছোটে তাদের উদ্দেশ্যকে সহজেই তিন ভাগ করতে পারি। উচ্চাকাঙ্খা যেটা জনমসর্থন লাভের ইচ্ছা, লোভ—যার দৃষ্টি সাফল্যের বাস্তবের দিকে। আর কোন নারীর প্রতি ভালবাসা যাকে সে পেয়েছে বা পেতে চায়।'

বেন কথাটা শুনে ভাবতে লাগল। সে বলল—'তোমার কথাগুলি অক্ষরিক অর্থে ঠিক কিন্তু আমি বলছিলাম একটি বিশিষ্ট মানুষ উইলি রবিন্স-এর কথা। এক সময়ে সে আমার পরিচিত ছিল। তোমার যদি শুনতে আপত্তি না থাকে তো তার সম্পর্কে কিছু বলতে চাই আমি।

"স্যান অগস্টিন-এ উইলি ছিল আমাদের বন্ধুমহলের একজন। সেই সময় আমি শুকনো খাবার ও ভুষিমালের পাইকরা ব্যবসায়ী ব্রাডি ও মার্চিসন কোম্পানীর কেরানি ছিলাম। উইলি ও আমি একই ক্লাবে, ক্রীড়া সমিতি ও সামরিক সঙেঘর সভ্য ছিলাম যে কোন হৈ হুল্লোড় করার ব্যাপারে সে ছিল ভীষণ উদ্যোগী।

আগে তার একটা বর্ণনা দিই। তারপর গল্প শুরু করব।

গায়ের রঙ ও চালচলনে একটু ককেসিয়ান ছোঁয়া ছিল। চুল নানা রঙে মেশান, চোখ লীল আর কথাবার্তা কাটাকাটা। তার সঙ্গে কখনও কোন বিরোধ ছিল না। সব কিছুই মানিয়ে নিতে পারত।

এই উইলি মিরা এলিসনকে দেখে একেবারে বিগলিত চিত্ত। গোটা অগাস্টিন-এ মিরা ছিল প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল, কুশলী ও সুন্দরী মেয়ে। সে ছিল কাজল নয়না, উজ্জ্বল কেশিনী আর একান্ত মনোহরিনী তবে মনে কোর না আমি তার প্রেমে পড়েছি। হয়তো পড়তাম কিন্তু বুঝতে পেরে সরে পরেছিলাম।

একদিন রাত্রে মিসেস কর্ণেল স্প্র্যাগিন্স-এর বাড়ীতে আইসক্রীম পার্টি ছিল। উপরের বড় ঘরে ছিল সাজাগোজের ব্যবস্থা। কিছুটা নীচে হলঘরে মেয়েদের প্রসাধনী কক্ষ। এক তলায় নাচের আসর।

এক সময় উইলি রবিন্স ও আমি যখন সাজঘরে ছিলাম, তখনই এলিসন কোথা থেকে সেখানে এল। উইলি তখন আয়নার সামনে চুলগুলো ঠিক করছিল। খামখেয়ালি মিরা হঠাৎ বলে উঠল—

—'হ্যালো উইলি! আয়নার সামনে কি করছ?'

উইলি—'প্রজাপতি হবার চেষ্টা করছি।'

প্রাণখোলা হাসি হেসে মিরা বলল—'দেখ তুমি কোনদিন প্রজাপতি হতে পারবে না।'

মিরা চলে যেতে দেখি উইলির মুখটা ফ্যাকাশে। বুঝলাম খুব মনে লেগেছে। মিরা দোষের কিছু না বললেও উইলি এত ভেঙে পড়েছিল যে বলবার নয়। সে রাতে উইলি একবারও মিরার কাছে গেল না।

পরিদন যুদ্ধ জাহাজ 'মেইন' কে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হল। তার পরে জো বেইলি বা বেন টিলম্যান বা সরকারও হতে পারে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

আসলে কি জান, ম্যাসন ও হ্যামলিন রেখার দক্ষিণ অঞ্চলের সবাই জানে যে উত্তর অঞ্চল একাকি স্পেনের মত এত বড় একটা দেশের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না। সুতরাং ইয়াংকিরা সাহায্যের জন্য আবেদন জানাল। জনি বেরস রাজি হল। তারা জানাল 'আমরা আসছি লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে।'

এরপর আমরা অবিভক্ত এক দেশ হয়ে লড়লাম। আমাদের সৈন্যরাই প্রথম কিউবাতে নামল। সে যুদ্ধের পুরো ইতিহাস তোমাকে বলছি না।

যদি কখনও কাউকে বীর জ্বরে ধরে থাকে তবে সে উইলি রবিন্স। ক্যাস্টিল-এর অত্যাচারীদের মাটিতে পা দেবার মুহূর্ত থেকে সে যেন বিপদ সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠল। সবাই তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। সে কিন্তু বিপদ বরণের মধ্য দিয়ে কর্ণেলের আর্দালি বা কমিসারির টাইপ রাইটারের পদের দিকে গেল না। সে সৃষ্টি করল এক বালক বীর-এর ভূমিকা।

বীর মেতে উঠেছে রক্তপাত, জয়ের মালা, উচ্চকাঙক্ষা, মেডেল, প্রশংসাপত্র এবং অন্য সব সামরিক গৌরব লাভের নেশায়। স্পেনের সৈন্যদল, কামানের গোলা বারুদ অথবা তোষামোদ সামরিক জীবনের কোন বিপদকেই তোয়াক্কা করে না সে। কোঁকড়া চুল ও নীল চোখ নিয়ে সে গিলে খেতে লাগল স্পেনীয় সৈন্যদের। যুদ্ধের কথা শুনে তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে না। একমাত্র জ্যাক অব ডায়মণ্ডস এবং রাশিয়ার রাণী ক্যাথরিন ছাড়া কারও সঙ্গে তুলনা চলে না।

আমি অনেক বুঝিয়ে বললাম—'এ পথ ছেড়ে ভবিষ্যৎ গোছাও। এমন বেপরোয়া যুদ্ধবাজ হলে মৃত্যু অনিবার্য। কেউ তোমার খোঁজ করবে না। আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারিনা কেন তুমি এমন হয়ে উঠলে। তোমাব স্বভাব সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কেমন করে এটা হল।'

উইলি বলল—এসব তুমি বুঝবে না বেন। বলে অবজ্ঞার হাসি হাসল।

আমি বললাম—যেও না। আমার কথা শোন, তোমার কাছ থেকে যতই দূরে থাকার চেষ্টা কর না কেন, তোমার হাবভাব আমাকে ভাবায। কেন তুমি বীর সাজছ আমি জানি। হয় তোমার মাথা খারাপ, না হয় এই পথে চলে কোন মেয়েকে হাত করতে চাইছ। আর এটা যদি কোন মেয়ের ব্যাপার হয় তাহলে একটা জিনিস তোমায় দেখাতে পারি।

আমার পিছনের পকেট থেকে একটা স্যান অগাস্টিন কাগজ টেনে এনে তাকে দেখালাম। কাগজের আধ কলম জুড়ে ছাপা হয়েছে মিরা এলিসন ও জো গ্রানবেরির বিয়ের খবর।

উইলি হেসে উঠল। বুঝলাম এতেও তাকে কাবু করতে পারেনি।

বলল—এটা হবে সকলেই জানত। এক সপ্তাহ আগে খবরটা শুনেছি।

আমি—ঠিক অছে। তাহলে তুমি কেন এমন বেপরোয়া খ্যাতির রামধেনুর পিছনে ছুটছ? তুমি কি দেশের প্রেসিডেন্ট হতে চাও না কি আত্মঘাতী দলের সদস্য?

এই সময় ক্যাপ্টেন ফ্লয়েড নাক গলিয়ে বললেন—এই বাজে বকবকানি থামিয়ে কোয়ার্টারে যাও। নাহলে রক্ষী দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দেব। আপাতত তোমরা বস, আর তোমাদের কাছে কিছু তামাক আছে।

আমি—আমরা চলে যাচ্ছি ক্যাপ্টেন। আমাদের স্নানের সময় হয়ে গেছে। কিন্তু যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিলাম সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? আচ্ছা এখানে উচ্চাকাঙক্ষা কিসের জন্য? দিনের পর দিন মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলে কিসের আশায়? শেষ পর্যন্ত সে কি কিছু পায়? আমি কিন্তু বাড়িতেই ফিরে যেতে চাই। কিউবা ডুবল কি ভাসল তাতে কিছু যায় আসে না। রাণী সোফিয়ো ক্রিস্টিন না চালি কালরার্সন কে এই দ্বীপে রাজত্ব করবে তাতে আমার কি? জীবিতদের তালিকা ছাড়া অন্য কোন তালিকায় নাম তুলতে চাই

না। আপনিও তো দেখছি ঐ তালিকার পিছনেই ছুটছেন। বলুন তো কিসের জন্য আপনি নিজে এমন করছেন?'

দুই হাঁটুর মধ্যে থেকে নিজের তলোয়ার-টা তুলে ক্যাপ্টেন ফ্রয়েড বললেন। দেখ বেন, তোমার এই ভীরুতা ও পলায়নী মনোভাবের জন্য উর্দ্ধতম অফিসার হিসাবে আমি তোমাকে কোর্ট মার্শাল করতে পারি। কিন্তু তা করব না। বরং তোমাকে বলব কেন আমি পদোন্নতি এবং যুদ্ধ ও জয়লাভের প্রাপ্য সম্মান পাবার জন্য এত চেষ্টা করছি। একজন মেজর একজন ক্যাপ্টেনের থেকে অনেক বেশী মাইনে পায়, আর টাকাটা আমার বড় দরকার।

আমি—আপনি খাঁটি বলেছেন। এটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আমি বুঝতে পারিছ না। যে উইলি রবিন্সের বাড়ির লোকরা সকলে ধনী, যে স্বভাবতই ধীর, স্থির এবং উচ্চাকাঙক্ষাবর্জিত, সে কেন হঠাৎ দুর্ধষ যোদ্ধা হয়ে উঠল। আমার মনে হয় এটা একটা সহজ উচ্চাকাঙক্ষার দৃষ্টান্ত। সে চায় ইতিহাসের পাতায় তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাক।

শেষ পর্যন্ত সেটাই ঘটল। ক্যাপ্টেন ফ্লয়েড মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হলেন, বা নাইট কমাণ্ডার হলেন। উইলি রবিন্স হল আমাদের কোম্পানির ক্যাপ্টেন।

হয়ত খ্যাতির জন্য এর বেশি সে আর যায় নি। আমি যতটুকু জানি সমাপ্তি সেই ঘটাল। নিজেই একটা খণ্ডযুদ্ধ সৃষ্টি করে আঠারটা ছেলেকে খুন করল। অথচ এটার কোন দরকারই ছিল না। একদিন রাত্রে আমাদের দশজনকে নিয়ে একশ নব্বই গজ চওড়া একটা ছোট খাঁড়ি পার হয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে, ঝোপঝাড়ের ভিতরে লুকিয়ে একটা ছোট গ্রামে পৌঁছে বেনি ভীডাস নামে এক স্পেনীয় সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করল। আমার মনে হয়েছিল বেনির জন্য এত কষ্ট করার মানে হয় না, কেননা লোকটি কালো,পায়ের জুতো নেই, আর সবথেকে বড় কথা শত্রুপক্ষের কাছে আত্মসমর্পন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

সেই কাজটাই উইলিকে এনে দিল তার বাঞ্ছিত পদোন্নতি। স্যান অগাস্টিন সংবাদ এবং গালভেস্টন সেন্ট লুইস, নিউইয়র্ক ও কান্‌সাস সিটির কাগজে তার ছবি ও দুঃসাহসিক অভিযানের খবর ছাপা হল অনেকটা জায়গা জুড়ে। স্যান অগাস্টিন তার সাহসী ছেলের জন্য হৈচৈ শুরু করে দিল।

পত্রিকাটি সরকারের কাছে প্রার্থনা জানাল সামরিক বাহিনী ও জাতীয় রক্ষীদলকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনা হোক, আর যুদ্ধ চালাবার ভার দেওয়া হোক উইলিকে।

যুদ্ধ শেষ হল। যদি শেষ না হত উইলি তাহলে আরও সোনার মেডেল ও প্রশংসা পেত। কর্ণেল নিযুক্ত হবার দিন তিনেক পর এবং ডাকযোগে আরও তিনটে সোনার মডেল তার হাতে আসার পর যুদ্ধ বিরতি ঘোষনা করা হল।

যুদ্ধ শেষ হলে কোম্পানি স্যান অগাস্টিন -এ ফিরে গেল। পুরনো শহরটা ছাপার আসরে, তারযোগে, বিশেষ লোক দিয়ে জানিয়ে দিল আমাদের সম্মানে বিরাট সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হবে।

আমি আমাদের বললেও, আসলে এ সবের লক্ষ্য ছিল প্রাক্তন সৈনিক বর্তমান ক্যাপ্টেন ও ভবিষ্যত কর্ণেল উইলি রবিন্স। তাকে নিয়ে শহরটা মাতাল হয়ে উঠল।

সকলেরই ইচ্ছা ছিল পূজনীয় কর্ণেল উইলি একটি গাড়ীতে থাকবেন, আর বিশিষ্ট নাগরিকগণ ও অস্ত্রাগারের কিছু অল্ডারম্যান গড়িটা টানবেন। কিন্তু দেখা গেল নিজের

কোম্পানির সঙ্গে থেকেই সকলের আগে আগে স্যান হাউস্টন এভেনিউ ধরে এগিয়ে চলল। রাস্তার দুই দিকের বাড়ীতে পতাকা ও মানুষে ছেয়ে গেল। তাদের মুখে এক ধ্বনি, রবিন্স। অথবা হেলো উইলি! আমার জীবনে উইলি অপেক্ষা এত খ্যাতিসম্পন্ন মানুষ দেখিনি।

আমাদের জানান হল সাড়ে সাতটার সময় আদালত ভবনে আলোকসজ্জা হবে এবং প্যালেস হোটেলে হবে বক্তৃতা ও ভোজন।

অস্ত্রাগারে পৌঁছে শোভাযাত্রা শেষ হবার পর উইলি আমায় বলল, আমার সঙ্গে হেঁটে যাবে?

আমি নিশ্চয়ই যাব, খুব খিদে পেয়েছে। বাড়িতে ফিরে কিছু খেতে হবে।। তা হোক, তোমার সঙ্গে আমি যাব।

একটা গলি ধরে উইলি আমায় নিয়ে গেল, পৌঁছালাম ছোট সাদা রঙের বাড়িতে। ২০×৩০ ফুট মাপের ছোট লনটা ইট ও পুরানো পিপেতে ঠাসা।

আমি বললাম—'আরে থাম আগে সংকেতটা জানাও। এই গোপন আস্তানাটা কি তুমি চেন না? এই পাখির বাসাটা জো প্রামবেরিই তৈরি করেছিল। মিরা এলিসনকে বিবাহ করার আগে। তুমি ওখানে যাচ্ছ কেন?

উইলি এতক্ষণে গেট খুলে ফেলেছে। ইটের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সে সিঁড়ির কাছে গেল। বারান্দায় একটা দোলনা চেয়ারে বসে মিরা সেলাই করছিল। মাথায় চূড়ো করে চুল বাঁধা ছিল। মুখে দাগ। এরকম আগে দেখিনি। বারন্দায় এক কোনে কলার বিহীন সার্ট পরে মুখময় দাড়ি নিয়ে জো মাটি খুঁড়ছে, গাছ লাগবে বলে। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল কিন্তু একটা কথাও বলল না। মিরাও কিছু বলল না।

ইউনির্ফম পরে, মেডেল ঝুলিয়ে সোনালি হাতলের নতুন তলোয়ার নিয়ে উইলিকে ফুলবাবুর মত দেখছিল। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে মিরার দিকে তাকিয়ে দাঁত চেপে বলে উঠল—ওঃ আমি জানি না। চেষ্টা করলে হয়তো আমিও পারতাম।

এই কথাগুলো বলেই উইলি টুপি পরে বেরিয়ে এল।

উইলির কথাগুলি শুনে আমার কেন যেন সেই দিনকার নাচের রাতের কথা মনে পড়ে গেল, যেদিন উইলিকে দেখে ঠাট্টা করেছিল মিরা।

আমরা স্যান হাউস্টন এভেনিউতে ফিরে এলাম। উইলি বললঃ আচ্ছা এবার চলি বেন, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নেব।

আমি— তুমি? তোমার কি হয়েছে বল তো? তোমাকে সম্মান জানানর জন্য সবাই যে অপেক্ষা করছে? সমস্ত রকম অনুষ্ঠান তোমার জন্য আটকে আছে।

উইলি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

বলল—ঠিক আছে বেন। এখনও যদি সব কিছু ভুলে না যাই তো আমাকে ধিক্।

আর তখনই গ্র্যাঞ্জার শেষ কথাটি উচ্চারণ করল—সেই জন্য আমি বলি উচ্চাকাঙ্ক্ষার শুরু যে কোথায়, আর শেষই বা কোথায় তা তুমি বলতে পার?

*The Moment of Victory

গল্প নয়

প্রথমেই বলে রাখি এটা কোন সংবাদপত্রের গল্প নয়। এত পাওয়া যাবে না কোন সর্বজ্ঞ শহর সম্পাদক, খামারবাড়ি থেকে আসা অসাধারণ সম্পাদক বা কোন বিশেষ সংবাদ, কি গল্প। এই কথাগুলি রাখা যাতে সন্দিগ্ধচিত্ত পাঠক বইটি পড়ে ছুঁড়ে না ফেলেন।

পাঠক যদি 'মর্নিং বিওয়েকন' পত্রিকার প্রতিবেদকের ঘরের সেটটাকে ঠিক করে সাজিয়ে দেয় তাহলে প্রতিদান হিসাবে উপরোক্ত প্রতিশ্রুতিগুলিকে ঠিক ঠিক মেনে চলবে।

আমি 'বিওয়েকন'-এ কাজ করি জায়গা অনুপাতে মজুরি হিসাবে। একজন মনে হয় বড় কাজকর্ম সেরে বড় টেবিলের এক পাশে একটুখানি জায়গা ফাঁকা রেখেছে আমার জন্য। আমি সেখানেই কাজ করি। সারা দিন রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার ফাঁকে ফাঁকে শহর কি গোপন কথার্বাতা বলে, আমি লিখে রাখি সেগুলো। আয়ের অঙ্কটা নিয়মিত নয়, তবে আশা করছি একদিন বেতন ভিত্তিক চাকরিটা পাব।

একদিন ঘরে ঢুকে ট্রিপ আমার কাছে এল। ট্রিপ কারিগরি বিভাগে কাজ করত। তবে কি করত জানি না। মনে হয় ছাপা সম্পর্কিত কাজ। কারণ তার গায়ে ফটোগ্রাফির জিনিষপত্রের গন্ধ পেতাম, হাত দুটোয় এসিডের দাগ আর কাটা ছেঁড়া থাকত প্রায়ই। পঁচিশ বছর বয়স হলেও দেখতে চল্লিশ বছরের মত। চেহারা ছিল বিবর্ণ, স্বাস্থ্যহীন, দুঃখী। ব্যবহার চাটুকার সুলভ। পঁচিশ সেন্ট থেকে এক ডলার পর্যন্ত যখন যা পেত তাই ধার করত। তবে এক ডলারের বেশী নয়। যখনই আমার টেবিলে বসত তখনই দুটো হাত চেপে রাখত।

আজকে আমার কিছু প্রাপ্য হয়েছে। রবিবাসরীয় সম্পাদক অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার একটা গল্প মনোনীত করেছে আর তার দক্ষিণা পাঁচ ডলার। তাই মনোভাবটা আমার অন্যরকম ছিল। শুরু করে দিয়েছিলাম লেখা 'চন্দ্রলোকে ব্রুকলিন সেতু' কেমন লাগে। স্বভাবতই বিরক্তির সঙ্গে বললাম—আরে ট্রিপ যে, কেমন চলছে। আজ তাকে কেমন শোচনীয় তোষামুদে দেখাচ্ছিল। এরকম আগে দেখিনি। দারিদ্র্যের এমন এক অবস্থায় সে পৌঁছেছে যেখানে তার প্রতি করুণার মাত্রাটা বেশি হয়ে যায়। তখন মনে হয় তাড়িয়ে দিই।

চোখ পিটপিট করে হাত কচলাতে কচলাতে বলল—'একটা ডলার হবে?'

ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম—হবে, হবে। একটা কেন পাঁচটি হবে। তবে বুড়ো এট্‌ফিসন-এর কাছ থেকে সেটা বাগাতে অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছি। টাকাটা আমি জোগাড় করেছি, একটা অভাব—একটা জরুরী ব্যাপার—মানে ঠিক পাঁচ ডলারের সঙ্কট মেটাবার জন্য।

ডলার হারানার ভয়ে জোর দিয়ে কথাগুলো বললাম।

ট্রিপ বলল—আমি কোন ধার চাইতে আসিনি। শুনে স্বস্তি পেলাম। সে বলে যেতে লাগল—'আমি ভাবলাম যে একটা ভাল গল্পের প্লট পেলে তুমি সেটা লুফে নেবে। সত্যি,

একটা রগরগে গল্প তোমায় দিতে পারি তাতে এক কলম লেখা যাবে। অবশ্য গল্পের মাল মশলা যোগাড় করতে দু এক ডলার খরচ করতে হবে। আমি নিজের জন্য কিছু চাই না।

খুশী হয়ে সম্পাদকীয় চালে কলম বাগিয়ে বললাম—'গল্পটা কি'?

ট্রিপ শুরু করল—"বলছি একটা সুন্দরী মেয়ের গল্প। শিশির ভেজা গোলাপ-কলি-শেওলায় ফোটা ভায়োলেট। এর আগে বিশ বছর লং দ্বীপে ছিল, কিন্তু আগে কখনও নিউইয়র্ক শহর দেখেনি। চৌত্রিশতম স্ট্রীটে দেখা হঠাৎ। তখন সবে পুবালি নদীর ফেরি থেকে নেমেছে। রাস্তাতেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কোথায় গেলে জর্জ ব্রাউনের দেখা পাবে। আমাকে জিজ্ঞাসা করল জর্জ ব্রাউনের কথা! কি রকম মনে হচ্ছে?

তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম পরের সপ্তাহে ডড নামে এক চাষী যুবককে সে বিয়ে করছে। কিন্তু মনে হয় জর্জ ব্রাউন তার যৌবনের কামনায় নায়ক হয়েই আছে। জর্জ ভাগ্যের সন্ধানে চলে আসে শহরে। ও দিকে আডাও। মেয়েটির নাম আডা লোয়ারি। একটা ঘোড়ার গাড়ি চেপে স্টেশনে পৌছাল ৬ঃ ৪৫য়ে শহরের ট্রেনটা ধরবে বলে। জর্জের খোঁজ করল, কিন্তু জর্জ ততদিনে ফিরে গেছে।

বুঝতেই পারছ হাডসন-এর তীরবর্তী শহরটা কেমন, তাই তাকে একা রেখে আসি নি। তার ভালটা দেখাও তো কর্তব্য।

আমিই বা কি করতে পারি? আমার পকেট গড়ের মাঠ। মেয়েটারও পয়সা নেই। আমি আগে যেখানে থাকতাম সেই বত্রিশতম স্ট্রীটে ওকে রেখে এসেছি। ম্যাকগিনিস বুড়ির বাড়ির ভাড়া দৈনিক এক ডলার। বাড়িটা তোমায় দেখিয়ে দেব।

আমি — এসব কি বলছ ট্রিপ? তুমি তো গল্প বলবে বললে? পুবালি নদীর প্রতিটি নৌকায় তো কত মেয়েকে আনা নেওয়া করে।

ট্রিপের মুখের রেখাগুলো গভীর হল।

গম্ভীরভাবে বলল — তুমি কি বুঝতে পারছ না যে এর থেকে একটা ঝকঝকে গল্প হতে পারে। তোমার গল্পটা উতরোবে ভাল, এর জন্য পনের ডলার তো পাবেই, চার ডলার খরচ হলে লাভ এগার ডলার।

আমি সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করলাম, আমার চার ডলার খরচ কেন হবে?

ট্রিপ বলল — এক ডলার মিসেস ম্যাকগিনিসকে, দু ডলার মেয়েটির বাড়ি ফেরার ভাড়া।

আমি — চতুর্থ ডলারটি?

ট্রিপ — এক ডলার আমার হুইস্কির দাম। ঠিক আছে?

রহস্যময় হাসি হেসে এমন ভাব করলাম যেন লিখতে শুরু করব। কিন্তু লোকটাও নাছোড়বান্দা।

বেপরোয়াভাবে বলে উঠল — তুমি কি বুঝতে পারছ না যে মেয়েটাকে আজই বাড়িতে পাঠাতে হবে। তার জন্য আমি কিছুই করতে পারছি না। তাই ভাবলাম এটা লিখলে তুমি কিছু টাকা পাবে। সে যাক্‌গে আজকে তাকে পাঠাতে হবে।

আর তখনই সেই কর্তব্যবোধ অনুভব করলাম। কেন এটা একজনের উপরই পড়বে? আমি জানতাম সেদিন আমার টাকাটা সাহায্যের জন্য খরচ হবে। রাগে গজ গজ করতে করতে ট্রিপের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

আমাকে নিয়ে গেল ম্যাকগিনিস বুড়ির কাছে।

ট্রিপ লাল ইটের বাড়ির বেল বাজাল। তার মুখ দেখেই বোঝা গেল সে কী রকম ভয় পায়।

'আমাকে এক ডলার দাও শীগিগির।' দরজাটা একটু ফাঁক করে সাদা চোখ, হলুদ মুখের ম্যাকগিনিস বুড়ি। ডলারটা দিতেই আমাদের ঢুকতে দেওয়া হল।

সে বৈঠকখানাতেই আছে — ম্যাকগিনিস বলল।

বৈঠকখানার ভাঙা শ্বেত পাথরের টেবিলের পাশে বসে একটা সুন্দরী মেয়ে কাঁদছে, কাঁদলেও চোখ দুটিকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আমার বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে ট্রিপ বলতে লাগল — মিস্ লোয়ারি, আমার বন্ধু মিঃ চামস তোমাকে সেই কথাগুলিই বলবে যা আমি তোমাকে বলেছি। সে একজন প্রতিবেদক, আর আমার চাইতে অনেক ভাল ভাবেই কথাগুলি বলতে পারবে। তাই তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। সে অনেক বিষয় জ্ঞানী। এখন তোমার কি করা উচিত সেটা বলে দেবে।

চেয়ারে বসে ট্রিপের কথা শুনে আমি রেগে বললাম, 'দেখ মিস্ লোয়ারি আমি তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত তবে কিনা...ব্যাপারটা তো আমাকে ঠিকভাবে বলা হয়নি, তাই... আমি—'

মুহূর্তের জন্য খুশী হয়ে মিস্ লোয়ারি বলল—'ওঃ মানে সে রকম কিছু ব্যাপার নয়। আমার পাঁচ বছর বয়সে একবার নিউইয়র্ক এসেছিলাম তারপর এই প্রথমবার। কাজেই শহরটা সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। পথে মিঃ ট্রিপের কাছে আমার এক বন্ধুর খোঁজ করি আর তিনি আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে বলে গেলেন।'

ট্রিপ বলল—শোন মিস্ লোয়ারি, তুমি মিঃ চার্মসকে সব খুলে বল, সে ঠিক পথ বলে দেবে।

মেয়েটির জবাব—তা তো বটেই। তবে বলবারমত কিছু নেই। শুধু এটুকু বলা যায় আগামী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হিরাম ডড-এর সঙ্গে আমার বিয়ে স্থির হয়ে আছে। সমুদ্রের ধারে হি-র-দশ একর জমি, আর একটা খামার আছে। আজ সকালে সাদা ঘোড়ায় চড়ে স্টেশনে এসেছি। বাড়িতে বলে এসেছিলাম সুসি অ্যাডাম্স্ এর সঙ্গে থাকব। সেটা বানান গল্প। কিন্তু আমি ওসব পরোয়া করি না। তাই এখানে চলে এলাম। পথে মিঃ ট্রিপ এর সঙ্গে দেখা হলে তাকে জিজ্ঞাসা—'

ট্রিপ তাকে বাধা দিয়ে বলল—আচ্ছা, এই হিরাম ডড-কে খুব পছন্দ না? মানুষটাও ভাল তাই না?

মিস্ লোয়ারি—নিশ্চয়ই আমি তাকে পছন্দ করি। হি খুব ভাল মানুষ। আমাকে সে ভালবাসে।

এ কথাটা আমিও বলতে পারতাম। মিস আডাকে সকলেই ভালবাসবে।

মিস লোয়ারি—কিন্তু কাল রাতে জর্জের কথা মনে এল আর আমিও—

মাথা নীচু করে কাঁদতে আরম্ভ করল। মনে হল তাকে সান্ত্বনা দিই। কিন্তু আমি তো জর্জ নই আবার হিরামও নই।

এক সময় কথা থামিয়ে সে সোজা হল, মুখে হাসি ফুটে উঠল। আবার গল্প শুরু করল।

আমি খুব হতাশ হয়ে পড়েছি-কিন্তু এছাড়া আমার কিছু করার ছিল না। জর্জ ব্রাউন ও আমি বন্ধু ছিলাম। তার বয়স ছিল আট আমার পাঁচ। চার বছর আগে সে গ্রীণবার্গ ছেড়ে চলে গেল তখন তার বয়স উনিশ। জানিয়ে গেল সে পুলিশ হবে নয়তো রেলের প্রেসিডেন্ট অথবা ঐ রকম কিছু হবে। তারপর আমার কাছে আসবে। সেই থেকে আর কোন খবর পাইনি। আমি তাকে ভালবাসতাম।

মনে হল আর একটা অশ্রুর বন্যা হবে। কিন্তু ট্রিপ সেদিকে না তাকিয়ে বলল—'চালিয়ে যাও মিঃ চার্মস। ওকে বলে দাও কোন রাস্তায় যাবে।'

আমি বুঝতে পারলাম ট্রিপ যা বলেছে সেটাই ঠিক। মেয়েটিকে গ্রীণবার্গে পাঠাতে হবে। হিরামকে আমি ঘৃণা করি, জর্জকে অবজ্ঞা করি। কিন্তু একটা ভাব দেখালাম যাতে মনে হয় আমি লংদ্বীপের প্রতিনিধি।

যতটা পারি সহানুভূতির সঙ্গে বললাম—মিস্ লোয়ারি, যাই বলুন জীবন বড় বিচিত্র। যাদের আমরা প্রথম ভালবাসি কদাচিৎ তাদের বিয়ে করি। জীবনের আলোয় রঞ্জিত প্রথম প্রেম প্রায়ই বাস্তবে রূপায়িত হয় না। কিন্তু জীবন তো বাস্তব ও স্বপ্ন দিয়ে গড়া। স্মৃতি নিয়ে তো কেউ বেঁচে থাকতে পাবে না। আচ্ছা, আমি কি প্রশ্ন করতে পারি একটা? আপনি কি মনে করেন মিঃ ডড-এর সঙ্গে সুখী অর্থাৎ পরিতুষ্ট ও মিলিত জীবন কাটাতে পারবেন?

লোয়ারি জবাব—"ওঃ হি-বড় ভাল, তার সঙ্গে তাল রেখেই চলতে পারতাম। সে কথা দিয়েছিল আমাকে একটা মোটর গাড়ি ও মোটর বোট দেবে। কিন্তু যাই হোক, তাকে বিয়ে করার দিনটা যখন এসে গেল তখন আমি একটা ইচ্ছার কথা প্রকাশ না করে পারিনি। — জর্জের কথা ভেবেই। যেদিন সে চলে গেল সেদিন আমরা দুজনে একটা ডাইমকে দু টুকরো করে কেটে নিজেদের কাছে রেখে দিলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব আর যতদিন না আবার দেখা হয় ততদিন নিজেদের কাছে ওটা রেখে দেব। আমার টুকরোটা বাড়িতে রাখা আছে, এখন মনে হচ্ছে এখানে এসে ভুলে করেছি বুঝতেই পারিনি জায়গাটা এত বড়।

ঈষাৎ কর্কশ হেসে ট্রিপ যোগ দিল—"আহা গ্রামের ছেলেরা যেমন শহরে এসে অনেক কিছু শিখে ফেলে তেমনি অনেক কিছু ভুলে যায়। আমার মনে হয় জর্জ গোল্লায় গেছে নয়তো কোন মেয়ের পাল্লায় পড়েছে, অথবা মদ ও রেস খেলে সর্বশান্ত হয়েছে। তুমি মিঃ চার্মস এর কথা শুনে বাড়ী ফিরে যাও।"

এবার যা হোক কিছু একটা করতে হবে কারণ দুপুর হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে মেয়েটিকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম।

মেয়েটি জানাল স্টেশনের কাছে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে এসেছে। ট্রিপ ও আমি বললাম, ঘোড়টায় চেপে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি চলে যেতে।

কিন্তু আমরাও তার সঙ্গী হলাম। খেয়া ঘাটে হাজির হয়ে গ্রীণবর্গের টিকিট কাটলাম একটা, এক ডলার আশি সেন্ট দিয়ে। বিশ সেন্ট দিয়ে কিনলাম লাল গোলাপ মিস্ লোয়ারিকে দেবার জন্য। নৌকায় উঠে আমাদের দিকে রুমাল নাড়তে নাড়তে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল। ট্রিপ ও আমি দাঁড়িয়ে রইলাম মাটির পৃথিবীতে, জীবনের কঠিন কঠোর বাস্তবের ছায়ায়

নিঃসঙ্গ হয়ে।

রূপ ও রোমাঞ্চও কেটে যেতে লাগল। ট্রিপকে যেন আরও বেশি যন্ত্রনাদীর্ণ ঘৃণ্য ও* কুখ্যাত মনে হল।

ফ্যাসফ্যাসে গলায় প্রশ্ন করল-এর থেকে একটা গল্প বার করে নিতে পারবে না, যে কোন একটা গল্প?

আমি—এক লাইনও নয়। একটা কাহিনীকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি সেটাই একমাত্র পুরস্কার।

ট্রিপ—তোমার টাকাটা খরচ হয়ে গেল বলে দুঃখিত, আমি ভেবেছিলাম এটা নিয়ে জমিয়ে গল্প লেখা যাবে।

খুশির ভাব ফোটাবার চেষ্টা করলাম। বললাম—চল, পরের গাড়িটা ধরে শহরে যেতে হবে।

ট্রিপ তার পুরাণো কোটের বোতাম খুলে পকেট থেকে একটা জীর্ণ রুমাল বার করল। তখনই আমার চোখে পড়ল ভেস্ট-এ ঝোলান একটি সস্তা রূপোর পাতে মোড়া ঘড়ির চেন তাতে সেই রূপোর ডাইমের অর্ধাংশ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম—'সে কি?' সে সাড়া দিল—'হ্যাঁ, আমিই জর্জ ব্রাউন ওরফে ট্রিপ। এটা দিয়ে আর কি হবে?'

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে এক ডলার বের করে তার হাতে দিলাম। আমার কাজকে নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন না, এমন কেউ নিশ্চয়ই নেই।

* No Story

শহুরে-মানুষ

আমি জানতে চেয়েছিলাম দু' তিনটি জিনিস। আমার কোন মাথাব্যাথা নেই রহস্য নিয়ে। অতএব শুরু করলাম তদন্ত। আমার দু' সপ্তাহ সময় লাগল, মেয়েগুলি প্রসাধন-সুটকেশ কেমন করে নিয়ে যায় সেটা জানতে। আমি প্রশ্ন করতে শুরু করলাম তারপর, তোষকটা দুই খন্ডে তৈরী কেন? প্রথমে বেশ সন্দেহের উদ্রেক করল, এই গুরুতর প্রশ্নটা। যে মেয়েরা বিছানা পেতে সেবার কাজ করে তাদের কথা ভেবে তোষকের বোঝাটা হাল্কা করার জন্যই এই কাজটা করা হয়েছে। তাহলে দুটো খন্ড সমান মাপে তৈরী কর, হয়নি কেন? আমিও তথাপি জানতে চাইলাম বোকার মতন। আর তারপর থেকেই তারা আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগল।

যে তৃতীয় জলধারাটুকু পেলাম সেটা "একটি শহুরে মানুষ" বলে পরিচিত চরিত্রটির উপর কিছুটা আলোকপাত। কতটা স্পষ্ট হওয়া উচিত—একটি প্রতীকী চরিত্রের ধারণা তার তুলনায়

সেই লোকটি সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল অস্পষ্টতর। আমাদের একটা মূর্ত ধারণা থাকা দরকার। কোন কিছুকে বুঝতে হলে সেটা যদি কোন কাল্পনিক ধারণাও হয় তার সম্পর্কেও। এখন জন ডো সম্পর্কে যে মানস মূর্তি আমি গড়তে পেরেছি সেটা ইস্পাতে খোদাই মূর্তির মতই স্পষ্ট। চোখদুটি তার হাল্কা নীল, তার পরিধানে বাদামী জামা ও চকচকে কালোসার্জের কোট। সে সব সময় রোদে দাঁড়িয়ে একটু কিছু দেখত; সে আধখোলা অবস্থায় পকেট ছুরিটাকে রাখে। আর বার বার বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে সেটা খোলে। আর "উপরওয়ালা লোকটির" দেখা যদি কোন দিন মেলে, তাহলে সে হবে একটি বড় মাপের বিষন্ন-মানুষ এটা নিশ্চিত জেনো। নীল হাতঘড়ি থাকবে তার আস্তিনের তলায়; বসে পড়ে জুতো পালিশ করাচ্ছে তাকে দেখা যাবে; আর পীরোজা মনি থাকবে কোথাও কাছাকাছি। কিন্তু যখন 'শহুরে মানুষ'টিকে আঁকার সময় এল তখন দেখা গেল যে আমার কল্পনার ক্যানভাসটা একেবারে ফাঁকা। একটা ঘৃণার ভাব (চেশায়ার বিড়ালের হাসির মত) ছিল তার মুখে, আর তার হাতে ছিল হাতকড়ি, ব্যাস এইটুকুই, এটা আমি কল্পন' করতে পারি। তারপর আমি তার সম্পর্কে দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিবেদকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। একজন 'শহুরে মানুষ' তো ক্রিকেট খেলোয়ার ও গদাধারীর মাঝামাঝি কিছু, তিনি বললেন। আপনাকে তিনি ঠিক যে কি তার সঠিক বিবরণ কি ভাবে দেব তাও আমি ঠিক ঠিক জানি না। কিছু করার যেখানে আছে সেখানেই তাকে দেখতে পারেন। হ্যাঁ আমি মনে করি তিনি একটি প্রতীকী চরিত্র। তিনি কেশবিন্যাস করেন প্রতি সন্ধ্যায়; শহরের প্রতিটি পুলিশ ও পরিচারকের নাম ধরে ডাকেন। সাধারণতঃ তাকে একাকী অথবা অন্য একজনের সঙ্গে দেখতে পাবেন।" চলে গেলেন আমার প্রতিবেদক বন্ধুটি। আমিও ঘুরে বেড়াতে লাগলাম মাঠের মধ্যে। ইতিমধ্যে ৩১২৬ টি বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে গেছে বিয়ালেটা সেতুর। যাতায়াত করছে লোকজন কিন্তু তারা আমাকে বাধা দিচ্ছে না। আমার উপর ঘোরাফেরা করছে। বিলাসিনিদের চোখ, কিন্তু কাবু করতে পারছে না আমায়। হোটেলগামী দোকানী মেয়ে, ফেরিওয়ালা, অভিনেতা, চোর-ডাকাত কোটিপতি, সমাজ বিরোধী সব ধরনের* মানুষ হাঁটছে। ছুটছে, টলছে, ভিড় করছে কিন্তু আমার কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সবাইকে চিনি আমি তাদের; মনের কথা জানি আমি তাদের । কিন্তু আমার 'শহুরে মানুষটিকে' আমার চাই। তাকে হারিয়ে ফেললে ভুল করা হবে— সে একটি প্রতীকী চরিত্র, কিন্তু না — যাওয়া যাক একটু অন্য কথায়।

আমার রবিবাসরীয় সংবাদপত্র পাঠরত একটি পরিবারকে দেখতে ভাল লাগে। আলাদা করে দেওয়া হয়েছে কাগজের বিভিন্ন বিভাগগুলি। সাগ্রহে সেই পাতাটাই দেখছেন বাপি যাতে দেখা যাচ্ছে খোলা জানলার সামনে একটি মহিলা খোলা জানলার সামনে ব্যায়াম করছে আর শরীরটাকে বেঁকিয়ে মামনির আগ্রহ অন্যত্র; তিনি অনুমান করতে চেষ্টা করছেনে "এন ডব্লুওয়াই ও কে" শব্দটার শূন্য স্থানে কোন অক্ষরগুলি বসতে পারে। অর্থনীতির প্রতিবেদন-গুলি বড় মেয়েটা সাগ্রহে পড়ছে। নিউইয়র্ক পাবলিক স্কুলে পড়ে আঠারো বছরের ছেলে উইলি। সে মজে গেছে সাপ্তহিক প্রবন্ধটিতে যেখানে বলা হয়েছে একটা পুরণো শার্টকে কি ভাবে নতুন করে তোলা যায়, কারণ আসন্ন পরীক্ষায় সেলাই-এর জন্য সে একটা পুরস্কার পাবে সে আশা করছে।

একটা পানশালায় ঢুকে আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম "শহুরে লোক" সম্পর্কে সে কি জানে? অনেক কথা বলে গেল লোকটি হড়বড় করে। আমি তার মাথামুন্ড কিছুই বুঝতে না পেরে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

একটা গলিপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একসময় স্যাল্‌ভেশন আর্মির একটি মেয়ে হাতের দান-পাত্রটি আমার কোটের পকেটের ঠেকিয়ে একটা ঝাঁকি দিল। "সাধারণতঃ সকলেই যাকে "শহুরে মানুষ" বলে ডাকে এমন কোন চরিত্রের সঙ্গে তোমার কখনও দেখা হয়েছে কি? "আমি তাকে শুধালাম।" তুমি তো প্রতিদিনই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াও, তাই তোমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করছি।"

মনে হচ্ছে আপনি যার কথা বলছেন তাঁকে আমি চিনি। মৃদু হেসে মেয়েটি জবাব দিল। তাদের আমরা একই জায়গায় দেখতে পাই রাতের পর রাত। শয়তানের দেহরক্ষী তারা। যে কোন বাহিনীর সৈন্যদের মতই তারা বিশ্বস্ত সেবক। তাদের কাছে আমরা যাই কয়েকটা পেনিকে তাদের অসৎ কাজকর্মের বদলে প্রভুর কাজের জন্য বাগিয়ে আনতে।

আবার বাক্সটায় ঝাঁকি দিল মেয়েটি; আমিও তার মধ্যে একটা মুদ্রা ফেলে দিলাম। আমার এক সমালোচক বন্ধুকে একটা আলো ঝলমল হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে এগিয়ে গিয়ে তাকেও প্রশ্নটা করলাম। নিউ-ইয়র্ক-এ এক বিশেষ চরিত্রের শহুরে মানুষ আছে, সে উত্তর দিল।

খুবই পরিচিত আমার শব্দটা কিন্তু শব্দটার সংজ্ঞা আমার কাছে আগে কেউ কখনও জানতে চেয়েছে বলে মনে হয় না। তোমাকে তার একটি সঠিক নমুনা দেখানো শক্ত। সব কিছু দেখার ও জানার যে বিশেষ রোগে নিউ-ইয়র্কের লোকেরা ভোগে আমি বরং বলে দিতে পারি যে এই লোকটি তাদেরই অন্যতম এক হতাশ দৃষ্টান্ত। তার জীবন শুরু হয় রোজ সকাল ৬টার সময়। সে কঠোরভাবে মেনে চলে পোশাক ও আচার আচরণের প্রচলিত রীতিগুলিকে। কি সে খট্টাশ বা দাঁড়কাকের সমগোত্রিয় যত্রতত্র নাক গলানোর ব্যাপারে। সে শহরের সর্বত্র উড়নচন্ডীর মত ঘুরে বেড়ায় হেয়ার স্ট্রীট থেকে হার্লেস পর্য্যন্ত। এমন কোন জায়গা তুমি পাবে না সারা শহরের যেখানে সে কোন না কোন কাজে হাজির আছে। সেই একই দশা তোমার "শহুরে মানুষ"টিরও। কোন নতুন কিছুর খোঁজে থাকে সে সব সময়ই। সে বে-আদপ, কৌতুহলী ও সর্বত্র বিরাজমান। তার জন্যই তৈরী হয়েছিল ছ্যাকড়া গাড়ী, সোনালী ব্যান্ড লাগানো চুরুট আর ডিনারের সময় বাজনার অভিশাপও তাই। তারা খুব বেশী নয় সংখ্যায় কিন্তু ওই একই কথা প্রযোজ্য সকলের সম্পর্কে। আমি খুশি হয়েছি তুমি বিষয়টা তোলায়। আমিও অনুভব করেছি এই নৈশরোগের বালাই আমাদের শহরে, কিন্তু আগে কখনও এটা নিয়ে বিশ্লেষণ করার কথা ভাবি নি। এখন বুঝতে পারছি অনেক আগেই তালিকাভুক্ত করা উচিত ছিল তোমার এই শহুরে মানুষটিকে। তার দর্শনই প্রতি সন্ধ্যায়ই মেলে, যদিও সেই রাজহস্তীকে সন্ধ্যায়ই মেলে, যদিও সেই রাজহস্তীকে তুমি আমি দেখতে পাই সপ্তাহে একদিন। কোন চুরুটের দোকান যখন লুঠ হয় তখন সে অফিসারের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করে, তারপর সব দেখে শুনে সেখান থেকে কেটে পড়ে, আর আমি প্রেসিডেন্ট মহলে তার নামের খোঁজ করি, এবং সার্জেন্টিকে দেবার জন্য তারকাদের কাছে তার ঠিকানা খুঁজে বেড়াই।"

নতুন করে কথা আরম্ভ করার জন্য শ্বাস নিতে একটু থামল আমার সমালোচক বন্ধুটি। সেই সুযোগটা আমিও কাজে লাগালাম। "তাকে ধরিয়ে দিয়েছ তুমি।" চেঁচিয়ে উঠলাম আনন্দে। তাঁর প্রতিকৃতিটা শহরের বিশিষ্ট চরিত্রের গ্যালারিতে তুমি ঠিকই এঁকেছ। কিন্তু মুখোমুখি আমি তাকে দেখতে চাই। সরাসরি দেখতেই হবে' শহুরে মানুষ'টিকে। তাঁকে কোথায় পাব? তাকে কেমন করে চিনে নেব?"

সমালোচক বন্ধুটি আমার কথায় কান না দিয়ে বলে উঠল, "শৃঙ্গাঘাতের এক মহৎ রূপ হচ্ছে সে, রবারের নিষ্কাশিত ক্বাথ স্বরূপ; কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার এক অনিবার্য, অখন্ডনীয়, নির্মল ও ঘনীভূত রূপ; তার নব নব সংবেদন নাকের নিঃশ্বাস, যখন অভিজ্ঞতার ঝুলি ফুরিয়ে যায় তখন সে অক্লান্ত পরিশ্রমে নবতর ক্ষেত্রে আবিষ্কারের জন্য"—আমি বাধা দিয়ে বললাম, "মাপ কর, কিন্তু আমার সমুখে এইরকম একটি চরিত্রও কি তুমি এনে হাজির করতে পার?" এটা নতুন জিনিস আমার কাছে। আমি ভাল করে বুঝতে চাই এটাকে। আমি গোটা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজব তাকে না পাওয়া পর্যন্ত। অবশ্যই ব্রডওয়ের কোথাও হবে তার আস্তানা।

আমি ডিনার খেতে এসেছি এখানে। বন্ধু বলল, তুমিও ভেতরে চল। 'শহুরে মানুষ'টি যদি উপস্থিত থাকে এখানে তো তোমাকে দেখিয়ে দেব। আমি এখানকার অধিকাংশ নিয়মিত খদ্দেরকে চিনি।

আমার খাবার সময় হয়নি। আমি তাকে বললাম, কিছু মনে করো না। আজ রাতেই আমার শহুরে মানুষটিকে খুঁজে বের করবই অস্ত্রশালা থেকে লিটল কোনি দ্বীপ পর্য্যন্ত গোটা নিউইয়র্ক চষে ফেলতে হলেও।

আমি ব্রডওয়ে ধরে হাঁটতে লাগলাম হোটেল ছেড়ে এসে। আমাব জীবনে লোকটির খোঁজ করাটা একটা নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে। ভরে দিয়েছে শ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাসকে নতুন উৎসাহে। এমন একটি বৃহৎ, জটিল ও বহুমুখী বিচিত্র শহরে বাস করছি বলে আমি খুশী।

ঘুরে দাঁড়ালাম বাস্তা পার হবার জন্য। একটা কিসের জন্য গুন-গুন আওয়াজ কানে এল। অনেকটা পথ পাড়ি দিলাম স্যান্টোস ডুমন্টে চেপে।

যখন চোখ মেলে তাকালাম তখন গ্যাসোলিনের গন্ধ পেলাম। আমি চেঁচিয়ে বললাম, "এখনও কি শেষ হয়নি এটা?"

আমার কপালে হাত রাখল হাসপাতালের নার্স। না জ্বর নেই। একখানা প্রাতঃকালীন সংবাদপত্র একটি তরুণ ডাক্তার দাঁত বের করে এগিয়ে এসে আমার হাতে দিলেন।

"এটা কি করে ঘটল দেখতে চান?"

খুশির সুরে জিজ্ঞেসা করলেন আমি নিবন্ধটা পড়লাম। আগের রাতে যেখানে গুণগুণ আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম সেখান থেকেই শুরু হয়েছে প্রতিবেদনের শিরোনাম। আব এই পংক্তিগুলি দিয়ে শেষ হয়েছে।'

."— বেলভিউ হাসপাতালে, যেখানে বলা হয়েছে তার আঘাত গুরুতর নয়। আদর্শ 'শহুরে মানুষ' বলেই মনে হয় তাকে দেখে।"

* Inhabitant of city

টবিনের হস্তরেখা

আমি ও টবিন, একদা দু'জন কোনি বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমাদের সম্বল ছিল মাত্র চার ডলার দুজনে মিলে। অথচ একটু হাওয়া বদলের দরকার হয়ে পড়েছিল টবিনের। কারণ তার প্রিয়তমা হবার পর থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে; তার সঙ্গে ছিল টবিনের পৈত্রিক সম্পত্তি শান্নখ জলাভূমির একটি সুন্দর বাড়ি ও শুকর ছানা বিক্রি করে পাওয়া একশ ডলার। ইতিমধ্যে টবিন তার প্রিয়তমার কাছ থেকে মাত্র একটি চিঠি পেয়েছে; তাতে সে জানিয়েছিল, তার কাছে ফিরে আসার জন্য রওনা হয়েছে ক্যাটি। কিন্তু তারপর থেকে সে না পেয়েছ ক্যাটির কোন খবর আর না পেয়েছে তার দেখা। টবিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপণ দিয়েছে, কিন্তু সে মেয়ের খোঁজ তাতেও মেলেনি।

অতএব একদিন কোনির পথে আমি ও টবিন বেরিয়ে পড়লাম; কিছুটা নদীপথে ঘোরাফেরা করলে এবং পপকর্ণের গন্ধ নাকে লাগলে তার মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কঠোর বাস্তববাদী মানুষ টবিন; আর তার মর্মে বড় বেশি করে বিঁধেছিল প্রিয়তমার নিরুদ্দেশের ব্যথাটা। সে দাঁতে দাঁত ঘষল বেলুনওয়ালার ডাক শুনে; গালাগালি করল চলমান দৃশ্যাবলীকে; অগত্যা একটা ছোট গলিতে ঢুকলাম তাকে নিয়ে। সেখানে ভাল লাগার মত জিনিসপত্র কিছু ছিল না। ছয় আট মাপের একটা ছোট স্টলের সামনে টবিন দাঁড়িয়ে পড়ল; হঠাৎ পাল্টে গেল তার চোখের দৃষ্টিটাই।

বলে উঠল, "আমার মন এখানেই ভাল হয়ে উঠবে। নীল নদের দেশের আশ্চর্য গণৎকারকে দিয়ে আমি আমর হস্তরেখা গণনা করাব। আমি দেখতে চাই যা হবার সেটা হবে কি না।" টবিন প্রকৃতির নানারকম লক্ষণ ও অস্বাভাবিক ঘটনাকে বিশ্বাস করত। কালো বিড়ালের বিষয়ে, ভাগ্যমন্ত সংখ্যায় এবং খবরের কাগজের আবহাওয়ার পূর্বাভাষে তার বিশ্বাস ছিল মাত্রাতিরিক্ত সে মনঃপূত মুরগির খোঁয়াড়টার মধ্যে ঢুকে পড়ল। লাল কাপড় আর রেলপথের জংশন স্টেশনের অনেকগুলি রেললাইনের কাটাকাটির মত নানা রেখায় ভর্তি অনেকগুলি হাতের ছবি দিয়ে খোয়াড়টাকে রহস্যজনকভাবে সাজানো হয়েছে। দরজার উপরে লেখা — মাদাম জোজো, মিশরীয় হস্তরেখাবিদ। ভিতরে ছিল একটি মোটাসোটা নারী তার লাল রং-এর জামায় অনেকগুলি আংটা ঝুলছিল; তাতে আঁকা ছিল নানারকম জীবজন্তুর ছবি।'

টবিন তাকে দশ সেন্ট দিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

টবিনের হাতটা নিজের হাতে তুলে ধরে বেশ ভালো করে দেখতে দেখতে মাদাম জো জো বলল, "দেখ হে, তোমার জীবনে অনেক দুর্ভোগ গেছে। আরও খারাপ সময় আসছে। শুক্র স্থানটি

— না কি এটা কোন পাথরে লেগে কেটে যাওয়ার দাগ? — বলছে তুমি প্রেমে পড়েছ। জীবনে অনেক কষ্টে তুমি সেই প্রিয়তমাটির জন্য পেয়েছ।"

আমার কানের কাছে মুখ এনে টবিন ফিসফিস করে বলল, "এই মেয়েটি নির্ঘাৎ ক্যাটি মহ্‌নারের খবর রাখে।"

"দেখতে পাচ্ছি তুমি যাকে তুমি ভুলতে পারছ না সেই তোমাকে অনেক কষ্ট, অনেক ভোগান্তি দিয়েছে — গণৎকারনি বলল। নাম রেখাটাতো দেখছি "কে" ও "এস" অক্ষর দুটির দিকেই নির্দেশ করছে।"

টবিন আমাকে বলল, "আরে!' কথাটা কানে ঢুকল কি?"

গণৎকারটি বলতে লাগল, "বাপু হে, দেখ, পুরুষের গায়ের রং যদি ঘোর কালো হয় আর নারীর গায়ের রং ফর্সা, সেক্ষেত্রে গন্ডগোল দেখা দেবেই। তোমাকে অচিরেই জলপথে ভ্রমণে যেতে হবে। আর তাতে অনেক খরচাপাতিও হবে। তবে একটা রেখা দেখতে পাচ্ছি যেটা মানুষকে সৌভাগ্য এনে দেয়। তাকে দেখলেই তুমি চিনতে পারবে; তার নাকটা বাঁকানো।"

"তার নামটাও কি হাতে লেখা আছে?" টবিন প্রশ্ন করল। "তাহলে সৌভাগ্যের বোঝা নিয়ে সে যখন আসবে তখন তাকে স্বাগত জানাতে সুবিধা হবে।"

ভুরু কুঁচকে গণৎকারনি বলল, "হস্তরেখা থেকে তো নামের বানানটা পাওয়া যায় না; তবে নামটা যে বেশ লম্বা এটা বোঝা যাচ্ছে আর তার মধ্যে "ও" অক্ষরটা অবশ্যই থাকবে। আমার আর কিছু বলার নেই। শুভ সন্ধ্যা। দরজাটা আটকে রেখো না আর।"

জাহাজ ঘাটার দিকে হাঁটতে হাঁটতে টবিন বলল, "এরা কি করে যে সব কিছু জানতে পারে সেটাই আশ্চর্য।

একটি নিগ্রোর জলন্ত চুরুটে টবিনের কানে ছাঁকা লাগল ফটকের ভিড় ঠেলে যাবার সময়, আর গোলযোগের সূত্রপাত হল তা থেকেই। একটা রদ্দা কষাল টবিন তার ঘাড়ে আর তার সঙ্গী মেয়েরা শুরু করে দিল চেঁচামেচি। আমি বেঁটে-খাটো লোকটিকে টানতে টানতে সেখান থেকে সরে পড়লাম পুলিশ আসার আগেই। যখনই কোন কিছুতে মজা পায় তখনই কেমন যেন বিদঘুটে হয়ে যায় টবিনের মেজাজটা।

সে রাতে বোটে চেপে পকেটে হাত দিয়ে টবিন বুঝতে পারল যে তার পকেটমার হয়েছে ভিড়ের মধ্যে। সেই বুঝি তার দুর্ভাগ্যের শুরু।

একটি যুবতী মেয়ে রেলিংয়ের ধারে একটা আসনে বসেছিল। লাল মোটরে সওয়ার হবার উপযোগী তার সাজ পোশাক। চুলের রং কাঁচা মাটির মত। হঠাৎই টবিন মেয়েটির পা মাড়িয়ে দিল পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময়। সে অতিমাত্রায় ভদ্রতা, সচেতন হয়ে পড়ে পেটে নেশার বস্তু কিছু পড়লেই। নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবার সময় এ ক্ষেত্রেও মাথার টুপিটাকে একটু ঘোরাতেই সেটা মাথা থেকে খুলে গেল আর বাতাসের টানে নদীর জলে পড়ে ভেসে গেল। টবিন ফিরে এসে আমার পাশে বসে পড়ল। আমিও ভাল করে নজর দিলাম তার উপর কয়েকটা দুর্ঘটনা লোকটার জীবনে পরপর ঘটে গেল। সেও যেন কেমন বেপরোয়া হয়ে ওঠে ভাগ্য যখন বিরূপ হয় তখনই। কখন কি করে বসবে তা কে জানে।

উত্তেজিত গলায় টবিন আমার হাতটা চেপে ধরে বলতে লাগল, "জন, আমরা এখন কি করছি তুমি কি জান? আমরা জলের উপর ভেসে বেড়াচ্ছি।" আমি বললাম, "ও সব চিন্তা রাখো তো। সংযত কর নিজেকে। দশ মিনিটের মধ্যেই বোটটা আমাদের মাটিতে নামিয়ে দেবে।"

সে বলল, "বেঞ্চিতে বসা ওই ফর্সা মেয়েটির দিকে তাকাও। আর যে কালো লোকটা আমার কানটা পুড়িয়ে দিল তার কথা কি তুমি ভুলে গেলে? আর আমার টাকাটা যে হাওয়া হয়ে গেল তার কি হবে? পঁয়ষট্টি ডলার ছিল আমার পকেটে।"

একটা হৈ চৈ বাধাবার অজুহাত তৈরি করতেই, আমার মনে হল সে দুর্ভাগ্যের একটা তালিকা আমায় শুনিয়ে দিল। তাই আমিও চেষ্টা করলাম, এ সব কিছুই যে তুচ্ছ ব্যাপার সেটা বুঝিয়ে দিতে।

টবিন বলল, "শোন। দৈববানী শোনার মত কানও তোমার নেই, আর ঈশ্বর-প্রেরিত মানুষদের অলৌকিক কান্ড বুঝবার মত মনও তোমার নেই। আমার হাত দেখে কি বলেছে গণৎকার মহিলাটি? সব কিছু তো সত্যি— সত্যি ঘটে গেল তোমার চোখের সামনেই। স্পষ্টই তো সে বলে দিয়েছে, "ভাল করে নজর রেখো। ঘোর রং-এর পুরুষ আর ফর্সা রংয়ের নারী; তোমাকে বিপাকে ফেলবে তারাই। ভুলে গেলে কি সেই কালো লোকটির কথা? এক ঘুষি মেরে যদিও আমি তার বদলা নিয়েছি। আর যে সুন্দরী মহিলার জন্য আমার টুপিটাই জলে ভেসে গেল তার চাইতে ফর্সা কোন মেয়ে কি তুমি দেখাতে পার? আর মুরগির খোঁয়ার থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমার ভেস্টের পকেটে যে পঁয়ষট্টি ডলার ছিল সেটাই বা কোথায় গেল?"

টবিন যে ভাবে কথাগুলি বলল তাতে ভবিষ্যতবানীর কৌশলকেই যেন সমর্থন করা হল; অথচ আমার তো ধারণ যে এই সব দুর্ঘটনা কোনিতে যে কোন মানুষেরই ঘটতে পারত। এর সঙ্গে হস্তরেখা বিচারের কোন সম্পর্কও নেই।

আসন থেকে উঠে পড়ল টবিন। তার ছোট ছোট দুটো লাল চোখ দিয়ে ডেস্কময় পায়চারি করতে করতে অন্য সব যাত্রীদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তার এই ধরনের আচরণের কারণ কি? নিজের মনের কথা কাজে পরিণত করার আগে কেউ বুঝতেই পারবে না টবিনের মনে কি আছে।

সে বলে উঠল, "আমার হস্তরেখায় যে মুক্তির বানী লেখা আছে, তোমার তো বোঝা উচিত, আমি তারই সন্ধান করছি। আমার সুদিন এনে দেব, যে বাঁকা নাক লোকটি আমি তাকেই খুঁজছি। আমাদের সে ছাড়া কেউ বাঁচতে পারবে না জন। এদের চাইতে খাড়া নাকের মানুষ তুমি সারা জীবনে আর কখনও দেখেছ?

ন'টা তিরিশের বোটটা ছিল আমাদের। বোট থেকে নেমে আমরা বাইশ নম্বর স্ট্রীট ধরে শহরের দিকে হাঁটতে লাগলাম। তখন টবিনের মাথায় টুপি ছিল না।

রাস্তার মোড়ে গ্যাস-বাতির নিচে দাঁড়িয়ে একটি লোক চাঁদের দিকে তাকিয়েছিল। লোকটি বেশ ঢ্যাঙ্গা, গায়ে ভাল পোশাক। দাঁতের ফাঁকে একটা চুরুট। দেখলাম, তার নাকটা সাপের কুন্ডলির মত দুটো বাঁক খেয়েছে। সেটা টবিনের চোখেও একই সঙ্গে পড়ল তার নাক থেকে ছুটন্ত

ঘোড়ার মত একটা ভারি শব্দ বেরিয়ে আসছে আমি শুনতে পেলাম। সে লোকটির দিকে সোজা এগিয়ে গেল। আমিও তার সঙ্গে গেলাম।

টবিন লোকটিকে বলল, "আপনাকে শুভরাত্রি জানাই।" একটা চুরুট বের করে ভদ্রতার বিনিময় করল লোকটি।

টবিন বলল, "আপনার নামটি লিখে দেখাবেন কি? আমরা দেখতে চাই নামটা কতটা বড়। আমাদের দিক থেকে আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা দরকারি হয়ে পরতেও পারে।"

বিনীতভাবে লোকটি বলল, "আমার নাম ফ্রীওডন হাউসম্যান—ম্যাক্সিমাম জি. ফ্রীডেন "হাউসম্যান।" লম্বাটাতো ঠিকই আছে, টবিন বলল, "নামের কোথাও কি আপনি 'ও' অক্ষর দিয়ে বানানটা লিখে থাকেন?"

"না তো", লোকটি বলল।

উৎকণ্ঠার সঙ্গে টবিন আবার প্রশ্ন করল, নামটাকে কি 'ও' অক্ষর দিয়ে বানান করা যায়?

নাকের মালিক লোকটি বলল, "বিদেশী বাক্যরীতি যদি আপনার বিবেকে বাধে তাহলে নিজের খুশির জন্য আপনি মাঝখানের ব্যাক্যাংশের কোথাও অক্ষরটাকে বসিয়ে নিতে পারেন।"

'তাহলে তো ঠিকই আছে" — টবিন বলল।

"এখানে আপনার সমুখে এসে হাজির হয়েছি জন ম্যালোন ও ড্যানিয়েল টবিন।' আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম—লোকটি মাথা নুইয়ে বলল। কিন্তু আপনারা যে রাস্তাব মোড়ে দাড়িয়ে বানানের আলোচনা শুরু করবেন এটা আমি ভাবতে পারছি না। আপনারা এখানে কোন বিশেষ প্রয়োজনে এসেছেন বলবেন কি সেটাই"। টবিন জবাব দিল, "আমরা এখানে দুটো লক্ষণ দেখে এসেছি। মিশরীয় হস্তরেখাবিদ আমার হাতের রেখা বিচার করে যে দুটো লক্ষণের কথা বলে দিয়েছে তার প্রকাশ আমরা আপনার মধ্যে পেয়ে গেছি ; আর এটাও বুঝতে পেরেছি , যে বিঘ্ন রেখার ফলে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল একটি কালো মানুষ ও একটি সুন্দরী মহিলার সঙ্গে, আর পয়ষট্টি ডলারের একটি আর্থিক লোকসান তো আছেই— সেই সব দুর্ভাগ্যের রেখাকে, সেই ভাগ্যের জল ছিটিয়ে ধুয়ে মুছে দিতে মনোনীত করা হয়েছে আপনাকেই।"

লোকটি চুরুট টানা বন্ধ করে আমার দিকে তাকাল, বলল "আপনি কি আপনার কথাগুলি সংশোধন করবেন, না কি ওই দলেরই একজন আপনি।"

তারপর বাঁকা নাক লোকটি পুলিশের খোঁজে এ-দিক ওদিক তাকিয়ে বলল,"আপনারা তো দু'জন দেখছি। খুব খুশি হয়েছি আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এবার শুভরাত্রি।" সে চুরুটটা মুখে দিয়ে এই কথা বলে হন হন করে রাস্তাটা পার হয়ে চলে গেল। কিন্তু জোঁকের মত টবিন তার একপাশে লেপ্টে রইল। আর আমি অন্য পাশে। "একি?" উল্টো দিকের গলির মুখে থেমে মাথার টুপিটা পিছনে ফেলে দিয়ে সে বলল, "আমার পিছু নিয়েছেন কেন আপনারা? আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি গর্ববোধ করছি। আপনারা কেটে পড়ুন এই আমি চাই—। আমি আমার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি।"

টবিন তার হাত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল," বেশ তো যান না। আপনি আপনার বাড়িতে ফিরে যান। সকালে আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত আপনার দরজাতেই আমি বসে থাকব।

কারণ সেই সুন্দরী মহিলার অভিশাপ ও কালো মানুষটা এবং একটি পঁয়ষট্টি ডলারের আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে উদ্ধারলাভের একমাত্র পথ আপনার উপর নির্ভর করে থাকা।"

লোকটা এবার আমাকে সুস্থতর পাগল ভেবে নিয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—"এ তো এক আজব ভ্রান্ত দর্শনের ব্যাপার। আপনি বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন ওঁকে?"

আমি বললাম, "শুনুন মশায়। ড্যানিয়েল টবিন যথেষ্টে বুদ্ধিমান লোক। অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলে হয়তো তার বুদ্ধিটা একটু টাল খেয়েছে। আসলে সে একটু বেহাল হয়ে গেছে নিজের কুসংস্কার ও ভবিষ্যদ্বানীর বিশ্বাসের আবর্তে পড়ে। আপনাকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি।" তার পর হস্তরেখাবিদ মহিলার কথা এবং এই লোকটিকেই সৌভাগ্যের বার্তাবহ বলে করে নেওয়া — সব কথা বুঝিয়ে বলে শেষ বললাম, "আমার অবস্থাটা এই গোলমালের মধ্যে একবার বুঝতে চেষ্টা করুন। আমি আমার বন্ধু, টবিনের বন্ধু। একটি সম্পন্ন মানুষের বন্ধু হওয়া সহজ, কারণ তাতে লাভের অংশ জোটে ; কোন গরীবের বন্ধু হওয়াটাও কঠিন কাজ নয়, কারণ উচ্ছসিত কৃতজ্ঞতায় আপনাকে সে আকাশে তুলে দেবে। কিন্তু একটি জন্মবোকা মানুষের সত্যিকারর বন্ধু হলে, বন্ধুত্বের বন্ধনেই টান পড়ে। আর আমাকে সেই দুর্ভোগই ভুগতে হচ্ছে, কারণ আমার মতে কোন যন্ত্র দিয়ে আমার হাতে যখন কিছুই লেখা হয় নি তখন সেই হাত দেখে কোন রকম সৌভাগ্যের কথাও বলা যায় না। আঁর যদিও নিউইয়র্ক শহরে আপনার নামটাই সবথেকে বেশি বাঁকানো, তবু আমার বিশ্বাস হাত দেখে ভবিষ্যদ্বানীর ব্যবসা যারা করে তারা যে আপনাকে দুইয়ে অনেক পয়সা কামাতে পারে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ড্যানির হাতের রেখা যখন আপনার দিকেই ঘুরেছে তখন আপনাকে নিয়ে সে যদি একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে চায় তো করুক ; সেও অবশ্যই শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারবে যে আপনার বাঁট একেবারেই শুকনো। তাতে এক ফোঁটা দুধও নেই। আমি আবিষ্কার করেছি তা নিয়ে আমি একটা বই লিখব।"

"আমাব কথাও লিখবেন একটা বইতে," টবিন বলে উঠল, "লিখবেন তো?"

"না লিখব না, "লোকটি বলল, "কারণ দুই মলাটের মধ্যে তোমাকে ধরে রাখা যাবে না। এখনতো নয়ই। তোমাকে নিয়ে মজাটা আপাতত আমিই উপভোগ করতে চাই, কারণ ছাপাখানার সীমাবদ্ধতাকে নষ্ট করার সময় এখনও আসে নি। তোমাকে ছাপার অক্ষরে উৎকট দেখাবে। আমি একাই চুমুক দিতে চাই— আনন্দের পেয়ালাটায়। কিন্তু আমি তোমাদের দুজনকেই ধন্যবাদ দিচ্ছি হে বাপুরা, আমি সত্যি কৃতজ্ঞ।"

গোঁফের ভিতর গড়্ গড়্ শব্দ করতে করতে টেবিলের উপর একটা ঘুষি মেরে টবিন বলল, "আপনার কথাবার্তা আমার ধৈর্যের পক্ষে চক্ষুশূল। আপনার নাকের বাঁকা অংশটা জাগিয়েছিল সেই ভাগ্যের আশা। কিন্তু তার কথা তো দেখছি ঢাকের বাদ্যির মত। আপনার মুখে পুঁথিপত্রের কথা ফাটলের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসা বাতাসের মতই শোনাচ্ছে। আমি হয়তো এতক্ষণে ভেবেই বাসতাম যে আমার হাতটাই মিথ্যে বলছে। কিন্তু কালো লোকটা ও সন্দরী মাহিলাটিতো মিথ্যে নয় আর"—

"থামো"! ঢ্যাঙ্গা লোকটি বলে উঠল, "মানুষের নাকটাই কি তোমাকে ভুল পথে নিয়ে যাবে? আমার নাকের যে কাজ তা সে করবেই। আমাদের গ্লাসগুলি আর একবার ভরে নেওয়া যাক,

কারণ চারিত্রিক বাতিকগুলোকে ভিজিয়ে রাখাই ভাল, শুকনো নৈতিক আবহাওয়ায় সেগুলো বিকৃত হয়ে যেতে পারে।"

এক সময় আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কারণ এগারোটা বেজে গিয়েছিল। গলিটার মধ্যে একটু দাঁড়ালাম। এখন লোকটি বলল, এবার হঠাৎ লোকটি তারপরই হো হো করে হেসে উঠল। কোনের একটা দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাসল। তারপর আমার ও টবিনের পিঠ চাপড়ে দুই হাতে আমাদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরল।

সে বলতে লাগল, "ভুলটা আমারই।" আমি কি করে আশা করব যে এমন একটা আশ্চর্য সুন্দর পরিস্থিতি আমার সামনে এসে হাজির হবে? আমি তো প্রায় হতভম্বই হয়ে গিয়েছিলাম। কাছেই একটা কাফে আছে ; বেশ আরামদায়ক, আর বাতিকগ্রস্থ লোকেদের পক্ষে খুবই উপযুক্ত জায়গা। চলুন, সেখানেই যাই। সব কথা আলোচনা করা যাবে কিছু পানীয় সামনে নিয়ে। এই কথা বলেই সে আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে লোকটা সেলুনের পিছনের ঘরে নিয়ে বসাল এবং পানীয়ের অর্ডার দিল। সে আমার ও টবিনের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমবা তার ভাই, টেবিলের উপর খামটা রেখে চুরুট ও দিল দুজনকে।

ভাগ্যবান লোকটি বলতে লাগল, "আপনাদের জানা দরকার যে আমার জীবনের পথ হল যাকে বলে সাহিত্যের পথ। আমি রাত হলেই পথে বেরিয়ে পড়ি মানুষের নানা রকম বাতিকের খোঁজে এবং আকাশের সত্যের সন্ধানে। আপনারা যখন আমার কাছে এসেছিলেন তখনও আমার মনের মধ্যে চলছিল আকাশ পথ ও রাতেব প্রধান আলোক বর্তিকার যোগসূত্রের চিন্তা ভাবনা। তা থেকে কবিতা ও কলাবিদ্যা ; চাঁদ তো একটি একঘরে নিরস বস্তু, কেবলই তার পথে ঘুরছে। কিন্তু এ সবই ব্যক্তিগত মতামত, কারণ সাহিত্যের কারবারে সব ধারণাই উল্টে যায়। আমি আশা করছি, সারা জীবনে যে সব আশ্চর্য জিনিস নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। সে আমাকে আর টবিনকে তার সঙ্গে হাটতে বলল। দুই ব্লক দূরে পাশের একটা রাস্তায় পড়লাম। ঝুঁকে পড়া এক সারি ইটের বাড়ি, লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা। তারই একটা বাড়িব সামনে লোকটি থামল। একেবারে উপরের জানলার দিকে তাকাল। সব অন্ধকার।

সে বলল, "এই আমার গরিবখানা ; আমার বৌ ঘুমিয়ে পড়েছে লক্ষণ দেখে বুঝতে পারছি। অতএব আমাকেই অতিথি সৎকারের ব্যবস্থাটা করতে হবে। আমার ইচ্ছা তোমরা নীচে তলার ঘরটাতে ঢুকে যাও ; সেখানেই আমরা আহারাদি করি ; তোমরাও ব্যবস্থানুযায়ী কিছু মুখে দিয়ে নাও। বেশ ভাল মুরগীর মাংস, পনীর, আর দুই এক বোতল বীয়ার সেখানে পাবে।" দুজনেরই খুব খিদে পেয়েছিল, তাই প্রস্তাবটা ভালই লাগল, যদিও তার হস্ত*রেখায় যে সৌভাগ্যের আশ্বাস মিলেছিল সেটা যৎসামান্য পানীয় ও ঠান্ডা খাবারের রূপ নেওয়ায় ড্যানির সংস্কারের আঘাতটা বেশ বড় রকমের লেগেছিল। বাঁকা নাক লোকটি বলল, "তোমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাও, আমি তোমাদের দরজা খুলে দেব। উপরকার দরজা দিয়ে ঢুকে রান্নাঘরে যে নতুন মেয়েটি আছে তাকেই বলে দেব একপাত্র কফি যেন তোমাদের আনিয়ে দেয়। ক্যাটি কফিটা খুব ভাল বানায়, যদিও মাত্র তিন মাস আগে মেয়েটি এ দেশে পা দিয়েছে। তোমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাও ; আমি তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

*Line on the palm of Tobin